[নব পর্য্যায়।]

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় বর্ষ।

১ম খণ্ড—বৈশাখ হইতে আশ্বিন, ১৩১৯।

২য় খণ্ড—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র, ১৩২২।

সম্পাদক—

মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী।

কলিকাতা-কার্য্যালয়।

হ্যারিসন-রোড পোঃ, কলিকাতা।

পাংশা, ফরিদপুর 'কোহিনূর সাহিত্য-সমিতি' হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

কোহিনুর।

দ্বিতীয় বর্ষ।
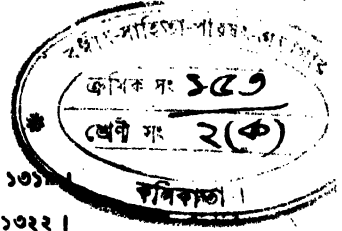
১ম খণ্ড—বৈশাখ হইতে আশ্বিন, ১৩[illegible]।
২য় খণ্ড—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র, ১৩২২।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক ও লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
অকাল (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৮১
অজ্ঞাত (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার বসু	১০৪
অনন্তের আহ্বান	শেখ হবিবর রহমান	২৫৯
অপরাজিতা (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩০৫
অপ্রকৃত নবী	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র	৩৫৩
আজান ...	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	২০১
আধফোটা ফুল (কবিতা)	... ...	৭৬
আবাহন (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৬১
আমাদের কথা ...	... ...	৩০৩
আশা (কবিতা)	শ্রীকুসুমেশ্বর বোল ...	৩৬৮
আরব জাতির ইতিহাস	শেখ রেয়াজউদ্দিন আহ্‌মদ	৫৫, ৯২, ১২৬
আশ্রয় (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার বসু	৪৬
ইঙ্গিত (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১২১
ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণের একাংশ	মোহাম্মদ হাফিজল হাসান	১৮৯,২৫৩,৩৯৬
ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	২১০

বিষয়।	লেখক ও লেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠা।
ইস্লাম বিস্তারে মুসলমানের অপবাদ	মোহাম্মদ কে, চাঁদ	৩৭৭
ইস্লামের স্বরূপ	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	২, ৪৩
ঈশাসন (কবিতা)	ওসমান আলী বি-এল	২৭৮
উপাসনা ...	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	৩২২
কবি (কবিতা)	কায়কোবাদ	৪৯
কবিতা-গুচ্ছ ...	...	৪০, ৭৬, ২৭৭, ৩৬৭
কামনা (কবিতা)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	৩৬৮
কামিনী ফুল (কবিতা)	মোজাম্মেল হক্	৭৬
কারনেজি	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	৩৮৯
কোরান শরীফের নীতি	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি-এল	৮২, ১২২, ১৬২, ২০৭, ২৪১
খনা ...	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	৩৫৮
গরল পান (কবিতা)	শেখ হবিবর রহমান	৪০
গুলেস্তানের গুল্ (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৯, ৭২
গ্রন্থ-সমালোচনা ...	... ...	৭৭, ২৭৯
গৃহহীনের গৃহলাভ (গল্প)	ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৬
চট্টগ্রামের মুসলমান	আবদুল করিম	৩৮৪, ৪১২
জামে অল-আজহারের ইতিহাস	মোহাম্মদ কে, চাঁদ	৬৬, ১০৫, ১৭৭
জিজ্ঞাসা (কবিতা)	শেখ ফজলল করিম	৩৫২
জীবনময়ী (কবিতা)	কায়কোবাদ	১৭৫
জেব-উন্নেসা বেগম	নূরুল হোসেন কাশিমপুরী	১১৬, ১৫৮, ১৮৫, ২৪৬
তীরে (কবিতা)	শ্রীঅবনীকুমার বং	
তৃষিতা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবী	
দস্যুর কাণ্ড (গোয়েন্দার গল্প)	শ্রীপাঁচকড়ি দে	৩১, ৬১,
দুইটি সাধুজীবনের চিত্র	শ্রীশশিভূষণ বসু	
ধর্ম্ম কি ও তাহার মূল কোথায় ?	নবী নওয়াজ খান বি-এ	১১২, ২৬৩,

বিষয়।	লেখক ও লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
ধর্ম্মজীবনের আদর্শ	নূরর রহমান খান ইউসফজী বি-এল	২৮৬
নবাব ঈশা খাঁ মসনদ আলী	মুকুল হোসেন কাশিমপুরী	৫১, ৮৬
নিগ্রো জীবন	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	১৪৬
নিশার সঙ্গীত (কবিতা)	শেখ্ মনসুর আলী	৭৬
নিশীথে (কবিতা)	শেখ্ মনসুর আলী	২২৫
পারস্তকবি রুদাকি	মোহাম্মদ খলিলোল্লাহ্ বি-এ	৩২৯
পুণ্য কথা ...	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল	২৭৩
পুণ্যশ্লোক ওমরের প্রতি (কবিতা)	শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	৩৪
পূর্ণ-কাম (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৭৯
প্রাকৃতিক ধর্ম্ম কি ?	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	৩৬২
প্রার্থনা (কবিতা)	কায়কোবাদ	৪০
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১২০
প্রেম-প্রতিমা (কবিতা)	কায়কোবাদ	১৫১
প্রেমিকের পণ (কবিতা)	মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ	৩০১
প্লিনি	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ	৩৫
		৯৯, ১৩৫
ফ্লোরা (গল্প) ...	খোন্দেকার হোসেন রেজা	১৬৭, ২১৬
বন্ধুর প্রতি (কবিতা)	শেখ ফজলল করিম	৩২০
ভাগ্যদোষ (গল্প)	শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী	৪০৫
মরণের পথ (কবিতা)	শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী	১৮০
মিলনের অন্তরায় (গল্প)	সৈয়দ এমদাদ আলী	২৯৬
মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল	৩১২, ৩৪৩
মেফিয়া হস্তে (গল্প)	শ্রীনলিনাক্ষ রায় চৌধুরী	১৩৯
মৈস্মর-তত্ত্ব ...		১৮১, ২২৮
মোল্লা দোপেয়াজা	সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস	২৫
রত্ন চয়ন ...		১১২, ১৫৩, ২৬৩, ২৭৩, ৩৩৩
বঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গ সাহিত্য-চর্চ্চা	আবদুল করিম	২৮১
বর্ষ মঙ্গল (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১

বিষয়।	লেখক ও লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	৩৩৭
বিবাহ বিপ্লব (উপন্যাস)	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল	১৯৪, ২৩৩, ২৬৫
বিশ্বাসীর পুরস্কার (কবিতা)	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্ বি-এ	১২
বিশ্বাসের মূল্য ...	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল	২৯২
শান্তিজল (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	৪১
শাপমুক্ত (কবিতা)	শেখ ফজলল করিম	৩০২
শিশুর খেলা (কবিতা)	শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক	৭৫
শোভার শেষ (কবিতা)	শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী	৩৬৮
সম্মিলন (কবিতা)	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ	৩৮
সাদি (কবিতা) ...	শেখ্ মনসুর আলি	২৭৭
সাহিত্য-প্রসঙ্গ ...	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী	৩৩৭, ৩৬৯
সাহিত্য সেবা ...	মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	৪০১
সোনার কাঠী ও রূপার কাঠী	শেখ ফজলল করিম	৩৭৬
হজরত ওমরের প্রজাপালন	আহমদ আলী	৭
হজরত ওমরের বিনয়-মাধুরী	আহমদ আলী	৪৭
হজরত রহ্মান শহিদ	আবদুল লতিফ্	৩০৬
হিন্দু-মুসলমান (কবিতা)	শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	৩৬৭
হেমন্তে (কবিতা)	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৬৭

"কোহিনূর" সম্বন্ধে অভিমত।

কোহিনূর।—নব পর্য্যায়। মাসিক পত্র ও সমালোচন। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে কোহিনূর পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। অনেকেই বোধ হয় জানেন, এই পত্রখানি বাঙ্গালার কয়েকজন সুশিক্ষিত মুসলমান কর্ত্তৃক পরিচালিত। বাঙ্গালা—হিন্দু মুসলমানের দেশ। এখানকার মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, তাঁহারা বাঙ্গালাভাষী, সুতরাং বাঙ্গালী। কেবল বাঙ্গালী হিন্দুর উন্নতিতে সমগ্র বঙ্গদেশের উন্নতির আশা করা যায় না। বাঙ্গালার পূর্ণ উন্নতি হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন ব্যতীত কখনই সংসাধিত হইবে না। যাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মগত একতা ভিন্ন পরস্পরের মিলন অসম্ভব, তাঁহারা ভ্রান্ত। ভাষাগত একতাই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। আজ বাঙ্গালী শিক্ষিত মুসলমানগণ তাহা বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। * * * কোহিনূরের সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের যে অপূর্ব্ব সম্মিলন সাধিত হইয়াছে, কবি মহম্মদ মোজাম্মেল হক, সুলেখক আবদুল জব্বর প্রভৃতি মোসলেম সাহিত্যিকগণের বাহুতে বাহু মিলাইয়া, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি যে ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গদেশে হিন্দু মুসলমানের মিলনের শুকতারা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। * * * আমরা আশা করি, কোহিনূর কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষিত হইয়া প্রকাশিত হইবে না। হিন্দু সাহিত্যানুরাগিগণও ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন। ইহাতে মুসলমানের লিখিত যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যদি লেখকের নাম না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই মনে করিতেন, যে উহা কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু-লেখকের রচনা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কোহিনূরের উন্নতি কামনা করি।—"সমাজ।" ২য় বর্ষ—৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

কোহিনূর।—সুদক্ষ মুসলমান সম্পাদক কর্ত্তৃক পরিচালিত ও সম্পাদিত। এ ধরণের মাসিক দুর্লভ ও সমাদরণীয়। অনেক খ্যাতনামা হিন্দু ও মুসলমান লেখক লিখিয়া থাকেন। ইহাতে আরবী পারসী ও উর্দ্দু ভাষা হইতে বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য অনাবিষ্কৃত তথ্য প্রকাশিত হইতেছে। সাহিত্যিক মাত্রেরই ইহা বহু আদরের জিনিষ।—"মেদিনীপুর-হিতৈষী।" ৫ই চৈত্র, ১৩১৮।

কোহিনূর।—হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত মাসিক পত্র ও সমালোচন। আমরা এই অভিনব পত্রিকাখানি প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। পত্রিকাখানি অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। সমালোচ্য সংখ্যা কয়টি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ ও কবিতায় সমলঙ্কৃত। আমরা

আশা করি বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য মহোদয়গণ কোহিনূরের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া সম্পাদককে উৎসাহ দিবেন। এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি সাধন ইহার ব্রত। দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর এই ব্রত সাধনের সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। বাস্তবিক ভারতের হিন্দু মুসলমান পরস্পর গলাগলি হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে এ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোহিনুর সম্পাদক এই মহৎ কার্য্য সাধনে সফলকাম হউন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।—"বরিশাল-হিতৈষী।" ৪র্থ ভাগ, ২৬শ সংখ্যা।

কোহিনুর।—এখানি মাসিক পত্র ও সমালোচন। হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণের লিখিত প্রবন্ধ ও গল্পাদিতে পূর্ণ, একারণ এখানি আমাদের বিশেষ স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শন। ভ্রাতৃভাবে এই কোহিনুর, প্রকৃতই বঙ্গ সাহিত্যের কোহিনুর। ইহার পদ্য প্রবন্ধাদি বেশ সুখ পাঠ্য ও সার কথায় পূর্ণ।—"মহামায়া।" ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

কোহিনুর।—হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি ও জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিই এই মাসিক পত্রিকাখানির প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। বিগত বৈশাখ মাস হইতে এই পত্রিকাখানি নব পর্য্যায়ে বাহির হইতেছে; কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রবন্ধ-গৌরবে ইহা একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে। * * * মুসলমান লেখকগণকে বঙ্গসাহিত্য-সেবায় অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরা অধিকতর প্রীতিলাভ করিয়াছি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে এইরূপ পত্রিকার বহুল প্রচলনের দ্বারা উভয় সমাজেরই কল্যাণের আশা করা যায়।—"নীহার।" ১১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

কোহিনুর।—(নব পর্য্যায়) মাসিক পত্র ও সমালোচন। এই পত্রখানির প্রতি আমরা একান্তই শ্রদ্ধাপূর্ণ। হিন্দু মুসলমানের একত্রে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায়, উভয়ের শাস্ত্র হইতে উচ্চ ভাব সকল প্রচার করিয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি করায় যে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ উন্নতি নিহিত আছে—তাহা এই পত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়া থাকে। কোহিনুর প্রকৃতই— "হিন্দু মুসলমানকে এক মার সন্তান" বলিয়া বুঝে। অন্যত্র একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইল।—"এডুকেশন গেজেট।" ২১শে মাঘ, ১৩২২।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩১৯। [১ম সংখ্যা।

বর্ষ মঙ্গল।

—o—

পুলক-বিস্মিত চিতে ভাবি আমি হে চির-নূতন,
বর্ষে বর্ষে নব বেশে হরিবারে বিশ্ব প্রাণ-মন ;
তুমি কিগো দেখা দাও ! অর্চ্চিবারে ও রঙ্গাচরণ
হে মায়াবী, একটি কি সুপবিত্র মাহেন্দ্র লগন
অতর্কিতে কর দান ! বর্ষে রবি নবীন কিরণ,
গাহে পাখী নব গান, বহে বায়ু নূতন জীবন,
হাসে ফুল অভিনব, তটিনীর লহরে লহরে
নব ছন্দ খেলা করে, ক্ষণে ক্ষণে কি অমৃত ক্ষরে
ব্যাপ্ত করি চরাচর ! অবসন্ন ঘুমন্ত হৃদয়
নবীন আশায় বলে অকস্মাৎ মহিমানিলয়,
জেগে উঠে মহোৎসাহে, চেয়ে দেখে অদূরে সম্মুখে
তোমারি পূজার অর্ঘ্যে সাজাইয়ে বিচিত্র কৌতুকে
কত হাসি, কত অশ্রু, কত প্রেম, কত পুণ্য-প্রীতি,
মহাতীর্থ সাম্মলনে ডাকিছে কে অচেনা অতিথি !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

———

ইস্‌লামের স্বরূপ

রজনীর অবসানে প্রভাতের শুভ্র করস্পর্শে ভুবনব্যাপী নিবিড় তিমিরা-বরণ অপসারিত হইলে বিশ্ব-প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত নগ্নমূর্ত্তি যেমন করিয়া নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠে, বৃক্ষে বৃক্ষে ক্ষুদ্র কিশলয় রেখায় রেখায় প্রকাশিত হয়, প্রান্তরে প্রান্তরে তৃণ-পল্লবে শিশির বিন্দু উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়, তেমনই "ইস্‌লাম" এই একটি মাত্র কথায় মুসলমানধর্ম্মের সমগ্রমূর্ত্তি,—ইহার নিগূঢ়তম দৃশ্য—ইহার ভিতর ও বাহির অতি উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়। পুষ্পের সুগন্ধমাত্র আঘ্রাণে যেমন তাহার স্নিগ্ধমধুর কোমল মূর্ত্তি অন্তরের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তেমনই "ইস্‌লাম" শব্দমাত্র উচ্চারণে মুসলমান ধর্ম্মের সমস্ত রূপ ও রসের সহিত পরিচয় হইয়া যায়।

নামের এমন মহিমা, ভাবের এমন দ্যোতনা, মহিমার এমন যোজনা, শক্তির এমন ব্যঞ্জনা আর কোথায়ও দেখি নাই। মুসলমান জাতির প্রাণ-শক্তির স্পন্দন এই "ইস্‌লামে"র মধ্যেই ধ্বনিত, তাহার বহুশতবর্ষব্যাপী শক্তির প্রকাশ এই "ইস্‌লামে"র মধ্যেই প্রকটিত। পারস্যের অতি প্রাচীন অতি পরাক্রান্ত মহিমময় রাজশক্তি যাহার বলে ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহা তর-বারীর নহে, রোমের বিশ্ব-বিজয়শীল রণশক্তি যাহার বলে নিষ্প্রভ হইয়া গেল তাহা বর্ষার ফলক নহে,—তাহা "ইস্‌লাম"। ইস্‌লাম বর্ষার ফলক নহে, কৃপাণের সুতীক্ষ্ণ ধার ইস্‌লাম নহে, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত দুর্দ্দম্য রণশক্তির হুঙ্কারে ও বিজয়ের দুন্দুভি-নির্ঘোষে ইস্‌লাম প্রকাশিত নহে। পুষ্পের যাহা সুরভি, পল্লবের যাহা শ্যামলতা, দিগন্তবিস্তৃত গগনের যাহা অসীম নীলিমা, ইস্‌লাম মানবাত্মার তাই। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যুগের পর যুগ ধরিয়া গিরি-গহ্বর ও কানন-কান্তারে অস্ফুট মানব-চিত্তে যে অসীমের অনুভূতি জাগিয়াছে, হিম-ঝঞ্ঝাময় পর্ব্বত ও উর্ব্বর নদীসৈকতে, জ্বালাময় মরুভূমি ও স্নিগ্ধ-শ্যামল সমতল ক্ষেত্রে কুটীরে কুটীরে হর্ম্ম্যেহর্ম্ম্যে নিখিল জগতের অধিরাজ সকল মঙ্গলের নিলয় করুণাময় বিশ্ব-পাতার উদ্দেশে মানবাত্মার যে আকুল আবেগ—যে গভীর নিবেদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে "ইস্‌লাম" তাহারই প্রকাশ। সেই অবাঙ্‌ মানসগোচর চির-বাঞ্ছিত প্রভুর প্রতি আপনহারা আকাঙ্ক্ষায় মানবপ্রাণ যে নিত্য শাশ্বতসুরে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে, "ইস্‌লাম" সেই সুরেরই সম্পূর্ণ ঝঙ্কার।

এই জন্যই পৃথিবীতে বিশ্বপতির বাণী প্রচার করিবার জন্য, যুগে যুগে যত তত্ত্ববাহক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, মুসলমান তাঁহাদের সকলকেই মানিয়া লইয়াছে, হজরত ইব্রাহিম, মুসা ও ইসার ধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। খৃষ্টানের জোব—মুসলমানের আইয়ুব নবীর জীবনে যে

বিস্ময়াবহ ঈশপ্রাণতা বিকশিত হইয়াছে, স্বীয় সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া খোদা-তালার বিধান সসম্মানে সাদরে ও সানন্দে মানিয়া লইবার যে অতুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা "ইস্‌লাম"। আর সেই জন্যই মোসলেম-কণ্ঠে তাহার জয়ধ্বনি যুগ যুগ ধরিয়া উচ্চারিত।

স্রষ্টার উদ্দেশে মানবের আকুল আত্মনিবেদন, একান্ত আত্মসমর্পণ ও গভীরতম নির্ভরের ভাব "ইস্‌লামে"র মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছে। শুভ সেই মূহূর্ত্ত যখন মানবকণ্ঠে উচ্চারিত হইল "আস্‌লামতো—হে প্রভো! আমি তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিতেছি; আমার সর্ব্বস্ব তোমা-কেই নিবেদন করিতেছি; তোমার সমস্ত নিদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করি-তেছি। সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, আনন্দে ও বিষাদে হে স্বামি! তোমারই নির্দ্দেশ আমার মাথার মণি; তোমার যাহা দান তাহাই আমার নিকট স্নেহের আশীর্ব্বাদ। হে নিয়ন্তা! আমার জীবনের কাযে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার জীবন-বীণার তারে তারে হে দয়িত! তোমারই ইচ্ছার রাগিণী নিত্য বাজিতে থাকুক, আমার জীবন-সরোবরে হে সুন্দর! তোমারই ইচ্ছার কমল নিত্য বিকশিত হউক।

ইহাই "ইস্‌লাম"। খোদাতালায় সম্পূর্ণরূপে আপনাকে অর্পণ করা, সেই মহা সম্রাটের দরবার হইতে যাহা কিছু আসে স্মিত মনে তাহাই গ্রহণ করা, তাহারই ইচ্ছা-সিন্ধু-নীরে আপন ইচ্ছা-বুদ্‌বুদ মিশাইয়া দেওয়া—ইহাই "ইস্‌লাম"। আরবের আদি মোস্‌লেম এই "ইস্‌লামের"ই সাধনা করিয়াছে। এমন নির্ব্বিকার নিরবলম্ব নির্ভরের ভাব-ধ্বনি বলিয়াই ভারতের মলয়জশীতল কৌমুদীফুল্ল শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে ইস্‌লামের উদ্ভব হয় নাই; চির শিশিরপাত-স্নিগ্ধ নীলনদের কল্লোলে "ইস্‌লাম" প্রথম ধ্বনিত হয় নাই; অথবা বস্‌রার গোলাপকুঞ্জে ইস্‌লাম প্রথম প্রস্ফুটিত হয় নাই;—কিন্তু মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড করবর্ষণে ধরিত্রী যেখানে কঠিন-বক্ষা, প্রকৃতি যেখানে দারুন হাহা-শ্বাসে নিত্য-অগ্নি-ক্ষরা, জীবন যেখানে রসহীন শূন্য ও নিরানন্দ-ময়, সেই কঠিন মরু আরবের বক্ষেই 'ইস্‌লাম' উচ্চ উদাত্ত সুরে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছে। এই খানেই মরণমুখ ময়ূখমালার নীচে, প্রাণধ্বংশী 'লু'র মাঝে, শত্রুর অস্ত্রবর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষ প্রথম "ইস্‌লাম"কে বরণ করিয়া লইয়াছে,—ভগবৎ-সকাশে মানবের আত্মনিবেদন সুরলয়ে বাজিয়া উঠিয়াছে,—মানুষ প্রথম বলিয়াছে, "আমি মোস্‌লেম;—হে খোদাতালা! আমি তোমারই দাস; জীবনে তোমাকেই বরণ করি, মরণে তোমাকেই কামনা করি। তোমার যদি ইচ্ছা হয় প্রভো, তবে অনাহারে এ দেহ শীর্ণ ও শুষ্ক হউক, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে এ দেহ জর্জ্জরিত ও শোণিতাক্ত হউক, নির্ম্মম অত্যাচারে এ জীবন পিষ্ট হউক,—আমি মানিয়া লইব। দাও, দাও, হে মহান, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমার সাজান বাগান শ্মশান করিয়া দাও, আমার কক্ষভরা স্বর্ণ-কলস জলধির বিশ্বপ্লাবিনী উর্ম্মিমালায় মিশাইয়া

দাও, ভীম করাল কলম্ব হইতে কুলিশের উপর কুলিশ হানিয়া, অগ্নির উপর অগ্নি বর্ষণ করিয়া, ঝঞ্ঝার উপর ঝঞ্ঝা বহাইয়া আমার অতি আপন, প্রাণের ধন জন পরিজনকে রেণু রেণু করিয়া দাও,—আমি মানিয়া লইব। আর তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমার করস্পর্শে ধূলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টি হউক, আমার দৃষ্টির সম্মুখে জগজ্জন সসম্ভ্রমে অবনত হউক, আমার রম্যহর্ম্ম্য মণিকাঞ্চনে পূরিয়া উঠুক,—আমি মানিয়া লইব।"

ইহাই "ইস্‌লাম"—ইহাই মোসলেমের ধর্ম্ম। জীবন-বীণা এই সুরে বাঁধিয়াছিল বলিয়া ইস্‌লাম প্রচারের প্রথমযুগে মহাপুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুষ্টিমেয় মুসলমান অর্থহীন, বলহীন ও স্বজনত্যক্ত হইয়াও শত অনাহার অবমাননা ও অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিয়াছে। অসংখ্য শত্রুর অস্ত্রবর্ষণের মধ্যে অটলভাবে দাঁড়াইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। লীলাময় খোদাতালার নিদেশ জীবনে এমন ভাবে মানিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই হজরতের বুকেরধন —মুসলমানের চোখের মণি প্রাণপ্রতিম এমাম হাসান হলাহলের পেয়ালা অম্লান বদনে মুখে তুলিয়া দিয়াছিলেন, মহাবীর এমাম হোসায়েন কার্ব্বালার অগ্নিময় প্রান্তরে কঠোর মরণ বরণ করিয়াছিলেন,—ক্ষোভের একটি অক্ষর উচ্চারণ করেন নাই, দুঃখের একটি নিঃশ্বাসও পরিত্যাগ করেন নাই! কার্ব্বালার সেই ভীষণ শ্মশানে একবিন্দু জলের জন্য স্নেহের পুষ্পগুলি একটি একটি করিয়া শুকাইয়া পড়িয়া বিধাতার বিধান যখন ভীষণভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিল, তখনকার এমাম হোসায়েনকে মনে কর, প্রাণপুত্তলি শিশু তনয়ের বিশুষ্ক কোমলকণ্ঠ সলিল ধারায় সরস হইবার পরিবর্ত্তে নির্ম্মম শত্রুর বাণাঘাতে মৃণালের মত ছিন্ন হইতে দেখিয়া যখন হোসায়েন-জায়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন, তখনকার হোসায়েনের কথা মনে কর, আর যখন মহাবীর হোসায়েনের সিংহবিক্রমে ফোরাতকূল শত্রুশূন্য হইয়া গেল — যখন অঞ্জলি ভরিয়া অমৃতোপম স্নিগ্ধসলিল তৃষাতুর কণ্ঠে ঢালিবার জন্য মুখের নিকট তুলিয়াও তিনি তাহা ফেলিয়া দিলেন, যখন তরবারি আঘাতে শত্রুবৃন্দকে ছিন্নভিন্ন ও পলায়নপর করিয়াও তিনি বর্ম্মচর্ম্ম, অস্ত্রশিরস্ত্রাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘাতকের অস্ত্রমুখে শরীর পাতিয়া দিলেন, তখনকার এমাম হোসায়েনকে মনে কর,—বুঝিতে পারিবে ইস্‌লাম কি, আর মোসলেম কি! ছিন্ন-কণ্ঠ পুত্র কোলে করিয়াও তিনি ক্রন্দন করেন নাই—সর্ব্বস্ব হারাইয়াও তিনি হাহাকার করেন নাই, খোদাতালা সমীপে আকুল হইয়া প্রার্থনা করেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন "হে নিয়ন্তা! আমি 'মোসলেম' —'ইস্‌লাম' আমার ধর্ম্ম। হে প্রিয়তম! এ সকলই যে দান,—আমি মাথায় করিয়া লই;—এ সকলই যে তোমার বিধান—আমি মানিয়া লই।" আর এই জন্যই ত তিনি একরূপ রণজয়ী হইয়াও অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিলেন,— মরণ বরণ করিলেন—প্রভুর বিধান মানিয়া লইলেন।

এমন করিয়া একান্ত আত্মসমর্পণ ও নির্ভরের ভাবে শক্তিময় জগৎপাতার

অনন্ত ইচ্ছাশক্তির সহিত আপন ইচ্ছা ও অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়াছিল বলিয়াই মুষ্টিমেয় মুসলমানের শক্তির অন্ত ছিল না; নিজের সমস্ত শক্তি সেই মহাশক্তিধরের শক্তি-সিন্ধুতে হারাইয়া ফেলিয়া তন্মধ্য হইতে মুসলমান যে শক্তি লাভ করিয়াছিল—তাহার দুর্ব্বার তেজের সম্মুখে জগতের তদানীন্তন প্রত্যেক শক্তি বাত্যামুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া সংখ্যায় দশ গুণ, বার গুণ অধিক রোমক সৈন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও সুশিক্ষিত হইয়াও মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত আরবের পরাক্রমে পুনঃ পুনঃ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হই বটে, কিন্তু যখন মনে হয় রোমকদিগকে যাহারা অবহেলে পরাভূত করিয়াছিল তাহারা "মোসলেম",—"ইস্‌লাম" তাহাদের ধর্ম্ম, তখন আর বিস্ময়ের অবসর থাকে না। খোদাতালায় আত্মসমর্পণ করিয়া মোসলেমগণ যখন শত্রুসৈন্যের উপর আপতিত হইত, তখন তাহাদের মধ্যে ঐশীশক্তির তাড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইত, তাহাদের বাহু এক মহাশক্তির প্রভাবে কার্য্য করিত,—শত্রু সে বল সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখিত না।

মহিমময় স্রষ্টা, করুণাময় পাতা ও শক্তিময় ধাতার প্রতি সমাহিত-চিত্ততা ও তৎসর্ব্বস্বতার এই যে সুর "ইস্‌লামে"র মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে, মুসলমানের নিখিল জীবনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কেবল সেই সুরেরই বাজনা উঠিয়াছে। ইস্‌লামের মহামন্ত্র "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্‌" "ইস্‌লামে"রই তালে তালে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। ইস্‌লামবাদী মোসলেমের কণ্ঠে যখন উচ্চারিত হয় 'আল্লা ভিন্ন উপাস্য আর কেহ নাই' তখন তাহার নিকট যে শুধু ৩৬ কোটী দেবতা, সূর্য্য-চন্দ্র, ভূত-প্রেত, পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ-প্রস্তর প্রভৃতির ঈশ্বরত্ব ধূলিসাৎ হইয়া যায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় জীবনে পার্থিব প্রতি পদার্থের প্রভাব-প্রভুত্ব সে অস্বীকার করে। এক ভীষণ "নাই" শব্দে তাহার সকল মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, তাহার সকল লালসা-কামনা, সকল মোহ অসার অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে। সে বলে "নাই"! "নাই"! হে আমার স্রষ্টা, হে আমার পাতা! তুমি ভিন্ন আর আমার প্রভু নাই; হে মহারাজ! এ রাজ্যের তুমিই অধিপতি, শাসক আর কেহ নহে। দাস আমি তোমারই, আর কাহারও নহি।—নহি আমি কাম-মোহ-মায়ার সেবক, নহি আমি লোভ-হিংসা-ক্রোধের উপাসক, কাঙ্গাল আমি নহি ধনের, হে স্বামি! জগতের সকল হীরা-মাণিক তোমারই প্রীতি। বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য্যচ্ছটা আমার ঈপ্সিত নহে, রাজৈশ্বর্য্যের বিভ্রমময়ী বিলাসলীলা আমার বাঞ্ছিত নহে, অপ্সরাকণ্ঠের পীযুষপ্লাবিনী সঙ্গীতধারা আকাঙ্ক্ষিত নহে। হে সুন্দর! আমার সকল সুষমার তুমিই ভূষা, হে বাঞ্ছিত! আমার

সকল ভোগের তুমিই তৃষা, হে প্রিয়তম! আমার সকল গানের তুমিই সুর।

এই জন্যই মোসলেম-সম্রাট হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মহাপরাক্রান্ত রাজশক্তি ও বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও অমন দীনভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার অঙ্গুলিহেলনে হিরণ্ময় রাজমুকুট ধূলি-ধুসরিত হইয়াছে, তিনি সাতদিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধা নিবারণের জন্য পেটে পাথর বাঁধিয়াছেন, দুইটি খোর্ম্মার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহুদীর হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। মোসলেম কুলভূষণ হজরত আবুবকর সিদ্দিক প্রভুর নামে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন, সংসারের শেষ সম্বল পর্য্যন্ত এমন করিয়া উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, জীর্ণ ছিন্ন মলিন বাস কোমলাঙ্গে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন! ইহা ভিন্ন লজ্জা নিবারণের উৎকৃষ্টতর উপায় পান নাই!

শক্তিগর্ব্বিত ও ধনসমৃদ্ধ রোমকদিগের দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি মহাবীর হজরত ওমরের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যখন সন্ধির আশায় শিবিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তখন সেই বিজয়ী মোসলেমনায়ক ভূমিতল ব্যতীত উপবেশনের শ্রেষ্ঠতর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। মুসলমানের অন্যতম গুরু হজরত আবুহানিফা বাদশাদের খলিফা মনসুর কর্ত্তৃক কাজীর সম্মানিত পদে পুনঃ পুনঃ বরিত হইয়াও সে সম্মান তুচ্ছ করিয়াছিলেন, খলিফার কোপানলে কারাগারে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন - তবুও তাহা গ্রহণ করেন নাই। পদ ঐশ্বর্য্য ও সম্মান মোসলেমগণকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই, ভোগ ও গর্ব্বের লালসা ক্ষণতরে ইঁহাদের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্" ছিল ইঁহাদের জীবনের মন্ত্র ;—তাই স্বীয় জীবনে খোদা ভিন্ন আর কোনও পদার্থের প্রভুত্ব ইঁহারা স্বীকার করেন নাই। ইঁহাদের প্রাণের সকল সাধ ও লালসা সেই মহাপ্রভুর প্রেমেই সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। জীবনের জন্য একমাত্র খোদাকেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, তাই সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ বাষ্পের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের জীবন-সঙ্গীতের সকল রাগিনী স্তব্ধ করিয়া কেবল এই মহারাগিনীই সর্ব্বত্র বাজিয়াছে "হে আমার রাজা, হে আমার প্রভু, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব তুমিই প্রিয়তম ; আমি আর কিছু চাইনা, শুধু তোমাকেই চাই। 'ইসলাম' আমার ধর্ম্ম—'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্' আমার বাণী।"

ক্রমশঃ।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী।

হজরত ওমরের প্রজাপালন

জগতে শাসন, পালন, বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা বলে যে সমস্ত ভূপাল অক্ষয় গৌরব লাভ করিয়া গিয়াছেন, অনন্যসাধারণ প্রজারঞ্জন ও সদাশয়-তার জন্য যে সমস্ত লোকপালের নামে মানব মন চিরদিন ভক্তিভরে অবনত হয়, মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁহাদের অন্য-তম। তিনি আদর্শ প্রজাপালক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রজার সুখ সাচ্ছন্দ্য ও অভাব অভিযোগের প্রতি তাঁহার মনোযোগের সীমা ছিলনা। বিজিত রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন, শাসনকর্ত্তারা প্রজার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখে না, প্রজারাও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ নিজ অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারে না। এ জন্য তিনি বহু সময় দেশের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রজা-দিগের অবস্থা অবগত হইতেন ও তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতীকার করি-তেন। তিনি নিতান্ত সামান্য লোকের ন্যায় সর্ব্বশ্রেণীর প্রজাদিগের সহিত মিশিতেন। তাহাদের দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান ও তাহাদের অশ্রুমোচন করিতেন। দীন-দুঃখী আর্ত্ত-অভাজন তাঁহার স্নিগ্ধমধুর প্রাণময় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। মুসলমানদিগের খলিফা হজরত ওমর কি সুন্দরভাবে প্রজা পালন ও প্রজারঞ্জন করিতেন তাঁহার শাসন সময়ের নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনায় তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

এক সময়ে মহাপুরুষ হজরত ওমর শাম (যিরুজালেম) কুফা, বসরা ও জিজিরায় ভ্রমণ করিয়া প্রজার অবস্থা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন। এতদুপলক্ষে তিনি শামদেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক বহু দীন দরিদ্র প্রজার আবেদন নিবেদন শ্রবণ ও তাহাদের অভাবাদির প্রতীকার করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি তাম্বু দেখিতে পাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন তাম্বুর নিকট এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। খলিফা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বৃদ্ধা! তুমি ওমরের সংবাদ কিছু জান?" বৃদ্ধা বলিল, "জানি, সে শামদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছে। খোদা তাহাকে ধ্বংস করুক, সে আজ পর্য্যন্ত আমাকে

একটি পয়সাও দেয় নাই"। খলিফা বলিলেন, "এত দূর দেশের অবস্থা ওমর কিরূপে জানিবে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "সে যদি প্রজার অবস্থাই অবগত হইতে না পারে, তবে 'খেলাফতি' (রাজত্ব) করে কেন?" ইহা শ্রবণ করিয়া মুসলমানদিগের মহাপরাক্রান্ত অধিপতি হজরত ওমর বেদনা ভরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার আর দুর্দ্দশা রহিল না। এই সামান্য ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় হজরত ওমর কিরূপ আদর্শ লোকপাল ছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর, ভোগবিলাস ও প্রভুত্ব ক্ষমতার মধ্যে নৃপতির আসন রচিত হয় নাই; পরন্তু নিরন্নের কষ্ট, ব্যথিতের হাহাকার ও আর্ত্তের আর্ত্তনাদের মধ্যে তাঁহার স্থান। তিনি নরপতি ও চক্রবর্ত্তী বটে, কিন্তু তিনি লোকপাল—জনসাধারণের অধীন—কোটি কোটি মানব সন্তানের অতি বিশ্বস্ত সেবক; সেবাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও অহঙ্কার। তাই বিজয়শীল মুসলমানের মহামান্য ও মহাপরাক্রান্ত খলিফা হইয়াও হজরত ওমর ছিলেন দীনের অপেক্ষাও দীন, দাসের অপেক্ষাও সেবক।

একবার একদল ভ্রমণকারী পবিত্রধাম মদিনা নগরীর বহির্ভাগে আসিয়া অবস্থান করে। সংবাদ পাইয়া হজরত ওমর তাহাদের তথ্য গ্রহণ ও অভাব অভিযোগ অবগত হইবার নিমিত্ত স্বয়ং তাহাদের নিকট গমন করিলেন। রাত্রে তিনি নিজেই তাহাদের প্রহরাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় শুনিলেন, কে যেন ক্রন্দন করিতেছে। যেদিক হইতে ক্রন্দনের সুর আসিতেছিল, তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি শিশু তাহার মায়ের কোলে বসিয়া কাঁদিতেছে। খলিফা শিশুকে সান্ত্বনা করিতে বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আবার সেই ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। পুনরায় সেই দিকে যাইয়া দেখিলেন, তখনও শিশুটি সেই-রূপ ক্রন্দন করিতেছে। খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে বলিলেন, "তুমি বড় নিষ্ঠুর মা।" স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, "তুমি প্রকৃত অবস্থা জান না, তাই অনর্থক আমাকে বিরক্ত করিতেছ। আসল কথা এই যে, ওমর আদেশ করিয়াছে যতদিন শিশু মাতৃস্তন্য ত্যাগ না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত সে 'বয়তোল মাল তহবিল' (সাধারণ ধনভাণ্ডার) হইতে মাসিক বৃত্তি পাইবেনা। এই জন্যই আমি ইহাকে স্তন্য ত্যাগ করাইতেছি, আর এই জন্যই এ রোদন করিতেছে।" ইহা শুনিয়া হজরত ওমর অত্যন্ত কাতরতার সহিত বলিয়া

ফেলিলেন, "হায় ওমর! তুমি যে কত শিশুকে হত্যা করিয়াছ তাহার অন্ত কি?" সেই দিন হইতে তিনি আদেশ দিলেন, "যেদিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে সেই দিন হইতেই সে মাসিক বৃত্তি পাইবে।"

হজরত ওমরের দাস আসলাম বলিয়াছেন, একদা রাত্রিকালে খলিফা নগরের অবস্থা অবগত হইবার জন্য বাহির হইলেন। মদিনা হইতে তিন মাইল দূরে সারার নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একটি স্ত্রীলোক রন্ধন করিতেছে, আর দুই তিনটি শিশুসন্তান নিকটে বসিয়া রোদন করিতেছে। তিনি নিকটে যাইয়া তাহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল, "কয়েক দিন শিশুগুলি নিয়ম মত খাইতে পায় নাই; আজ কিছুই মিলে নাই, তাই উহাদিগকে বুঝাইবার জন্য শূন্য হাঁড়িতে পানি দিয়া জ্বাল দিতেছি।" এতচ্ছ্রবণে হজরত ওমর অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তখনই মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সাধারণ-ভাণ্ডার হইতে ময়দা, মাংস, ঘৃত ও খর্জ্জুর লইয়া আসলামকে সেগুলি তাঁহার পিঠে উঠাইয়া দিতে বলিলেন। আসলাম বলিল, "আপনি কেন?—আমি আপনার সঙ্গে লইয়া যাইতেছি"। হজরত ওমর বলিলেন, "বেশ—কিন্তু কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন তুমি আমার বোঝা বহন করিবে না।" ফল কথা সমস্ত জিনিষ তিনি নিজে বহন করিয়া সেই স্ত্রীলোকটির নিকট লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি ময়দা হাঁড়িতে চড়াইল, খলিফা চুল্লী জ্বালিয়া দিলেন। খাদ্য প্রস্তুত হইলে শিশুগণ পেট ভরিয়া আহার করিল এবং পরমানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। হজরত ওমর তাহাদের নৃত্য দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল, "আল্লা ইহার পরিবর্ত্তে তোমাকে মহা পুরস্কার দিবেন; আর সত্য কথা বলিতে গেলে ওমর অপেক্ষা তুমিই 'আমীরুল মুমেনীন' (বিশ্বাসীদিগের নেতা অর্থাৎ খলিফা) হওয়ার উপযুক্ত।"

পাঠক! দেখিলেন রাজমহিমা! এই খলিফা ওমর অতি কঠিন বিচারক ও অতি কঠোর শাসক ছিলেন। বড় বড় বীরপুরুষগণ ইঁহার দৃষ্টির সম্মুখে কম্পিত হইতেন। এমন কি যে খালেদের অসাধারণ বাহুবলে মুসলমান সাম্রাজ্য দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল, তিনিও ইঁহার অতি সূক্ষ্ম কঠোর বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। এহেন পরাক্রান্ত মহিমান্বিত খলিফার কি কারুণ্য! কি কোমলতা! কি অপূর্ব্ব বিনয়-মাধুর্য্যে তাঁহার রাজমহিমা দীপ্যমান! কি সেবা-সৌন্দর্য্যে তাঁহার রাজগরিমা

বিলসিত! কি কঠোর শাসক—কি মধুর লোকপাল! তাঁহার লোকপালিনী রাজমহিমার আরও পরিচয় লউন। এমন আর বুঝি দেখেন নাই, শুনেন নাই!

একদা খলিফা রাত্রিতে নগর পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। একস্থানে দেখিলেন, একজন বুদ্দু (বেদুইন) স্বীয় তাম্বুর বাহিরে মৃত্তিকার উপর বসিয়া আছে। তিনিও তথায় গমন করিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিলেন এবং তাহার সহিত নানা বিষয়ক কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। হঠাৎ তাম্বুর মধ্য হইতে ক্রন্দন ধ্বনি শুনা গেল। তিনি বুদ্দুকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমার স্ত্রী প্রসব-যন্ত্রণায় রোদন করিতেছে। হজরত ওমর তখনই গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং একজন রমণীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বুদ্দুর অনুমতি লইয়া তাঁহাকে বুদ্দুর স্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সন্তান প্রসব হইয়া গেল এবং রমণী হজরত ওমরকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমীরুল মুমেনীন! স্বীয় বন্ধুকে (অর্থাৎ বুদ্দুকে) সুসংবাদ দিন।" 'আমীরুল মুমেনীন' শব্দ শুনিয়া বুদ্দু চমকিয়া উঠিল এবং অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। হজরত ওমর বলিলেন, "কিছু মনে করিও না; কাল আমার নিকট যাইও, শিশুর মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" পাঠক! এই শুশ্রূষাকারিণী রমণী আমীরুল মুমেমীন খলিফা ওমরের সহধর্ম্মিণী ওম্মে কুলসুম।

এক বৎসর আরবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেবার হজরত ওমরের আহার-নিদ্রা ও শান্তি ছিল না। যতদিন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ছিল, ততদিন তিনি মাংস ঘৃত মৎস্য ইত্যাদি কোন সুস্বাদু দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই। সর্ব্বদাই অত্যন্ত কাতরতা সহকারে প্রার্থনা করিতেন, "হে আল্লা! আমার পাপে মোহাম্মদের (দঃ) মণ্ডলীকে ধ্বংশ করিও না।" তাঁহার দাস আসলাম বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের সময় হজরত ওমর যেরূপ চিন্তামগ্ন থাকিতেন, তাহাতে বোধ হয় যে, যদি আর কিছু দিন দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হইত তাহা হইলে সেই চিন্তাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য তিনি যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং যে প্রকার দান শৌণ্ডতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ।

একদা জনৈক বুদ্দু হজরত ওমরের নিকট গমন করত একটি আরবী কবিতা পাঠ করে। তাহার অর্থ—"হে ওমর! যদি কিছু সুখ থাকে তবে

সে স্বর্গ-সুখ। তুমি আমার সন্তান দিগকে ও তাহাদের মাতাকে বস্ত্র দান কর; আল্লার শপথ তোমাকে ইহা করিতেই হইবে।" হজরত ওমর বলিলেন, "আর তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যদি না করি, তবে কি হইবে?" বৃদ্ধ আর একটি আরবী কবিতায় উত্তর দিল, "কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন আমার সম্বন্ধে তোমার নিকট প্রশ্ন করা হইবে। তাহাতে তুমি আকুল ও দিশাহারা হইয়া পড়িবে। তারপর দোজখ বা বেহেস্তের দিকে তোমার গমন হইবে।" উত্তর শুনিয়া হজরত ওমর এত ক্রন্দন করিলেন যে অশ্রুজলে তাহার শ্মশ্রু অভিসিক্ত হইয়া গেল। তিনি স্বীয় দাসকে আদেশ দিলেন, 'আমার এই জামাটি বৃদ্ধকে প্রদান কর, এখন ইহা ভিন্ন আমার নিকট আর কিছুই নাই।'

হজরত ওমর যে শুধু জনসাধারণের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা নহে। যদিও সামরিক নিয়ম পালন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, তাহা হইলেও সৈন্যদিগের সুখদুঃখ সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন থাকিতেন না।

তিনি একদিন রাত্রিতে নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। একস্থানে শুনিলেন, একটি স্ত্রীলোক অট্টালিকার ছাদে বসিয়া এই গান গাহিতেছে— "একে রজনী অন্ধকার তায় আবার অতি দীর্ঘ। হায়! আমার বন্ধু আমার পার্শ্বে নাই যে তাহার সহবাসে সুখী হইতে পারি।"

এই স্ত্রীলোকটির স্বামী বিদেশে ধর্ম্ম যুদ্ধে গিয়াছিল। তাই সে তাহার বিচ্ছেদে এই মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত গান করিতেছিল। খলিফা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি আরব রমণীগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিয়াছি।" গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি প্রেরিত মহাপুরুষের সহধর্ম্মিনী বিবি হাফেজার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "স্ত্রীলোক কত দিন পর্য্যন্ত পুরুষ ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে?" তিনি বলিলেন, "চার মাস পর্য্যন্ত।" পরদিন খলিফা সর্ব্বত্র আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন যে, কোন সৈন্যই চারি মাসের অধিক কাল স্ত্রীত্যাগ করিয়া বিদেশে অবস্থান করিতে পারিবে না। *

খলিফা হজরত ওমর মৃত্যুকালেও প্রজাদিগকে ভুলিতে পারেন নাই।

* এই সমস্ত ঘটনা 'তারিখ-ই-তিবরি', 'কাঞ্জুল আমান', 'খাজানাতুল খাফা' এবং 'সাদল গাতেফা' এই সকল সুবৃহৎ ও সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

জীবনের শেষ সময়েও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রজাদিগের হিতচিন্তা করিয়া গিয়াছেন। সন্তানসম প্রজার কল্যাণ কামনায় এই মহাপুরুষ ভূপতির শেষ মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রজাপালন সম্বন্ধে তিনি সমবেত লোকদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন,—"আমার অন্তে যিনি খলিফা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার এই অন্তিম উপদেশ,—তিনি যেন এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রজাবর্গের স্বত্বাধিকার যথাযথ ভাবে রক্ষা করেন। ১ম—মহাজের (যাঁহারা জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করত হজরতের সহিত মদিনা-বাসী হইয়াছিলেন); ২য়—আন্‌সার (মদিনাবাসী মুসলমানগণ); ৩য়—আরববাসী (বুদ্দু সম্প্রদায়); ৪র্থ—রক্ষিত-সম্প্রদায় (অর্থাৎ মুসলমান শাসনাধীন ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নি উপাসক প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবৃন্দ, যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার মুসলমানদিগের উপর ন্যস্ত ছিল); ৫ম—প্রবাসী আরব।" তৎপর তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে উপদেশ দিয়া রক্ষিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে এই অনুশাসন প্রদান করেন—"আমি আমার পরবর্ত্তী খলিফাকে উপদেশ দিতেছি, তিনি যেন আল্লাহ্‌তালা ও প্রেরিত মহাপুরুষের গচ্ছিত বিষয় সংরক্ষণ করেন, অর্থাৎ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট তিনি যাহা প্রতিশ্রুত হইবেন, তাহা যেন সম্পূর্ণরূপে পালন করেন; তাহাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করেন এবং তাহাদিগের উপর কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার না করেন।"

আহমদ আলী।

বিশ্বাসীর পুরস্কার।*

১

'বাহ্‌রেণের' অধিপতি, 'এব্‌নে সওয়া' নামে রাজা,
মরুভূ-প্রান্তরে,
যুঝিছেন শৈল-বাসী-আরব-সন্তান সনে
দুর্ব্বার সমরে!

---

* সার এডউইন আর্ণল্ড কৃত "দি পার্লস্ অভ ফেথ' নামক মুসলমান-মাহাত্ম্য সংক্রান্ত ইংরাজী পুস্তক হইতে গৃহীত।

তায়েফ-পুত্র-সইদ নামে 'শেখ'-শিরোমণি
ভক্ত একজন
বন্দীভূত সে সমরে হ'ল রাজ-সৈন্য দ্বারা
সহ ভ্রাতৃগণ।
রাজা দিয়াছেন আজ্ঞা—"প্রত্যেক দশম শেখ
সহ সেনাপতি
করবালে ছিন্ন-শির হয়ে ভূলুণ্ঠিত হ'বে"—
নাহি অন্য গতি!
ভাগ্য-দোষে সেই ভক্ত গণনায় দশমের
হয়ে একজন,
বধ-হেতু নীত হ'ল বস্ত্রাবাস-প্রাঙ্গনেতে
সহ রক্ষিগণ।
সান্ত্রীদলে 'খোজা' এক অসভ্য ও কৃষ্ণকায়
হন্তারূপে আসি'
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে দাড়া'ল দৈত্যের বেশে
হেসে' অট্টহাসি!

অকস্মাৎ নৃপবর কি জানি কি ভাবি' মনে
চাহি তার প্রতি,
বধ-পূর্ব্বে 'এ জিজ্ঞাসা করেন' আরব শেখে
স্নেহে গলে অতি!—
"সমরের পূর্ব্বে যবে কৃষ্ণসার মৃগয়ায়
গিয়াছিনু বনে,
তুমিই না তৃষা মোর করিয়াছ নিবারিত
অম্বু বিতরণে?"
"হাঁ আমি সে শেখ" বলি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ উত্তরিলা
চাহি নৃপ-পানে;
রাজা বলে, "প্রাণ বিনা চাহিবে যে বর তাহা
পূরাইব দানে।"

'সইদ' বলিলা "মৃত্যু আমার নিকটে নৃপ,
নহে ভয়ঙ্কর,
স্বইচ্ছায় মৃত্যুকামী হ'য়ে হইয়াছি যবে
রণে অগ্রসর!
কিন্তু, মম বস্ত্রাবাসে স্বর্গ-পারিজাত সম
শিশু সুকুমার
লভেছে জনম, তার মুখচন্দ্র নেহারিতে
বাসনা আমার—
নেত্রদ্বয় চিররুদ্ধ হইবার আগে মোর
শেষ একবার
তনয়ের মুখ হেরে' ভুঞ্জিতে জীবনে সাধ
আনন্দ অপার!
একটি দিনের তরে আমার জীবন তুমি
কর আজি দান,
আবার দিবস-শেষে ঝটিতি হেথায় আসি'
সঁপিব পরাণ।"

৩

নৃপতি কহিলা হাসি, "তোমার বিহনে শেখ
স্বীয় প্রিয় প্রাণ
স্বইচ্ছায় বলি দিবে তিলার্দ্ধ দেরিতে তব
হয়ে আগুয়ান;
এ হেন প্রতিভূ যদি থাকে তব কোন জন
আনহ এখানে"
"আমিই প্রতিভূ তার" কহিলা আরব এক
চাহি নৃপ পানে।
এসহাক নাম তার সাহসে পূরিত বক্ষ
সুঠাম শরীর,
তায়েফ নিবাসী যুবা বন্দী দলে লভি' প্রাণ
ভাগ্য বান বীর!

"ভাগিনেয় আমি তাঁর, বাঁধহ আমার ভুজ
সুদৃঢ় বন্ধনে,
মাতুলে করহ মুক্ত, যাক্ সে ঝড়ের বেগে
অশ্ব-আরোহণে
স্বীয় বস্ত্রাবাসে চলি', জীবনের শেষ সাধ
করুক পূরণ—
নবজাত তনয়ের লাবণ্য-মণ্ডিত মুখ
করি' দরশন!
নির্দ্দিষ্ট সময় গতে আবার আসিবে ফিরি'
ত্বরিত গমনে,"
বলি' নিরবিলা যুবা, শেখ মুক্তি লভি' গেলা
স্বকীয় ভবনে।

৪

বস্ত্রাবাসে সবে মিলি' হাসিলা বিশ্বাসী সেই
আরব-যুবায়
কহিয়া "জীবন নিজ দিতেছ নির্ব্বোধ মত
'শেখে'র কথায়!
শাণিত কৃপাণ-মুখে স্বীয় প্রাণ প্রদানিতে
কে ছুটেছে কবে?
ভয়-বিতাড়িত শিবা কোথা ফিরে আসে বল,
পাশ-মুক্ত যবে?
কোথা কবে শ্যেন পাখী আসিয়াছে পাশে পুন
তীব্র জ্বালা সহে'?
মরু-সমীরণ তবু ডাকিলে আসিতে পারে
শেখ্ কভু নহে!"
বিশ্বাসী-প্রধান সেই যুবক-বদন এই
অবিশ্বাস বাণী
স্বর্গীয় মাধুরীময় প্রীতি-ফুল্ল হাসি-রেখা
দিলা শুধু আনি!

মধুরে কহিলা যুবা "মোস্‌লেম-তনয় মোরা
সত্যসন্ধ সবে,
নিশ্চয় আসিবে শেখ, বাক্য তার দেছে যবে
—অন্যথা না হবে।"
তখনো না আসে যদি বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রাণ
দিব অসি তলে,
কাঁপিবেনা এ হৃদয় জন্মমোর বীর্য্যবন্ত
মোস্‌লেমের দলে!

৫

দিবা অবসান প্রায়,—"সইদ্‌" না আসে তবু
—"আর কেন তবে?"
প্রতিভূ আরব-যুবা 'এসহাকে' বধ্য-ভূমে
নিয়ে গেলা সবে;
এখনই প্রাণতার খরকরবাল মুখে—
হবে বলিদান,
নাহি অন্য গতি আর—তবুও বদনে তার
হাসি বিদ্যমান!
সুধীরে কহিলা যুবা "অস্তগামি তপনের
ক্ষীণ রেখা যবে
আজি এই ধরা হ'তে নয়ন হইতে মোর
চির লুপ্ত হবে,
তখন বধিও মোরে—তা'র পূর্ব্বে-বধ-কার্য্য
রাখহ বারণ,
সায়াহ্নে নিশ্চয় 'শেখ' যেন ধ্রুব করিবেন
হেথা আগমন।"

৬

তপনের শেষ আভা আকাশের কোল হ'তে
যেই গেল খসি'
কৃষ্ণকায় হন্তা আসি বধ-হেতু দাঁড়াইলা
উঠাইয়া অসি!

আর যে গো রক্ষা নাই—মুহূর্ত্তে লুণ্ঠিত হ'বে
এস্হাকের শির !
সকলেরি মর্ম্ম কাঁপি' উঠিয়াছে বেদনায়
—সব চক্ষুস্থির !!
একি দৃশ্য ! 'সইদের' শ্বেত-অশ্ব তীর বেগে
আসিয়া অমনি
উগারি' অনল শ্বাসে রাজ-বস্ত্রাবাস পার্শ্বে
দাঁড়াল তখনি !
এক লম্ফে 'জিন' হ'তে 'সইদ্' পড়িয়া ভূমে
যুবার নয়নে
সহস্র চুম্বন দিয়া, কহিলা সুধীরে সবে
"আমি যে এখানে !"

তখন কহিলা নৃপ "পরার্থে আপন স্বার্থ
—স্বীয় প্রিয়-প্রাণ
একটি কথায় মাত্র আস্থা রাখি' অসি-মুখে
দিতে বলিদান
অগ্রসর হয় কেহ ; অপরে তেমনি আসে
অশ্ব আরোহণে
মৃত্যু-আলিঙ্গন-হেতু' ছুটে আসে যথা
প্রিয়া-আলাপনে !
কোথাও কখনও বিশ্বে এ হেন অপূর্ব্ব দৃশ্য
কেহ দেখে নাই,
'চিরজীবি হও দোহে'—তোমরা যে আজি হ'তে
মোর বন্ধু-ভাই !
কিন্তু এক কথা শুধু জিজ্ঞাস্য আমার আছে
—কহ ভ্রাতৃগণ,
কোথা হ'তে এত উচ্চ—এ উন্নত মহাশিক্ষা,
করেছ গ্রহণ ?"

৮

এস্‌হাক্ কহিলা "নৃপ, আমরা মোস্‌লেম তাই
পবিত্র 'কোরান'
ভক্তিভরে—শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ে রেখেছি' ধরে'
ঢেলে মন প্রাণ!
এই মহাগ্রন্থ বলে 'প্রতিজ্ঞা করিলে কভু
করিও পূরণ,—
নিত্য সত্য পরমেশ আপনি যে সাক্ষী তার—
রাখিও স্মরণ
মানবের সঙ্গে যদি অঙ্গীকারে বদ্ধ হও,
প্রভু সেই বাণী
শুনেছেন, ভঙ্গ তাহা করোনা বারেক ভুলে
হে অযুত প্রাণি!
নিশ্চয় জানিও সবে সকলের শ্রোতা তিনি
সকল সময়'
এই মহা গ্রন্থ যে গো এ উন্নত শিক্ষাদানে
পুরেছে হৃদয়।"

* * * *

কোরানের ঐ কটি মহাবাণী নৃপবর
সুবর্ণ অক্ষরে
লিখিতে আদেশ দিলা প্রাসাদ-প্রবেশ-চারু
দ্বার-শীর্ষ পরে।
আর তিনি নিজে সহ পাত্র-মিত্র-পারিষদ
স্বীয় পরিজন
ইস্‌লামে বিশ্বাসী হ'য়ে সুশীতল ছায়া তার
করিলা গ্রহণ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্।

গুলেস্তানের গুল্

(গল্প)

১

ইয়োরোপ ঘুরিয়া আমি যে দিন দেশে ফিরিয়া আসিলাম, সে দিন বিরহ-কৃশা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলে গো ?"

"অনেক। একদিনে সব কথা ফুরাইবে না।"

আমেনা—"থাক্,—সে সব গল্প পরে হবে তখন। এখন, আমার জন্য কি আনিলে দেখি—?"

আমি পোর্টফোলিওর ভিতর হইতে একখানি ছোট বাঁধানো বই বাহির করিয়া বলিলাম, "আর আর যা' আনিয়াছি, সব তোমার,—কেবল এটি ছাড়া।"

"ইঃ! তা' আর হয় না! বইখানা দেখি,"—আমেনা রাজ্ঞীমহিমায় হাত বাড়াইয়া দিল।

আমি বলিলাম, "অরসিকেষু রসনিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ—

আমেনা কোপকটাক্ষে বাধা দিয়া বলিল "থাক্—দু'পাতা সংস্কৃত পড়িয়া আর শ্লোক আওড়াইতে হ'বে না! বই দাও—।"

"কিছুই বুঝিবে না, এ তুর্কীভাষায় লেখা!" "হোক। আমি দেখিতে চাই।"

"যদি না দি ?"

আমেনা, কপালের মদন-ধনু দু'খানি বাঁকাইয়া বলিল "তবে আমি কাঁদিয়া ফেলিব সখা!"

"বেশ কাঁদ, আমি দেখি।"

আমেনা আমার কাছে আসিয়া বলিল "ইস্! আমি কাঁদিবার মেয়ে কিনা? আমি হাসিব।"

আমি বলিলাম, "কৈ দেখি।"

আমেনা বলিল "না, আমি ঠোঁট্ ফুলাইব।" বলিয়া মুখখানি একটু গম্ভীর করিল।

আমি তাহার রঙ্গ দেখিয়া কিছু অন্যমনস্ক হইলাম। দুষ্টা আমেনা, অমনি খপ্ করিয়া হাত বাড়াইয়া আমার কাছ হইতে বইখানা কাড়িয়া লইল এবং

জানালার আলোর কাছে গিয়া পুঁথির পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। একটু পরেই সে ফিরিয়া, বইখানা খুলিয়া আমার চোখের সামনে ধরিয়া বলিল "একে?"

আমি এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বলিলাম "একটি তুর্কী মহিলা।"

"নাম জান?"

"মরিয়ম।"

"কি করে?"

"আবার যদি ইয়োরোপ যাই তবে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব।"

"এ ছবি তোমার কাছে কেন?"

"একদিন বলিব। আজ না"

আমেনা, বইখানা মুড়িয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

আমি বলিলাম, "কোথা যাও?"

"রান্না ঘরে।"

"কেন?"

"বইখানা অগ্নিকে উপহার দিব বলিয়া মনে করিতেছি।"

"ঈর্ষাপরায়ণে, নিশ্চিন্ত থাক। মরিয়ম তোমার সপত্নী হইবার সাহস রাখে না।"

"তবে বল, বইখানা তোমায় কে দিয়াছে?"

"শুন তবে।"

২

আমেনা আমার পাশে আসিয়া বসিল।

আমি বলিতে লাগিলাম—

"সুলতান আব্‌দুল হামিদের নির্ব্বাসনের কথা, তোমরা বোধ হয়, খবরের কাগজে কিছু কিছু পড়িয়াছ। আমি সেই সময়ে কন্‌ষ্টান্টিনোপলে ছিলাম।

কিন্তু সুলতান তখনও সিংহাসনচ্যুত হন নাই। তবে, নব্যতন্ত্রীরা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। দু'একটা যুদ্ধও হইতেছিল।

আমি একদিন বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাজপথের চারিদিকেই লোকারণ্য, যেখানে দু'চারিজন লোক একত্র হইতেছে, সেইখানেই বিদ্রোহের কথা। রাস্তার ধারে ধারে কাফিখানার ভিতরে বসিয়া কেহ 'দাবা-

বোড়ে' খেলিতেছে, কেহ যুদ্ধের গল্প করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একজন তুর্কীরমণী, আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। এ'দেশের মেয়েদের আব্রু বেশ। তাঁহারা যখন রাস্তায় বাহির হন, তখন আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করেন, কেবল সুডৌল নাসিকাটি আর আয়ত চোখ দুটি খুলিয়া রাখেন।

আমি ক্রমে গোলমাল ছাড়িয়া শহরের বাহিরে গিয়া পড়িলাম। চারিদিক নির্জ্জন—নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে ধনীদের চমৎকার উপবন। তাহার ভিতর হইতে কত রকম চিড়িয়া যে ডাকিয়া উঠিতেছে, তা' আর কি বলিব!

অবশেষে, একটি উদ্যান-প্রাচীরের সম্মুখে গিয়া, আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং একবার পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কতদূর আসিয়াছি। ছোট ঝর্-ঝরে পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে; দু'ধারে তার পুষ্পিত গাছের সার। বহুদূরে শ্যামলিত কান্তার, নীলাঞ্জনীল নভঃপদ নিলীন। এমন সময়ে, হঠাৎ প্রাচীরের আড়াল হইতে রমণীকণ্ঠে শুনিলাম—

"যব্ সে লাগি তেরি আঁখিয়াঁ
দিল্ হোগেয়া দিওয়ানা
তুম্ লয়্লা হো—মৈঁ মজ্নুঁ;
তুম্ শিরীঁ হো মৈঁ খোস্রু;
তুম্ গুল্ হো—মৈঁ বুল্বুল্—
তুম্ শামা হো—মৈঁ পরওয়ানা।"

কি মধুর আবৃত্তি! বুঝিলাম, কেহ কোন পুস্তক পড়িতেছেন। যাঁহার কণ্ঠস্বর এত মিষ্ট, না জানি তিনি দেখিতে কেমন! আমি কৌতুহল দমন করিতে পারিলাম না,—এক লম্ফে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলাম। প্রাচীরের উপর হইতে, স্বর্গকে যেন আমার পদতলে পাইলাম।

সুন্দর উদ্যান—তাহার শোভার কথা আমি বলিতে পারিব না—যেন একখানি সোনার জলে লেখা ছবি। চারিদিকে কৃত্রিম শৈল। তাহাদের অযত্ন-ন্যস্ত পাথর গুলির উপর দিয়া কলতানে ঝরনা ঝরিয়া পড়িতেছে। একদিকে—যেখানে ঝাউগাছের সান্ধ্যস্নিগ্ধ ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে—সেইখানে দুর্ব্বা-বিভূষণা মেদিনীর উপরে যেন কোন বেহেস্তের হুরী আপন তনুলতাখানি এলাইয়া দিয়া শয়ান। মৃণাল-পেলব কি সুষমা তার! দুগ্ধ-শুভ্র কি বর্ণ তার! মাথার উপরে একটি ফলভারকাতর সাচীকৃত আঙ্গুর-বল্লরী

লতাইয়া পড়িয়া সমীর-তালে ছন্দে ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। শষ্পা সনে একখানি গ্রন্থ পড়িয়া রহিয়াছে। সেই বিহসিতাস্য যুবতী একান্তমনে তাহাই পাঠ করিতেছিলেন। ধন্য সেই কবি,—যাঁহার এমন ভক্ত পাঠিকা! তুর্ক-সুন্দরীর পূর্ণাংশ মুখচন্দ্রদর্শনের সৌভাগ্য খুব অল্প বিদেশীর ভাগ্যে ঘটে। এ দুর্লভ সুযোগ আমি অবহেলা করিলাম না,—তখনই পকেট হইতে 'কোডাক' বাহির করিলাম। ইচ্ছা, মুখখানিকে আমার কাছে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিব।

সুন্দরী, সহসা পুস্তক হইতে মুখ তুলিলেন এবং আমাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলাম, প্রথমে তাঁহার মুখে চোখে বিস্ময়ের আভাস ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর, যখন তিনি বুঝিলেন যে আমি কি করিতেছি, তখন লজ্জাত্রস্তা হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন,—তাঁহার পেলব কপোলে গুলাবের রক্তিমা খেলিয়া গেল। কিন্তু তদ্দণ্ডে তাঁহার মুখ কালিমাময় হইয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার বাহুলতা দু'খানি ভঙ্গী সহকারে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া, আমাকে তাঁহার ছবি তুলিতে নিষেধ করিলেন।

কিন্তু নিষেধ আমি মানিলাম না প্লেটের উপরে এক সেকেণ্ডে তাঁহার মুখখানি ধরা পড়িয়া গেল। এমন সময়ে অদূরে দ্রুত ধাবমান অশ্বপদধ্বনি শুনিলাম।

যুবতীও তাহা শুনিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ব্যাকুলভাবে আমাকে পলাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু আমি ভয়ের কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না। কাজেই নড়িলাম না। একটু হাসিলাম মাত্র।

অশ্বের পদধ্বনি ক্রমে নিকট হইতে নিকটে আসিল। আমি কৌতূহলী হইয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল,—সেই দিকে চাহিলাম। অবিলম্বে দেখিলাম, প্রায় সাত আট জন সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া সবেগে আমার দিকে আসিতেছে। তাহাদের হাতে উলঙ্গ তরবারি,—সূর্য্যকরে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। ঘোড়াগুলা উল্কাবেগে আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

একজন আমাকে প্রাচীরের উপর হইতে নামিতে বলিল। আমি নামিলাম না। সে আবার ইঙ্গিত করিল। আমি অচল। বুঝিলাম, ইহারা আমার উপর সন্দেহ করিয়াছে। একবার হাতে পাইলে ইহারা আর আমায় আস্ত রাখিবে না। আমি আমার রিভলভারে হাত দিলাম।

আমি প্রাচীর হইতে অবতরণ করিলাম না দেখিয়া, একজন তরবারি তুলিয়া আমাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। আমি তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া রিভলভার তুলিলাম এবং ঘোড়া টিপিলাম। সে তখনই ভূতলে পড়িয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তে একসঙ্গে অনেকগুলি তরবারি জ্বলিয়া উঠিল। আমি সভয়ে বাগানের ভিতরে লাফাইয়া পড়িলাম।

তখনও সেই তুর্ক-রমণী, উদ্যানের ভিতরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি, সাহায্যের জন্য তাঁহার দিকে আকুলভাবে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি করুণভাবে আমাকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ধন্য ধন্য খোদা! রমণী সকল দেশেই করুণারূপিণী!

যুবতী, একখানি তরল মেঘের মত আগে আগে ছুটিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

পিছনে শব্দ হইল! বুঝিলাম, আক্রমণকারীরাও উদ্যানের ভিতরে লাফাইয়া পড়িতেছে! কিন্তু ঘনসংলগ্ন তরুলতায় তাহারাও আমাদিগকে দেখিতে পাইল না, আমরাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না।

আমরা অবিলম্বে উদ্যানবাটীকার সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। রমণী, আমাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, এ স্থানও আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। কিন্তু নিরুপায়! কোথাও লুকাইবার স্থান নাই।

সহসা পায়ের শব্দ শুনিলাম! সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের গলা পাইলাম। আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল,—আর রক্ষা নাই! কিন্তু বিদেশে বাঙ্গালী-মুসলান নামে কলঙ্ক রাখিয়া যাইব না,—কাপুরুষের মত আচরণ করিব না,—না—না—কখনই না—মরিতে হয় মরিব;—কিন্তু বীরের মত! আমি রিভলভারটা দৃঢ়হস্তে চাপিয়া ধরিলাম।

পায়ের শব্দ একেবারে আমার কাছে আসিয়া পড়িল,—মুক্তস্থান হইলে এতক্ষণে সকলেই আমাকে দেখিতে পাইত। তখনই পিছনে আর একটা শব্দ হইল।

ফিরিয়া দেখি,—সেই করুণারূপিণী! তিনি একটা দরজা খুলিয়া, দ্বার-পথের উপরে দাঁড়াইয়া, আমাকে ত্রস্তভাবে ভিতরে যাইতে বলিলেন। আমি বিনাচিন্তায়, তীরের মত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমার পিছনে নিঃশব্দে পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। রমণী, তাড়াতাড়ি পাশের আর একটা কামরার দরজা খুলিয়া দিলেন। আমি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম,—আমার পিছনে পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ হইল। ঘরটি ছোটখাট,—কক্ষতলে ধূলা। বুঝিলাম, এটি অব্যবহার্য্য,—এখানে কেহ আসে না। একটু নিশ্চিন্ত হইলাম।

তখন আপনার অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি যে, সেই আমি, তাহা মনে হইল না। আমি যেন, আরব্য-উপন্যাসের একজন নায়ক,—কোন একটি রজনীর অভিনয় করিতেছি। বাঙ্গালী-মুসলমান হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়া আমাকে যে এমন বিস্ময়াবহ অচিন্ত্য ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে, তাহা আগে কে জানিত বল? অদৃষ্টে আরও যে কি আছে, কে জানে!

এখন মুক্তির উপায় কি ? ভবিষ্যের দিকে চাহিলাম—অন্ধকার সেই ! অন্ধকারের ভিতরে ধ্রুবতারা,—এই করুণাময়ী ললনা ! কিন্তু তিনি রমণী মাত্র। যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। প্রাণটা আর একটু হইলেই ত' খরচ হইয়া গিয়াছিল !

দিনের আলো ক্রমে নিভিয়া আসিল—বাগানের ভিতরে পাখীর গান ক্রমেই থামিয়া গেল,—সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। এমন সময়ে বাড়ীর ভিতরে কাহাদের গলা শুনিলাম—কে যেন কাহাকে ধমক দিতেছে। ঘরের একদিকে একটি জানালা ছিল—সেই জানালার একটি ছোট ছিদ্রে আমি আমার চক্ষুঃসংলগ্ন করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

দেখিলাম, একদিকে সেই করুণাময়ী মহিলা বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে আর এক ব্যক্তি একখানি উন্মুক্ত ছোরা নাচাইয়া বলিতেছে—"তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিস্ শীঘ্র বল্। নহিলে—"

ভ্রূসঙ্কোচ করিয়া রমণী বলিলেন—"নহিলে ?"

"নহিলে, এই ছোরা সেই কুকুরের বুকে না বসিয়া তোর বুকে বসিবে !"

রমণী, নির্ভয়ে কহিলেন, "খুঁজিয়া দেখুন জনাব ! বাদীর সঙ্গে বাক্যব্যয় বৃথা।"

"তুই বলিবি না ?"

"আমি বলিব না।"

"যদি প্রাণবধ করি !"

"বুক পাতিয়া দিতেছি। বসাও ছোরা !"

সহসা, বহুদূর হইতে ভীষণ কোলাহলের শব্দ পাইলাম। আবার বুঝি, নূতন কোন বিপদ উপস্থিত হইল ! আমি ঘরের এককোণে সরিয়া দাঁড়াইলাম,—আমার বক্ষঃক্ষেপন দ্রুততর হইয়া উঠিল—তাহার শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম !

কোলাহল ক্রমে বাড়িতে লাগিল—সেই সঙ্গে বন্দুক কামানের বজ্রনাদ ধ্বনিয়া উঠিল। তাহার পর, উপরতল হইতে ক্রমাগত দ্রুতধাবনজনিত পদধ্বনিও শুনিতে পাইলাম। কাহারা যেন শশব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে,—যেন কোন মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে ! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—এত কোলাহল কেন, এত আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ কেন, এত পদশব্দ কেন—কি হইয়াছে—কিছুই জানিলাম না—যেন সব স্বপ্ন—সব স্বপ্ন—স্তম্ভিতহৃদয়ে আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম !

ক্রমে বাড়ীর ভিতর হইতে পদশব্দ থামিয়া গেল,—কিন্তু দূরে জনতার কোলাহল এবং আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জন আরও বাড়িয়া উঠিল !

আগামী বারে সমাপ্য।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মোল্লা দোপেয়াজা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মওলানা আবুল বাকা সর্ব্বদা হাসিখুসি আমোদ প্রমোদ ভালবাসিতেন। তিনি ছেলেদের সহিত হাসি তামাসা ও গল্প করিতেন, অশিষ্টতা দেখিলে শাসনও করিতেন। মোল্লা ইঁহার নিকট 'আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। একদিনের পাঠ ছিল 'আরবীতে দুইটি হসন্ত অক্ষর একসঙ্গে যোগ করা যায় না। মওলানা পাঠ দিলেন, "দুইটি সাকেন (হসন্ত) অক্ষর একত্রে রওয়াঁ হয় না" অর্থাৎ চলিতে পারে না। এখানে চলিতে পারে না অর্থ ব্যবহার হয় না; কিন্তু মোল্লা ধরিয়া লইলেন, গমন করিতে পারে না। মোল্লা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন হয় না?" মওলানা—"দুইটি সাকেন একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায় না।" মোল্লা—"সাকেন কাহাকে বলে?" মওলানা—"যে অক্ষরের উপর জযম (আরবী হসন্ত চিহ্ন) হয় তাহাকে সাকেন বলে।" "জযম কিরূপ?" মওলানা উত্তর করিলেন, "আরে, গাধার ক্ষুর দেখিয়াছিস্?" "হাঁ, হুজুর"। "তবে সেইরূপ, গাধার ক্ষুরের মত"। মোল্লা বলিলেন, "হুজুর, সে কি? আপনি বলিলেন জযমওয়ালা (হসন্তযুক্ত) দুইটি অক্ষর একসঙ্গে চলে না; গাধার ত চারটি জযম—সামনে দুইটি, পিছনে দুইটি,—সে কেমন করিয়া চলে?" মওলানা এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া মনে মনে প্রীত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, বালক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুচতুর। এবং তখন হইতে অশেষ যত্নে প্রাণপণে মোল্লাকে পড়াইতে লাগিলেন।

একদিন এক ব্যক্তি মওলানার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর! নপুংসকের সঙ্গে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইতে পারে কি না?" মওলানা উত্তর না দিতেই মোল্লা বলিলেন, "হুজুর অনুমতি হইলে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি"। মওলানা সম্মতি দিলে মোল্লা বলিলেন, "ব্যাকরণে পড়িয়াছি দুই সাকেন (হসন্ত) একত্র যুক্ত হইতে পারে না। স্ত্রীলোক নিজে সাকেন, নপুংসকও তাই। সুতরাং সাকেনে সাকেনে যোগ হইবে কিরূপে? ইহাদের বিবাহ অসম্ভব।" মওলানা মোল্লার উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু মোল্লা সর্ব্বদা দুষ্টামি ও আমোদেই রত থাকিতেন, পড়িতেন না। ইহাতে মওলানা মনে মনে ভাবিতেন, এ দুষ্ট যদি যত্ন করিয়া প্রাণপণে লেখাপড়া শিখিত, তাহা

হইলে এ বর্ত্তমান সময়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারিত ; ইতিহাসে মহাপণ্ডিত বলিয়া ইহার নাম থাকিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, এ দুষ্টামিতেই মজিয়া গেল, ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে না।

মোল্লার বয়স তখন নয় বৎসর। সেই বয়সেই তিনি হাফেজ ও কারি এবং ব্যাকরণে পণ্ডিত হইয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা সেরাজন্ নেসা পরলোক গমন করেন। কাজেই পিতার একমাত্র ও মাতৃহীন পুত্রের আদর আহ্লাদের সীমা রহিল না। মোল্লার বিদ্যাশিক্ষাও একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মোল্লার পিতা যখন মোল্লার আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন এবং বলিতেন, হা খোদা! তুমি উহাকে বিদ্যাবুদ্ধি সবই দিয়াছ, কিন্তু যদি সৌন্দর্য্য দিতে তাহা হইলে আরও কত আনন্দের বিষয় হইত।

সে যাহা হউক, মোল্লার পিতা স্ত্রী অভাবে মোল্লাকে লইয়া বড়ই কষ্টে পড়িলেন। বৃদ্ধ বয়সে ঘর-সংসারের কাজকর্ম্ম সমস্তই এখন তাঁহাকে নিজ হস্তে করিতে হইত। একে বৃদ্ধ বয়স, তার উপর এই পরিশ্রম ও নানা জ্বালা যন্ত্রণা ; আর কত সহ্য হয়! কাজেই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আবার বিবাহের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল এবং দেখিয়া শুনিয়া অগত্যা এক অল্পবয়স্কা সুন্দরী যুবতীকেই তিনি বৃদ্ধ বয়সের সম্বল করিয়া লইলেন। মনের মধ্যে যাহাই থাকুক, বাহিরে তিনি লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "আবুল হাসানের বড়ই কষ্ট হইতেছিল ; বাছা আমার সময়মত খেতে পায় না ; ঘরের জিনিসপত্র ঠিক থাকে না ; কে দেখে আর কে শুনে? কি করি সংসারটা ত চালান চাই, তাই নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া এই কাজ করিয়াছি।" শুনিয়া কেহ মুচ্‌কি হাসিল, কেহ "হাঁ তা করবেন বৈ কি" বলিয়া সায় দিয়া গেল। কিন্তু মোল্লার পিতা তাঁহার নূতন স্ত্রীর অনেক গুণের কথা বর্ণনা করিলেও জনসমাজে তাঁহার প্রকৃত রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। স্বামীবাড়ী আসিয়া বিবি সাহেবা প্রথম প্রথম মাসাবধিকাল মাঝামাঝি একরূপ চালাইয়া লইলেন ; পরে ক্রমে ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিক্রম দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে দাসিগণ, পরে বালক মোল্লা, তদ্‌পর বৃদ্ধ স্বামী এবং অল্পকাল মধ্যেই বাড়ী ও সমস্ত পাড়া তাঁহার রণতাণ্ডব ও কলহ-কোলাহলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সকলের অপেক্ষা কষ্ট হইল বেচারা মোল্লার। নূতন মা যখন কলহ করার আর কোন পথ পাইতেন না, তখন

মোল্লার উপর সমস্ত ঝাল ঝাড়িতেন। বেচারার আদর যত্ন হওয়া ত দূরের কথা, তাঁর প্রাণ বাঁচান ভার হইয়া উঠিল। উঠিতে বসিতে সর্ব্বদাই তাঁহার কপালে তাড়না ও লাঞ্ছনাই জুটিতে লাগিল। তাঁহার নামে প্রতিদিনই একটা না একটা অপবাদ তাঁহার পিতার নিকট লাগিয়াই আছে। মোল্লার বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর; তিনি চতুর বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বালক। তিনি দেখিলেন, কোন নূতন চাল না চালিলে এ মা-রাক্ষসীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। মা এমনি গুণের মা, যে তাঁহার কলহ-কোন্দল দুষ্টামি শুধু এখানে নহে, পিত্রালয়েও তিনি 'ঝগরাটে' মেয়ে বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিভীষণ স্বভাব-চরিত্র ও রসনার ক্ষুরধার দেখিয়া পিতামাতা খাসিমা (অর্থাৎ কলহপ্রিয়া) নাম রাখিয়াছিলেন।

মোল্লার পিতা যতদিন পারিলেন, নতমস্তকে নবীনা পত্নীর সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিলেন। শেষে তরুণীর উৎকট প্রেম-রস পরিপাক করা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন তিনি বিরক্ত হইয়া খাসিমাকে পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আর যায় কোথা?—আদেশ শুনিয়া খাসিমা একেবারে রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; মুখে যত আসিল, একদিক হইতে বৃদ্ধকে অজস্রধারে গালাগালি দিতে লাগিলেন। মুখের চোটে ঝড় বহিয়া গেল। বিবাহের সময়ের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, সমস্ত ক্রোধা-বেগে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিলেন। শেষে মনের মত করিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইয়া বিবি সাহেবা আপন ইচ্ছামত জিনিস পত্র লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। বসন ভূষণ সবই পড়িয়া থাকিল। মোল্লা মনে মনে বলিলেন ভালই হইল। কিন্তু মোল্লার পিতা অলঙ্কারাদি উঠাইয়া নানারূপ কাকতি মিনতি করিয়া পত্নীকে বুঝাইতে লাগিলেন, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বলিলেন, এগুলি পরিয়া যাও, নহিলে লোকে কি বলিবে? কিন্তু তাহাতে খাসিমার ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। কি করা,—অগত্যা মোল্লা পিতার হাত হইতে সেগুলি লইয়া উঠাইয়া রাখিলেন। তাহাতে খাসিমার মনের ভাব যাহা হইবার তাহা ত হইলই, বৃদ্ধও ভিতরে ভিতরে প্রিয় পুত্রের উপর বিরক্ত হইলেন। বৃদ্ধবয়সে তরুণী ভার্য্যা জুটিলে এইরূপই হয়! অবশেষে রাগে গর গর করিতে করিতে বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি ফেলিয়াই খাসিমা প্রস্থান করিলেন। মোল্লার পিতা প্রিয়তমার জন্য বড়ই দুঃখিত হইলেন ও মনোকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মোল্লা একদিবস তায়েফের বাজারে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক পাগলিনী রমণী বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ছেলেরা ঢিল ছুড়িয়া, কাপড় টানিয়া, ক্ষেপাইয়া নানাপ্রকারে তাহাকে বিরক্ত করিতেছে। পাগলিনীর নাম সামিনা—দেখিতে পরমা সুন্দরী। মোল্লা অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান বালক। তাঁহার মাথায় অমনই চট্ করিয়া এক ফন্দি জুটিয়া গেল। তিনি দৌড়াদৌড়ি যাইয়া পাগলিনীকে 'মা' বলিয়া ডাক দিয়া এক লম্বা সালাম প্রদান করিলেন। 'মা'-ডাক শুনিয়া পাগলিনীর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পাগলিনীর সহিত মোল্লার সহজেই আলাপ ও ভাব জমিয়া গেল; মোল্লার সহিত তাহার কথাবার্ত্তার মিল পড়িল; মোল্লা যাহা বলিতে লাগিলেন, পাগলিনীও তাহাতে সম্মত হইতে লাগিল। মোল্লা বলিলেন, "মা চলুন, বাড়ী যাই।" পাগলিনী অমনই আনন্দে আটখানা হইয়া মোল্লার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মোল্লা বাড়ী লইয়া গিয়া নূতন মার পরিত্যক্ত সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার সমস্তই পাগলিনীকে পরাইয়া দিলেন এবং খাসিমা বিবির ঘর খুলিয়া তাঁহার খাট পালঙ্ক দেখাইয়া পাগলিনীকে সেই ঘরে থাকিতে বলিলেন। পাগলিনীকে রাখিয়া, মোল্লা খাসিমা বিবির পিত্রালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নূতন মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই মা মা বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া গেলেন। এই কয়দিনে খাসিমা বিবির রাগ একটু কমিয়া আসিয়াছিল। মোল্লাকে ওরূপভাবে পায়ের উপর পড়িয়া মা-মা বলিয়া কাঁদিতে দেখিয়া তিনি একটু বিচলিত না হইলেন, এরূপ নহে। তিনি নরম হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা! কি হইয়াছে, ওরূপ করিতেছ কেন?" মোল্লা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, কি বলিব! বাবা কি আর সে বাবা আছেন। তিনি এই কয়দিনের মধ্যেই আবার এক সুন্দরী ভদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাঁহাকে আপনারই সাড়ি ও অলঙ্কার পরাইয়া আপনারই সেই ঘরে আপনার পালঙ্কে, আপনার বিছানায় মহা সমাদরে রাখিয়াছেন। আর কি তাঁর আপনার কথা মনে আছে! এখন সর্ব্বদাই বলেন, 'বাঁচা গেছে। খাসিমা ছোট লোকের মেয়ে, সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ করিত; চলে গেছে ভালই হইয়াছে। এবার ভদ্রলোকের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়াছি; এখন একটু সুখে থাকিতে পাইব।' মা! কি বলিব, বাবা আমায় আর এখন একটুও ভাল বাসেন না।" আর বলিতে হইল না, শ্রবণমাত্র খাসিমা বিবি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ছেলের সহিত হাঁটিয়াই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—যান-বাহন আনাও সহ্য হইল না।

খাসিমা বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ বাড়ী নাই; অন্য এক পরমা সুন্দরী রমণী তাঁহারই বসন-ভূষণ পরিয়া তাঁহার পালঙ্কে শুইয়া আছে। দেখিয়াই তিনি উন্মত্তের মত হইয়া উঠিলেন। জ্বলন্ত রোষে অধীর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "ওরে শয়তান, বাঁদী, বজ্জাৎ, হারামজাদী!. তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা!" যেমন এই বলা, আর অমনি পাগলিনী বিছানা হইতে এক লাফে উঠিয়া খাসিমা বিবিকে ধরিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করা। ভীষণ প্রহারে খাসিমার নাক মুখ দিয়া রক্ত ছুটিল; চুল কাপড় কিছুই বাকি থাকিল না। তখন খাসিমার দুরবস্থা দেখে কে! তাঁহার ভীষণ চীৎকারে পাড়ার লোক বাড়ী ও ঘরের চতুর্দ্দিকে ভরিয়া গেল। বৃদ্ধ বাজারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তিনি বাড়ী আসিয়া দেখেন, প্রলয় ব্যাপার! ঘরের মধ্যে দুম্‌দাম্—কান্নাকাটি, মহা চীৎকার। খাসিমা বিবির গলার স্বর শুনিয়া বৃদ্ধ অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রাণের খাসিমা কোথা হইতে আসিল ও তাহার এমন বিপদই বা কোথা হইতে উপস্থিত হইল! বৃদ্ধ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঘরের নিকট যাইয়া দেখেন, দ্বার বন্ধ করিয়া এক বিপুলকায় বলিষ্ঠা সুন্দরী স্ত্রীলোক খাসিমাকে ধরিয়া বেদম প্রহার করিতেছে। বৃদ্ধ ইহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া গেল। তিনি দরজা খুলিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। অবশেষে জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেমন তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণের খাসিমা বিবি বাঘিনীর ন্যায় লাফাইয়া গিয়া তাঁহার দাড়ি ধরিয়া দুই হাতে উপড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ দারুণ যন্ত্রণায় পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। কে আর কাকে দেখে! মোল্লা তখন স্বীয় চাতুরীর বিষম পরিণাম দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও সন্তপ্ত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি পিতাকে বাঘিনীর হাত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। সামিনা পাগলিনীও এই অবসরে চম্পট দিল। বৃদ্ধ একটু সুস্থ হইয়া তখনই খাসিমা বিবিকে তালাক দিলেন। এই ঘটনার আদি অন্ত সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে, মোল্লার পিতা লজ্জায় লোকসমাজে মুখ দেখাইতে না পারিয়া, পবিত্র ধাম মক্কা শরীফে প্রস্থান করিলেন। বাড়ী ঘর সমস্তই পনর বৎসরের বালক পুত্র মোল্লার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গেলেন।

যখন তীর্থযাত্রিগণ দল বাঁধিয়া মক্কা শরীফে যাত্রা আরম্ভ করিল, তখন মোল্লা প্রতি যাত্রিদলে যাইয়া পিতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই

তাঁহার সন্ধান বলিতে পারিল না। মোল্লা তখন পিতার শোকে পাগলের মত হইয়া পড়িলেন এবং বাড়ীর জিনিষ পত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়া মদিনা শরীফের দিকে পিতার সন্ধানে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে বহু অনুসন্ধান করিয়াও পিতার কোন সংবাদ পাইলেন না। তখন পবিত্র রওজা শরীফ (হজরতের সমাধি) 'জিয়ারৎ' এবং নানারূপ কাঁদাকাটি করিয়া ও হজরতের প্রতি দরুদ শরীফ উপঢৌকন দিয়া তাঁহার দরবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেখান হইতে এক পারশ্যদেশীয় যাত্রিদলের সহিত মক্কা শরীফের দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ডাকাত পড়িয়া মোল্লার টাকাকড়ি জিনিস পত্র যাহা কিছু সঙ্গে ছিল সমস্তই লুটিয়া লইয়া গেল। মোল্লা তখন একেবারে রিক্ত-হস্ত হইয়া পড়িলেন। একে পিতার শোক, তাহার উপর সম্বল-নাস্তি।

যাত্রিদলের যিনি সর্দ্দার ছিলেন, তাঁহার নাম মির্জা আকবর আলী। তিনি মোল্লার দুরবস্থা দেখিয়া পারশ্য ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তু কিস্তি" —তুমি কে? মোল্লারও পারশ্য ভাষা জানা ছিল, তিনি উত্তর দিলেন, "এনসান"—মানুষ। মির্জা—"আজ কুজা মি আয়ী।"—কোথা হইতে আসিতেছ? মোল্লা—"আজ নজ্‌দে খোদা"—খোদার নিকট হইতে। মির্জা— "বকুজামি মানী"—কোথায় থাক? মোল্লা—"বর জমিন"—মাটির উপর।

মোল্লাকে আরব হইয়াও ফার্সিতে কথা বলিতে দেখিয়া, তাঁহার কৌতুকপূর্ণ উত্তর শুনিয়া ও তাঁহার অদ্ভুত আকৃতি দেখিয়া মির্জা আকবর আলী মনে মনে খোদাতালার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন এবং মোল্লাকে নিজের দলভুক্ত করিয়া তাঁহাকে অশেষ যত্ন ও সম্মানের সহিত স্বীয় অন্তরঙ্গ মোসাহেব করিয়া লইলেন। মোল্লা সাহেব এই পারশিক সর্দ্দারের সহিত মক্কা শরীফে গমন করিয়া পিতাকে বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন না। অগত্যা মির্জা আকবর আলীর সহিত জেদ্দা বন্দরে পৌছিয়া তথা হইতে জলপথে বন্দর আব্বাসে আগমন করিলেন এবং সেখান হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে পারশ্যের রাজধানী তিহরান নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্রমশঃ।

সৈয়দ আব্দুল কুদ্দুস।

দস্যুর কাণ্ড।

দুই লক্ষ টাকা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিত্রজাও সিন্দুকের নিকট আসিলেন। বৃহৎ সিন্দুকের ডালা খোলা, সামান্য কয়েকটা দ্রব্য ব্যতীত বহুমূল্য সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে!

স্বরযমল উন্মত্তপ্রায়। কখন তিনি প্রস্তর-প্রাচারে আঘাত করিয়া মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে উদ্যত। আবার কখন বা তিনি বৃদ্ধ মিত্রজার ব্যাকুল হতবুদ্ধি স্তম্ভিত প্রায় মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিতেছেন।

মিত্রজা অতিমাত্র বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বরযমলের কাতরোক্তির কোন উত্তর না দিয়া প্রথমে সিন্দুকটি অতি সাবধানে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন—কেহ চাবি দিয়াই সিন্দুক খুলিয়াছে! চাবি ভাঙ্গে নাই।

তাহার পর তিনি জানালা দরজা গুলি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন। গত রাত্রে তাঁহারা যেরূপ ভাবে ভিতর হইতে এই জানালা দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা সেইরূপ ভাবে রুদ্ধ রহিয়াছে। কেহ যে রাত্রে এ জানালা দরজা খুলিয়াছে, এমন বোধ হইল না। তবে কে কিরূপে সিন্দুক হইতে বহুমূল্য জহরতাদি লইয়া কোন পথে বাহির হইয়া গেল?

তিনি তখন ভ্রুকুটি করিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার লোক দুটির চুল সবলে ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইলেন, তাহারা জড়বৎ পড়িয়া রহিল; কিছুতেই তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল না। বৃদ্ধ মিত্রজা হতাশ ভাবে বলিলেন, "ইহাদের বিষ খাওয়াইয়া কেহ অজ্ঞান করিয়াছে?"

স্বরযমল কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কে এমন করিল, কে ইহাদিগকে বিষ খাওয়াইল? কে কেমন করিয়া এ ঘরে আসিল, এ ঘরে আসিবার আর দরজা নাই, দরজার ওদিকে আমি সমস্ত রাত্র জাগিয়া বসিয়াছিলাম।"

মিত্রজা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—"সেই—সেই রণরাও বা তাহার কোন লোক। এ রণরাও ভিন্ন আর কাহারও কাজ নহে, দেখিতেছি তাহার অসাধ্য কিছু নাই।"

"তাহা হইলে—তাহা হইলে উপায়?"

"হতাশ হইবেন না। সে যেমনই চালাক হউক না কেন, পুলিশও গাধা নহে।"

"গাধা নহে?—এখন উপায়, আপনি—কই আপনি তো কিছুই করিতেছেন না—আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! দেখুন, দেখুন ভাল করিয়া দেখুন, সে কিরূপে এই ভয়ানক কাজ করিল তাহার কোন সূত্র পান কি না।"

"সূত্র! রণরাও সূত্র রাখিয়া কোন কাজই করে না। এখন আমার মনে হইতেছে যে, নিরাপদে এই কাজ করিবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া সে ধরা দিয়া জেলে গিয়াছে!"

"হায়, হায়, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সব লইয়াছে! সে যাহা লইয়া গিয়াছে, সে সব জিনিসের দাম নাই, দাম হয় না। এ সকল পুরাতন জিনিস আর পাইবার উপায় নাই। লাক টাকা. দুলাক টাকা দিলেও যদি সে আমার সেগুলি ফেরত দেয়! হায়, হায়, আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে!"

মিত্রজা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "এ কথাটা মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। তাহার পক্ষে এই বহুমূল্য জহরত বিক্রয় করা অসম্ভব না হইলেও সহজ হইবে না। তবে এ সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতসারে বন্দোবস্ত করা চলিতে পারে না। যদি আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে না পারি, তখন—আপনার জন্য,—কেবল আপনারই জন্য আমি কিছুই বলিব না। যাহাতে টাকা লইয়া আপনার দ্রব্যগুলি আপনাকে ফেরত দেয়, তাহার উপায় দেখিতে পারেন। উপস্থিত, আমি যে এখানে রাত্রে ছিলাম তাহা কোন মতে প্রকাশ করিবেন না, ইহাতে সমস্তই গোল হইয়া যাইবে। আপনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, সেজন্য বন্ধু ভাবে আপনাকে উপদেশ দিতেছি, গোল করিলে হয় তো আর আপনার জহরত ফেরত পাইবার কোন আশা থাকিবে না। বিশেষতঃ আর একটা কারণেও এ কথা আপনাকে গোপন রাখিতে বলিতেছি, লোকে এ কথা জানিলে আমায় বিশেষ হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে মিত্রজার লোক দুইজনের ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ হইতে লাগিল, তাহারা হতবুদ্ধি ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। মিত্রজা তাহাদের টানিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিলেন, তখনও তাহারা ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। মিত্রজা তাহাদিগকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাত্রে

কি হইয়াছে, কি ঘটিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র তাহারা স্মরণ করিতে পারিল না। তাহারা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাও তাহারা জানে না,—তবে তাহারা শপথ করিয়া বলিল, তাহাদের যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, তাহারা কাহাকেও গৃহমধ্যে আসিতে দেখে নাই! প্রকৃতপক্ষে সে গৃহে কাহারও আসিবার উপায় ছিল না।

মিত্রজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ঘরে আসিয়া কিছু পান করিয়াছিলে?"

তাহারা বলিল, "রাত্রে খাইবার জন্য এক ঘটি জল আনিয়াছিলাম, তাহাই পান করিয়াছি।"

মিত্রজা ঘটির জলের ঘ্রাণ লইলেন, অনেকটা পান করিলেন, কিন্তু জলে যে কিছু মিশ্রিত আছে তাহা বোধ হইল না।

তাঁহার লোকের উপর সন্দেহ করিবার তাঁহার বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না। তবুও স্বরযমলের বিশ্বাসের জন্য তিনি তাঁহার লোকের কাপড় ঝাড়া দিলেন,—তাহাদের নিকট কিছুমাত্র নাই,—তখন তিনি সেই গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কোথায়ও জহরতের কোন চিহ্ন পাইলেন না। যেন সমস্তই কোন যাদুবলে বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছে!

মিত্রজা স্বরযমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ফল নাই। এবার রণরাও আমায় হাস্যাস্পদ করিয়াছে, কিন্তু সময়ে কাহার হার হয় তাহা দেখিব।"

* * * * *

কাল বিলম্ব না করিয়া আজিমগঞ্জের থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। সকলে শুনিল "আলিপুরের জেলে অবরুদ্ধ দস্যু রণরাও স্বরযমলের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে!"

বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে চারিদিকে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। জেলে আটক থাকিয়া দূর আজিমগঞ্জে স্বরযমলের বাড়ীর মত বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া চুরি? এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কেহ আর কখনও পূর্ব্বে শুনেন নাই!

যে বাড়ীতে স্বরযমল কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেন না,—তাহা পুলিশে একরূপ চষিয়া ফেলিল। যেখানে কেহ কখনও আসিত না, কেহ কখনও প্রবেশাধিকার পাইত না,—সেখানে শত শত লোক ছুটিল। তাহারা আজ্ঞা না মানিয়া অবাধে তাঁহার দুর্গসম অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া এই অভূতপূর্ব্ব চুরি কিরূপে সংঘটিত হইল, তাহার সন্ধান লইতে লাগিল। তখন দুর্ভাগ্য স্বরযমল ভাবিলেন, পুলিশে সংবাদ দিয়া তিনি তাঁহার বিপদ বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে যে বিশেষ কোন ফল হইবে তাহার আশা বিন্দুমাত্র ছিল না।

এই প্রাচীন অট্টালিকায় কোন গুপ্ত দ্বার —কোন সুড়ঙ্গ পথ আছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য পুলিশ সর্ব্বত্র খুঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া তচনচ করিল,—সকলেই বলিতে লাগিল, "জহরত ভূতের ন্যায় হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন উপায়ে কেহ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। নিশ্চয়ই কোন লোক কোন উপায়ে জহরত লইয়া পলাইয়াছে!" কিন্তু কে কিরূপে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাই সমস্যা।

পুলিশ অনেক অনুসন্ধানেও অট্টালিকায় কোন গুপ্ত দ্বার বা সুড়ঙ্গ পথ দেখিতে পাইল না। আজিমগঞ্জের ও মুর্শিদাবাদের পুলিশ এই ভয়াবহ অত্যাশ্চর্য্য চুরির কিছুই করিতে পারিল না, তখন তাহারা হতাশ হইয়া কলিকাতার পুলিশে সংবাদ দিল। ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

পুণ্যশ্লোক ওমরের প্রতি।

("খলিফার মহানুভবতা" * প্রবন্ধ পাঠে।)

ওমর অমর তুমি নশ্বর জগতে
বরেণ্য, পবিত্র এই তোমার কাহিনী
আজি এ বিলাসপূর্ণ পৃথিবী মাঝারে
সমাদরে ঘরে ঘরে হোক্ প্রতিধ্বনি।
অশেষ মহিমান্বিত খলিফার পদে
প্রতিষ্ঠিত ছিলে সাধো অতুল্য গৌরবে
বীরত্বে কম্পিত তব হইত মেদিনী ;
তথাপি যোগীর মত, নির্লিপ্ত বিভবে,
থাকিতে হে দীনভাবে জীর্ণ বস্ত্র পরি'
সামান্য আহারে তুষ্ট ; উষ্ট্র আরোহণে
ভ্রমিলে বিশাল রাজ্যে, সঙ্গে ক্রীতদাস,
বন্ধুতুল্য ব্যবহার করি' তার সনে।
হায় সে আদর্শ তব কি উচ্চ মহান্
বুঝিবে কি ভারতের হিন্দু মুসলমান!

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

* কোহিনূর—মাঘ, ১৩১৮।

প্লিনি।

ত্রয়োবিংশ খৃষ্টাব্দে প্রাণীতত্ত্ব-প্রণেতা প্লিনি জন্মগ্রহণ করেন। রোম সম্রাট নিরোর মৃত্যুর পরে তিনি রোমে গমন করেন এবং ভেসপেসিয়ান ও তৎপুত্র টাইটাসের অধীনে চাকুরী করেন। ৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তক 'Natural History' ন্যাচারাল হিষ্ট্রি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ টাইটাসকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। গ্রন্থ প্রকাশের মাত্র দুই বৎসর পরে ভিসুবিয়াস নামক আগ্নেয়গিরির নির্গমনে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্লিনি অত্যন্ত অধ্যয়নরত ছিলেন, এমন কি যখন তিনি আহারাদি করিতেন,তখনও কিছু না কিছু পাঠে বিরত থাকিতেন না। প্লিনির প্রাণীতত্ত্ব সাঁইত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার ষষ্ঠ খণ্ডে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত আছে।

ষষ্ঠ খণ্ড। দ্বাবিংশ অধ্যায়। বহু দিবস ধরিয়া তাপ্রোবেণকে অন্য একটি পৃথিবী বলিয়া গণ্য করা হইত। আলেকজান্দারের যুগে এবং বস্তুতঃ তাঁহার দ্বারাই ইহা যে একটি দ্বীপ তাহা জানা যায়। তাঁহার নৌসেনাধ্যক্ষ ওনিসিক্রিটস বলিতেছেন যে,ভারতীয় হস্তী অপেক্ষা এতদ্দেশীয় হস্তী বৃহদাকারের এবং কলহপ্রিয়। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে, একটি নদী এই দ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার অধিবাসীকে প্যালিওগোনই বলে এবং ভারতবর্ষে যেরূপ আকারের মুক্তা পাওয়া যায়, তদপেক্ষা বৃহদাকারের ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ এই দ্বীপে পাওয়া যায়। ইরাটস বিনিসের মতে ইহা দৈর্ঘ্যে সাত হাজার ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে পাঁচ হাজার ষ্টাডিয়া; তিনি আরও বলেন যে ইহাতে কোন নগর নাই,কেবলমাত্র সাত শত গ্রাম আছে। ইহা পূর্ব্বসাগর হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বিপরীত দিকে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। পূর্ব্বকালে যখন প্যাপাইরস বৃক্ষ দ্বারা নৌযানাদি প্রস্তুত হইত ও সে গুলিকে নীলনদস্থ নৌকার ন্যায় সজ্জিত করা হইত, তখন প্রাসি দেশ হইতে এই দ্বীপে পৌছিতে বিশ দিবস লাগিত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের জাহাজগুলি যেরূপ দ্রুতগামী, তাহাতে মাত্র ৭ দিবসে এই দ্বীপে পৌছান যায়। এই দ্বীপ ও ভারতবর্ষ মধ্যস্থ সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর—প্রায়ই ছয় হাতের অধিক গভীর নহে কিন্তু কোন কোন স্থানে একরূপ অতলস্পর্শ। এইজন্য এই সকল জাহাজের সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করা হয়, যাহাতে অপ্রশস্ত খালে ঘুরাইতে কোন

অসুবিধা না হয়। এই সকল জাহাজে ৩০০০ আম্ফোরী মাল ধরে। সমুদ্র-যাত্রাকালীন তাপ্রোবেণ দেশীয় নাবিকগণ নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করে না। বস্তুতঃ সপ্তর্ষিমণ্ডল এ দেশ হইতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রা-কালে পক্ষী সঙ্গে লয় এবং মধ্যে মধ্যে এই সকল পক্ষী ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের গতির অনুসরণ করে। বৎসরের ৪ মাস মাত্র তাহারা সমুদ্রে গমনাগমন করে। বিশেষতঃ উত্তরায়নের পরবর্ত্তী এক শত দিবস তাহারা বিশেষরূপ বর্জ্জন করে—কেন না এই সময়ে এ সকল সমুদ্রে অত্যধিক শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক হইতে আমরা উপরোক্ত বিবরণ পাইয়াছি। আমরা এ দ্বীপের আরও সঠিক বৃত্তান্ত পাই; কেন না সম্রাট ক্লদিয়াসের রাজত্বকালে এ দ্বীপ হইতে দৌত্যবাহিনী তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রকারে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। আনিয়াস প্লোকামাসের একজন Freedman (মুক্তদাস) আরব্যোপসাগরে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতিকূল বায়ু দ্বারা তাপ্রোবেণ দ্বীপান্তর্গত হিছুরা বন্দরে নীত হন। এই স্থানে তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তিনি রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ছয় মাস এ দেশে বাস করিয়া তিনি তদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন। রাজা রোমকদিগকে ও তাহাদের সম্রাটকে বিশেষ ভাবে প্রশংসা করেন। বিশেষতঃ বন্দীর নিকট তিনি যে সকল সুবর্ণের দীনারী প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন রাজার রাজত্বকালে প্রস্তুত হইলেও একই ওজনের থাকাতে রোমক ও রোমক সম্রাটগণের সততায় বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। এইজন্য রোমের সহিত সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হইতে তিনি বিশেষ ইচ্ছুক হন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি চারি জন দূত প্রেরণ করেন; ইহাদের মধ্যে রাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এই সকল দূতের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, তাপ্রোবেণে পাঁচ শত নগর ছিল এবং প্যালিসিমুণ্ডাস নগরের সন্নিকটে দক্ষিণাভিমুখী একটি বন্দর ছিল। রাজা এই নগরে বাস করিতেন এবং নগরে দুই লক্ষ লোক বাস করিত। এই সকল দূত আরও বলিয়াছিল যে, দ্বীপাভ্যন্তরে ৩৭৫ মাইল পরিধি লইয়া একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদে কতকগুলি দ্বীপও আছে। ইহাদের ভূমি উর্ব্বরা কিন্তু দ্বীপগুলি কেবলমাত্র পশু চারণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই হ্রদ হইতে দুইটি নদী বহির্গত হইয়াছে। প্যালিসিমুণ্ডাস নামক নদীটি তিন মুখ হইয়া ঐ নামের নগরীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তিনটি মুখের ক্ষুদ্রতমটি

পাঁচ ষ্টাডিয়া,বৃহৎটি পনের ষ্টাডিয়া ও ছাইডারা নামক তৃতীয়টি উত্তরাভিমুখী হইয়া ভারতবর্ষের দিকে প্রবাহিতা। দূতের নিকট ইহাও অবগত হওয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের অন্তরীপ কোলিয়াকাম হইতে তাপ্রোবেণ মাত্র চারি দিবসের পথ এবং এই পথের মধ্যস্থলে সূর্য্য দ্বীপ। এই সকল সমুদ্র সবুজবর্ণ এবং ইহাদের তলদেশে অনেক বৃক্ষ জন্মে। এই কারণে জাহাজের হালে অনেক সময় এই সকল বৃক্ষের শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া যায়। দূতেরা গ্রেটার বিয়ার নক্ষত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। ইহা তাহাদের দেশে কেবলমাত্র অষ্টম হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্তই দেখা যায়। কিন্তু ক্যানোপাস নামক বৃহৎ ও উজ্জ্বল নক্ষত্র রাত্রিতে আলোকদান করে। সূর্য্য বাম দিক হইতে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত যায় ইহা দেখিয়া তাহারা অত্যধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। তাহারা ইহাও বলিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের বিপরীত দিকে তাহাদের দ্বীপের যে অংশ অবস্থিত তাহা দীর্ঘে দশ হাজার ষ্টাডিয়া। হেমোডি পর্ব্বতের পরে সিরিশ জাতি। এই জাতির সহিত তাহাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। রাচিয়ার পিতা এই দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই দেশে পৌছিলে সিরিশগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এই জাতীয় ব্যক্তিগণ দৈর্ঘ্যে অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা দীর্ঘ ; ইহাদের চুল পীত ও চক্ষু নীল ; ইহাদের স্বর কর্কশ এবং ইহাদের প্রচলিত কোন ভাষা নাই। অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের বর্ণনা ও আমাদের দেশীয় বণিকগণের বর্ণনা একরূপ।

কিন্তু তাপ্রোবেণ যদিও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে পৃথক, তত্রাপি সেস্থানেও আমাদের দেশীয় প্রথা প্রচলিত। সেখানেও সুবর্ণ ও রৌপ্যকে সম্মান করা হয়। তথায় মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তরাদিকেও আদর করা হইয়া থাকে। তাহাদের বিলাস সামগ্রী আমাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং উহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দূতেরা বলিল যে, তাহারা আমাদের অপেক্ষা ধনী কিন্তু অর্থ হইতে যে সুখ উৎপাদিত হয়, সেই সুখ ভোগ করিতে তাহাদের অপেক্ষা আমরা দক্ষ।

তাপ্রোবেণ দ্বীপে ক্রীতদাস নাই। অধিবাসীরা সূর্য্যোদয়ের পরে আর নিদ্রা যায় না। তাহারা দিবাভাগেও নিদ্রা যায় না। তাহাদের গৃহাদি অধিক উচ্চ নহে। শস্যের মূল্য কোন দিন বৃদ্ধি পায় না। তাহাদের আদালত বা মালি-মোকদ্দমা নাই। তাহারা হার্কিউলিসকে পূজা করে। অধিবাসীরাই রাজনির্ব্বাচন করে। রাজা বৃদ্ধ,দয়ালু এবং অপুত্রক হইবেন। নির্ব্বাচনের পরে সন্তানাদি হইলে তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়, অন্যথা উত্তরাধিকাব স্বত্ব বংশানুক্রমিক

হইয়া পড়ে। অধিবাসীরাই রাজার জন্য ত্রিশ জন মন্ত্রী মনোনীত করে। অধিকাংশের মত না হইলে কেহই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় না। দণ্ডিত ব্যক্তি জনসাধারণের নিকট আপিল করিতে পারে; এক্ষেত্রে ৭০ জন জুরি নিযুক্ত হয়। যদি এই জুরিগণ নির্দ্দোষ বলেন তবে পূর্ব্বোক্ত ৭০ জন সদস্যকে আর কেহ গণ্য করে না এবং তাঁহাদের অত্যন্ত অপমান করা হয়। রাজা ব্যাকাসের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করেন। অধিবাসীরা আরব দেশীয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। রাজা যদি কোন প্রকারে বিরাগভাজন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; কিন্তু কেহই তাঁহাকে হত্যা করে না। সকলেই তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকে, এমন কি কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করে না। উৎসব কাল তাহারা মৃগয়ায় অতিবাহিত করে; হস্তী ও ব্যাঘ্র শিকারই তাহাদের প্রধান ক্রীড়া। ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা হয়। দ্রাক্ষার চাষ নাই, কিন্তু অন্যান্য ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা মৎস্য বিশেষতঃ কচ্ছপ ধরিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করে। এই সকল কচ্ছপের পৃষ্ঠ এত বৃহৎ যে তাহার মধ্যে অনায়াসে একটি বৃহৎ পরিবার আশ্রয় লইতে পারে। এই দ্বীপবাসীরা শত বৎসর পরমায়ু স্বল্প বলিয়া বিবেচনা করে। তাপ্রোবেণ সম্বন্ধে আমরা মাত্র ইহাই অবগত আছি। ক্রমশঃ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

সম্মিলন।

(চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।)

চিত্তভূমি অধিষ্ঠাত্রী জননি আমার—
বুদ্ধিরূপা মানব-সংস্কৃতি!
চিত্তে চিত্তে রচ মাতঃ কুসুমের হার
তোমার চরণে করি নতি।
জ্ঞান দাও—বুদ্ধি দাও শক্তি দাও প্রাণে,
ধ্যানে দাও মূরতি তোমার;
করিব তোমার মাগো, আবাহন গান,
তুমি যোগ্য সুর দাও তার।
তোমারি আদেশে আমি তোমার সম্মুখে
ভিক্ষুবেশে আছি দাঁড়াইয়া;

শুনিতে তোমার বাণী তোমারি শ্রীমুখে
আনন্দে কম্পিত মোর হিয়া।
তব দত্ত বর্ণমালা, তব দত্ত তুলি –
তব দত্ত ভঙ্গি রচনায়,—
রচে কবি ভাব রাশি আপনারে ভুলি—
উপহার দেয় গো তোমায়।
ভুলে যায়—গেয়ে যায়, ভেসে যায় গানে,
চলে যায় কোন্ মুক্ত দেশে ;
করে ধরে লয়ে যাও তোমার উদ্যানে
রবি-শশী নাহি যথা পশে।
পঞ্চ বর্ষে শিশু আজি করি পদার্পণ—
দাঁড়ায়েছে জাহ্নবীর তীরে,
আশায়—হরষে—ভয়ে—কম্পিত চরণ—
পশিবে সে বাণীর মন্দিরে।
করুণায় হের মাতা কর আশীর্ব্বাদ,
ধান্য-দূর্ব্বা দাও শিশু শিরে,
সমীর ছুটিয়া যা'ক লইয়া সংবাদ—
উল্লাসে শুনাতে ধরণীরে।
ত্রিবেণী হয়েছে মুক্ত পঞ্চবর্ষ শেষে
শতধারে ছুটুক মহিমা,
তিল তিল বর্ণভারে বিমোহন বেশে
দিগন্তে চলুক তিলোত্তমা !
হে সঙ্ঘ ! তোমারে আমি করি নমস্কার
তুমি মাত্র জাতির জীবন ;
একদিন তব মূর্ত্তি শোভার আধার
বিমুগ্ধ করেছে ত্রিভুবন।
সে বাঞ্ছিত শুভদিন দাও ফিরাইয়া
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ যার প্রাণ,
শুভ্র শঙ্খ পুণ্যনাদে উঠুক বাজিয়া
দুঃখ জ্বালা হউক নির্ব্বাণ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

কবিতা-গুচ্ছ।

প্রার্থনা।

"নাথ ভু'লনা আমারে তুমি!"

১

নাথ ভু'লনা আমারে তুমি!
তব দয়া বিনে, আঁধার জীবনে,
যাইব কেমনে, এ বিশ্ব ভবনে,
শুনি না শ্রবণে, হেরি না নয়নে,
অন্ধ ও বধির আমি!
ভু'লনা আমারে তুমি!

২

নাথ ভু'লনা আমারে তুমি!
আমি পাপী তাপী, নাহি পুণ্য-লেশ
হৃদয়ে আমার, অশান্তির শেষ,
দেহ পদ-ছায়া হে প্রিয় প্রাণেশ
তুমিই আমার স্বামী!
তুমিই আমার, জীবনের ধন
তুমিই আমার বাঞ্ছিত রতন,
তুমিই আমার শান্তি-নিকেতন
তোমারি চরণে নমি!
ভু'লনা আমারে তুমি!

৩

নাথ ভু'লনা আমারে তুমি!
এ সৌর জগতে যেই দিকে চাই
তোমারি মহিমা দেখিতে যে পাই,
তুমি ভিন্ন ভবে আর কিছু নাই,
অন্তরে বাহিরে তুমি।
তোমা'র চরণে লইলে আশ্রয়
ঘু'চে যায় নাথ মরণের ভয়,
মায়া মুগ্ধ জীব চির মুক্ত হয়
তোমারি চরণ চুমি!
ভু'লনা আমারে তুমি!

৪

নাথ ভু'লনা আমারে তুমি।
যার কাছে যাই, সেই ঘৃণা করে,
পাপী তাপী ব'লে কেহ না আদরে,
"দূর দূর" করে তাড়ায় আমারে
ভিখারী উন্মাদ আমি!
তুমি দয়াময় পতিত পাবন
তুমিও কি মোরে করিবে বর্জ্জন
তোমারি চরণে লইনু শরণ
তুমি নাথ অখিলের স্বামী!
ভু'লনা আমারে তুমি!

৫

নাথ ভু'লনা আমারে তুমি!
অর্থের লালসা, প্রেমের পিপাসা
মিটিল না প্রাণে নিতি নব আশা
কেবলি অতৃপ্তি কেবলি দুরাশা
সকলি ত জান তুমি!
ভয়ে ভয়ে আজি তোমার দুয়ারে
আসিয়াছি নাথ, প্রাণ কাঁপে ডরে
আমি পাপী তাপী ক্ষমা কর মোরে
হে প্রিয় প্রাণের স্বামি!
ভু'লনা আমারে তুমি!

কায় কোবাদ।

গরল পান।

১

পরাণের জ্বালা মিটা'য়ে
আজি এ গরল পিইব
রেখনা আমারে ঠেকা'য়ে
একেবারে আজি মরিব;
অনেক র'য়েছি স'য়েছি
আর ত না আমি সহিব
নীরবে নয়ন মুদিয়া
আজি এ গরল পিইব।

২

আয় "সাকী" আয় আয়রে
অধরে অমিয় মাখিয়া
বুঝিবা পরাণ যায়রে
আয় তাই ত্বরা ছুটিয়া,
দেহ দেহ মোরে পেলা'য়ে
গরলে পেয়ালা পুরিয়া
পরাণের জ্বালা মিটা'য়ে
পিব এ গরল হাসিয়া।

শেখ হবিবর রহমান।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। [২য় সংখ্যা।

শান্তিজল।

১

দাও শান্তিজল !
দাও—দাও, ঘুচে যাক্ যন্ত্রণা সকল।
সংসার—শ্মশান-ভূমি,
কোথা দেব, কোথা তুমি !
চিতাধূমে অন্ধ চক্ষু, দগ্ধ মর্ম্মস্থল।
নিরাশার হা-হুতাশে
কত কি যে মনে আসে !
কোথায় তোমার স্নেহ—অমৃত শীতল !

২

করহ সংশয় দূর,
অশুভ অসত্য চূর,
দুর্ব্বল হৃদয়ে, দেব, দাও পূত বল !
দূর কর দুঃখ শোক,
জীবন সার্থক হোক্,
ধন-ধান্যে মধুময় কর ধরাতল !

৩

কর বায়ু মধুগতি,
মধুময়ী স্রোতস্বতী,
মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল,
মধুময়ী নিশীথিনী,
মধুময়ী পয়স্বিনী,
মধুময় সূর্য্যালোক, মধু মেঘদল !

৪

ঘুচে যাক্ হাহাকার,
গর্ব্ব, দর্প, অহঙ্কার,
অবিচার, অত্যাচার, স্বার্থ-কোলাহল।
ঘুচে যাক্ হিংসা দ্বেষ,
ব্যাধি জরা হোক্ শেষ,
দুরাশা, ভাবনা, ভয়, কপটতা, ছল।

৫

ঘুচাও এ তমঃ ভ্রম,
মুছাও নয়ন মম,
ভূলোকে দ্যুলোকচ্ছায়া হউক উজ্জ্বল !
যেন মনে প্রাণে মানি,—
লইতেছ কোলে টানি',
তোমারি সন্তান আমি, হে চির-মঙ্গল !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ইস্‌লামের স্বরূপ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মুসলমানের কর্ম্মমন্ত্র "বিস্‌ মিল্লাহ্‌" ঐ ইস্‌লামেরই মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত, মুসলমানের বিজয়ধ্বনি "আল্লাহো আক্‌বর" ঐ ইস্‌লামেরই সুরে ঝঙ্কৃত, মুসলমানের বিস্ময়বাণী "সোবহানাল্লাহ্‌" ঐ ইস্‌লামেরই মন্ত্রে উচ্চারিত, মুসলমানের হর্ষসঙ্গীত "আলহামদোলিল্লাহ্‌" ঐ ইস্‌লামেরই ভাবে অনুপ্রাণিত। মুসলমানের ভিতর ও বাহির পূর্ণ করিয়া ঐ একই ঈশপ্রাণতা বিকশিত হইয়াছে। মুসলমানের বিজয়ে ও বিষাদে, বিস্ময়ে ও আনন্দে কেবলই এক ধ্বনি উঠিয়াছে "হে স্বামি! তুমিই সব, তুমিই সব"। কর্ম্মের প্রারম্ভে মুসলমান বলিয়াছে "বিস্‌ মিল্লাহ্‌"—হে নিখিল কর্ম্মের কর্ম্মি! কর্ম্ম তোমারই নামে আরম্ভ করিতেছি। আমার কর্ম্ম তোমাকেই নিবেদন করিতেছি। আমার কর্ম্ম-শক্তি তুমি। জয়ী যদি হই, সাফল্যের কাঞ্চনজঙ্ঘায় যদি পৌছিতে পারি, তবে হে দয়িত, সে তোমারই দান। আর আমার সাধনা যদি ব্যর্থ হয়, নিস্ফলতার ধূলিতলে যদি আমি লুটাইয়া পড়ি, সে তোমারই আশীর্ব্বাদ।

সমরাঙ্গনে মুসলমানের কৃপাণঘায় শত্রুকুল যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার ভীম ভীষণ আক্রমণে বহুগুণ অধিক শত্রুসৈন্য বাষ্পের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে, তখন শত্রুমুণ্ডময় রণক্ষেত্রে শত্রুর ধূলিলুণ্ঠিত পতাকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়ী মুসলমান স্বীয় রণশক্তির প্রশংসা করে নাই, সে তাহার বাহুর বল ও তরবারীর তীক্ষ্ণতা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে নাই, তাহার সম্রাট ও সেনাপতির জয়ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত করে নাই, তাহার অন্তর মথিত করিয়া শুধু এই নিবেদনই বজ্রনাদে বিঘোষিত হইয়াছে—এই জয়ধ্বনিই ব্যোমপথ বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছে, "আল্লাহো আক্‌বর—তুমিই শ্রেষ্ঠ, হে সর্ব্বশক্তিময়, তুমিই শ্রেষ্ঠ। হে নিখিল জগতের সম্রাট, তোমারই জয়, তোমারই জয়।"

বজ্র-গর্জ্জন-নির্ঘোষিত ভীষণ দর্শন জলপ্রপাতের উপর হেমরাগ-রঞ্জিত রবিরশ্মিমালা নীলিম ও রক্তিম, হরিৎ ও পাটল, কৃষ্ণ ও ধূসর প্রভৃতি বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া ফুটিয়া আশ্চর্য্য সৃষ্টিবৈচিত্র্যে মন যখন বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া ফেলে, জননীজঠরে জীবশিশুর উৎপাদন ও ঘটন প্রভৃতি ক্রিয়ার পরমাদ্ভুত কৌশল

লীলায় বুদ্ধি যখন বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া উঠে, জাগতিক ঘটনা পরম্পরার অচিন্তনীয় বিকাশে রাজাকে ফকীর ও ফকীরকে রাজা হইতে দেখিয়া হৃদয় যখন ভাবাবেশে বিকশিত হইয়া উঠে, তখন জর-জর তনু, রোমাঞ্চিত-কলেবর শিথিলাঙ্গ মুসলমান আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, জগৎ বিস্মৃত হয়, তাহার অবশ-বিবশ কণ্ঠ ভেদিয়া ফুটিয়া উঠে, "সোবহানাল্লাহ্"—হে লীলাময় তুমিই পবিত্র।" অসাধারণ কর্ম্মশক্তিবলে ক্ষুদ্রশক্তি মানুষ যখন অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া কল্পনার সামগ্রীকে বাস্তবের বর্ণরাগে সজীব উজ্জ্বল করিয়া তুলে, তখনও মুসলমান বলে "সোবহানাল্লাহ্"—হে ভগবন! তুমিই পবিত্র"। পরের সেবা ও রক্ষার জন্য আত্মদান ও আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মহিমার মহালোকে ক্ষুদ্র নর যখন সপ্তসূর্য্য জিনিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহত্ত্বে গগনেরও উৰ্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করে, তখনও মুসলমান বলে "সোবহানাল্লাহ্"—হে মহিমময় তুমিই পবিত্র।" মুসলমানের বিস্ময়বিমূঢ় অন্তরে আর কোন শক্তিরই প্রভাব অনুভূত হয় না, তাহার নিশ্চল নয়নে আর কিছুই প্রতিবিম্বিত হয় না, তাহার শিরায় শিরায় ছুটে, তাহার রোমে রোমে ফুটে "সোবহানাল্লাহ্, সোবহানাল্লাহ্"। সে দেখে সকল শক্তির মধ্যে তাঁহারই দ্যুতি, সকল গরিমার মধ্যে তাঁহারই মহিমা, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে ভুবন ভরিয়া তাঁহারই অঙ্গরাগ।

"আলহাম্‌দো লিল্লাহ্" মুসলমানের বিস্ময়াবহ মহাবাণী। মুসলমান হাসিয়া বলে "আলহাম্‌দো লিল্লাহ্", কাঁদিয়া বলে "আলহাম্‌দো লিল্লাহ্" আনন্দেও তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করে, বিষাদেও তাঁহারই প্রশংসা উচ্চারণ করে। সৌভাগ্যের পূর্ণশশী হইতে সুখাংশু যখন জীবনের উপর হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়ে, প্রাণ যখন একবার অনির্ব্বচনীয় সুখের অতলস্পর্শ সিন্ধুসলিলে নিমজ্জিত হইয়া মুক্তার ঝলকে ঝলকে বিচরণ করে, আবার স্বর্গীয় পুলকের উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে, উৰ্দ্ধ হইতে উৰ্দ্ধতর গ্রামে আরোহণ করিয়া অমৃত রসে পরিপূর্ণ হয়, তখন অবনত মস্তকে পরিপূর্ণ অন্তরে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে মোসলেম বলে "আল্‌-হামদো লিল্লাহ্" হে খোদাতালা! আমি তোমারই প্রশংসা করি; তুমিই মহান্, তুমিই প্রধান, তুমিই সুন্দর। এ জীবন তোমারই কৃপা, এ সুখ তোমারই করুণা, এ হর্ষ তোমারই দান। তৃণ আমি, হে মহান্! তোমারই কৃপার সলিলধারায় সরস হইয়া, তোমারই করুণার শিশিরবিন্দু মাথায় ধরিয়া সজীব ও সুন্দর হইয়াছি। বালুকণা আমি, হে জগদীশ! তোমারই স্নেহের কিরণ-পাতে শত সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল হইয়াছি, কাঞ্চন জিনিয়া মোহন হইয়াছি।"

আবার দুঃখের কালমেঘ যখন জীবনের ব্যোমপথ আচ্ছন্ন করিয়া ঘনাইয়া আসে, আশার আলোক রেখা যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অন্ধকারের নিবিড় কায় মিলাইয়া যায়, দুর্দ্দশার তরঙ্গঘায় সম্মুখে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে সৌভাগ্য যখন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে, তখনও মুসলমান বলে "আল-হামদো লিল্লাহ্" হে মঙ্গলময়! করুণার তোমার সীমা নাই।" আঘাতের উপর আঘাতে নিঃশ্বাস যখন রুদ্ধ হইয়া আসে, স্নেহের কমলদল যখন সম্মুখে দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া ঢলিয়া পড়ে, তখনও মোসলেম কণ্ঠে উচ্চারিত হয় "আলহামদো লিল্লাহ্"—হে লীলাময় তুমিই ধন্য।" ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিয়া সে বলে, "মহিমা তোমার কি বুঝিব মহারাজ! দীন আমি কি কহিব তোমার স্নেহের বারতা! ভোগের মোহপঙ্কে আমি ডুবিয়া মরিতেছিলাম, তুমি বড় দয়া করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছ; মায়ার ফাঁদে আমি জড়াইয়া মরিতেছিলাম, তুমি করুণা করিয়া মুক্ত করিয়াছ, সৌভাগ্যের শৈলচূড় হইতে গর্ব্বগহ্বরে আমি পড়িয়া মরিতেছিলাম, তুমি সৌভাগ্য চূর্ণ করিয়া তোমার অনুকম্পার সমতলে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ। আমার ভাগ্যগগন অন্ধকার করিয়া যে তিমির রাশি নামিয়া আসিয়াছে তাহা তোমারই ঘনীভূত স্নেহ, তাহার স্পর্শে তোমারই সত্বা জাগরিত হইয়াছে। আমার চারিদিকে ভয়ঙ্কর নির্ঘোষে বিপদের যে বিদ্যুৎ চমকিয়াছে তাহাতে নয়ন অন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়—হে প্রেমময়! তোমারই রূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে।"

এই নিখিল-কিরণ-কারণ রূপ এমনই করিয়া মোসলেম-জীবনের অঙ্গে অঙ্গে প্রভা বিস্তার করিয়াছে; এই ভুবন-জীবন-মহিম-জ্যোতিঃ শোক-সন্তাপ ও বেদনার মধ্যে মোসলেমের নয়নে নয়নে ঝলসিত হইয়াছে। স্বজনের মৃত্যু সংবাদে, ধ্বংস ও সর্ব্বনাশের সমাচারে যখন প্রাণ দুঃসহ শোক ও ব্যথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,—হৃদয় যখন রুদ্ধ যাতনায় শতধা বিদীর্ণ হইতে চায়, তখন ইসলামবাদী হাহাকার করিয়া কাঁদিতে শিখে নাই। মোসলেম প্রাণ মথিত করিয়া জগৎ স্তম্ভিত করিয়া বাণী উঠিয়াছে "ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলায়হে রাজেউন"—"আমরা তোমারই জন্য আছি, আমরা তোমারই দিকে ফিরিয়া যাইব। হে প্রভো! তোমারই ইচ্ছায় আমাদের সৃষ্টি-স্থিতি জীবন-মরণ। আমরা ধনের নই, যশের নই, আত্মীয়ের নই—হে নাথ! আমরা শুধু তোমারই, আর তোমারই দিকে আমাদের যাত্রা। তাই বিয়োগে আমাদের ব্যথা নাই, মরণে আমাদের শোক নাই, ধ্বংসে আমাদের দুঃখ নাই। এই মহাযাত্রায়

আশে পাশে চারিদিকে কত জনের সহিত পরিচয় হইয়াছে, কত মোহমায়ার ছবি দেখা গিয়াছে, কত স্নেহপুষ্পের ঘ্রাণ আসিয়াছে, কিন্তু সকলই পার্শ্বে, পশ্চাতে, দূরে—সুদূরে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আছ শুধু তুমিই ধ্রুবতারা। ইহার কোনখানে থামিবার অবসর আমাদের নাই, কেন না তোমারই দিকে আমাদের গতি; ইহার কোন আকর্ষণে অভিভূত হইবার অধিকার আমাদের নাই, কেন না আমরা তোমারই তরে নির্দ্দিষ্ট।"

এমনই ভাবে মোসলেম-জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যত সুর বাজিয়াছে তাহার সকলগুলি মিলিয়া কেবলই এক ধ্বনিকেই সম্পূর্ণ করিয়াছে—"ইস্‌লাম"। মোসলেমের সকল মন্ত্রে, সকল কর্ম্মে প্রকাশ পাইয়াছে "ইস্‌লাম"—সেই আকুল আত্ম নিবেদন, একান্ত আত্মসমর্পণ ও গভীরতম নির্ভর;—সেই প্রভুর বিধান বরণ করিবার ঐকান্তিকী বাসনা। তাঁহারই মধ্যে আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবার, সকল ভুলিবার তীব্রতম কামনা।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী।

আশ্রয়।

সঙ্গে যখন থাক্‌বে না কেউ
তুমি সাথে থেকো,—
আমায় যখন ডাক্‌বে না কেউ—
তুমি মোরে ডেকো;—
যখন জীবন-তরী অন্ধকারে—
হারিয়ে যাবে পারাবারে,—
দেখাতে পথ আশার প্রদীপ
তুমি জ্বেলে রেখো।
যখন ভুলে যাবে জগত মোরে,—
ভাসিয়ে দেবে অতিদূরে,—
আপন জন চাইবে না আর—
তুমি মোরে দেখো;—
যখন মরম-ভাঙ্গা অশ্রু-ধারা—
ছাপিয়ে দেবে কূল কিনারা,—
তোমার স্নেহের আঁচল দিয়ে—
তুমি মোরে ঢেকো।

শ্রীঅবনীকুমার বসু।

হজরত ওমরের বিনয়-মাধুরী।

মহিমান্বিত দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর একদিকে যেমন বিপুল প্রতাপ সম্পন্ন নৃপতি ও অসামান্য প্রভাবশালী পুরুষ ছিলেন, পক্ষান্তরে তেমনই সুস্নিগ্ধ বিনয় ও সুকুমার সারল্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার মহৎ জীবনের নম্রতা, নিরহঙ্কার ও আড়ম্বরশূন্যতার যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহার প্রভাব-প্রাধান্যময় জীবনের শীর্ষদেশে কুসুমমাল্যবৎ সুদৃশ্যমান। তাঁহার জীবন-পটের এক প্রান্তে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে—তিনি কেমন দৃপ্তভাবে রুম ও শামদেশ বিজয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইতেছেন, কেমন বিচক্ষণতা সহকারে রোমাধিপতি ও পারশ্যাধিপতির সহিত রাজ্যঘটিত আলোচনা করিতেছেন, কেমন দৃঢ়তা ও প্রভাবের সহিত দামস্কের শাসনকর্ত্তা অতুল রাজনীতিবিশারদ মাবিয়া ও পারশ্যবিজেতা বীরচূড়ামণি খালেদের কার্য্য কলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মিশর-বিজেতা ও তথাকার শাসনকর্ত্তা রাজনীতিজ্ঞ ওমর এব্‌নে আসের উপর আদেশ প্রেরণ করিতেছেন; —আবার অন্য প্রান্তে দেখ, তাঁহার শরীরে দ্বাদশ তালিযুক্ত জামা, পায়ে ছিন্ন পাদুকা, মস্তকের উষ্ণীষ ছিঁড়িয়া চারিদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে! আবার এই অবস্থায় তিনি স্কন্ধোপরি কলসি লইয়া অসহায়া বিধবাগণের জল যোগাইতেছেন, কখন বা পরিশ্রান্ত হইয়া মসজিদের নিকটে মৃত্তিকার উপর বসিয়া কাকনিদ্রা যাইতেছেন। (আল খেরাজ—৩৮৭ পৃঃ)।

তিনি বহুবার মদিনা হইতে মক্কা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু কোন সময়েই বস্ত্রাবাস সঙ্গে লন নাই। পথে যেখানে অবস্থান করিতেন বৃক্ষের কতিপয় শাখার উপর চাদর টাঙ্গাইয়া তন্নিম্নে শয়ন করিতেন।

এব্‌নে সাদ বর্ণনা করিয়াছেন খলিফা ওমরের দৈনিক ব্যয় দুই দেরহাম ছিল।*

একদা আহনাফ বেন-কয়েছ কতিপয় আরব-প্রধানকে সঙ্গে লইয়া খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া খলিফা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। আহনাফকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এস, আমার সঙ্গে যোগদান কর। সাধারণ-ভাণ্ডারের একটি উট পলাইয়া গিয়াছে। তুমি জান না, একটি উটে কত দরিদ্রের স্বত্ব রহিয়াছে।" আগন্তুকদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, "আমীরুল মুমেনীন!

* আরবী দুই দেরহাম আমাদের প্রায় দশ আনার সমান।

আপনি কেন কষ্ট করিতেছেন? কোন দাসকে আদেশ করুন, সে খুঁজিয়া আনিবে।" খলিফা বলিলেন, "আইও আবদিন্ আবাদু মিন্নি"—আমা অপেক্ষা আবার দাস কে?" কি মহৎ উক্তি!

হজরত ওমর একদিন মসজিদে খোৎবা পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "সমবেত জনমণ্ডলি! এক সময় আমি এমন নিঃসম্বল ছিলাম যে লোকের জল বহন করিতাম। তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা আমাকে খর্জ্জুর প্রদান করিত। আমি তাহাই ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতাম।" ইহা বলিয়াই তিনি বেদী হইতে অবতরণ করিলেন। লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, বেদীর উপর দাঁড়াইয়া ইহা বলার তাৎপর্য্য কি? তিনি জানাইলেন, "আমার অন্তরে সামান্য অহঙ্কার আসিয়াছিল, ইহা তাহারই ঔষধ।"

মুসলমান-সৈন্য 'কাদিছা' নামক স্থানে পারশ্যাধিপতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত; খলিফা হজরত ওমর যুদ্ধের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। যে দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তিনি প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে মদিনা হইতে বাহিরে আসিয়া সংবাদবাহকের উদ্দেশে পথ পানে তাকাইয়া থাকিতেন। যুদ্ধে মুসলমানদিগের জয়লাভ হইয়াছে। সেনাপতি সায়াদ খলিফা সমীপে যুদ্ধ-সংবাদ সহ সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়াছেন। দূত দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মদিনার সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। খলিফা সংবাদ-বাহকের অপেক্ষায় নগরপ্রান্তে বাহির হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, একজন উষ্ট্রারোহী যোদ্ধৃপুরুষ আসিতেছে, নিকটে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" খলিফাকে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া দূত তাঁহাকে সামান্য একজন আরব জ্ঞানে উত্তর করিল, "আমি সেনাপতি সায়াদের দূত।" খলিফা যখন জানিলেন এ ব্যক্তি সায়াদের দূত, তখন আগ্রহান্বিত হইয়া যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত উত্তর করিল, "খোদাতালার কৃপায় যুদ্ধে মুসলমানদিগের জয়লাভ হইয়াছে।" এবং এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল। তখন খলিফা তাহার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলেন এবং যুদ্ধের সবিশেষ অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় উষ্ট্রারোহী যখন নগরে প্রবেশ করিল, তখন দেখিল যে সমস্ত নগরবাসী তাঁহাকেই 'আমীরুল মুমেনীন' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। ইহা দেখিয়া দূত ভয়বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, "হজরত! পূর্ব্বে যদি আমাকে আপনার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে এই গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতাম না।"

খলিফা বলিলেন, "তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তুমি যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বলিতে বিরত হইও না।" এইরূপে দূতসহ খলিফা স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং নগরবাসী-দিগকে আহ্বান করিয়া সকলের সম্মুখে যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ প্রদান করিলেন। তৎসহ তিনি যে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার শেষাংশটুকু এই —"মুসলমানগণ! আমি রাজা নহি যে তোমাদিগকে ভারবাহী দাস করিব। আমি আল্লার দাস। তবে খলিফিয়ত্বের বোঝা আমার মস্তকের উপর অর্পিত হইয়াছে। এখন যদি আমি তোমাদিগকে এরূপে সেবা করিতে পারি যাহাতে তোমরা স্ব স্ব গৃহে সুখ-স্বচ্ছন্দে নিরাপদে শয়ন করিতে পার, তবেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আর যদি আমার এরূপ ইচ্ছা হয় যে তোমরা আসিয়া আমার দ্বারে দণ্ডায়মান থাক, তবে তাহা আমার দুর্ভাগ্য। আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তাহা বাক্যদ্বারা নহে, স্বকার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা।"

আহমদ আলী।

কবি

(মোহাম্মদ এয়াকুব আলী সাহেবের "বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান লেখক" *
শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইল।)

১

আঁধারে এ'সেছি আমি,
আঁধারেই যে'তে চাই!
তোরা কেন পিছু পিছু
আমারে ডাকিস ভাই?
আমি ত ভিখারী-বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে,
নাহি বিদ্যা, নাহি বুদ্ধি,
গুণ ত কিছুই নাই!

২

আলো ত লাগে না ভাল,
আঁধারি যে ভালবাসি!
আমি ত পাগল প্রাণে
কভু কাঁদি কভু হাসি!
চাই না ঐশ্বর্য্য-ভাতি, চাই না যশের খ্যাতি,
আমি যে আমারি ভাবে
মুগ্ধ আছি দিবা নিশি!

* কোহিনুর—আষাঢ়, ১৩১৮।

৩

অনাদর-অবজ্ঞায়
সদা তুষ্ট মম প্রাণ!
সংসার বিরাগী আমি,
আমার কিসের মান!
চাই না আদর স্নেহ, চাই না সুখের গেহ,
ফল মূল খাদ্য মোর,
তরুতলে বাসস্থান!

৪

কে তোরা ডাকিস্ মোরে,
আয় দেখি কাছে আয়!
কি চা'স আমার কাছে,
আমি যে ভিখারী হায়!
ধন নাই, জন নাই, কি দিব তোদেরে ভাই,
আছে শুধু অশ্রুজল,
তোরা কি তা' নিবি হায়!

৫

মিলনের মধুরতা
পাবিনে পাবিনে তোরা!
হা হুতাশ দীর্ঘ শ্বাস
পাবি ইথে বুক ভরা!
কেউ ত না ভালবাসে, কেউ ত না কাছে আসে,
তোরা কেন রাত দিন
ডে'কে ডে'কে হলি সারা?

৬

পাপে তাপে এ হৃদয়
হ'য়ে গেছে ঘোর কালো!
আঁধারে থাকিতে চাই,
ভাল যে বাসিনে আলো!
আমি যে পাগল কবি, দীনতার পূর্ণ ছবি,
সবি করে "দূর দূর",
তোরা কি বাসিস্ ভালো?

কায়কোবাদ।

নবাব ঈশা খাঁ মসনদ আলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিয়েম খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গের শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদ খাঁ পরাজিত হইলে, তদীয় অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাতেও ঈশা খাঁর বল চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে দায়ুদ খাঁর দৌহিত্রী ও কালাপাহাড়ের দুহিতার সহিত ঈশা খাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং ঈশা খাঁও দায়ুদ খাঁর সন্নিধানে বাস করিতেছিলেন। সৈন্যগণ ঈশা খাঁর বুদ্ধিমত্তা, বীরত্ব, ধীরত্ব প্রভৃতি গুণের কথা অবগত ছিল, তাই দায়ুদের বিপুল বাহিনী সহসা ঈশা খাঁর ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়া মোগলকে পর্য্যুদস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। আকবর নামা পাঠে জানা যায় যে, ঈশা খাঁ বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে একরূপ স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গ-বিহার রাজ্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ জন ভৌমিক বা ভুঞাঁর সৃষ্টি করত তাঁহাদের শাসনাধীন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের নেতৃত্ব বা মার্কিন রাজ্যের ন্যায় প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট কর এবং যুদ্ধ-কালে সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রদান করিয়া ভৌমিকগণ তাঁহাদের রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক সৈন্য ও কামান রাখিবার অধিকার কাহারও ছিল না। এই ভৌমিকদের মধ্যে আবার তিনটি শ্রেণী ছিল। প্রথম "মোসাহেব" শ্রেণীতে চারিজন। ইহারা ইহাদের অধিকৃত রাজ্যের জন্য কর প্রদান করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর কার্য্যও করিতেন। ইহারা অবৈতনিক মন্ত্রী ছিলেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ইহাদের মন্ত্রণা গ্রহণ করা হইত এবং ইহাদের রাজ্য করদ মিত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হইত। ইহাদের মধ্যে যশো-হরের প্রতাপাদিত্যই প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর চারি জন "মজলিস" নামে কথিত হইতেন। ইঁহাদেরও রাজ্য ছিল এবং ইঁহারাও কর প্রদান করিতেন। কিন্তু ইঁহাদিগকে সর্ব্বদা ঈশা খাঁর দরবারে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। চন্দ্রদ্বীপের রাজা এই শ্রেণীর প্রধান ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর চারিজন "গাজী"। ইহারা কোনরূপ কর প্রদান করিতেন না, অথচ বিস্তৃত জায়গীর ভোগ করিতেন এবং তাহার আয় দ্বারা সৈন্য পোষণ ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহই ইঁহাদের কার্য্য ছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহারা ঈশা খাঁর সেনাপতি ছিলেন। ভাওয়ালের ফজল গাজী ইঁহাদের মধ্যে প্রধানরূপে পরি-

গণিত ছিলেন। কিন্তু এই দ্বাদশ জনই ভুঞা বা ভৌমিক শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। ভুঞা বা ভৌমিক উপাধি ঈশা খাঁর আবিষ্কৃত। মুসলমানের কোরান এবং হিন্দুর ব্যবস্থা শাস্ত্রানুসারে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। প্রত্যেক বিচারালয়ে মুসলমান কাজী এবং হিন্দু পণ্ডিত বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতেন। হিন্দু বিচারককে "মজমুয়াদার" বা "মজুমদার" বলা হইত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতিও শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে বিচারক হইতে পারিতেন। ঈশা খাঁ অবসর মত ভৌমিকগণের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় পরিদর্শন করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই অন্তর্বিপ্লবের সময় ঈশা খাঁ এতাদৃশ প্রবল শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশা খাঁ অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ-রত্ন।

পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশ যখন জর্জ্জরিত হইতেছিল, সেই সময় ঈশা খাঁ পর্ত্তুগীজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার কল্পনা করেন এবং রণতরির বহর সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরের শক্তিশালী ভৌমিক চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রাচীন কাল হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ উৎকৃষ্ট নৌকার জন্য বিখ্যাত। পূর্ব্ববঙ্গের বজরা, কোষ, ভাওয়ালিয়া, লাল-ডিঙ্গি, পান্সী, ছিপ, প্রভৃতি নৌকা ভারতের অদ্বিতীয় শিল্প দ্রব্য রূপে পরিগণিত। তদুপরি আবার পূর্ব্ববঙ্গের মসনদে যিনি উপবেশন করিতেন, তাঁহার জন্য বিশেষ উপকরণে ও উন্নত প্রকারে শিল্প চাতুর্য্যের সহিত যে বজরা, কোষ, পান্সী, ছিপ ইত্যাদি নৌকা প্রস্তুত হইত—তাহা অতুলনীয়। তাদৃশ নৌকা প্রস্তুত ও আরোহণ করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও ছিল না। ঈশা খাঁ বঙ্গ ও বিহারের স্বাধীন নরপতি সুতরাং তাঁহার বজরা, কোষ ও পান্সী ইত্যাদি নৌকাগুলিও অতুলনীয় ছিল।

প্রবল স্রোতস্বতী পদ্মানদীর উত্তাল তরঙ্গমালায় নৃত্য করিতে করিতে —ভীষণ তোপধ্বনিতে জল স্থল প্রকম্পিত করিয়া ঈশা খাঁর নৌ-বহর শ্রীপুরের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। চাঁদ রায় ও কেদার রায় বঙ্গাধিপের উপযুক্ত সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। ঈশা খাঁর জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল; তাঁহার গুণ-গরিমা বীরত্ব ধীরত্ব ও সৌজন্যের কাহিনী ঘরে ঘরে আলোচিত হইতে লাগিল। দলে দলে লোক নৌ-বহরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বজরার ছাদে আরোহণ করিয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন মানসে ঈশা খাঁ যখন এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন এবং নদীর তরঙ্গমালার প্রতি চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন, তখন চাঁদ রায়ের কন্যা ও কেদার রায়ের ভগ্নী সোনামণি বা স্বর্ণময়ী বীরাগ্রগণ্য ঈশা খাঁকে দর্শন মানসে চাঁদ মঞ্জিলের ত্রিতল ছাদে আরোহণ করিয়া নদীবক্ষে নৌ-বহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অতুল সৌন্দর্য্যমহিমামণ্ডিত নব যুবক ঈশা খাঁর দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র রূপজ মোহে সোনামণি মোহিত হইয়া আত্মহারা হইলেন। শূন্য হৃদয়—শূন্য দেহ লইয়া সন্ধ্যাকালে স্বর্ণময়ী গৃহে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পঞ্চ আত্মা ঈশা খাঁর সঙ্গে মিশিয়া গেল। ঈশা খাঁ কিন্তু তখনও স্বর্ণময়ীকে দেখেন নাই।

পরদিন চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ ঈশা খাঁ রায়-ভবনে উপনীত হইলেন। চাঁদ মঞ্জিলে তাঁহার আবাস নির্দ্ধারিত হইল। চাঁদ মহলের একটি প্রকোষ্ঠে কয়েকখানি চিত্র দেখিয়া তন্মধ্যে দুইখানি চিনিতে পারিলেন; অন্য একখানি অপরূপ লাবণ্যময়ী মহিলার চিত্র দেখিয়া ঈশা খাঁ কেদার রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে ইহা তদীয় বিধবা ভগ্নী স্বর্ণময়ীর চিত্র। ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীর চিত্র দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বীর-হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা দেখা দিল; তিনি ডুবিলেন, মজিলেন।

গভীর রজনীতে ঈশা খাঁ চাঁদ মঞ্জিলের সেই চিত্রের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ অন্দর মহলের দিকের একটি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং প্রদীপ হস্তে জনৈক পরিচারিকা উপস্থিত হইয়া রাজনন্দিনী স্বর্ণময়ীর আগমন বার্ত্তা ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কামনা জ্ঞাপন করিলে ঈশা খাঁ অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজনন্দিনী তাম্বুলপূর্ণ স্বর্ণনির্ম্মিত বিড়ীদান ঈশা খাঁর সম্মুখে ধারণ করত ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় হইলেন। ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীর অতুল সৌন্দর্য্যসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং কি উপায়ে এই অমূল্য-রত্ন লাভ করা যায় সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে পর্ত্তুগীজদিগকে শাসন করিবার ভার চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রতি অর্পণ করত অসুস্থতার ভান করিয়া তিনি ত্বরিত গতিতে স্বীয় রাজধানী খিজিরপুরে উপনীত হইলেন এবং সম্রাট আকবরের সাম্যনীতির উল্লেখ করত স্বর্ণময়ীর পানিপ্রার্থী হইয়া চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে পত্র

লিখিলেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় এতাদৃশ পত্র পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন ও স্বর্ণময়ীর বৈধব্যের অজুহাত দেখাইয়া ঈশা খাঁকে এবম্বিধ ধারণা পরিত্যাগ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। তরুণবয়স্ক ঈশা খাঁ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় অতি তীব্র ভাবে পত্র প্রেরণ করিলেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় তাহাতে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করত বাঙ্গালা সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী সহ কলাগাইছা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। উভয়দলে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

এদিকে স্বর্ণময়ী রাজানুচর শ্রীমন্তকে নিজের মুক্তামালা পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহার যোগে ঈশা খাঁকে পত্র লিখিলেন যে "আপনি ওদিকে পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে থাকুন এবং এদিকে আমার জন্য কতকগুলি উপযুক্ত সৈন্য সহকারে কয়েকখানি দ্রুতগামী নৌকা প্রেরণ করুন, আমি তাহাতে আরোহণ করিয়া অন্য কোন সুরক্ষিত দুর্গে গিয়া উপনীত হইব।" তাহাই হইল। এদিকে যুদ্ধ চলিতেছে, ওদিকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সৈন্যসহ কয়েকখানি দ্রুতগামী নৌকা প্রেরিত হইল। স্বর্ণময়ী কোটীশ্বরের মন্দিরে যাইবার ছলনা করিয়া শ্রীমন্তকে সঙ্গে লইয়া পাল্কী যোগে রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন এবং ঈশা খাঁর প্রেরিত দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া প্রথমে খিজিরপুর তৎপরে এগারসিন্দুর দুর্গে উপনীত হইলেন। যখন ঈশা খাঁ জানিতে পারিলেন যে স্বর্ণময়ী হস্তগত হইয়া এগারসিন্দুর দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন প্রবল পরাক্রমের সহিত চাঁদ রায়ের বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বদাহী কামানের গোলার আঘাতে কেদার রায়ের সাধের নৌ-বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইল। দ্রুতগামী ছিপ্ নৌকায় কেদার রায় পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ঈশা খাঁ মহানন্দে এগারসিন্দুর দুর্গে উপস্থিত হইলেন এবং স্বর্ণময়ীকে যথাবিধি ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। স্বর্ণময়ীর মুসলমানী নামকরণ হইল "বিবি আলি নেয়ামত"। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে কন্যা স্বর্ণময়ীর পলায়ন ও যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজয়, এই উভয়বিধ শোকে বিহ্বল ও আকুল হইয়া চাঁদ রায় কালীকা মন্দিরে "হত্যা" দিলেন। স্বপ্নাদেশ হইল যে স্বর্ণময়ীর জন্য আর বৃথা নর শোণিতপাত করিও না। যুদ্ধ থামিল। চাঁদ রায় ও কেদার রায় জিঘাংসানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ।

নুরুল হোসেন কাশিমপুরী।

আরবজাতির ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বারমেকিদিগের পতন।

খলিফা রশিদের শাসনকালে ১৮৭ হিজ্বরীতে এমন এক ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহার ফলে তাঁহার যশঃগৌরব হীনপ্রভ হইয়া পড়ে এবং তিনি অকৃতজ্ঞতারূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হন--তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন বিষাদ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। সপ্তদশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত বারমেক পরিবার গভীর বিশ্বস্ততা ও অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময় জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি রাজ্যের ধন ও শক্তি এবং জাতীয় উন্নতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, প্রত্যেক স্থান সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইতেছিল; কিন্তু তাঁহারা যে আড়ম্বর, ঐশ্বর্য্য, পরোপকারিতা ও অপরিমিত দানশীলতার জন্য সর্ব্বসাধারণের ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে এমন এক শত্রুদল গঠিত হইল—যাহারা যে কোন উপায়ে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল। কি কারণে তাঁহাদের পতন হয় অনেকে তাহার অনেক কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবনে খালদুন তৎকাল প্রচলিত জনশ্রুতি ও গল্পগুলির প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন। অনেক ঐতিহাসিক উক্ত জনশ্রুতি ও গল্পগুলির উপর নির্ভর করিয়া বারমেক পরিবারের প্রতি খলিফা রশিদের দুর্ব্ব্যবহারের কারণ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খলিফা রশিদের ভগ্নী আব্বাসার সহিত জাফরবিন ইয়াহ্ইয়ার বিবাহ ঘটিত গল্পকে এবনে খালদুন অমূলক কল্পনা বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। তিনি বারমেক পরিবারের পতনের প্রকৃত কারণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"এই সময় বারমেক পরিবার রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাম্রাজ্যের রাজস্ব এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, এমন কি স্বয়ং খলিফা রশিদের অর্থের আবশ্যক হইলেও তিনি উহা তাঁহাদের নিকট চাহিয়া লইতে বাধ্য হইতেন; তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত তিনি কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও পাইতে পারিতেন না। তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও যশঃগৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফৌজদারী ও

দেওয়ানী বিভাগ সংক্রান্ত রাজ্যের যাবতীয় উচ্চপদ তাঁহাদের পরিবারভুক্ত অথবা পক্ষভুক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাদের মুখাপেক্ষী ও তাঁহাদের নিকট নতশির ছিল। তাঁহারা ব্যতীত আবেদনকারী ও কর্ম্মপ্রার্থিগণের আশা পূর্ণ হইত না। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দিকে, প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক নগরে ও প্রত্যেক গ্রামে তাঁহাদের বদান্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সকলেই তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিত এবং তাঁহারা স্বকীয় প্রভু খলিফা অপেক্ষাও জনসাধারণের অধিকতর ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন।" এই সমস্ত কারণে রাজ-সভাসদ ও সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ ধর্ম্মনেতাদিগের ঈর্ষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। রাজসিংহাসনের সুশীতল ছায়ায় বাস করিতে-ছিলেন বলিয়া অপবাদরূপ বৃশ্চিক তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিশ্রাম-শয্যায় দংশন করিতে আরও সুবিধা পাইয়াছিল। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান প্রাচীন শত্রু কোষাধ্যক্ষ ফজল-বিন রাবি তাঁহাদের বিরুদ্ধে খলিফার মনকে কলুষিত করিতে নানাপ্রকার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি যে পদে কার্য্য করিতেন তাহাতে তাঁহার ঐ সমস্ত সুযোগ পাইবার সুবিধাও ছিল। এবনে খালদুন বর্ণন করিয়াছেন যে তাঁহার (ফজল-বিন রাবির) এমন কতকগুলি সহকারী জুটিয়াছিল যাহারা প্রবল বিদ্বেষের বলে বারমেক পরিবারের সহিত আত্মীয়তার কথাও বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহারা গোপনে খলিফাকে বলিয়াছিল যে, বারমেক পরিবার বনু-আব্বাসদিগের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। অবিরত মিথ্যা সংবাদ শ্রবণে উত্তেজিত হইয়া স্বেচ্ছাচারজনিত ক্রোধ ও সন্দিগ্ধতামূলক অন্ধ প্রচণ্ডতার বশে তিনি তাঁহাদের বংশপরম্পরাগত বিশ্বস্ত রাজসেবা বিস্মৃত হন। মন্ত্রী জাফরকে হত্যা, বৃদ্ধ ইয়াহ্ইয়া এবং তাঁহার অন্যান্য পুত্র ফজল (খলিফা রশিদের ধাত্রী পুত্র), মুছা ও মোহাম্মদকে বন্দী করার জন্য হঠাৎ এক রাত্রিতে আদেশ প্রচারিত হইল। ছদ্মবেশে বাগদাদ নগরীর নৈশ ভ্রমণে যে মস্‌রুর (Masrur) খলিফা রশিদ ও তদীয় মন্ত্রীর অনুগমন করিত, আজ তাহার দ্বারাই মন্ত্রী জাফরের হত্যাকার্য্য সংসাধিত হইল এবং অন্য সকলে রাক্কা (প্রাচীন নিসিদোরিয়াম) নামক স্থানে কারারুদ্ধ ও তাহাদের সম্পত্তি রাজসরকারে গৃহীত হইল। প্রথমে কারাগৃহে তাঁহাদিগকে কষ্ট প্রদান করা হয় নাই। তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য তথায় তাঁহারা স্বীয় ভৃত্যদিগকে রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আব্দুল মালেক-বিন সালেহ* খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া তদীয় সেক্রেটারী ও পুত্র কর্তৃক অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ হন। বারমেকিগণ এই ষড়যন্ত্রের সাহায্য না করিলেও তাঁহারা ঐ বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া খলিফার ধারণা জন্মে; তজ্জন্য তিনি বন্দি-দিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করা আরম্ভ করেন এবং পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন। বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ইয়াহ্‌ইয়া ১৯০ হিজরীতে (৮০৫ খৃঃ) কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন এবং তদীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র ফজল ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার অনুসরণ করেন। মুছা ও মোহাম্মদ তাঁহাদের পিতার মৃত্যুর পর বন্দি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু আব্দুল মালেক খলিফা আমিনের সিংহাসনারোহণ কাল পর্য্যন্ত বন্দী অবস্থায় থাকিয়া তৎকর্ত্তৃক মুক্তি প্রাপ্ত ও সিরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। খলিফা মামুন বাগদাদের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া বারমেক পরিবারের সম্পত্তি ও সম্মান প্রত্যর্পণ করেন।

খলিফা রশিদের রাজত্বকালেও খারিজিগণ তাহাদের চিরন্তন অভ্যাসানুসারে কয়েকবার বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা অক্লেশে বশীভূত হয়। এই সমস্ত বিদ্রোহের কোন একটিতে লায়লা † নাম্নী জনৈক অল্পবয়স্কা বালিকা উত্তেজিত খারিজিদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করায় উহা প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথমে তাবিদের পুত্র ও লায়লার ভ্রাতা ওয়ালিদ কর্ত্তৃক ঐ বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং তাহার পতনের পর লায়লাই সৈন্য পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া রাজকীয় সৈন্যের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করেন। পরিশেষে তাঁহার জনৈক আত্মীয় ‡ খলিফার সৈন্যদলের সেনাপতি পদে বরিত হইয়া তিনি লায়লাকে অস্ত্র ত্যাগ করত ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ কুমারী জীবন যাপন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। লায়লাও তদনুযায়ী কার্য্য করেন। এই আরব বীর কুমারী অতীব সৌন্দর্য্যশালিনী ও কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

---

* তিনি আলী-বিন-আবদুল্লা-বিন-আব্বাছের পৌত্র ছিলেন, সুতরাং খলিফা মাহদির পিতৃব্য পুত্র।

† এবনে আল আছির এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এবনে খালিকান তাঁহার নাম আলকারিয়া লিখিয়াছেন।

‡ এই ব্যক্তির নাম এজিদ বিন মাজেদ ছিল।

মোজেলবাসীদিগের বিদ্রোহোন্মুখ ভাবে বিরক্ত হইয়া খলিফা রশিদ তাহাদের দণ্ড স্বরূপ উক্ত নগরী ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। মোধার ও হিমিয়ার-দিগের পরস্পর আত্মকলহে দামাস্কাস নগরীতে অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। খলিফা রশিদ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে সিরিয়াবাসিগণ আব্বাস বংশের প্রতি অনুরক্ত নহে। উভয় পক্ষ যাহাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া দুর্ব্বল হয়, তজ্জন্য কিছুদিন তিনি ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই; পরিশেষে তিনি তাহা-দের সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদে হস্তক্ষেপ করিয়া দৃঢ় হস্তে দামাস্কাসে শান্তি স্থাপন করেন।

গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ।

গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধই খলিফা হারুণ আর রশিদের রাজত্বকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খলিফা মাহদির সহিত রাজ্ঞী আইরিণের যে সন্ধি হইয়াছিল ১৮১ হিজরীতে গ্রীকগণ ঐ সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া ইসলাম রাজ্য আক্রমণ করে; কিন্তু তাহাদের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হওয়ায় তাহারা বিতাড়িত হয় এবং তাহাদের মাতারা (Matarah) ও আনসাইরা (Ancyra) নামক নগরদ্বয় মুসলমানদিগের করতলগত হয়। উম্মিয়া ও আব্বাসি-দিগের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহের সময় সাইপ্রাস দ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে উহা পুনরধিকৃত হয় ও ক্রীটবাসিগণ বশ্যতা স্বীকার করে। এই সকল ঘটনার পর পুনরায় গ্রীক ও আরবদিগের মধ্যে নূতন সন্ধি স্থাপিত হয়। গ্রীকগণ পূর্ব্ব সন্ধি-সর্ত্তানুযায়ী মুসলমানদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হয় এবং উভয় পক্ষ বন্দিদিগকে মুক্তি প্রদান করে। সকলেই মনে করিয়াছিল যে এই সন্ধি কিছুকালের জন্য স্থায়ী হইবে। ১৮২ হিজরীতে নিষ্ঠুর রাজ্ঞী আইরিণ তদীয় অল্পবয়স্ক পুত্র ষষ্ঠ কনস্ট্যানটাইনকে অন্ধ করিয়া অগাষ্টা (আরবী ভাষায় আতাসা) উপাধি ধারণ করত রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন এবং স্বীয় প্রিয় খোজা ইটিয়াসের (Aetius) সহায়তায় পাঁচ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করেন। তৎপর চঞ্চলচিত্ত গ্রীকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত ও বন্দী করে এবং তাঁহার কোষাধ্যক্ষ নাইস্‌ফোরাসকে * সিংহাসন প্রদত্ত হয়। স্বভাবগত বিশ্বস্ততার অভাবে রাজ্ঞী আইরিণ ও মুসলমানদিগের মধ্যে স্থাপিত

* আরবগণ তাহাকে নিকফুর বলিত।

সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিতে মনস্থ করিয়া * নাইস্‌ফোরাস খলিফা রশিদের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক অপমানসূচক লিপি প্রেরণ করে। "রোমক সম্রাট নাইসফোরাসের নিকট হইতে আরবদিগের রাজা হারুণের নিকট—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্রাজ্ঞী তোমাকে দাঁড়কাকের আসন প্রদান করিয়াছেন ও নিজকে পনের সামান্য আসনে রাখিয়াছেন † এবং তাঁহার বহু ঐশ্বর্য্য তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার রমণীসুলভ দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ঘটিয়াছে। তুমি আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্র রাজ্ঞী আইরিণের নিকট হইতে গৃহীত সম্পত্তি ফেরত দিবে; অন্যথায় তরবারি তোমার ও আমার বিষয় মীমাংসা করিবে।" জনৈক ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন—খলিফা রশিদ এই পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে এতই উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে কেহই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করে নাই; কেহই তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সক্ষম হয় নাই; তাঁহার সভাসদগণ ভয়ে দরবারগৃহ হইতে প্রস্থান করেন; তদীয় মন্ত্রীবর্গ নির্ব্বাক হইয়া মন্ত্রণা প্রদানে নিবৃত্ত হন।

তৎপর তিনি ঐ পত্রের পৃষ্ঠদেশে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠান —*"বিশ্বাসীদিগের নেতা হারুণের নিকট হইতে রোমকদিগের কুক্কুর নাইস্‌ফোরাসের নিকট—পত্রের উত্তর দেখিতে পাইবে, শুনিতে পাইবে না।"*

খলিফা রশিদ তাঁহার কথানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সেই দিবসেই সসৈন্যে অভিযান করিয়া যে পর্য্যন্ত হিরাক্লিয়ার দুর্গে ‡ পঁহুছিতে না পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পথে বিশ্রাম করেন নাই। গর্ব্বিত নাইস্‌ফোরাস এইস্থানে খলিফার সম্মুখীন হইয়া শোচনীয় রূপে পরাজিত হয়। § কেবল তাহার অনুতাপের ভান ও প্রতারণার কৌশল আরবদিগের

* এবনে খালদুনের বর্ণনা।

† এখানে শতরঞ্চ খেলার দাঁড়কাক ও পনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরাজিতে শতরঞ্চ খেলার নিকৃষ্টতম অঙ্ককে পণ (Pawn) ও উচ্চতম অঙ্ককে রুক (দাঁড়কাক) বলে। খলিফা হারুণ আর রশিদ এই ক্রীড়া পশ্চিম এসিয়ায় প্রচলিত করিয়াছিলেন।

‡ যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, আরবগণ উহাকে হিরাক্লিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক লেখকগণ বলেন যে, এই যুদ্ধ থাইমব্রিস (Thymbris) নদীতটে ডরিলিয়াম (Dorylaeum) নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল।

§ ঐতিহাসিক সয়ূতী ইহাকে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাতে মুসলমানদিগের জয়লাভ হইয়াছিল লিখিয়াছেন।

দুর্দ্দমনীয় যুদ্ধবেগ প্রদমিত করিয়াছিল। নাইস্‌ফোরাস সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বাৎসরিক নিয়মিত কর দিতে সম্মত ও প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়। এই সন্ধি অনুমোদন করিয়া বিজয়ী খলিফা রাক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। খলিফা রাক্কায় পঁহুছামাত্র নাইস্‌ফোরাস পুনরায় সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করে। সে মনে করিয়াছিল যে খলিফা রাক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে এই প্রচণ্ড শীত ঋতুতে পুনরায় তাঁহার পক্ষে সমরক্ষেত্রে আগমন অসম্ভব; কিন্তু তিনি তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভ্রম তিরোহিত করিয়াছিলেন। খলিফা সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গের কথা শুনিবামাত্র ভীষণ শীত ঋতুতে বরফাচ্ছন্ন টরাস পর্ব্বত পুনরায় অতিক্রম করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। "নাইস্‌ফোরাস বিশ্বাসীদিগের নেতার এই প্রকার দ্রুত বীরোচিত অভিযান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়—তাহার রাজনৈতিক যুদ্ধ কৌশল ব্যর্থ হইয়া যায় এবং এই বিশ্বাসঘাতক গ্রীক তিন স্থানে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় সমরক্ষেত্রে তাহার চল্লিশ সহস্র সৈন্যের মৃতদেহ ফেলিয়া পলায়ন করে।"* নাইস্‌ফোরাস পুনরায় সন্ধি প্রার্থনা করায় তাহার প্রার্থনা অনুমোদিত হয় (১৮৮ হিজরী)। গ্রীকদিগের চরিত্র বিশেষরূপে অবগত হইয়া খলিফা ফ্রিজিয়া (Phrygia) পরিত্যাগের পূর্ব্বে সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য স্থাপনের এ প্রকার সুবন্দোবস্ত করেন যাহাতে পুনরায় তাহারা সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিতে না পারে। কিন্তু "খলিফা হারুণ অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় নাইস্‌ফোরাস পুনরায় সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিতাড়িত হইয়াছিল"†। ১৮৯ হিজরীতে রায়ের (Ancient Rhages) শাসনকর্ত্তা অবাধ্যতা প্রকাশ করিলে তাহাকে স্ববশে আনয়নের নিমিত্ত খলিফা রশিদ তথায় গমন করেন। নাইস্‌ফোরাস এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া পুনরায় মোসলেম সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু খলিফার পুত্র কাসেম কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়। খলিফা এই পুত্রকে সীমান্ত প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ধিভঙ্গের জন্য এবারও নাইস্‌ফোরাস ক্ষমা প্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ।

শেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ।

* গিবন।

† মুর।

দস্যুর কাণ্ড।

দুই লক্ষ টাকা।

নবম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা পুলিশের বড় সাহেব এই ভয়াবহ সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ মিত্রজাকে ডাকিলেন। তিনি ব্যতীত এই গূঢ় রহস্যপূর্ণ চুরির তদন্ত করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, ইহাই সকলের বিশ্বাস।

মিত্রজা এই অত্যাশ্চর্য্য চুরির বৃত্তান্ত সমস্ত নীরবে শ্রবণ করিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এই স্বরযমলের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার কোন গুপ্ত দ্বার আছে কি না, ইহার অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র। এ রহস্যের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে অন্যত্র অনুসন্ধান করাই উচিত।"

সাহেব তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় উচিত?"

"রণরাওই কেবল বলিতে পারে।"

"তাহা হইলে আপনি মনে করেন সেই এই চুরি করিয়াছে।"

"সে ব্যতীত এরূপ কাজ আর কাহারই করিবার ক্ষমতা নাই। গুপ্ত দ্বার প্রভৃতির অনুসন্ধান করা বৃথা। রণরাও সেরূপ কিছুর সাহায্যে যে এই কার্য্য করিয়াছে তাহা আমার বোধ হয় না। তাহার কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণই নূতন।"

"তাহা হইলে কি করিতে চাহেন?"

"সে এখনও আলিপুরের জেলে সুখে বাস করিতেছে। অনুমতি লিখিয়া দিন, আমি কিয়ৎক্ষণ গোপনে তাহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি। তাহার কোনরূপ ক্ষতি হইবে না সে যদি এইরূপ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে চুরির রহস্য কথা বলিতে বিশেষ আপত্তি করিবে না। তাহা হইলে আমারও আর কষ্ট করিয়া আজিমগঞ্জে যাইতে হইবে না।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ অনুমতি পত্র লিখিয়া দিলেন। ঠিক বারটার সময় বৃদ্ধ মিত্রজা আলিপুরের জেলের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার খুলিল।

পুলিশের বড় সাহেবের অনুমতি পত্র দেখাইলে, রণরাওর সহিত গোপনে দেখা করা মিত্রজার পক্ষে কঠিন হইল না। একজন জেলরক্ষক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জেলের ভিতরস্থ একটি কক্ষে আনয়ন করিলেন। দ্বারে বৃহৎ তালা ঝুলিতেছিল, তিনি তালা খুলিলেন, দ্বার টানিলেন এবং মিত্রজা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে আবার বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দ্বারের বাহিরে শান্ত্রি বন্দুক স্কন্ধে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

যে কক্ষে রণরাও আবদ্ধ ছিল, সেই কক্ষ-প্রাচীরে প্রায় বিশ হাত উর্দ্ধে একটি মাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। তাহারই ভিতর হইতে আলোক আসিত। চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর,দ্বার লৌহের গরাদে সংযুক্ত—সুদৃঢ়। এস্থান হইতে কাহারও পলায়ন সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

গৃহের এক পার্শ্বে রণরাও কম্বলের উপর শায়িত ছিল,—সে মিত্রজাকে দেখিয়া হাই তুলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, তাহার পর অতি আনন্দিত স্বরে বলিয়া উঠিল,"এ কে! মিত্রজা যে!—কি সৌভাগ্য!—কি সৌভাগ্য! আপনাকে দেখিয়া প্রাণে যে কত আনন্দ হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। বসুন—বসুন,—কি করিব, এই জঘন্য কম্বল ব্যতীত আর কিছু বসিতে দিবার নাই। একটু তামাক পান দিয়া যে আদর-অভ্যর্থনা করি, তাহারও উপায় নাই; তবে বেশি দিন নয়, শীঘ্রই এখান হইতে যাইব, তখন আপনার সমুচিত অভ্যর্থনা করিতে পারিব। এখন উপায় নাই, কিছু মনে করিবেন না।"

মিত্রজা বসিলেন। রণরাও বলিল, "এতদিন পরে একজন ভদ্রলোকের মুখ দেখিয়া প্রাণে যে কি আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। দিবা রাত্রি চোর ডাকাতের মুখ দেখিতে হইতেছে। তাহার পর এই মূর্খেরা দিনের মধ্যে একশ বার আমার কাপড় ঝাড়া দিতে আসে; দেখে—যদি পলাইবার কোন উপায় আমার কাছে থাকে।—কি আপদ! গভর্ণমেণ্ট যেন জোঁকের মত আমার গায় বসে আছে! কি মুস্কিল! আমিই নিজের মনে বকিতেছি;—আজ এত অনুগ্রহ কেন হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।"

মিত্রজা গম্ভীরভাবে কেবল মাত্র বলিলেন, "আজিমগঞ্জের ব্যাপার।"

রণরাও বলিয়া উঠিল, "দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান,—কি বলিলেন? আজিমগঞ্জের ব্যাপার? হাঁ, এই মাথার ভিতর এত ব্যাপার আছে যে, হঠাৎ সব মনে হয় না;—আজিমগঞ্জের ব্যাপার! হাঁ, মনে হইয়াছে—তাহার পর——"

দশম পরিচ্ছেদ।

মিত্রজা মৃদু হাসিলেন। রণরাওর ন্যায় লোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্ম-গ্রহণ করে, এই রক্ষা!

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে কত দূর কি আমরা অনুসন্ধান করিয়াছি, বোধ হয় মহাশয়কে তাহা খুলিয়া বলিতে হইবে না।"

রণরাও বিনম্র ভাবে বলিল, "নিশ্চয়ই নয়—নিশ্চয়ই নয়,—যথা সময়ে আমি সব খবরই পাই;—জানি মহাশয়েরা এ সম্বন্ধে বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।"

মিত্রজা বলিলেন, "এই জন্যই মহাশয়ের নিকটে আসিয়াছি। এ সম্বন্ধে একটু অনুগ্রহ করিবেন কি?"

রণরাও হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "সে কি! সে কি! গোলাম তো হাজির আছে।"

মিত্রজা একেবারে কাজের কথা তুলিলেন, বলিলেন, "এ ব্যাপারটা কি হুজুরেরই কীর্ত্তি?"

অতি বিনম্র ভাবে রণরাও বলিল—"ক হইতে চন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত।"

"চিঠি দুইখানা মহাশয় কি এখান থেকেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন?"

রণরাও মৃদু হাসিয়া বলিল, "হাঁ, অধীনই সুরযমলকে এখান থেকে চিঠি দুখানা পাঠিয়েছিলেন। আবার সে দুখানা ফেরতও পাইয়াছেন, এই বোধ হয় এখানে আছে।"

এই বলিয়া রণরাও প্রস্তর নির্ম্মিত বালিশটি সরাইয়া দুইখানা কাগজ বাহির করিল।

দেখিয়া মিত্রজা বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি জানিতাম দিন রাত তুমি পাহারায় আছ।"

রণরাও হাসিতে হাসিতে বলিল, "নিশ্চয়—নিশ্চয়!"

"আর তুমি এখান হইতে পত্র লিখিতেছ, পত্র পাইতেছ,—আমি জানিতাম সর্ব্বদাই তোমার কাপড় ঝাড়া দেওয়া হয়।"

"নিশ্চয়,—নিশ্চয়,—সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হয় না। তবে এই মূর্খদের মাথায় প্রবেশ করে না যে, তাহাদের এত পাহারার মধ্যেও রণরাও সব ইচ্ছা মত করিতে পারে,—হা, হা, মিত্রজা!" (হাস্য)।

মিত্রজা এই অদ্ভুত লোকের ব্যবহারে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতে পারিলেন

না। বরং তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলেন,—বলিলেন, "তুমি আশ্চর্য্য লোক, সহস্র বার স্বীকার করি, তোমার অন্ত পাওয়া ভার। এখন আজিমগঞ্জের কীর্ত্তিটার কথা হউক।"

রণরাও একটু গম্ভীর হইল, কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিল, তাহার পর মিত্রজার স্কন্ধে সস্নেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "বলি, স্বরযমলকে যে পত্রখানা লিখিয়াছিলাম, তাহার বিষয়ে আপনার মতামত কি ?"

মিত্রজা রণরাওর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বোধ হয় মহাশয় আমাদের উপর এক হাত লইতে চাহিয়াছিলেন ?"

রণরাও মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওঃ, মহাশয়! তাহাই ভাবিতেছেন ? মিত্রজা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি অন্যের ন্যায় গাধা নও। তুমি মনে করিয়াছ আমি পুলিশের সহিত কৌতুক করিয়া আমার বহু মুল্য সময় বৃথা নষ্ট করিব ? এ পত্র না লিখিয়া অন্য কোন রকমে কি কৃপণ স্বরযমলের জহরত চুরি করিতে পারিতাম না ? তোমাদের মাথায় এটুকু বুদ্ধিও কি নাই যে, এই পত্রই হইল আমার এ কার্য্যের কেন্দ্রস্থল,—ইহা হইতেই সকল কার্য্য সুলভ-সাধ্য হইয়াছিল। যখন এখানে আর কেহ নাই, আর তুমি আমার কথা প্রকাশ করিলে তাহা অস্বীকার করিয়া তোমায় অনায়াসেই মিথ্যাবাদী বানাইতে পারিব,—তখন তোমায় সব কথা বলিতে আমার আপত্তি নাই। এস, মনে কর,—স্বরযমলের বাড়ীতে আমরা চুরি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।"

মিত্রজা বলিলেন, "বল, আমি খুব মনোযোগের সহিত শুনিতেছি।"

রণরাও বলিল, "মহাশয় বোধ হয়, স্বরযমলের বাড়ীর বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন—দুর্জ্জেয় অজেয় স্থান,—কাহারও সাধ্য নাই যে দরজা বন্ধ থাকিলে বাহির হইতে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করে—"

"এ সমস্তই শুনিয়াছি।"

"তাহা হইলে এই বাড়ী হইতে জহরত লইবার উপায় কি ? আমি কি রাত্রে লোক জন লইয়া প্রকাশ্য ভাবে এই বাড়ী আক্রমণ করিব ? ইহা করিলে তাহা কি নিতান্ত ছেলে মানুষি হইত না ? লুকাইয়া সিঁদ দিয়া প্রবেশ করিব ?—অসম্ভব। তবে কিরূপে এই বাড়ীতে প্রবেশ করা যায় ? বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারিলে যে সেই বাড়ী হইতে কিছু লইয়া আসিতে পারা যায় না, তাহা বোধ হয় মহাশয় বুঝিতে পারেন।"

"নিশ্চয়!"

"তাহা হইলে উপায় কি!—একমাত্র উপায় আছে, যদি বাড়ীর মালিক স্বয়ং আমাকে বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যান, তবেই আমার প্রবেশ করা ঘটিতে পারে, নতুবা আর কোন উপায় নাই।"

"বুঝিলাম।"

"বেশ,—মনে কর যে, বাড়ীর মালিক এক পত্র পাইল—তাহাতে লিখিত আছে যে বিখ্যাত দস্যু রণরাও আলিপুরের জেলে থাকিয়াও তাহার জহরত চুরির আয়োজন করিতেছে, এ অবস্থায় তাহার কি করা উচিত?"

"সে পুলিশে সংবাদ দিবে।"

"আর পুলিশ তাহার এই কথায় হা হা করিয়া হাসিবে। এ অবস্থায় লোকটা অধীর হইয়া যাহার তাহার সাহায্য লইবার জন্য ব্যগ্র হইবে না কি?"

"নিশ্চয়ই।"

"এমন সময়ে সে যদি শুনে যে, পুলিশের বিখ্যাত দারোগা মিত্রজা মুর্শিদাবাদে বেড়াইতে আসিয়াছেন,—সে—"

"নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট ছুটিবে।"

"ভাল কথা,—রণরাও মনে মনে জানিত যে, ঠিক এই রকম ঘটিবে, তাহাই সে তাহার জন কয়েক লোক আজিমগঞ্জে পাঠাইয়াছিল, তাহারাই মুখে মুখে প্রচার করিয়াছিল যে মিত্রজা মুর্শিদাবাদে আসিয়াছেন,—তাহাদের এক জনই বৃদ্ধ মিত্রজা সাজিয়াছিল—তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মহাশয় নিশ্চয়ই তাহা সমস্তই শুনিয়াছেন।"

"হাঁ, বুঝিলাম এই রকমে মহাশয়ের লোক সুরযমলের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু জহরতগুলি উড়িল কিরূপে?"

"অতি সহজ! ভিতরে যে লোকটা ছিল তাহাদের নিকট কোন সিন্দুকই খোলা কঠিন নহে; তাহারা সিন্ধুক খুলিয়া জহরত নিঃশব্দে বাহির করিয়া গঙ্গার দিক্‌কার ছোট জানালা খুলিয়া দড়ি দিয়া নীচে নামাইয়া দিয়াছিল, গঙ্গায় একখানি নৌকা ঠিক জানালার নীচে অপেক্ষা করিতেছিল—আর অধিক কি শুনিতে চাও?"

মিত্রজা হাসিয়া বলিলেন, "আর বেশি কিছু শুনিবার নাই,—লোক দুইটার অজ্ঞান হওয়াটাও জাল?"

"সম্পূর্ণ! এ সকল ব্যাপারে অনেক শিখিতে হয়। এখন আমি যাহা বলি-

লাম, তাহা যদি তুমি সুরযমলকে গিয়া বল, তাহা হইলে সুরযমল তখনই মিত্রজাকে গ্রেপ্তার করিতে বলিবে। মিত্রজাকে মিত্রজা গ্রেপ্তার করিবে,— কি মজা!”

রণরাও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সময়ে একজন জেল-কর্ম্মচারী কিছু খাবার রণরাওর জন্য আনিল। সে তাহা রণরাওর নিকটে রাখিয়া চলিয়া গেল। রণরাও হাসি বন্ধ করিয়া আহারে বসিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

জামে অল-আজহারের ইতিহাস।

‘মধ্যযুগে মোসলেম সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিবার পর দেখিলাম যে ভুবনবিখ্যাত, প্রাচীন বিরাট মোসলেম-বিদ্যালয় জামে অল-আজহারের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ প্রদান না করিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যদিও প্রবন্ধমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, তবুও ইহার একটু বিস্তারিত পরিচয় প্রদানেরও প্রয়োজন।

যাহাহউক, ইহার ইতিহাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহার শিক্ষার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহারও একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

‘ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী’ নামক গ্রন্থে ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী জামে অল-আজহারকে জগতের অতি প্রাচীন বৃহৎ ও বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা না থাকায় তিনি বলিয়াছেন যে, মুসলমান শিক্ষার মস্তকও নাই, হৃদয়ও নাই। অর্থাৎ মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। তিনি অবশ্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলতিলকগণের মতানুসারে এরূপ বলিয়া থাকিবেন। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংসারিক বা অর্থকরি বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অথবা বিজাতীয় ভাষা বা বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তেমন কোনও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল না।

ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তাৎকালিক মুসলমানেরা ধর্ম্মালোচনাতেই অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা ইহাকেই সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলিয়া জানিতেন। আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকা বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে একদিকে যেমন সাংসারিক বা অর্থকরি বিদ্যা উচ্চ আসন বা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই ধর্ম্মশিক্ষা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে ও ইহার ফলে নাস্তিকতা আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত লোক স্ব স্ব ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থাবলীকে কুসংস্কারবিশিষ্ট ধর্ম্মমত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, স্বধর্ম্মে তাঁহাদের আদৌ আস্থা নাই।

আধুনিক ভারতবাসীরও ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে। মুসলমান বা হিন্দু যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই হউন না কেন, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইলেই স্বধর্ম্মের প্রতি আর তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে না। তাঁহার ধর্ম্ম একরূপ 'খিচুড়ী' হইয়া পড়ে। তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ত্তব্যগুলিকে 'ছেলে খেলা', সভ্যতাশূন্য প্রাচান মূর্খগণের কুসংস্কার বলিয়াই মনে করেন। আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশের হিন্দুগণই পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষায় প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের হিন্দুত্ব নাই বলিলেও হয়। তাঁহারা পাশ্চাত্য ধরণ-ধারণ অনুকরণ করিতে বড়ই পটু, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

মুসলমানদিগের মধ্যে যদিও বা একটু ধর্ম্মভাব বিদ্যমান ছিল, তাহাও ক্রমে লোপ পাইয়া আসিতেছে। যাঁহারা এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাঁহারাই ইসলামধর্ম্ম-ব্যবস্থাপিত কর্ত্তব্যগুলিকে কুসংস্কার-বিশিষ্ট বাহ্যানুষ্ঠান বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা এরূপ শুনিতে পাই যে, ইসলামধর্ম্মশিক্ষাস্থল কলিকাতা মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলিতেও এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। সেখানে আধুনিক সভ্যতা-লোকপ্রাপ্ত ও নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত একদল সমাজসংস্কারক ধর্ম্মবিবর্জ্জিত পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইসলামের নিয়মানুষ্ঠানগুলিকে অকিঞ্চিৎ-কর ও আধুনিক সভ্য-সমাজ-বিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া ইসলামের সীমার বাহির করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য ধরণ প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

পূর্ব্বে কি এরূপ ছিল? তখন মক্তবেই হউক আর মাদ্রাসায়ই হউক, প্রথমে

ধর্ম্মশিক্ষার দিকেই লোকের দৃষ্টি ছিল; তৎপরে অর্থকরি বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা। এজন্য তৎকালে কেহই ধর্ম্মবিহীন কপট সাজিতে পারিত না। সকলেরই স্ব স্ব ধর্ম্মে দৃঢ় আস্থা ছিল। তৎকালে বিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল 'ধর্ম্ম'। এক্ষণকার বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পাঠ্য বিষয় হইয়াছে কেবল ধর্ম্মবিবর্জ্জিত অর্থকরি বা সাংসারিক বিদ্যা। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়েও সাংসারিক বিদ্যার চর্চ্চা হইত,—তবে এতদূর নহে; কার্য্যোপযোগী শিক্ষা হইলেই হইল। এক্ষণে সাংসারিক শিক্ষার প্রভাব অধিক। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কেহ গাণিতিক, কেহ দার্শনিক, কেহ নৈয়ায়িক, কেহ বাগ্মী, কেহ ঐতিহাসিক, কেহ বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন বটে, কিন্তু কেহই ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারিতেছেন না। তৎকালে যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রগুরু বলিয়া ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহারাও গণিত বা দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন।

মধ্যযুগে মোসলেম বিদ্যালয়ের পঠিত গণিত বিজ্ঞান বা ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভূমিকায়ও ঈশ্বর নাম লিখিত থাকিত। ইহাতে সুফল ফলিত। কারণ বালকগণ অতি শৈশবাবস্থা হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাত হইত, ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও ভক্তিমান হইত। এক্ষণে তাহার নামগন্ধও নাই। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষাপদ্ধতি পাশ্চাত্য ধরণের হওয়ায় লোকের ধর্ম্মমতও পাশ্চাত্য ভাব ধারণ করিয়া কিম্ভূত-কিমাকার হইয়াছে। মধ্যযুগে মোসলেমগণ ধর্ম্মশিক্ষাকে মস্তক ও হৃদয় বলিয়া জানিতেন। এজন্য তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার মস্তকও ছিল, হৃদয়ও ছিল।

আমার এই দীর্ঘ মন্তব্য পাঠ করিয়া বোধ হয় অনেকেই বলিবেন যে, কেবল ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসী হইয়া থাকিলে কিরূপে বিদ্যোন্নতি হইতে পারে। আমি সেরূপ অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধী। এক্ষণে যেমন গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য, তেমনই প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষাও বাধ্যতা-মূলক (Compulsory) করা চাই। উচ্চশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার সংস্রব না থাকিলে লোকে ক্রমে ধর্ম্মলেশ শূন্য বা নাস্তিক হইয়া পড়িবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আধুনিক যুক্তি-শাস্ত্রের সাহায্যে স্বীয় ধর্ম্মের কর্ত্তব্য-পালনগুলিকে অযৌক্তিক বলিয়া খণ্ডন করিতেও চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ইহা কি ধর্ম্মশিক্ষা বিবর্জ্জিত শিক্ষার ফল নহে? যাহা হউক, আমি বলিতে বলিতে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে প্রবন্ধোদ্দিষ্ট বিষয় আরম্ভ করা যাউক।

আজহার মিশর দেশের একটি পূর্ব্বতন মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়। ধর্ম্মই এখানকার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। অন্যান্য সাংসারিক বিদ্যার আলোচনা হইত বটে, তবে তাহা অতি সামান্য ভাবে। আজহার (অলজামি অল-আজহার হইতে জামি অল-আজহার), কায়রো নগরস্থ মস্‌জিদ ও কলেজ।

প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও উৎসৃষ্ট দান।—ফাতেমিয়াগণ কর্ত্তৃক মিশর দেশ অধিকৃত হইবার এক বৎসর পরে (অল-কাহিরা, জমাদিয়ল আউয়ল ৩৫৯—রমজান ৩৬১ হিঃ) ও নূতন রাজধানী স্থাপনের অব্যবহিত পরেই আবুতমিম মা'আদ্দের সৈন্যাধ্যক্ষ জওহার অল-কাতিব অল-সিকিল্লি (ওরফে অল-সকলাবি) কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ৩৬১ হিজরীর রমজান মাসে (জুন-জুলাই, ৯৭২ খৃঃ) উপাসনা (এবাদত) কার্য্যের জন্য উন্মোচিত হয়। নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে তুর্কী পল্লী ও দাইলেম পল্লীর মধ্যস্থলে তৎকালে বিদ্যমান 'বৃহৎ দুর্গে'র অনতিদূরেই ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। ৩৬০ হিজরীতে জওহার গুম্বজোপরি শিলালিপি স্থাপন করেন। ইহার (লিপির) মূল আমাদের জন্য মাক্রিজী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল (কিতাব অল-খিত্তাত --২য় খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ) পরে ইহা বিলুপ্ত হইয়াছে। অপরাপর ফাতেমিয়া শাসনকর্ত্তাগণ মস্‌জিদে আরও বহু গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন এবং অর্থদান ও স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপন করত ইহাকে উৎসৃষ্ট করিয়া যান। অল আজিজ নেজার (৩৬৫-৩৮৬ হিঃ, ৯৭৬-৯৯৬ খৃঃ) ইহাকে পাঠাগার (একাডেমি) করিয়াছিলেন ও ইহাতে পঞ্চত্রিংশ জনের বাসোপযোগী একটি দরিদ্রাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রথম প্রাসাদোপরি স্থাপিত একটি তেলেস্‌ম (Talisman) বিশেষ বিস্ময়াবহ ব্যাপার বলিয়া উল্লিখিত আছে। মস্‌জিদে পক্ষিদিগকে নীড়নির্ম্মাণ ও শাবকপালন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনটি স্তম্ভের উপর একটি কৃত্রিম বিহগ মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। অল-হাকিমের শাসনকালে (৩৮৬-৪১১ হিঃ, ৯৯৬-১০২০ খৃঃ) মসজিদ্‌ প্রাসাদে গৃহসংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত এবং আজহার ও অন্যান্য মসজিদ সমূহে (ওয়াকৃফ) সম্পত্তি ও প্রচুর অর্থদান করা হয়। অল-মাক্রিজী দ্বারা চারিশত হিজরীর এতৎসংক্রান্ত একখানি দলিল আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। হিঃ ৫১৯ (১১২৫ খৃঃ) সালে অল-আমির

কাষ্ঠ খোদিত করিয়া একটি উপাসনা বেদী (মেহরাব্) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও এতদুপরিস্থ লিপিমালা অদ্যাপি কায়রো নগরের আরব মিউজিয়মে (কৌতুকাগারে) রক্ষিত আছে।

ফাতেমিয়াগণ কর্ত্তৃক মস্‌জিদের মূলপত্তন হইতেই ইহার নাম জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। ... ... তাঁহার (ফাতেমার) নামানুসারে মসজিদের একটি মকৃসুরার নাম দেওয়া হয়। খলিফা অল-মস্তানসির ও অল হাফেজও ইহার সহিত সামান্য পরিমাণে গৃহাদি সংযোগ করিয়াছিলেন।

আয়ুবিদ্ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। কারণ তাঁহারা গোঁড়া সুন্নি ছিলেন বলিয়া সিয়া ফাতেমিয়াদিগের সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন লোপ করিতে প্রবৃত্ত হন। সুলতান সালাউদ্দিন মস্‌জিদ হইতে 'খোতবা'র স্বত্বগ্রহণ করেন ও ইহাতে অলহাকিমের ওয়াকৃফ সম্পত্তির কতকগুলির স্বত্ব লোপ করিয়া দেন। প্রায় শতবর্ষ গত হইবার পূর্ব্বেই শাসনকর্ত্তা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনুগ্রহ পুনরায় ইহার উপর নিপতিত হয়। অলমালিক অলজাহির বার্ব্বরী ইহাতে নূতন নূতন হর্ম্ম্য সংযোগ করেন ও ইহার খোতবার স্বত্ব পুনরুদ্ধার করেন। (৬৬৫ হিঃ, ১২৬৬-১২৬৭ খৃঃ—জওয়াজ্ঞ অল-জুমা)। বহুসংখ্যক আমীর তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। এই সময় হইতেই মস্‌জিদ ও শিক্ষা-নিকেতনরূপে আজহারের উন্নতি আরম্ভ হয়। স্বদেশবাসিগণের মনোযোগ ব্যতীত পূর্ব্বদেশে মোগলদিগের লুণ্ঠন হেতু ও পশ্চিমদেশে ইসলামের পতন নিবন্ধন বহু প্রাচীন উন্নতিশীল মাদ্রাসা ধ্বংস বা অবনত হইয়াছিল বলিয়াও ইহার উন্নতিপথ যথেষ্ট উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ৭০২ হিজরীতে (১৩০২-১৩০৩ খৃঃ) ভূমিকম্পে মস্‌জিদ ভগ্ন হইলে আমীর সলার (সল্লার) ইহাকে পুনর্নির্ম্মিত করেন। ৭২৫ হিজরী (১৩২৫ খৃঃ) হইতেই কায়রোর মহতাসিব্ মোহাম্মদ বিন্ হোসেন অল-ইসির্দ্দী কর্ত্তৃক সংযোজিত নূতন হর্ম্ম্যমালার তারিখ নির্দ্ধারিত হয়। প্রায় সেই সময়েই মস্‌জিদের নিকটে কলেজ সকল 'মদারিস্' আমীরদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইতে থাকে। ৭০৯ হিজরীতে (১৩০৯-১৩১০ খৃঃ) তায়বারদিগের দ্বারা ও ৭৪০ হিজরীতে (১৩৩৯-১৩৪০ খৃঃ) আকৃবুঘা আব্দুল ওয়াহেদ কর্ত্তৃক এই সকল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ইহাদিগকে আজহারের অধীনত্বে আনয়ন করা হয়। আজ পর্য্যন্ত সেগুলি ইহারই অধীন। খোজা বসির অল-জামদার অল-নাসিরি কর্ত্তৃক অনেক নূতন বাটীর নির্ম্মাণ ও জীর্ণ সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল (৭৬১ হিঃ, ১৩৬০ খৃঃ)। তিনি একখানি

কোরানও উপহার প্রদান করেন এবং ইহার জন্য একজন পাঠকের (কারীর) বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। দরিদ্রদিগের জন্য পুনরায় রন্ধনশালা নির্ম্মিত এবং হানিফী ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একজন অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮০০ হিজরীতে (১৩৯৭-৯৮ খৃঃ) একটি মিনার পড়িয়া যায়, কিন্তু সুলতান বরকুক স্বীয় ধনকোষ হইতে অবিলম্বে তাহা পুনরায় নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন। এইরূপ দুর্ঘটনা দুইবার ঘটিয়াছিল। (৮১৭ হিঃ, ১৪১৪-১৪১৫ খৃঃ এবং ৮২৭ হিঃ, ১৪২৩-১৪২৪ খৃঃ)। কিন্তু প্রতিবারই তাহার প্রতিবিধান করা হয়। ঠিক এই সময় একটি চৌবাচ্চা খনন করা হইয়াছিল। একটি 'সবিল' ও অজু করিবার জন্য একটি 'মিজা'আ' প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঠিক মস্‌জিদের পার্শ্বে খোজা জওহার অল-কঙ্কবাই (মৃত্যু ৮৪৪ হিঃ, ১৪৪০-১৪৪১ খৃঃ) কর্ত্তৃক একটি বিদ্যালয় নির্ম্মিত হয়। এই 'অল-জওহরিয়া' বিদ্যালয় সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ আলি মোবারক লিখিত 'অল-খিলাত অল-জদিদা', নামক পুস্তকের ৪র্থ ভাগ, ১৯৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। নবম শতাব্দীতে কায়েত্‌বেই মস্‌জিদের একজন অতি শ্রেষ্ঠ দানকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেই ৯০০ হিজরীতে (১৪৯৪-১৪৯৫ খৃঃ) সুদীর্ঘ অট্টালিকার নিৰ্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত দরিদ্রদিগের জন্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের নিমিত্ত তিনি অনেক স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা শিলালিপি সমূহ হইতেই তাঁহার হর্ম্ম্যমালা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হই। এবে্‌ ইয়াস্‌ এই শাসনকর্ত্তার একটি অত্যাশ্চর্য্য অভ্যাস সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়া-ছেন :—"তিনি একজন পশ্চিমদেশীয় লোকের বেশে আজহার মস্‌জিদে গমন ও তথায় উপাসনা কার্য্য সমাধা করিতেন এবং লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি বলে তাহা শুনিতেন। আমরা কিন্তু ইহার পরিণাম ফল অবগত হইতে পারি নাই। শেষ প্রধান মাম্‌লুক শাসনকর্ত্তা কানসুহ অল-ঘুরী (৯০৬-৯২২ হিঃ, ১৫০০-১৫১৬ খৃঃ) দুইটি উচ্চতম মিনার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

গুলেস্তানের গুল্।

গল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এমন সময়ে দরজাখোলার শব্দ পাইলাম। যেন কেহ আমারই ঘরের দরজা খুলিতেছে। কে আসিতেছে? শত্রু না মিত্র? অন্ধকারে আত্মপ্রচ্ছন্ন করিয়া আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম এবং রিভল্‌ভারটা প্রস্তুত রাখিলাম।

দ্বার খুলিয়া গেল এবং মুক্তদ্বারপথে সেই করুণারূপিণী মহিলা, একটি আলোক লইয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া, আমার কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তিনি সলজ্জভাবে মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন!

হঠাৎ মনে পড়িল, যুবতীকে উদ্যানে পারসী কবিতা পড়িতে শুনিয়াছিলাম। আমিও পারস্য ভাষা কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম। সেই ভাষায় বলিলাম "আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ।"

তিনি নীরবে রহিলেন। বুঝিলাম, লজ্জা তাঁহার মুখবন্ধ করিয়াছে।

এমন সময়ে বাহিরে আবার কামানের শব্দ হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিসের শব্দ ও?" এইবার যুবতী কথা কহিলেন। বলিলেন, "বিদ্রোহীরা রাজপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছে। এ'বাড়ীর সকলেই পলাইয়াছে। কেবল আমি আছি।"

আমি বলিলাম "আপনিও যান নাই কেন?" রমণী বলিলেন, "আমি গেলে আপনি বাঁচিতেন না।"

"আমাকে তারা আক্রমণ করিয়াছিল কেন?" "আমার স্বামী সুলতানের একজন সেনাপতি। আপনি ছবি তুলিতেছিলেন। তাঁরা ভাবিয়াছিলেন, আপনি গুপ্তচর,—কেল্লার ছবি লইতেছেন।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম "আমার জন্য আপনার প্রাণ সংশয় হইয়াছে। আমি জানালা দিয়া একটু আগে আপনার অবস্থা দেখিয়াছি। আমার জন্য আপনি কেন মরিবেন?"

রমণী হাসিয়া বলিলেন "আশ্রিতকে রক্ষা করা ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে আমি পতিত হইতে পারি না।" "যিনি আপনার বুকে ছোরা তুলিয়াছিলেন, তিনি কে?"

"আমার স্বামী।"

"এখন উপায়?"

"আসুন, আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

"আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" "মরিয়ম। আসুন।" চেরাগ লইয়া মরিয়ম অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গমনে কি লালিত্য! সেই বিপৎকালেও তাহা আমার চক্ষু এড়ায় নাই।

আমরা আবার বাগানের ভিতরে আসিয়া পড়িলাম। সুন্দর রাত্রি! আকাশে চাঁদ। ঝাউগাছের ফাঁক দিয়া আলোক-শলাকাগুলি ধরণীর হৃদয়ে গিয়া পড়িয়াছে। একটা অজানা পাখী কোথা হইতে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছে।

উদ্যানপ্রান্ত পর্য্যন্ত নীরবে আসিয়া আমরা দাঁড়াইলাম। মরিয়ম বলিলেন, "এখন যাইতে পারিবেন?" "পারিব" বলিয়া আমি তাঁহার সাঞ্জন নয়নের দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিলাম। কোথা হইতে পুষ্পগন্ধী সমীরের একটা হিল্লোল আসিয়া তাঁহার তমিস্রতরঙ্গতুল্য আলুলাইত কুন্তলমালা দোলাইয়া দিল। আমি মুগ্ধকণ্ঠে বলিলাম, "মহিমময়ী, দুনিয়ার গুলেস্তানে অনেক গুল ফুটে। জানিতাম—দেখিতেই তারা খুবসুরৎ—কিন্তু তার মাঝে এত গন্ধ কে জানিত?"

লজ্জায় মুখখানি হেঁট করিয়া মরিয়ম বলিলেন, "আপনার 'এবারৎ'এর তারিফ করি। কিন্তু আর কখনও পরের গুলেস্তানের গুলের উপরে নজর দিলে আপনার বখ্‌তে এমন সুখের জেহেল্‌খানা মিলিবে না। এখন বিদায়! খোদাতালা আপনার মঙ্গল করুন।"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "আমার গোস্তাকি মাফ ক[illegible] আর একটি আরজি আছে।" মুরলীগুঞ্জনবৎ স্বরে মরিয়ম বলিলেন "কি, বলুন!" "আমাদের এই দেখা—শেষ দেখা। আপনি পর্দা-নসিন, আপনার কোন স্মৃতিচিহ্ন পাইতে পারি কি?"

মরিয়ম, কোমলদৃষ্টিতে আমার সমগ্র অন্তরাত্মাকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, "উপহার? বাঁদী আমি—দিবার মত কি আছে আমার?"

একটু নীরবে থাকিয়া তিনি আপনার বক্ষঃবসনের অন্তরাল হইতে একখানি ছোট বই বাহির করিয়া আমায় বলিলেন—"লয়লা-মজনুর প্রেমকাহিনী বড় ভালবাসি আমি! তাই, আমি নিজের হাতে তার শ্লোকগুলি লিখিয়া রাখিয়াছি। আমার কাছে এই দপ্তরের মত প্রিয় কিছুই নাই—এই সামান্ত উপহার, যদি নিতে চান, দিতে পারি।"

আমি সাগ্রহে হস্তপ্রসারিত করিলাম, মরিয়ম বইখানি আমার হাতে দিলেন, তাঁহার হাতে আমার হাতে মিলন হইল! মরি, কি কুসুমসুকুমার স্পর্শ! আমার হৃদয় নন্দিত হইয়া উঠিল—আমার কণ্ঠ দিয়া আমার অজ্ঞাতসারে বাহির হইল—

"আয় কয়গে মাহে হুসন্ আজ্ রূয়ে রূখশানে শুমা।
আব্ রূয়ে খুবী আজ চাহে জনখ্দানে শুমা॥
আজ মে দীদায়ে তু দারদ্ জানে বর্ লব্ আম্দা।
বাজ্ গর্দদ্ ইয়া বেরায়েদ চীসৎ ফরমানে শুমা॥"

(ওগো ললনা, শশিলেখার রূপমাধুরী তোমারই সুন্দর বয়ানের প্রতিচ্ছায়া; ওগো তরুণী, বিশ্বে যে এত ললিত শ্রী দেখি, তোমার গণ্ডকূপ তাহার উৎস; এ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিবার লালসায়, আমার প্রাণ ওষ্ঠের কাছে আসিয়াছে—ওগো! হুকুম দাও,—সে বাহির হইবে, কি ফিরিয়া যাইবে।)

একবার তারাকৃতমাল্য মেঘ-মৌলী আকাশের দিকে চাহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে বিদায় লইলাম। খানিক দূরে আসিয়া একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, মরিয়ম শরীরিণী সুষমার মত উদ্যানের ভিতরে তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং ব্যোমবিসারী সমগ্র জ্যোৎস্না যেন তাঁহারই মুখের উপর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

৩

আমি গল্প সমাপ্ত করিয়া আমেনাকে বলিলাম "শুনিলেত সব? বইখানা দাও এখন!"

আমেনা বলিল, "তা যেন দিলাম। কিন্তু মরিয়ম বিবির যে রকম উজ্জ্বল বর্ণনাটা শুনিলাম, তাতে সকলেরই মনে হইবে, তুমি তাঁর বড় বেশী রকম পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলে।"

উত্তরে আমি মৃদুহাস্ত করিয়া বলিলাম "সুন্দরের প্রশংসা করিব না?"

আমেনা আমার খুব কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি ঠিক্ উত্তর দিবে?"

আমি জিজ্ঞাসমাননেত্রে আমেনার দিকে চাহিলাম। সে বলিল "মরিয়ম বিবি তোমাকে শুধু দপ্তরখানাই দিয়াছিলেন ?"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম "আবার কি দিবেন ?"

আমেনা তার ডান হাতখানি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখখানি আমার মুখের সাম্‌নে আনিল এবং দুষ্টামি-ভরা হাসির সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে বলিল "একটি বিদায়-চুম্বন ?" ঈষৎ রাগতভাবে আমি বলিলাম, "স্ত্রী-হৃদয় এমনি সন্দেহপূর্ণ বটে !"

আমেনা বলিল, "হাঁ গো হাঁ, অত রাগ কেন! বেশ, মরিয়ম বিবি যা দেন নি, তোমাকে আমি তাই দিলাম।"

আমেনা আমার মুখচুম্বন করিল। আমার ঋণ জমাইয়া রাখা অভ্যাস ছিল না সুতরাং আমিও চুম্বনটি তদ্দণ্ডে ফিরাইয়া দিলাম।

আমেনা মুখখানি নীচু করিয়া বলিল, "এখন বুঝিলে ত, পরস্ত্রীর কাছে যা পাওয়া যায় না, নিজের স্ত্রীর কাছে সেটা পাওয়া খুব সহজ। সুতরাং আশা করি, আর তুমি কখনও পরের গুলেস্তানের গুলের দিকে নজর দিবে না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শিশুর খেলা।

শিশুকাল কিশোরের শেষ সীমাগত
কত খেলা খেলিলাম—এ ভব ভবনে,
যৌবন গিয়াছে চলে, বার্দ্ধক্য আগত,—
এখনো খেলার শেষ হ'লনা জীবনে।
প্রতিনিয়তই খেলা—নিত্যই নূতন,
তথাপি শিশুর খেলা মানসমোহন।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

কবিতা-গুচ্ছ।

আধ ফোটা ফুল।

তাহার বিরহানলে এ হৃদয় সদা জ্বলে,
হেরিতে সে মুখখানি সদাই আকুল!
রহিতে না পারি ঘরে, সদা প্রাণ হুহু করে,
নবনী-মাখানো সে যে প্রেমের পুতুল।
নেহারিলে এক পল, প্রাণ হয় সুশীতল,
সাধে কি তাহার প্রেমে হ'য়েছি বাতুল।
সে যদি না কাছে আসে,থাকি সদা উপবাসে,
প্রাণের ভিতরে বহে ঝটিকা তুমুল!
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, সে সদা বিরাজ করে,
না হেরিলে মুখ তার সদা হয় ভুল!
এমনি সে রূপরাশি, এমনি সে সুধাহাসি,
কৌমুদী-মাখানো যেন আধ ফোটা ফুল!

কামিনী ফুল।

ফুটেছে কামিনী ফুল, রূপের ছটায়
করেছে বাগান আলো, আহা কি সুন্দর!
গরবে পড়িছে ঢ'লে এ উহার গায়,
সৌরভে ভরিয়া গেছে দিগ্‌দিগন্তর।

প্রেম-মাতোয়ারা অলি মধুর গুঞ্জনে
আকুলি ব্যাকুলি আসি বসে দলে দলে,
আদরে চুম্বিয়া কত অধরে বদনে
পান করে হৃদয়ের মধু কুতূহলে।

অই যা কি হল! ফুল পড়িল খসিয়া,
ধূলামাখা হ'য়ে ভূমে গড়াগড়ি যায়!
লুকাইল রূপজ্যোতিঃ, ঝঙ্কার তুলিয়া
তোষে নাক অলি আর, কেহ না সুধায়!

ঠিক এ কামিনী ফুল বঙ্গবামাকুল,
বৃন্তচ্যুত হ'লে ভাসে পাথারে অকূল।

মোজাম্মেল হক্‌।

নিশার সঙ্গীত।

কে গাহেরে এ নিথর চাদনি নিশায়,
বসি একা তটিনীর কূলে?
কে গাহেরে ফুকারিয়া মধুর ঝঙ্কারে,
ললিত বেহাগে তান তু'লে?

এ নীরব প্রান্তরের বক্ষঃ আলোড়িয়া
উঠিতেছে যে সুর সমীরে;
তীব্র যাতনার ঢেউ খেলিছে সে সুরে
এ নীরব হৃদয়-মাঝারে!—

ছিল তারা একদিন এ মর-ভবনে
জীবনের বাল-সহচর;—
ছিল তারা একদিন হৃদয়-গগনে
অশান্তির শান্ত জলধর।

শৈশবের চিন্তাহীন হৃদয়-কন্দরে
জনমিত কত আশালতা,—
কত ভালবাসা,—প্রেম,—প্রিয় সম্ভাষণ;
আজি সব গিয়াছেরে কোথা!

সেই স্থান,—সেই নদী,—সেই তরুতল,
সকলিরে রয়েছে পড়িয়া;
যেই স্থান শূন্য করি গিয়াছে তাহারা,
নাহি তথা আসিবে ফিরিয়া।

অশান্তির বহ্নিকণা বহিয়া হৃদয়ে,
ছুটিতেছে যে তপ্ত সমীর
এ হৃদয় 'সাহারা'য়;—সদা সর্ব্বক্ষণ
প্রাণ মম তাহাতে অধীর।

কতদিন শৈশবের সুখময় কাল
জাগে নাই এ দগ্ধ হৃদয়ে;
সংসারের কর্ম্মরাশি চাপিয়া সে সব
রাখিয়াছে এ দীর্ঘ সময়ে।

শৈশবের সহচর-শোকে অভিভূত
হে গায়ক! হইবে নিশ্চয়;
তা' না হ'লে, শান্তিময় গভীর নিশায়
কেন তব কাঁদিছে হৃদয়?

শৈশবের পূর্ব্ব সুখ জাগিয়া এখন,
আজি প্রাণ আকুল তোমার;
যাতনা-হিল্লোল তাই তুলিছ সঙ্গীতে,—
আঘাতিছ মরম আমার!

এ নিশার শান্তিময় নীরব সময়ে,
প্রাণ কাড়ি' গাহিও না আর;
হৃদে চাপি রাখ'সব,—পাইবে আবার,
তেয়াগিলে আলোক ধরার।

শেখ্‌ মনসুর আলি।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বঙ্গদেশীয় হিন্দুমুসলমান।—মোহাম্মদ গোলাম হোসেন প্রণীত।—২৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানার প্রকার বড় বিচিত্র। মূল গ্রন্থ বাঙ্গালা, কিন্তু ভূমিকা ইংরাজীতে লিখিত। এমন বিসদৃশ কাণ্ডে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল কেন, তাহা বুঝিবার জন্য গ্রন্থকার পাঠকদিগকে উপসংহার পড়িতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু উপসংহারের কুত্রাপি এ কথার উত্তর ত নাই-ই পরন্তু স্বয়ং উপসংহারই ইংরাজীর বার্ণিশে শোভমান। যাহা হউক লেখক বেশ সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারেন এবং ভূমিকায় অনেক মূল্যবান কথা আছে। মুসলমান সাহিত্যিকের প্রতি দেশের নিদারুণ উপেক্ষার কথা উল্লেখ করিয়া লেখক জ্বলন্ত ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকের চিন্তার বিষয়। লেখা পড়িয়া গোল্‌ডস্মিথ লিখিত ইংরাজ সাহিত্যসেবীদের দুর্দ্দশার বিবরণ মনে আসে। গ্রন্থ-প্রণয়নে লেখকের কৃতিত্ব সুপ্রচুর। হিন্দুমুসলমানের বিবাদ সম্পর্কীয় বহু ব্যাপারের বিশদ ও নিরপেক্ষ আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। লেখকের মতে "দুই সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের নিকট স্বরূপে পরিচিত না থাকাতেই এই সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ও দ্বেষ হিংসার সূচনা" এবং ঐরূপ পরিচয় সংঘটিত হইলেই মধুর প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, বহুলাংশে সত্য। অনেক সময়েই অজ্ঞানতা শত্রুতার কারণ। কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া দেখিলে লতাগুল্মকে বাঘ বলিয়া মনে হয়, মানুষকে রাক্ষস বলিয়া ভীতি জন্মে। বহু মুসলমানের নিকট হিন্দু কেবল 'নাদান কাফের', অধিকাংশ হিন্দুর নিকট মুসলমান কেবল "গোখাদক বর্ব্বর নেড়ে"।

সুতরাং লেখক যে রোগের একটি প্রকৃত নিদান ও ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি গ্রন্থে উভয় জাতির স্বরূপ, কীর্ত্তি ও গৌরব প্রকটিত করিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধাবুদ্ধি জাগরুক করার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বহু হিন্দু লেখকের লেখা দ্বারা দেখাইয়াছেন, খৃষ্টান লেখক ও বঙ্কিমপ্রমুখ বিদ্বিষ্ট-হৃদয় হিন্দুলেখকগণ কর্ত্তৃক কুৎসিত রূপে চিত্রিত হইলেও মুসলমান সম্রাটগণ অত্যাচারী পিশাচ ছিলেন না। তাঁহারা গুণবান, ন্যায়-পরায়ণ, প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। মুসলমান শুধুই বর্ব্বর ম্লেচ্ছ নহে, তাহাদের অতীত মহত্ত্ব, বীরত্ব, জ্ঞান এবং গৌরবে ভাস্বর ও মহীয়ান। পক্ষান্তরে হিন্দুর প্রাচীন বিশ্ববিশ্রুত সভ্যতা ও কীর্ত্তির কথাও তিনি উজ্জ্বল রূপে বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, হিন্দু সামান্য, অপদার্থ নহে— অপরের সম্মান লাভ করিবার সেও অধিকারী।

এই গ্রন্থের "আচার ব্যবহার ও দেশাচার" পরিচ্ছেদ প্রত্যেকের পাঠ্য। ইহাতে গোঁড়া হিন্দুদের অতিরিক্ত আচারপরায়ণতা ও 'ছোঁয়াচে' (স্পর্শদোষ) রোগে হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ কিদৃশ তিক্ত হইয়া দাঁড়ায় ও উহা যে মিলনের কিরূপ পরিপন্থী তাহা সুন্দর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। লেখক দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, "একত্রে বসিয়া পান তামাক খাওয়া এ দেশের

আমোদ প্রমোদের একটি প্রধান অঙ্গ,—ইহাও যদি দুই ভাগ হইয়া যায় তাহা হইলে মিলনের আর থাকে কি ?" কথাটি সামান্য, কিন্তু ভাবিবার বিষয়। এই পরিচ্ছেদেই, মুসলমানদিগের শুচি ও সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুদের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার কিরূপ ভয়ানক ও মিলনের অন্তরায়, লেখক তাহা বর্ণনা করিয়া শেষে বুঝাইয়া দিয়াছেন, মুসলমানের অন্তঃশুচি ও বহিঃশুচির ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও তাহা বাবু হিন্দুর সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

সাধারণ মানুষের হৃদয়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে মূর্খতা ও হীনাবস্থা যে মিলনের এক গুরুতর অন্তরায়, ইহা প্রতীয়মান হয়। বহু হিন্দু এই কারণেই যে মুসলমানদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, ইহা ঠিক। লেখক গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন এবং মুসলমানদিগকে উন্নতি করিতে ও হিন্দুদিগকে উদারতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে শিক্ষিত মুসলমানের প্রতি শিক্ষিত হিন্দু প্রকাশ্য ঘৃণা প্রকাশ না করিলেও নিতান্ত ভ্রাতৃভাব পোষণ করেন না—এবং উভয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষির ভাব দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে। এ অবস্থা মর্ম্মান্তিক।

ফলতঃ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ করায় লেখক হিন্দুমুসলমানের বিবাদ সম্পর্কীয় অন্য বহু তথ্যই আলোচনা করিতে পারেন নাই। ইহাতে আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট অঙ্গহানি হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলেন নাই। উন্নতিকামী শিক্ষিত মুসলমানদিগকে হিন্দুগণ পথ করিয়া দিতে সম্মত নহেন,—অর্থহীন মুসলমান ভ্রাতার জন্য একটু ত্যাগস্বীকার করিতে তাঁহারা নিতান্ত নারাজ। ফলে বাধা পাইয়া হিন্দুর প্রতি শিক্ষিত মুসলমানের বিদ্বেষ ভাবও দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহার উপায় কি ?

লেখক গোবধে আপত্তি করিয়াছেন। তবে তিনি যে হিন্দু-প্রেমের বশীভূত হইয়া এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ ভাবিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। তিনি হয় ত ভাবিয়াছেন, গোবধ হিন্দুমুসলমানের বিবাদের এক মূল কারণ। উহা দূরীভূত হইলে মিলন সহজ হইবে। কিন্তু হিন্দু পক্ষ হইতে এতদিন যে ভাবে গোহত্যা বন্ধ করার চেষ্টা হইতেছে, তাহা নিতান্ত অসমীচীন ও ভ্রমব্যঞ্জক। হিন্দুকর্ত্তৃক জোর করিয়া গোবধ নিবারণের চেষ্টায় হিন্দুর প্রতি মুসলমানের জাতীয় আক্রোশ তীব্রভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। রাজশক্তির সাহায্যে মুসলমান-দিগের এক চিরন্তন অধিকার হরণ করিলে মুসলমান সে জাতীয় অপমান কখনই ভুলিবে না,—মিলন কখনই হইবে না। গোবধ বন্ধ করিয়া যাঁহারা বিবাদের কারণ দূরীভূত করিতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা মিলনের ঘোর পরিপন্থী, তাঁহারা যে দেশের বিষম শত্রু তাহাতে সন্দেহ নাই। স্নেহে প্রেমে প্রাণদান করিতে পারা যায়, বল প্রয়োগে বিদ্বেষ আরও বর্দ্ধিত হয়। লেখক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথা তুলিয়া গোমাংস ভোজনে আপত্তি তুলিয়াছেন। স্বীকার করি, বহু ব্যক্তি রোগ বৃদ্ধি ভয়ে গোমাংস ভক্ষণ করেন না, গোমাংস উগ্রবীর্য্য ও দেশ উষ্ণপ্রধান বলিয়াও অনেকে উহা [illegible] বিরত থাকেন। ইহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। যাঁহার যে আহার্য্য সহ্য হইবে না, [illegible] ত তাহা হইতে বিরত হইবেনই—উহা ত সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। কিন্তু [illegible] বলিয়া ইহা [illegible] নিয়ম হইতে পারে না। কলিকাতার সহস্র সহস্র শ্রমজীবী ও হিন্দুস্থানী মুসলমান

প্রতিদিন গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের শরীর রোগ-নিবাস ত নয়ই, পরন্তু জীবনী-শক্তি যাহা আছে তাহা ইহাদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদিগের গোবধ জন্য গো জাতি ধ্বংস হইবে না বা কৃষিকার্য্য বিনষ্ট হইবে না। বাঙ্গালায় কৃষিকার্য্য মুসলমান-দিগেরই হস্তে—গোবধে কৃষির অবনতি হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহারাই প্রতিবাদ করিত। আর গোবধে গোজাতির ধ্বংস হইতেছে না, যদি হয় তবে চারণ-ভূমির অভাবেই তাহা হইতেছে; এজন্য হিন্দু জমিদারগণই সর্ব্বতোভাবে দায়ী। অধিকন্তু আমাদের বিশ্বাস জগৎ হইতে কোন কারণে মানুষের ব্যবহারোপযোগী কোন জন্তু লোপ পাইতে পারে না।

তাহার পর হিন্দুদিগের প্রীতির জন্য এবং শিষ্টতার খাতিরে গো-কোর্ব্বাণি ও গোবধ গোপনে নির্ব্বাহ করিবার জন্য লেখক মুসলমানদিগকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা সমর্থন-যোগ্য। আমরাও বলি এই পথে হিন্দুদিগের সন্তোষ সাধন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, কোন কোন স্থলে অসভ্য দুর্ব্বিনীত মুসলমান হিন্দুদিগের প্রাণে আঘাত দিলেও অধিকাংশ স্থলে মুসলমানগণ গোপনেই গোবধ করিয়া থাকে। হিন্দু জমিদারদিগের অত্যাচারে বহু স্থানে মুসলমানগণ গো-কোর্ব্বাণি করিতে সমর্থ নহে,—অত্যাচারে তাহারা ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত হইয়া আছে—উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিবার তাহাদের সামর্থ্য কোথায়? এই ত সে দিন কাশ্মীর ও কোচিন রাজদরবার হুকুম দিয়া গোবধ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অনেক হিন্দু সহযোগী শিশুর ন্যায় অজ্ঞতা সহকারে বলিয়া থাকেন কাশ্মীরে গোবধ বন্ধ হওয়ায় ত মুসলমান প্রজাদের কোন অসুবিধা হইতেছে না—ব্রিটীশ শাসিত ভারতে বন্ধ হইলে আপত্তি কি? কাশ্মীরে মুসলমানদিগের ধর্ম্মকার্য্যে অসুবিধা হইতেছে কি না, তাহাদের হৃদয়ে কি অগ্নি জ্বলিতেছে তাহা সুখ-পালিত ধন-সমৃদ্ধ হিন্দু কি বুঝিবে? মুসলমানদিগের সুখ দুঃখের খবর যদি তাহারা রাখিত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত!

তারপর হিন্দুমুসলমানের প্রাচীন জাতীয় গৌরব প্রসঙ্গে উভয় জাতির গৌরব-গাথা গান করিয়া গ্রন্থকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধাবুদ্ধি জাগরূক করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ও পন্থা বিশেষ প্রশংসনীয়—এরূপ চেষ্টা যে বিদ্বেষভাব দূরীকরণে বিশেষ ফল-দায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু "হিতবাদী"র সহিত সুর মিলাইয়া আমরাও বলিতে বাধ্য যে, যে প্রাণে তিনি হিন্দুগৌরব গান করিয়াছেন, সেই প্রাণে মুসলমানকীর্ত্তি কথার আলোচনা করিতে পারেন নাই। হিন্দু প্রাচীনগরিমাঘোষণায় এবং সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিদিগের পরিচয় প্রদানে তাঁহার স্বভাবতঃ মনোহারিণী ভাষা লালিত্যের সর্ব্বোচ্চ গ্রামে আরোহণ করিয়াছে, শব্দে শব্দে তাঁহার প্রাণের ব্যাকুল আবেগ ফুটিয়া বাহির হইতেছে; কিন্তু মুসলমানদিগের গৌরব-কীর্ত্তনে কুত্রাপি সেরূপ প্রাণময়ী ভাষার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত মুসলমান-দিগের জাতীয় কীর্ত্তির পরিচয় যথেষ্ট বলিয়াও আমরা মনে করি না।

ইহার কারণ লেখকের জ্ঞান বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে সীমাবদ্ধ। আরবী ও পারসী সাহিত্যে তিনি অনভিজ্ঞ বলিয়াই বোধ হয়। এই কারণেই মোস্লেম ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় তাঁহাকে কেবলই গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয় জ্ঞাপন করিতে হইয়াছে। তাঁহার হিন্দু-ধর্ম্মালোচনায় প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটি বাহ্যাঙ্গের সামান্য পরিচয়,

দিয়াছেন—উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্বের কথা কিছুই বলিতে সমর্থ হন নাই। তিনি আপনাকে অনভিজ্ঞ ও অনধিকারী বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন; এরূপ স্থলে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় হস্তক্ষেপ না করিলেই তাঁহার পক্ষে শোভন হইত।

এখন গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি লেখকের ভাষা মনোহারিণী। তাঁহার শব্দ-সম্পদ অপরিমেয়; ললিত শব্দ যোজন ক্ষমতা ও মধুর বাক্য-বিন্যাস শক্তি অসাধারণ। স্থানে স্থানে গ্রন্থের রচনা এতই সুন্দর হইয়াছে যে বঙ্গ সাহিত্যে তাহার তুলনা অধিক মিলে না। কিন্তু এমন সুন্দর ভাষা এক মারাত্মক দোষে বহু স্থলে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। শ্রুতিমধুর বিশুদ্ধ বাক্যাবলীর মধ্যে মধ্যে অশ্রদ্ধেয় গ্রাম্য শব্দগুলি প্রবেশ করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। গ্রন্থকারকে এ সম্বন্ধে ঘোরতর অসাবধান বলিয়া বোধ হইল—ইহা যেন তাঁহার স্বভাবগত দোষ। আর এক বিসদৃশ ব্যাপার তাঁহার বাঙ্গালা রচনার মধ্যে ইংরাজী শব্দ ও ইংরাজী রচনা ব্যবহার করার আসক্তি। ইহা নিতান্তই অদ্ভুত। লেখক যেন বাঙ্গালা বলিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না তাই ইংরাজী বলিয়া সুখ—হয় ত গর্ব্ব অনুভব করেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন "ভারতচন্দ্রই বুঝি আদিরসের ব্যাখ্যায় expert (এক্সপার্ট)—নিপুণ শিল্পী"। কেন, শুধু "নিপুণ শিল্পী" বলিলে কি আমরা বুঝিতে পারিতাম না?—না মহাভারত অশুদ্ধ হইত? আবার "সেইরূপ কোন মহাত্মা ইহার দুই এক পাতা উল্টান বা kindly give it a perusal throughout"—নিতান্তই হাস্য-জনক। অন্যত্র, "মানুষের মনে ধর্ম্মভাব, ভক্তি-বিশ্বাস-রসে সিঞ্চিত না হইলে, আদৌ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, সেখানে বিজ্ঞান এরূপ প্রবল নয় যে, ট্রপিক রিজিয়নের বৃক্ষলতা হট্‌বেড করিয়া শীতপ্রধান 'এ্যাণ্টারটিক্ রিজিয়ানে' জন্মান যায়।" বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে একস্থলে লিখিয়াছেন "আমরা সামান্য লেখক হইয়া আর তাঁহার গুণের পরিচয় দিতে কি জানি? আমাদের সেরূপ আভাস প্রবৃত্তিও অসমীচীনতা। What has a dealer in ginger to do with the talk of ships and commerce"? আমরা গদ্য বাঙ্গালা সাহিত্য রঙ্গে তাঁহারই চেলা, তাঁহারই অনুকরণকারী এবং তাঁহারই Admirer—We should say, devoted admirers" মাতৃভাষা ও সাহিত্যের একজন শক্তিশালী লেখকের পক্ষে এরূপ লেখা সাহিত্যের পক্ষে ঘোরতর অপমানজনক। জিজ্ঞাসা করি—ইহাই কি বাঙ্গালা? পোলাও পাকাইয়া শেষে এমন অহঙ্কারজনক জগাখিচুড়ি না পাকাইলে কি প্রাণ ঠাণ্ডা হইত না? লেখক উপসংহার বরাবর এইরূপ কিম্ভূতকিমাকার করিয়াই সাজাইয়াছেন—খানিক ইংরাজী, খানিক বাঙ্গালা—না রাম, না গঙ্গা! এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, আমরা বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চ্চার নিতান্ত পক্ষপাতী। এক শ্রেণীর হিন্দু লেখক বাঙ্গলা ভাষাকে যে ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, আমরা তাহার ঘোর পরিপন্থী। যাহাই হউক, এ সমস্ত ভাষাগত ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, সমালোচ্য পুস্তকখানি একখানি চিন্তাপূর্ণ মূল্য-বান গ্রন্থ হইয়াছে—দেশহিতৈষী মিলনপ্রয়াসী প্রত্যেক বাঙ্গালীর ইহা পাঠ করা উচিত।

হক্ দোস্ত।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩১৯। [৩য় সংখ্যা

অকাল।

এবার আসেনি বর্ষা অন্তরে আমার
হয় নাই চিত্ত-মরু শ্যামল উর্ব্বর,—
দারুণ মার্ত্তণ্ড করি অনল উগার
করিয়াছে দগ্ধ মোরে শুধু নিরন্তর!

পিপাসিত আত্মা মোর করিছে ক্রন্দন
কোথা এক বিন্দু বারি সাধনা-দুর্লভ,—
সারা বক্ষ ক্ষণে ক্ষণে করিয়া মন্থন
জাগে তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস তীব্র আর্ত্তরব!

গোপন মর্ম্মের মোর সুধা-প্রস্রবণ
কে দিয়াছে রুদ্ধ করি নাহি বুঝি হায়,—
করিব কাহার দ্বারে ভিক্ষা আহরণ
নির্ব্বাসিত অভাগ্যের আশ্রয় কোথায়!

হে দেবতা, বর্ষা মোর! বিশ্বের জঞ্জাল
ভস্মিতে আনিলে কিবা এ ঘোর অকাল!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কোরান শরীফের নীতি

(উপক্রমণিকা।)

জগৎপাতা মানুষকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অমনি ছাড়িয়া দেন নাই। তাহার উপর তিনি কর্ত্তব্যের গুরু ভার চাপাইয়া দিয়াছেন। তিনি দিয়াছেন কেন, বরং মানুষ স্বেচ্ছায় এই ভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে। খোদাতা'লা তাঁহার পবিত্র বাণীতে বলিতেছেন "নিশ্চয় আমি দ্যুলোক, ভূলোক ও পর্ব্বত সমূহের নিকট ন্যাস (আমানত) উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহারা তাহা বহন করিতে অস্বীকার করিল ও তাহা হইতে ভীত হইল; কিন্তু মানুষ তাহা বহন করিল,—নিশ্চয় সে [নিজের উপর] অত্যাচারী (ও) অজ্ঞান ছিল।" (সুরা আহজাব, ৭২)। সেই ন্যাস—সেই "আমানত" যাহা বিশ্বের প্রভু প্রথমতঃ দ্যুলোক ও ভূলোকস্থ মনুষ্যেতর সমুদয় প্রাণীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা কি? তাহা 'ইস্‌লাম'—আল্লার আত্মসমর্পণ—স্বকীয় ইচ্ছাকে প্রভুর ইচ্ছার নিকট বলিদান—আল্লায় অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আল্লাতে বিলুপ্ত হওয়া—সুফীদিগের ভাষায় "বাকা বি-ল্লা"র জন্য "ফানা ফী-ল্লাহ্"। ইহাই 'ইস্‌লাম'—ইহাই সেই আমানত। সকলই ভয় পাইল, কেহই বিশ্বের গুরুত্ব হইতেও গুরুতর সেই আমানত স্কন্ধে লইতে সম্মত হইল না। কিন্তু মানুষ—দুর্ব্বল মানুষ—তাহা বহন করিল। প্রভু বলিলেন, "আলস্তু বিরব্বিকুম্—আমি কি তোমাদের প্রভু নহি?" মানব উত্তর করিল, "বালা ওয়া শাহিদ্‌না—হাঁ, এবং আমরা ইহার সাক্ষী রহিলাম।" প্রভুভৃত্যের একরার নামা সেই আধ্যাত্মিক জগতে 'রেজিষ্টারি' হইয়া গেল। সেই হইতে মানব-মৎকুণের উপর বিশ্বের বোঝা চাপিল। দায়িত্ব যদি সে বুঝিত, তবে কি তাহা ঘাড়ে লইত? তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলিলেন, "নিশ্চয় সে অত্যাচারী (ও) অজ্ঞান ছিল।"

সাকি ঘুরিয়া ফিরিয়া পেয়ালা ভরিয়া সুরা কর দান;
প্রেম বুঝেছিনু সোজা, এবে দেখি হায়! শঙ্কট প্রধান।

(হাফেজ।)

দাস ও অজ্ঞানতা বশতঃ অতি গুরুভার গ্রহণ করিয়া নিজের উপর অত্যাচার করিল। কিন্তু প্রভু—'লোকের প্রতি প্রেমিক ও অনুগ্রহকারী প্রভু' (সুরা বকর ১৭।১৪৩) কি করিলেন? তিনি মানবকে পাপ পুণ্য বুঝিবার ক্ষমতারূপ

অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। "জীবাত্মা ও যাহা তাহাকে সৌষ্ঠবযুক্ত করিয়াছে তাহার শপথ। অনন্তর তাহার পাপ ও তাহার পুণ্য তিনি তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।" (সুরা শম্‌স।) কিন্তু পুণ্যই মানুষের প্রকৃতি, পাপ নহে। তাই প্রভুর বাণী—"অবশেষে তুমি বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি. যাহার উপর তিনি লোকদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত প্রকৃতির (ফিত্‌রৎ) প্রতি উন্মুখ হও। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সৃষ্টির পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না।" (সুরা রূম ৪।২৯)। এই মহাবাণীর ব্যাখ্যা স্বরূপ ইস্‌লাম-গুরু বলিতেছেন "[মানুষ] জাত মাত্রেই প্রকৃতির অর্থাৎ ইস্‌লামের উপর জন্ম গ্রহণ করে, পরে তাহার পিতা মাতা তাহাকে য়াহুদী খৃষ্টান বা অগ্নি-উপাসক করিয়া তুলে।"

কিন্তু যেমন অন্ধকার বিনা আলো, অবরুদ্ধ স্থান বিনা শূন্য (Space), শীত বিনা উষ্ণ, শত্রু বিনা মিত্র, দুঃখ বিনা সুখ সম্ভব নয়; সেইরূপ পাপ বিনা পুণ্য সম্ভব নয়। দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে উৎকৃষ্টতরকে অনুসরণ করার নাম পুণ্য। মনে কর, আমার মনে যদি কেবল পরপীড়নেরই প্রবৃত্তি থাকে, পরোপকার করা উচিত এরূপ জ্ঞান যদি একেবারেই না থাকে, তবে পরপীড়ন করিলেও আমি পাপী হইব না। এই জন্য সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ কিছুতেই পাপী নহে। এইরূপ যদি আমার মনে কেবলই পরোপকার প্রবৃত্তি থাকে, পরপীড়ন-প্রবৃত্তির ছায়া মাত্র যদি কখন আমার মনে না আসে, তবে পরোপকার আমার পক্ষে পুণ্য নহে। এইজন্য জীবনদায়িনী ওষধি, সন্তাপহারক মৃদু মলয়ানিল, চিত্তানন্দবিধায়িনী কৌমুদী, সুকোমল ঢল ঢল প্রসূনরাজি প্রভৃতি পুণ্যভাক্‌ নহে। পুণ্য অভ্যাস কিংবা পাপ অভ্যাস প্রবল হইলে বিপরীত প্রবৃত্তি এত ক্ষীণ হইয়া যায় যে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। তখন কিন্তু অভ্যাসের পূর্ব্বাবস্থায় কাহারও পক্ষে যাহা পাপ বা যাহা পুণ্য ছিল, তাহাই থাকে; অভ্যাসবদ্ধ ব্যক্তি পাপ পুণ্যের অতীত হয় না। কেন না তাহার যে অভ্যাস তাহা তাহারই অভ্যাস, তাহারই স্বেচ্ছাকৃত—জন্মগত নহে। এই জন্যই অভ্যস্ত প্রতারকের মনে প্রতারণা ভিন্ন অন্য কোন প্রবৃত্তি না থাকিলেও, সে প্রতারণার জন্য পাপী। "কিন্তু তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাদের অন্তঃকরণ মলিন হইয়াছে।" (সুরা তৎফীফ)। এই জন্যই অভ্যস্ত পুণ্যবান্‌ লোকদিগের মনে পাপ প্রবৃত্তি লুপ্ত হইলেও, তাঁহারা পুণ্যের ফলভোগী হন। এই প্রকার সাধু লোকদিগের সম্বন্ধে খোদাতালা বলিয়াছেন,

'হে প্রশান্তাত্মন্! তোমার প্রভুর দিকে ফিরিয়া যাও; তুমি সন্তুষ্ট, তিনিও সন্তুষ্ট। অনন্তর আমার সেবকগণের অন্তর্নিবিষ্ট হও, আমার স্বর্গে প্রবিষ্ট হও।' (সুরা ফযর ১।২৭-৩০)।

পুণ্যের জন্য যে নিম্ন প্রবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় এক্ষণে বেশ বোধগম্য হইবে। কোরান শরীফেও আল্লাহ্‌তালা হজ্‌রত য়ুসুফের প্রমুখাৎ বলিতেছেন, "এবং আমি আপন জীবাত্মাকে নিষ্পাপ বলি না; আমার প্রভু যখন দয়া করেন, সেই সময় ব্যতীত নিশ্চয় জীবাত্মা পাপ বিষয়ে আজ্ঞাদাতা হয়।" (সুরা য়ুসুফ ৭।৫০)। পূর্ব্বে বলিয়াছি দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে উৎকৃষ্ট কিংবা অপকৃষ্টের নির্ব্বাচনের জন্যই পুণ্য বা পাপ। এই নির্ব্বাচন ক্ষমতা মানুষের আছে। ইহাই মানুষের আল্লাহ্‌প্রদত্ত স্বাধীনতা। কোরান শরীফেও উক্ত হইয়াছে "এবং আমরা তাহাকে দুই পথ দেখাইয়াছি, অনন্তর সে কঠিনকে (ধর্ম্মের পথকে) অবলম্বন করিল না।" (সুরা বলদ ১।১১)। "এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে পথ দেখাইয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইল অথবা অকৃতজ্ঞ।" (সুরা দহর ১।৭৬)।

আমাদের আল্লাহ্‌প্রদত্ত হিতাহিত জ্ঞান থাকিলেও, পাপাভ্যাস বশতঃ সেই জ্ঞানে আবিলতা উপস্থিত হয়, এমন কি তাহা প্রায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। "তাহাদের অন্তঃকরণ তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য মলিন হইয়াছে"। (সুরা তৎফীফ)। এই প্রবচন প্রাথমিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার উক্তি,—"বধির, মূক, অন্ধ; অনন্তর তাহারা (সত্যের দিকে) ফিরে না।" (সুরা বকর ২।১৮)। অপিচ "আল্লা তাহাদের অন্তরে ও কর্ণে মোহর মারিয়াছেন ও তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ আছে এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি আছে।" (সুরা বকর ১।৭)। শেষোক্ত প্রবচনে 'আল্লাহ্‌ মোহর মারিয়াছেন' ইহার অর্থ আল্লার অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে পাপের পরিণাম এইরূপ হয়। রাজাজ্ঞা অনুসারে নরহত্যা-কারীর ফাঁসি হইলে যেমন বলা যাইতে পারে রাজা ইহাকে বধদণ্ড দিয়াছেন, কিন্তু রাজা অপরাধীর হত্যার জন্য দায়ী হন না। বস্তুতঃ সেই অপরাধীই নিজের হত্যার জন্য দোষী। সেইরূপ পাপীর পূর্ব্বোক্তরূপ পরিণামের জন্য আল্লাহ্‌ তা'লা কিছুতেই দোষী হইতে পারেন না।

পাপাভ্যাস ব্যতিরেকে আর এক প্রকারে হিতাহিত জ্ঞান দূষিত হইতে পারে। যদি কোন সমাজে একটি পাপ বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকে, তবে সেই সমাজস্থ

কোন ব্যক্তি যে এখনও সেই পাপ করে নাই তাহারও নিকট সেই পাপ পাপ বলিয়া বোধ হইবে না। যেমন চোর-সমাজের শিশুর নিকটও চুরি দোষ বলিয়া বোধ হইবে না। "এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে আল্লাহ্ যাহা প্রেরণ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর, তাহারা বলে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে আমরা যে বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি বরং তাহার অনুসরণ করিব—যদিচ তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝিত না ও পথভ্রান্ত ছিল।" (সুরা বকর ২১।১৭০)। অভ্যাস বশতঃই হউক কিংবা সমাজে প্রচলিত থাকার কারণেই হউক, পাপের দ্বারা কাহারও হিতাহিত জ্ঞান দূষিত হইলে,তাহাকে আধ্যাত্মিক রোগগ্রস্ত বলা যায়। এই আধ্যাত্মিক রোগ অতীব ভীষণ। ইহা একবার উপস্থিত হইলে (প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে) ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই আন্তরিক রোগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "তাহাদের অন্তরে রোগ আছে, পরন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাহা বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ক্লেশজনক শাস্তি আছে, যেহেতু তাহারা অসত্য বলিতেছে। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, 'ভূমণ্ডলে অহিতাচরণ করিও না' তাহারা বলিল 'আমরা হিতকারী বই নহি'। জানিও নিশ্চয় তাহারা অহিতকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, '(ধার্ম্মিক) লোকে যেমন বিশ্বাস করিয়াছে তদ্রূপ বিশ্বাস কর' তাহারা বলিল 'নির্ব্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছে আমরা কি তদ্রূপ বিশ্বাস করিব?' জানিও নিশ্চয় তাহারাই নির্ব্বোধ, কিন্তু বুঝিতেছে না।" (সুরা বকর ২।১০-১৩)।

এইরূপে যখন হিতাহিত জ্ঞান দূষিত হয়, যখন ভীষণ আধ্যাত্মিক মহামারি উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপত্রসহ চিকিৎসক প্রেরণ করেন। জগতের শেষ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মোয্তাবা। [তাঁহার উপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও শান্তি হউক।] এবং শেষ ব্যবস্থা পত্র মহাগ্রন্থ কোরান মযীদ। হজ্রত মোহাম্মদ সম্বন্ধে খোদাতা'লার 'সার্টিফিকেট' এই—"তিনিই (আল্লা) যিনি অজ্ঞ লোকদিগের প্রতি তাহাদের মধ্য হইতে দূত (নবী) প্রেরণ করিয়াছেন, যেন সে তাঁহার আয়ত (বাণী) সকল তাহাদের নিকট পাঠ করে, তাহাদিগকে শুদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞান শিক্ষা দেয় ; এবং নিশ্চয় তাহারা পূর্ব্বে স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল। এবং তাহাদের অপর লোকদিগের জন্যও প্রেরণ করিয়াছেন, যে এক্ষণে তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই ; এবং তিনি পরাক্রান্ত ও কৌশলময়।

ইহাই আল্লার করুণা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন বিতরণ করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ মহাকৃপাবান্।” (সুরা যুমা ১।২-৪)। পুনশ্চ, “নিশ্চয় তুমি উন্নত চরিত্র” (সুরা কলম।) অপিচ “তোমাকে সমস্ত জগতের প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ ব্যতিরেকে পাঠাই নাই।” এবং সেই ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা অনুজ্ঞা করিয়াছেন, “হে লোকসকল! সত্যই তোমাদের প্রতি-পালক হইতে উপদেশ ও যাহা (যে আধ্যাত্মিক ব্যাধি) তোমাদের অন্তরে আছে, তাহার আরোগ্য উপস্থিত হইয়াছে; পথ প্রদর্শন ও অনুগ্রহ বিশ্বাসী-দিগের জন্য। বল, ইহা আল্লার অনুকম্পায় ও তাঁহারই অনুগ্রহে, অতএব ইহা দ্বারা আনন্দিত হওয়া বিধেয়; যাহা তোমরা সঞ্চয় করিতেছ, তদপেক্ষা ইহা যে শ্রেষ্ঠ। (সুরা য়ূনস, ৬।৫৭-৫৮)।

উপক্রমণিকা সমাপ্ত।

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

নবাব ঈশা খাঁ মসনদ আলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

ইতিমধ্যে পরাজিত ও পলায়িত সাহাবাজ খাঁ পুনরায় এক বিপুল বাহিনী সহ ঈশা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। ঈশা খাঁ সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া চট্টগ্রামের দিকে পলায়ন করিলেন। আরাকানরাজ বাধা প্রদান করিলে ঈশা খাঁ আরাকান রাজসৈন্য কে পর্য্যুদস্ত করিয়া চট্টগ্রাম বা ইসলামাবাদ অধিকার করিলেন। ঈশা খাঁ কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করত আরও নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিলেন এবং অচিরাৎ সাহাবাজ খাঁকে আক্রমণ করিয়া বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

এদিকে আরাকানরাজ, ত্রিপুরেশ্বর ও কেদার রায় একযোগে অসংখ্য সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী সহ ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিলেন; ঈশা খাঁও প্রচণ্ড বিক্রমে প্রতি-আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগের বিষদন্ত ভগ্ন করিলেন। বহু যুদ্ধোপকরণ পরিত্যাগ করিয়া নৃপতিত্রয় পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন্। বহু ত্রিপুর ও আরাকানসৈন্য ধৃত এবং কারাবদ্ধ হইল। অতঃপর সন্ধি সংস্থাপিত হইলে ঈশা খাঁ তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

আমরা যতই ইতিহাসের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই—ততই ঈশা খাঁর প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল প্রভা চতুর্দ্দিক হইতে বিকশিত হইয়া পড়ে। ইতিপূর্ব্বে ঈশা খাঁ ও মানসিংহের যুদ্ধ বৃত্তান্ত নানা ইতিহাস অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমানে মির্জ্জা আর্জ্জুমন্দ আলী ও মুন্সী সূর্য্যনারায়ণ কৃত পার্শী ভাষায় লিখিত "তারিখে বাঙ্গালা" নামক গ্রন্থে ঈশা খাঁ ও মানসিংহের যুদ্ধবৃত্তান্ত যেরূপ ভাবে বিবৃত আছে, তাহারও অবিকল অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। "তারিখে বাঙ্গালা" একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

সাহাবাজের শোচনীয় পরাজয় দর্শন করিয়া সম্রাট আকবর প্রধান সেনাপতি মানসিংহকে বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া দশ সহস্র সৈন্য ও পঞ্চাশটি কামান সহ বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ এই বিপুল বাহিনী সহ বঙ্গদেশে উপনীত হইলে ঈশা খাঁর সৈন্যগণ তাজপুর দুর্গ (বর্ত্তমান দিনাজপুর) হইতে তাহাদিগকে বাধাপ্রদান করিল বটে, কিন্তু তিন দিন অনবরত যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য জয়লাভ করিল। ঈশা খাঁর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। মানসিংহ বঙ্গের দ্বার স্বরূপ তাজপুর দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন।

অতঃপর মানসিংহ পৌষনারায়ণী যোগে মহাস্থান নামক প্রাচীন দুর্গে আগমন করিয়া করতোয়ায় স্নান সমাপন করত মুর্চা শেরপুরে উপনীত হইলে ঈশা খাঁর একদল সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং প্রায় সারাদিন যুদ্ধের পর ঈশা খাঁর সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। মানসিংহ কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়াও বিপক্ষের আর কোন সৈন্য দেখিতে পাইলেন না। তিনি সেখান হইতে শিবির উঠাইয়া টাঙ্গাইলের অন্তর্গত মধুপুরে উপনীত হইয়া সমস্ত বর্ষাকাল সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে খণ্ড যুদ্ধও হইতে লাগিল। তখন বিশালকায়া যমুনা নদীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। বর্ষা শেষে ঈশা খাঁ 'কালে খাঁ ও ফজল গাজী'র নেতৃত্বাধীনে বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা প্রচণ্ড বিক্রমে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া প্রায় চারি সহস্র সৈন্যকে সমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ হীনবল হইয়া পড়িলেন এবং তিনি আরও অধিকতর সৈন্য প্রেরণ জন্য সম্রাটকে লিখিলেন। ফলে আরও পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তুমুল যুদ্ধ হইল এবং পুনরায় বর্ষা সমাগত হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত থাকিল। বর্ষাশেষে মানসিংহ (ঢাকার অন্তর্গত) ডেমরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শিবির

সংস্থাপন করিলেন এবং ঈশা খাঁর দেওয়ান বাগ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ঈশা খাঁ তখন দেওয়ান বাগ দুর্গে ছিলেন না। দুর্গরক্ষিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল বটে কিন্তু মানসিংহের কৌশল ও প্রতারণা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলে মোগল সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুর্গ অধিকার করিল।

অতঃপর মানসিংহ এগারসিন্দুর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ঈশা খাঁও সিংহবিক্রমে সৈন্য পরিচালনা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই মাস কাল অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল, রণক্ষেত্র হইতে রুধির ধারা ব্রহ্মপুত্র নদে মিশিয়া সলিল রাশিকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিল। এই নরশোণিতপাত ও যুদ্ধের ভাবী ফল মঙ্গলজনক নহে দেখিয়া বিবি অলি নেয়ামতের করুণ-হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার হইল। তিনি ঈশা খাঁকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এতাদৃশ নর-শোণিতপাত দ্বারা সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী-বক্ষঃ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ছার রাজ্যলাভে কি ফল? সত্বর যাহাতে এ ভীষণ নরশোণিতপাত বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সহধর্ম্মিণীর সুযুক্তিপূর্ণ পরামর্শের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া ঈশা খাঁ অবিলম্বে মানসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, অনর্থক লোকক্ষয় করিয়া ফল কি? আগামী কল্য প্রত্যূষে ঈশা খাঁ স্বয়ং রাজপুতবীর মানসিংহের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। মানসিংহ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। মোগল শিবির সন্নিধানে এক প্রান্তরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

পরদিন প্রাতে ঈশা খাঁ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া অসি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে মোগল শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মোগল শিবির হইতেও এক অশ্বারোহী কৃপাণ চম্‌কাইতে চম্‌কাইতে তথায় উপনীত হইলেন। অত্যল্পক্ষণ যুদ্ধের পরে মোগলশিবিরসমাগত অশ্বারোহী আহত হইয়া ধূলি লুণ্ঠিত হইলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। কিন্তু ঈশা খাঁ জানিতে পারিলেন যে তিনি মানসিংহ নহেন, মানসিংহের জামাতা দুর্জ্জয়সিংহ। ইহাতে ঈশা খাঁ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও মানসিংহের উদ্দেশে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। জামাতৃ শোকে ও দুহিতার বৈধব্যদশা দর্শনে মানসিংহ অধীর হইয়া শরাহত শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া অসি চালনা করিতে করিতে শিবির হইতে বাহির হইলেন। ঈশা খাঁ বুঝিলেন যে এবার অগণিত রণক্ষেত্রজয়ী মানসিংহ সত্য সত্যই স্বয়ং যুদ্ধে আসিতেছেন। ঈশা খাঁ আপন অশ্বের বল্গা সুদৃঢ়

মুষ্টিতে ধারণ করিয়া স্থিরভাবে মানসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মানসিংহ নিকটবর্ত্তী হইলে উভয়ের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর মানসিংহের তরবারি হস্ত হইতে ভূতলে পতিত হইল, তরবারি উঠাইতে চেষ্টা করিয়া তিনি আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না; অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলশায়ী হইলেন। নিমিষের মধ্যে ঈশা খাঁ অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া এক হস্তে বজ্রমুষ্টিতে মানসিংহের হস্ত ধারণ করিয়া অপর হস্তস্থিত নিষ্কোষিত অসি উত্তোলন করিলেন। বুঝি বা পলক পড়িতে না পড়িতে সেই অসি মানসিংহকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী এক শিবির হইতে রোরুদ্যমানা বিদ্যুতবরণা এক রমণী বিদ্যুতবেগে আসিয়া ঈশা খাঁর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "খাঁ সাহেব! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! দেড় সহস্র কুলকামিনীকে বিধবা করিবেন না।" ঈশা খাঁর হস্তের অসি হস্তেই রহিয়া গেল, মানসিংহ যেরূপ ধরাশায়ী ছিলেন সেইরূপই রহিলেন। জেতা ও বিজেতা উভয়েই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। ঈশা খাঁ মানসিংহকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই দিন হইতে—সেই মৃজাপুরের প্রান্তরে—উভয়ে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন; মানসিংহ ঈশা খাঁর আতিথ্য স্বীকার করিয়া এগারসিন্দুর দুর্গে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যগণ সেস্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল।

মানসিংহ ঈশা খাঁর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া এগারসিন্দুর দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। বিবি অলি নেয়ামতের সঙ্গে মানসিংহের প্রধানা মহিষীর বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়া গেল। একদা রাজমহিষী রোদন করিতেছিলেন। বিবি অলি নেয়ামত তদ্দর্শনে আকুলা ও বিহ্বলা হইয়া কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মানসিংহের পত্নী বলিলেন, "ভগ্নি! আমরা সম্রাটের কি প্রকার ভৃত্য তাহা অবশ্য আপনি জানেন না। আমার স্বামী খাঁ সাহেবের সহিত যুদ্ধে বিজিত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে বাদশা আকবর তাঁহাকে কারা নিক্ষিপ্ত করিবেন এবং আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবেন। খাঁ সাহেব আমার স্বামীর প্রাণদান করিলেও সম্রাটের হস্ত হইতে রক্ষার উপায় দেখি না। হায়! হায়! কেন এ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছিল!" এই বলিয়া মানসিংহ-পত্নী করুণ ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বিবি অলি নেয়ামত স্বভাবতঃ অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন। মানসিংহ-পত্নীর চক্ষুঃজল দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইল এবং সম্রাট হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

মানসিংহ-পত্নী বলিলেন, আপনার স্বামীর আগ্রায় উপনীত হওয়া ভিন্ন আমাদের ধনপ্রাণ ও মান রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। বিবি অলি নেয়ামত বলিলেন, "ভগ্নি! আমার স্বামীর হৃদয় আমি জানি, পরের উপকারার্থে তিনি তাঁহার নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। নহিলে কি একজন হিন্দু-রমণী স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে? নিশ্চিন্ত হউন, আমি খাঁ সাহেবকে অবশ্য আগ্রায় প্রেরণ করিব। খোদাতালা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। শত সম্রাটের ক্রোধও তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না।"

মানসিংহের পত্নীর রোদনের কথা এবং তাঁহার আগ্রা না গেলে তাঁহাদের বিপদের কথা সমস্তই বিবি অলি নেয়ামত ঈশা খাঁর নিকট বিবৃত করিলেন। অম্লান বদনে বীরবর ঈশা খাঁ আগ্রা যাইতে স্বীকৃত হইলেন। দিন নির্দ্ধারিত হইল, বিবি অলি নেয়ামতের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বীরচূড়ামণী উদারহৃদয় ঈশা খাঁ কয়েকজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া মানসিংহের সহিত আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আগমহলে উপস্থিত হইয়া মানসিংহ তথায় রহিলেন এবং কিছু সৈন্য, স্বীয় পত্নী ও ভগ্নীসহ ঈশা খাঁকে আগ্রায় প্রেরণ করিলেন। সম্রাট আকবর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঈশা খাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের যাবতীয় বৃত্তান্ত যখন তিনি অবগত হইলেন, তখন সম্রাট আকবর ঈশা খাঁর মহত্ত্ব ও বীরত্বে এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, অবিলম্বে স্বয়ং কারাগারে গমন করত স্বহস্তে ঈশা খাঁর লৌহশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন "আমাদের মধ্যে কে প্রধান তাহা স্থির করা দুষ্কর"। তৎপর ঈশা খাঁকে সঙ্গে লইয়া দরবারে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন প্রদান করিয়া "মসনদ আলী" উপাধিতে বিভূষিত করত দ্বাবিংশতি পরগণা নিষ্কর জায়গীর ও বাঙ্গালার দেওয়ানী পদ প্রদান করিলেন। মানসিংহ সুবাদার ও ঈশা খাঁ দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়া দ্বাবিংশতি পরগণা জায়গীরের সনন্দ সহ সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে ঈশা খাঁর জয় ঘোষণা হইল।

নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ঈশা খাঁর জায়গীরভুক্ত ছিল:—১। আটিয়া, ২। কাগমারী, ৩। শেরপুর, ৪। বড়বাজু, ৫। জোয়ানশাহী, ৬। আলাপসিংহ, ৭। ময়মনসিংহ, ৮। সেলবরস, ৯। নসিরুজিয়াল, ১০। খালিয়াজুরি, ১১। গঙ্গামণ্ডল, ১২। পাইটকাড়া, ১৩। বরদাখাত, ১৪। সোনারগাঁও, ১৫। বিক্রমপুর, ১৬। হোসেনশাহী, ১৭। ভাওয়াল, ১৮। কুড়িখাই,

১৯। দরজিবাজু, ২০। মেহ্‌মানশাহী, ২১। বাহ্‌মন কুণ্ডা, ২২। কাটাবার মহেশ্বরদী। হাজরাদী, বরদাখাত মগরা, জোয়ার হোসেনপুর, সিংধা, মিটামৈন, জাফরশাহী এবং নসরতশাহী প্রভৃতি পরগণাগুলি উপরোক্ত বাইশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত তপ্পা বা খণ্ড বিশেষ। আইন আকবরীতে এই সমস্ত পরগণার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ ঈশা খাঁর পরবর্ত্তী বংশধরগণ সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত এই সমস্ত তপ্পা বিভাগ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান ইংরাজ আমলে সেইগুলি পৃথক নম্বরের মহাল নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পরগণা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

ঈশা খাঁর বীরত্ব, মহত্ব ও অতুল সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া মানসিংহের সহোদরা সিমন্তিনী তাঁহার সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ইচ্ছুক হন। ঈশা খাঁ সম্মতি জ্ঞাপন করেন; কিন্তু বিবি অলি নেয়ামতের পালিত পুত্র ঈশা খাঁর সঙ্গে আগ্রায় গিয়াছিলেন, তিনি ইহা জানিতে পারিয়া একজন অশ্বারোহীর হস্তে এতৎ সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তদীয় জননীর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। বিবি অলি নেয়ামত এই লিপিকা পাইয়া অবিলম্বে আগ্রায় উপনীত হন এবং এই পরিণয় কার্য্যে বাধা প্রদান করেন। ঈশা খাঁ বিবি অলি নেয়ামতের সহিত পরিণয়াবদ্ধ হওয়ার সময়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবিতাবস্থায় অন্য কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না। কাজেই বিবি অলি নেয়ামত উপস্থিত হওয়ায় প্রবল ইচ্ছা স্বত্বেও সিমন্তিনীর আশা পরিত্যাগ করিয়া ঈশা খাঁকে সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হইতে হইল। দুঃখে ক্ষোভে রাজকুমারী সিমন্তিনী বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন।

ঈশা খাঁ সর্ব্বপ্রথমে মালেকুল উলামা সৈয়দ ইব্রাহিমের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তৎপর চাঁদরায়ের দুহিতা স্বর্ণময়ীকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। স্বর্ণময়ীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত দেওয়ান মুসা খাঁ ও দেওয়ান মোহাম্মদ খাঁ সমস নামক দুই পুত্র ও কনিষ্ঠা পত্নী বিবি অলি নেয়ামতকে বর্ত্তমান রাখিয়া বীরবর ঈশা খাঁ পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত দেওয়ানবাগের নিকটবর্ত্তী বক্তারপুর গ্রামে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর বিবি অলি নেয়ামত রাজ্য শাসন করেন।

সুযোগ বুঝিয়া ত্রিপুরেশ্বর, আরাকান রাজ ও পর্ত্তুগীজ দস্যু এবং কেদার রায় একতাসূত্রে-আবদ্ধ হইয়া একযোগে ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন।

প্রবল পরাক্রমের সহিত বিবি অলি নেয়ামত এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবশেষ নিরুপায় হইয়া সোনাকুণ্ড নামক নব নির্ম্মিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুগণ দুর্গ অবরোধ করে। বীরাঙ্গনা দুর্গাভ্যন্তর হইতে কামানের গোলাতে বিপক্ষগণকে বহুবার পরাজিত করিলেন; কিন্তু দুর্গটি নিম্নভূমিতে ছিল বলিয়া সেই বৎসরের প্রবল বন্যায় দুর্গের ভিতরে জল উঠিল, তখন নিরুপায় হইয়া বিবি অলি নেয়ামত দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিয়া দুর্গের সহিত স্বয়ং ভস্মীভূত হইলেন।

সমাপ্ত।

নুরুল হোসেন কাশিমপুরী।

আরব জাতির ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নাইস্‌ফোরাসের বিশ্বাসঘাতকতা।

খলিফা রশিদ রায় নগরে অবস্থান কালে ডিলেম ও টাবারিস্তানের করদ রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের প্রতি উদারতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেন; ইহাতে তাহাদের রাজভক্তি দৃঢ়ীভূত ও আনুরক্তি বর্দ্ধিত হয়। তৎপর খলিফা রাক্কার পথে বাগ্‌দাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাক্কা নগরী তাঁহার স্থায়ী বাসস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এইস্থান হইতে তিনি গ্রীকগণ, উত্তর প্রদেশবাসী ভ্রমণকারী জাতি সমূহ ও অর্দ্ধ রাজভক্ত সিরিয়াবাসীদিগের গতিবিধি পরিদর্শন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর এখানে ক্ষণিক বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। ট্রান সক্সিয়ানা প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় নাইসফোরাস মোস্‌লেম্ সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব হইতে সে এই প্রকার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে সে খলিফার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সীমান্ত প্রদেশ ধ্বংস ও বহুসংখ্যক অধিবাসীর হত্যা সাধন করিল। খলিফা এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মামুনকে সমস্ত রাজক্ষমতা প্রদান করত তাহাকে রাজকীয় প্রতিনিধি

স্বরূপ রাখিয়া তিনি উত্তর দিকে অভিযান করিলেন। গ্রীকগণ শপথ পূর্ব্বক যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল, উহা রক্ষার নিমিত্ত এবং রাজ্যে শান্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে এবার তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) ঘোষণা করা হইল। একলক্ষ পঁয়ত্রিশ সহস্র বেতনভোগী সৈন্য * রাজকীয় পতাকামূলে সমবেত হইল। এতদ্‌ব্যতীত বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যও যোগদান করিয়াছিল। এই বিরাট বাহিনী সমগ্র এশিয়া মাইনর এমন কি উত্তরে বিথিনিয়া এবং পশ্চিমে মাইসিয়া ও কেরিয়া পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইল। নগরের পর নগর খলিফা রশিদের সেনানিগণের করতলগত হইতে লাগিল। সেনাপতি এজিদ-বিন মাখলাদ কর্ত্তৃক লিডিয়া প্রদেশের কুনিয়া (Iconium) † ও ইফিসাস্ (Ephisus) অধিকৃত হয়। মায়ান-বিন-জায়দার পুত্র শুরাবিল সাকাল্লিয়া (Sakallya) থেবাসা (Dabsa) ম্যালিকোপিয়া (Malicopaea) সিদারো-পলিস (Sideropolis), আনড্রাসাস্ (Andrasus) এবং নিকিয়া (Nicaea) নগর স্বাধিকারে আনয়ন করেন। তৎপর বিজয়ী সৈন্যদল কৃষ্ণসাগরের তটস্থিত হিরাক্লিয়া পনটিকা (Hiraclia Pontica) নগরী অবরোধ করেন। এই নগরী উদ্ধারার্থ নাইস্‌ফোরাস প্রেরিত একদল সৈন্য শোচনীয়রূপে পরাজিত হওয়ার পর উহা আরবদিগের করতলগত হয়। ইহার পর গ্রীকগণ ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং খলিফা স্বীয় অদূরদর্শিতা প্রসূত ক্ষমাগুণ প্রভাবে তাহাদের প্রার্থনা অনুমোদন করেন।

যদি এই সময় কনস্‌টাণ্টিনোপল মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত ও বাইজান-টাইন সাম্রাজ্যের শাসনভার তাঁহাদের হস্তে পতিত হইত, তাহা হইলে সমগ্র জগতে শান্তিস্থাপন ও সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে ইহা অধিকতর শুভজনক হইত। নাইস্‌ফোরাস, তাহার পরিবারের কুমারগণ এবং রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হইয়া শপথ পূর্ব্বক পুনরায় এক নূতন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। ইহাদ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, নাইসফোরাস ও তদীয় পরিবারস্থ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কর প্রদান ব্যতীত গ্রীক সম্রাট খলিফা রশিদকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কর প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু

---

* ইহাদিগকে মুরতাজাকা বলিত। ইহারাই নিয়মিত বেতনভোগী সৈন্য।

† এবনে খালদুন এই নাম লিখিয়াছেন; অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ইহাকে মালাবুনিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১৯২ হিজরীতে (৮০৮ খৃঃ) গ্রীকগণ পুনরায় তাহাদের শপথ ভঙ্গ করত মোস্লেম রাজ্যে প্রবেশ করে। ঐতিহাসিক মুর সাহেব লিখিয়াছেন "পুনঃ পুনঃ এই প্রকার যুদ্ধের ফলে পরিশেষে প্রবল ধর্ম্মবিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল"। ঠিক এই সময় খোরাসান প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় খলিফা সেইদিকে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হন এবং তজ্জন্য কিছুদিনের জন্য গ্রীকগণও উপযুক্ত শাস্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

খুজেমা-বিন খাজিম নামক জনৈক উপযুক্ত সেনাপতিকে সহকারী স্বরূপ প্রদান করিয়া তৃতীয় পুত্র কাসেমকে রাক্কায় এবং প্রথম পুত্র আমিনকে বাগ্দাদে রাখিয়া শ্রমক্লান্ত সম্রাট পূর্ব্বদেশে যাত্রা করেন। দ্বিতীয় পুত্র মামুন পিতার অনুগমন করেন, কিন্তু পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পারশ্যে প্রবেশ করার পর তিনি একদল সৈন্যসহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া মার্ভের দিকে গমন করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। স্বয়ং খলিফা মূল সৈন্যদল লইয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। রাক্কা পরিত্যাগের পর হইতেই খলিফা পীড়ায় ভুগিতেছিলেন, এক্ষণে তুসনগরের * অন্তঃপাতী সানাবাদ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে তাঁহার পীড়া অতীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া তিনি সৈন্যদল স্থিত স্বীয় পরিবারের (হাশেমবংশের) সমস্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করত নিম্নলিখিত উপদেশগুলি প্রদান করেন—"যাহারা এখন যুবক তাহারা বৃদ্ধ হইবে, যাহারা এই পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহাদের সকলকেই মরিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে তিনটি উপদেশ প্রদান করিতেছি—স্বীয় কর্ত্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিপালন করিবে, তোমাদের এমামদিগের (খলিফাগণের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকলে একতায় আবদ্ধ থাকিবে এবং মোহাম্মদ ও আব্দুল্লার (আমিন ও মামুন) জন্য বিশেষ যত্ন লইবে। যদি একজন আর একজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে তাহা হইলে বিদ্রোহীকে দমন করিবে এবং রাজভক্তি হীনতার জন্য তাহার নাম কলঙ্কিত করিবে।" তৎপর তিনি স্বীয় অনুচরবর্গ ও সৈন্যদলকে বহু ধনরত্ন দান করেন। ইহার দুইদিন পর তাঁহার মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়। খলিফা হারুণ আর-রশিদ ২৩ বৎসর ৬ মাস কালব্যাপী গৌরবান্বিত রাজত্বের পর জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগে ৪ঠা জমাদিয়স্সানি (১৯৩ হিজরী, ৮০৯ খৃঃ) কাল কবলে পতিত হন। এই সময় তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর ৬মাস হইয়াছিল।

---

* তুস নগর কবি ফেরদৌসির জন্মস্থান।

খলিফা হারুণ-আর রশিদের চরিত্র চিত্র ।

যে কোন ব্যক্তিই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অতীব সূক্ষ্মভাবে যদৃচ্ছা তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করুন না কেন, খলিফা হারুণ-আর-রশিদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নরপতি ও রাজ্যশাসকদিগের মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা করা ভ্রম—বিংশ শতাব্দীর মানব চরিত্র ও উৎকর্ষ,ইহার কেন্দ্রীভূত সভ্যতা এবং কালের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নানা প্রকার উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার তুলনা করা যাইতে পারে না। সন্দিগ্ধতার প্রবল উচ্ছ্বাস বশতঃ তিনি সময় সময় কোন মন্দকার্য্য করিলেও উহা স্বেচ্ছাচারিতার স্বাভাবিক ফল। তদীয় অসাধারণ শক্তিবলে তিনি এত আত্মসংযমী, জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য এত অনুরক্ত এবং প্রজার হিতার্থে এত যত্নবান ছিলেন যে, তাঁহার প্রতিভাকে আমরা উচ্চাসন প্রদান করিতে বাধ্য। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতেন না। শাসন শৃঙ্খলা, ন্যায় বিচার এবং স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা পরিদর্শন জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং নয়বার সদলে পবিত্র মক্কাতীর্থে গমন করেন। এতদ্দারা তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বিদিগকে এস্‌লামের বাধ্যতা মূলক একতা ও ধর্ম্মের জন্য স্বীয় ব্যক্তিগত উত্তেজনা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সমস্ত রাজন্যবর্গের রাজদরবার অপেক্ষা তাঁহার রাজদরবার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই দরবারে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই বদান্যতার সহিত অভ্যর্থিত হইতেন। শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং মনোবৃত্তি বিকাশার্থ প্রত্যেক প্রকার বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোস্‌লেম সমাজে তিনিই প্রথম সঙ্গীত বিদ্যাকে উচ্চাসন প্রদান এবং সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ক্রমিক শ্রেণী বিভাগের সৃষ্টি করেন।

এসলামধর্ম্মবিধির হানিফি-বিদ্যালয় ।

যদিও এমাম আবুহানিফার নামানুসারে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছিল, তত্রাচ প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকে খলিফা হারুণ-আর রশিদের প্রধান কাজি (কাজি-উল-কুজ্জাত) আবু-ইউসফের পরিশ্রম ও জ্ঞানের ফল স্বরূপ বলিতে হইবে; কারণ

খলিফা রশিদের রাজত্বকালে তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রধান কাজি উক্ত আবু-ইউসফের নেতৃত্বে ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের হস্তে হানিফি-বিদ্যালয় সুশৃঙ্খল আকার ধারণ করিয়াছিল। আবু-ইউসফের চরিত্রে ক্র্যানমুরের * উদারতা এবং বেকনের জ্ঞানলিপ্সা বিমিশ্রিত ছিল †। শক্তি ও সজীবতায় এই বিদ্যালয়টির শৈশবাবস্থা থাকা নিবন্ধন অথবা বিরুদ্ধমতের অবিদ্যমানতা প্রযুক্ত আবু-ইউসফ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও নৈতিক প্রণালীতে একাল পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী সময়ের কঠোরতা প্রবেশলাভ করে নাই। যে পরিমাণে বিরুদ্ধমতের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মতন্ত্রই স্বকীয় মত রক্ষার্থ সেই পরিমাণে কঠোরতা অবলম্বন করে। যদিও এই সময়ে স্ব স্ব মত রক্ষার্থ জনসাধারণের মন উত্তরোত্তর কঠোরতা অবলম্বনের দিকে ধাবিত হইতে ছিল, তথাপি আবু হানিফার ধর্ম্মবিধান উদারতাবিচ্যুত হয় নাই, বরং ইহার উন্নতির নিশ্চিত লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। কিন্তু খলিফা রশিদ তাঁহার সমসাময়িক নৈতিক বিধান-প্রণেতা-দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মব্যাখ্যার সমর্থন করায় ধর্ম্ম-শাসকদিগের একটা দল সংগঠনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল; তজ্জন্য (পরবর্ত্তী কালে) দুর্ব্বল খলিফাদিগের সময় উক্ত ধর্ম্মশাসকদলের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় এমাম আবু হানিফার ধর্ম্ম বিধানের উন্নতি ও পুষ্টির পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। যে সুন্নি বিদ্যালয়ের ভিত্তি খলিফা মন্‌সুরের সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন এই প্রকারে উহার ক্রমোন্নতি সাধিত হয় এবং

---

* ক্র্যানমার—ইঁহার পূর্ণ নাম টমাস ক্র্যানমার। তিনি ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরি, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ও রাজ্ঞী-মেরীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডবাসীর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহার সময় বাইবেল প্রথম ইংরাজিতে অনুবাদিত হয়। তিনি রোমান ক্যাথলিক মতের সংস্কার করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রচলন করেন, কিন্তু রাজ্ঞী মেরী তাঁহাকে ক্যাথলিক মত গ্রহণ জন্য তিন বৎসর কাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। উহাতেও তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় তাঁহাকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হয়। তাঁহার ধর্ম্ম মত উদার ভাবাপন্ন ছিল। এখানে তাঁহার উদার মতের সহিত আবু-ইউসফের উদার মতের তুলনা করা হইয়াছে। (অনুবাদক।)

† বেকন ফ্রান্সিস্—লর্ড বেকন রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমসাময়িক প্রধান দার্শনিক জ্ঞানী ও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। নানাপ্রকার রাজকার্য্য করার পর তিনি পরিশেষে গ্রেট বৃটনের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে "Novum organum" নোভাম অরগ্যানাম নামক এমন এক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যে এখনও ইউরোপের বুধমণ্ডলী উহার ভাব সমূহের অনুসরণ করিতেছেন। এখানে তাঁহার জ্ঞানলিপ্সার সহিত কাজি আবু-ইউসফের জ্ঞানলিপ্সার তুলনা করা হইয়াছে। (অনুবাদক।)

যখন পরবর্ত্তী আব্বাসবংশীয় খলিফাগণ পার্থিব শক্তিবিচ্যুত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক আধিপত্য সংরক্ষণ জন্য মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সময় এই বিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। খলিফানির্ব্বাচন সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করা শাস্ত্রানুমোদিত এবং এইরূপে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিই ধর্ম্মনেতা অর্থাৎ জনসাধারণের এমাম,—এই মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ বর্ত্তমানে "আহলে আস্সুন্নত ওয়াল জামায়াত" অর্থাৎ হাদিস ও সর্ব্ববাদীসম্মত মতের অনুসরণকারী নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

খলিফা হারুণ-আর রশিদের শাসনকালে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবস্থা।

খলিফা মনসুর ভিন্ন ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানগ্রন্থাদি আরবীতে ভাষান্তরিত করিবার জন্য এক অনুবাদ বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। খলিফা রশিদ ঐ বিভাগের উন্নতিসাধন ও অনুবাদকের সংখ্যা বর্দ্ধিত করেন। কিন্তু খলিফা মামুনের সময় উহার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার সমগ্র অথবা আংশিক রাজত্বকালে যে সমস্ত খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যাকরণবিদ্ আসমাই * (Asmai), সাফী (Shafei), আবদুল্লা-বিন ইদ্রিস, ইসা বিন ইউনাস্, সুফিয়ান-বিন সুরী, সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ইব্রাহিম মজুলী, বৈদ্য বকতেষুর পুত্র গেব্রাইল (Gabriel) প্রমুখ মনীষিগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এবনে খালদুন লিখিয়াছেন,—খলিফা রশিদ এক কৃপণতা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ে তদীয় পিতামহ খলিফা মনসুরের আদর্শের অনুকরণ করিয়াছিলেন। কারণ আড়ম্বর ও দানশীলতায় কোন খলিফাই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি নিজে কবি † ছিলেন

* ইনি খলিফা রশিদের পুত্রগণের শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন।

† খলিফা রশিদের রচিত কতকগুলি কবিতা হেলেন নাম্নী কোন অনুপম সুন্দরী মহিলার উদ্দেশে লিখিত হইয়াছিল। হেলেনসুন্দরী সত্য হউন বা কাল্পনিক হউন সে বিষয় বিচার না করিলেও, খলিফা রশিদ হিরাক্লিয়ার কোন রোমক ভদ্রলোকের কন্যার ভালবাসায় অতীব আসক্ত হইয়া তাঁহাকে যে সেখান হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। রক্কিকা নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে ইউফ্রেতীজ নদীর উপকূলে তিনি তাঁহার জন্য একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার জন্মস্থানের স্মরণার্থ উক্ত প্রাসাদের নাম হিরাক্লিয়া রাখেন। সেখানে নানাপ্রকার বিলাস সামগ্রীর যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। ঐতিহাসিক মস্উদির সময় উক্ত প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল।

বলিয়া কবিদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিতেন। পাশ্চাত্য ও অতীব দূরবর্ত্তী প্রাচ্য রাজ্যের রাজাদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনিই প্রথমে চীন ও চারলিম্যাগনি রাজ্যের * সম্রাটের দূতদিগকে সাদরে অভ্যর্থিত করেন। তিনি শেষোক্ত রাজ্যের সম্রাটকে এরূপ কতিপয় আশ্চর্য্য উপহার প্রদান করিয়াছিলেন যে তাহার বর্ণনা এখনও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐগুলির কারুকার্য্যই আব্বাসী খলিফাদিগের রাজত্বকালীন শিল্পবিদ্যার উন্নতির জ্বলন্ত প্রমাণ। উপহারগুলির মধ্যে একটি ক্লক ঘড়ি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা অত্যাশ্চর্য্য শিল্পবিদ্যার পরিচায়ক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। † খলিফা রশিদের যে কয়েকজন পুত্র জীবিত ছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারি জনের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ—মোহাম্মদ আল-আমিন, আবদুল্লা আল-মামুন, কাসেম আল-মোতামিন এবং আবু ইস্‌হাক মোহাম্মদ আল-মুতামিন।

খলিফা মোহাম্মদ আল-আমিনের শাসনকাল।

(১৯৩—১৯৮ হিজরী ; ৮০৯—৮১৩ খৃঃ।)

যখন খলিফা হারুণ-আর রশিদ মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন আমিন রাজধানীতে, মামুন মার্ভ নগরে, কাসেম কিন্নিস্‌রিনে এবং সাম্রাজ্ঞী জোবেদা রাক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। খলিফার মৃত্যু সংবাদ পোষ্টমাষ্টার জেনারাল (সাহেব-আল-বারিদ) হামাবি (Hamawieh) কর্ত্তৃক বাগ্‌দাদে এবং তৎপর দিন রাজকীয় শীলমোহর, তরবারি এবং হজরত পয়গম্বরের জামা আমিনের ভ্রাতা সালেহ কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। এই সালেহ্ খলিফা রশিদের মৃত্যু সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। আমিন এতদিন 'কসর-আল-খুন্দে' (স্বর্গীয় প্রাসাদে) অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি সেখান হইতে কসর-আল-খেলাদতে (রাজকীয় প্রাসাদে) বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। পরদিন তিনি জনসাধারণের মিলিত উপাসনার সময় আচার্য্যের (এমামের) কার্য্য

* পূর্ব্বে ফ্রান্সের ডিউকের শাসনাধীন রাজ্যকে চারলিম্যাগনি বলিত। (অনুবাদক।)

† একখানা পিত্তল নির্ম্মিত থালার উপর কতকগুলি বল ক্রমান্বয়ে পতিত হইয়া এই ঘড়িতে সাময়িক ঘণ্টা বাজাইত। ইহার একটি দ্বার ছিল। যেইমাত্র ঘণ্টা বাজিত, অমনি ঐ দ্বারটি চকিতে খুলিয়া যাইত ও ঘড়ীর মধ্য হইতে সাময়িক ঘণ্টার সংখ্যানুযায়ী অশ্বারোহী সৈন্য বহির্গত হইত। ঘণ্টা বন্ধ হইবামাত্র উহারা ভিতরে প্রবেশ করিত এবং ঐ দ্বারটিও আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত।

করিয়া আবশ্যক উপদেশাদি প্রদান করত সৈন্যদল, অভিজাতবর্গ ও নগর-বাসিগণের নিকট হইতে বশ্যতার শপথ গ্রহণ করেন। মামুনও তদীয় ভ্রাতার সিংহাসনারোহণোপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করত তাঁহার নিকট উপহার প্রেরণ করেন। এদিকে খলিফা রশিদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণমাত্র সাম্রাজ্ঞী জোবেদা রাক্কা পরিত্যাগ করিয়া বাগ্‌দাদ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে আনবার নামক স্থানে তদীয় পুত্র আমিন কর্ত্তৃক অতীব আড়ম্বর সহকারে অভ্যর্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদে নীত হন। এইস্থানে তিনি আমিনের শোচনীয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ।

শেখ রেয়াজউদ্দিন আহ্‌মদ।

প্লিনি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ভারতবর্ষের আকৃতি, সীমা ও প্রকৃতি।

হিমোদাস পর্ব্বতের সন্নিকটে অধিবাসীবৃন্দ স্থায়ীভাবে বাস করে। ভারতীয় জাতিগণ এই স্থান হইতে কেবলমাত্র যে পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত বাস করে তাহা নয়, তাহারা দক্ষিণসাগর পর্য্যন্তও বাস করে। এই সাগরকে আমরা পূর্ব্বে ভারতীয় মহাসাগর নামে আখ্যাত করিয়াছি। পূর্ব্বাঞ্চল হিমোদাস পর্ব্বত হইতে সমরেখায় গমন করিয়াছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলে ভারতীয় সমুদ্রের মধ্যে ১৮৭৫ মাইল ব্যবধান। এইস্থান হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ২৪৭৫ মাইল। সিন্ধুই ভারতের পশ্চিম সীমা। অনেক গ্রন্থকার ইহার উপকূলকে জলপথে ৪০ দিবা-রাত্রির পথ বলিয়াছেন; উত্তর দক্ষিণে ইহা ২৮৫০ মাইল। আগ্রিপ্পার মতে ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৩০০ মাইল এবং বিস্তারে ২৩০০। পসিডোনিশ উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাপ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষ গলদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়াছেন। এই জন্য তিনি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষ গলের বিপরীত দিকে অবস্থিত বলিয়া পশ্চিম বায়ু ভোগ করে এবং সেই জন্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। ভারতবর্ষে তারকাগুলি অন্যভাবে আকাশে দেখা যায়। বৎসরে দুইটি ঋতু। আমাদের দেশে যখন শীতঋতু তখন তদ্দেশীয় সমুদ্রে নাবিকেরা সহজে গমনাগমন করিতে পারে। এইদেশে

এত জাতি ও নগরী যে গণনায় শেষ করা যায় না। কেবলমাত্র যে আলেকজান্দারের ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সেলুকস ও আন্টিওকাসের সৈন্যবাহিনীর জন্য আমরা ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি, তাহা নয়। তাঁহাদের নৌসেনাধ্যক্ষ পাট্রোক্লিস ও হিরকানিয়ানও কাসপিয়ান সাগর পর্য্যন্ত জলযাত্রা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মেগাস্থিনিস, ফিলাডেলফিয়াস প্রেরিত ডাইওনিয়াস প্রমুখ কয়েকজন গ্রীক যাঁহারা ভারতীয় রাজগণের দরবারে বাস করিতেন, তাঁহারাও ভারতীয় জাতির প্রতাপ ও বৈভবের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বৃত্তান্ত বিভিন্ন প্রকারের এবং বিশ্বাসযোগ্যও নহে। আলেকজান্দারের সহযাত্রিগণ লিখিয়াছেন যে, আলেকজান্দার যে জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে পঞ্চ সহস্র নগর ও নয়টি জাতি ছিল। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে,—ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ,এবং ইহার জনসংখ্যা গণনায় শেষ করা যায় না। অবশ্য এরূপ উক্তির হেতুও আছে, কেন না সকল জাতির মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয়েরাই কোনদিন তাঁহাদের সীমার বাহিরে যায় নাই। ফাদার ব্যাকাস হইতে আলেকজান্দার পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর তিন মাস রাজত্ব করিয়াছেন।

নদীর আকার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আলেকজান্দার কোন দিনও ৬০০ ষ্টাডিয়ার কম সিন্ধুনদে ভ্রমণ করেন নাই, কিন্তু তত্রাপি পাঁচ মাস কয়েক দিবসে ইহার মুখে পৌঁছিয়াছিলেন। অথচ সিন্ধু গঙ্গা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমাদের নাগরিক সেনেকা যিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন, তিনি বলেন যে,—ভারতবর্ষে ৬০টি নদী আছে এবং ১১৮টি জাতি আছে। পর্ব্বতের সংখ্যানির্ণয়ও এইরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইমাবস, হিমোদস, প্যারোপানিসাস এবং ককেসাস পর্ব্বতশ্রেণী একটি অপরের সহিত সংযুক্ত এবং তাহাদের সানুদেশ হইতে একটি বিরাট সমতলক্ষেত্র বহির্গত হইয়াছে। এই সমতল ক্ষেত্র দেখিতে অনেকটা মিশরের ন্যায়। কিন্তু যাহাতে এই দেশের ভূগোল সহজে বোধগম্য হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা আলেকজান্দার যে যে পথে গিয়াছিলেন তাহারই অনুসরণ করিব। এই পথ ডাইরগনিটিস ও বিটা কর্ত্তৃক পরিমিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড। ৭৩ অধ্যায়।

তাহারা বলে যে সিন নগরে (যাহা আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে ৫০০০ ষ্টাডিয় দূরে অবস্থিত) অয়নান্তের দিন দ্বিপ্রহরে কোন ছায়া পড়ে না। পরীক্ষার

জন্য একটি গর্ত্ত খনন করিলে দেখা গিয়াছিল যে ঐ গর্ত্ত সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়াছিল। এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য্য ঐ স্থানে লম্ব (Perpendicular)। অনিসিক্রিটস বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে হাইপেসিস নদীতেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ওরিটিস দেশে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে ও শীতকালে উত্তর দিকে ছায়া পড়ে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রগুলি বৎসরে কেবলমাত্র পনর দিবস দেখা যায়। পাটল নামক সুবিখ্যাত বন্দরেও সূর্য্য উত্তর দিকে উঠে এবং সেইজন্য ছায়া দক্ষিণ দিকে পড়ে। আলেকজান্দার যখন সেইস্থানে ছিলেন তখন সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রগুলি মাত্র গোধূলিকালে দেখা যাইত। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি ওনিসিক্রিটাস বলেন যে, ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে ছায়া পড়ে না তথায় সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয় না। এই সকল স্থানকে Ascia বলে এবং তথায় সময় ঘণ্টানুসারে নির্ণীত হয় না।

ভারতবর্ষ হইতে ও ভারতবর্ষে সমুদ্রযাত্রা।

ভারো বলেন যে সাত দিনে ভারতবর্ষ হইতে আইয়াক্রাস নদীতে পৌঁছা যায়। এই নদী অক্সাসের সহিত মিলিত হইয়াছে। স্থলপথ দিয়া পণ্টাশ প্রদেশস্থ ফাসিস নগরে ভারতীয় পণ্য পাঁচ দিনে আনয়ন করা যায়।

নেপস বলেন যে সুইডের রাজা মিটেলাস সিলার কয়েকজন ভারতবাসীকে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল ভারতবাসী বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া প্রতিকূল বাতাসের জন্য জর্ম্মনি পৌঁছিয়াছিল।

অনিসিক্রিটস ও নিয়ার্কাসের বর্ণনায় স্থানের নাম বা তাহাদের দূরত্ব উল্লেখিত হয় নাই। কিন্তু তত্রাপি নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য। নিয়ার্কাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরাবিস নগরী; আরাবিস নদী; আলেকজান্দর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া লিওনোটাসের প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরী; আর্গেনাস বন্দর; টনবিরস নদী ও তাহার তীরবর্ত্তী পাসিরীজাতি; ইকথিও ফ্যাগি। আরাবিয়ার অন্তর্গত সিয়াগ্রাস অন্তরীপ হইতে হিপালাস বায়ুর সাহায্যে অনায়াসে ভ্রমণ করা যাইত। পরবর্ত্তীকালে আরও অল্প সময়ে ভারতীয় বন্দর সিগারাস হইতে যাতায়াত করা যাইত। অনেক দিন ধরিয়া এই পথেই যাতায়াত করা হইত। অবশেষে এক বণিক আরও একটি সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করেন। এইপ্রকারে লাভের জন্য ভারতবর্ষ আমাদের খুব নিকট হইয়া পড়ে। হিপালাস বায়ু প্রবাহিত থাকিলে ৪০ দিনে মাজ্রিরিস নামক ভারতীয় বন্দরে পৌঁছা

যায়। বাণিজ্যের পক্ষে এই বন্দর প্রশস্ত নহে; কেন না নিকটেই নিট্রিয়াস নামক স্থানে জলদস্যুগণ বাস করে এবং এস্থানে সুবিধা মত পণ্যাদিও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বন্দর হইতে অনেক দূরে জাহাজগুলি নোঙর করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা মাল উঠাইতে ও নামাইতে হয়। আমাদের সময়ে কিলোবোথ্রাস রাজা ঐ দেশের রাজা ছিলেন। নিকিনডন নামক বন্দরটি পূর্ব্বোক্ত বন্দরাপেক্ষা ভাল। এইস্থানে প্যাণ্ডিয়ন রাজত্ব করিতেন এবং বন্দর হইতে অনেক দূরে মদুরা নামে একটি নগর আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকের গ্রন্থেই এই সকল নাম পাওয়া যায় না এবং তাহাতে বোধ হয় যে এই সকল স্থানের নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাটানারা হইতে বিকারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় মরিচ লইয়া যাওয়া হয়। ডিসেম্বর মাসে বণিকগণ মিশর হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করে। এই সময়ে যাত্রা করিলে তাহারা এক বৎসরের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব বাতাসে যাত্রা করিয়া তাহারা লোহিতসাগরে পৌঁছে এবং তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম বা দক্ষিণ বায়ুর সাহায্যে মিশরে পৌঁছে।

ভারতীয় মহাসাগর সমূহে অনেকপ্রকার বৃহৎ বৃহৎ জলজন্তু পাওয়া যায়। তিমিগুলি ২৪০ ফীট দীর্ঘ ও ১২০ ফীট প্রস্থ। কামট ২০০ হাত লম্বা। ভারতীয় পঙ্গপাল যেরূপ ৪ ফীট দীর্ঘ, সেইরূপ তদ্দেশীয় বানমৎস্যও ৩০০ শত ফীট লম্বা।

ভারতীয় জাতি।

বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণার্থ আমোমিটাস আটাকোরিদিগের সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। হিকেটিয়াস হাইপার বোরিয়ানসদিগের সম্বন্ধে যেরূপ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এখানিও সেইরূপ। আটাকোরির পার্শ্বেই থুনি এবং ফরকারাই বাস করে। তৎপর কাসিরাই নামক ভারতীয় জাতি বাস করে। ইহারা মনুষ্যমাংস ভক্ষণ করে। ভারতবর্ষে ভ্রমণশীল জাতিও আছে,—ইহারা যত্রতত্র ভ্রমণ করে। কাহারও কাহারও মতে এই সকল জাতি উত্তর ভারতে বাস করে।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের জন্তু পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাদের কুকুরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে;—এই সকল কুকুর অন্যান্য দেশের কুকুরাপেক্ষা বৃহৎ। তাহাদের দেশীয় বৃক্ষাদিও এত উচ্চ যে তীর তাহাদের শীর্ষদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। ভূমি উর্ব্বর, জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু পানীয়

জল পাওয়া যায়। ডুমুর বৃক্ষগুলি এত বৃহৎ যে, একটি বৃক্ষের ছায়ায় একদল অশ্বারোহী আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। নলগুলি এত বৃহদাকারের যে দুইটি গিরার মধ্যস্থিত ফাঁপে নৌকা হইতে পারে। এই নৌকায় তিন জন মনুষ্য বসিতে পারে। অনেক ভারতবাসী যে পাঁচ হাতের উপর উচ্চ, তাহারা যে থুথু ফেলে না, তাহারা মস্তিষ্কের পীড়া অথবা চক্ষু বা দন্তরোগে আক্রান্ত হয় না এবং অন্যান্য অসুখ হয় না এবং তাহাদের স্বাস্থ্য যে ভাল, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তাহাদের দার্শনিকগণ সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকে এবং উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর প্রথমে এক পা ও পরে অন্য পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে পর্ব্বত মধ্যে সাতির (Satyr) ও অত্যন্ত দ্রুতগামী জন্তু পাওয়া যায়। এই সকল জন্তু কখনও কখনও সাধারণ ভাবে, কখনও সোজা হইয়া ভ্রমণ করে। দেখিতে ইহারা মনুষ্যাকার। ইহারা এত দ্রুতগামী যে, বৃদ্ধ বা পীড়িত না হইলে ইহাদের ধৃত করা যায় না। তারাণ কোরোমাণ্ডি নামক এক জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—ইহারা জঙ্গলে বাস করে এবং রীতিমত কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না। ইহারা কর্কশ শব্দ উচ্চারণ করে। ইহাদের শরীর লোমশ, চক্ষুগুলি নীলাভ এবং দন্ত কুক্কুরের ন্যায়। ইউডোক্সাস বলিয়াছেন ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য দেশীয় মনুষ্যগুলির পায়ের তলা এক হস্ত দীর্ঘ কিন্তু স্ত্রীলোকের পদ এত ছোট যে, তাহাদের ষ্ট্রুথোপোঙ্গি বলে। ইসিগোনাশ লিখিয়াছেন যে, চির্ণি নামক ভারতীয় জাতির ১৪০ বৎসর পরমায়ু। ক্ষনিসিক্রিটস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতের যে সকল স্থানে ছায়া নাই, তথায় মনুষ্যগণ পাঁচ হস্ত ও দুই তালু (Palm) লম্বা। ইহারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। যৌবনকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক্রাটিরস বা পার্গেমাস বলেন যে, ভারতীয়গণের পরমায়ু একশত বৎসরেরও অধিক। কালিঙ্গী জাতীয় স্ত্রীলোকগণ পাঁচ বৎসর বয়সে সন্তানবতী হন এবং আট বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকেন না। অন্যত্র—মনুষ্যের লেজ আছে এবং ইহারা অত্যন্ত দ্রুত চলিতে পারে। অন্যান্য জাতির এত দীর্ঘ কর্ণ যে, এই কর্ণে তাহাদের সকল শরীর আচ্ছাদিত হয়। আরাবিস নদী তীরস্থ ওরিটি জাতি মৎস্য ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করে না। এই সকল মৎস্য তাহারা নখদ্বারা ছিন্ন করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া রুটী প্রস্তুত করে। ক্রমশঃ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

অজ্ঞাত।

১

জানে না জগত কোন্ সুরেতে
পরাণ আছে সাধা,
জানে না মোর হৃদ-বীণাতে
কোন রাগিণী বাঁধা ;
হৃদয়-জয়ী পরাণ-প্রিয়
আমিই শুধু জানি—
কে নেয় আমার সকল গান
কার চরণে টানি।

২

জানে না জগত আঁখির আগে
কাহার আলো জাগে,
কার দরশন জনম ভ'রে
পরাণ আমার মাগে,
মরম মাঝে আসন আমার
কার তরেতে পাতা—
কে মোর শোকের শান্তি-বারি
সর্ব্ব সুখের ধাতা।

৩

জানে না জগত কে মোর চিতে
ফোটায় শতদল,
নীরস জীবন সরস করে
বইয়ে আঁখি জল,
প্রভাত কালে ছড়িয়ে কে দেয়
দীপ্ত অরুণ লেখা,
শান্ত সাঁঝের চাঁদ হ'য়ে দেয়
মোর গগনে দেখা।

৪

নাই বা জানুক বিশ্ব তোমার
আসন কোথা রাজে,
জীবন মরণ ছেয়ে আমার
আছ বুকের মাঝে।
হৃদয়-জয়ী পরাণ প্রিয়
আমিই শুধু জানি—
কে নেয় আমার পরাণ অর্ঘ্য
কার চরণে টানি!

শ্রীঅবনীকুমার বসু।

জামে অল-আজহারের ইতিহাস।

(২)

ওস্‌মানীয়দিগের রাজত্বকালে মস্‌জিদের শোভাসমৃদ্ধি স্বভাবতঃ একটু ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ইহার অনেক উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তির কথাও লেখা যাইতে পারে। বিজেতা সেলিমশাহ তথায় প্রায়ই আসিয়া উপাসনা করিতেন। তিনি মসজিদে কোরান পাঠ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এবং দরিদ্র ছাত্রদিগকে দান করিতেন। প্রাচীনকালীন হর্ম্ম্যমালা অপেক্ষা ওস্‌মানীয় কালের সৌধরাজীর নির্ম্মাণ-কৌশল অত্যন্ত অপকৃষ্ট। উন্নতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে অন্ধদিগের জন্য নির্ম্মিত একমাত্র উপাসনার স্থানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ১১৪৮ হিঃ (১৭৩৫—১৭৩৬ খৃঃ অঃ) ওসমান-কদ্‌-খোদা অল-কজ্‌দোগ্‌লী (কাসেদ আগ্‌লু) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। আব্দুররহমান-কদ্‌-খোদা বা কিহিয়াকে (মৃত্যু ১১৯০ হিঃ ১৭৭৬ খৃঃ) মসজিদের মহত্তর দাতাগণের মধ্যে অবশ্যই গণ্য করা যাইতে পারে। ইনি উপরোক্ত ওস্‌মান-অল-কজ্‌দোগলীর একজন আত্মীয় বলিয়াই বোধ হয়। তিনি একটি বৃহৎ ও প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত 'মকসুরা' একটি 'মেহরাব', একটি 'মিম্বর' পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি চৌবাচ্চা এবং আপনার নিমিত্ত একটি

সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সমাধিতেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। প্রাগুক্ত অল-তায়বার্সিয়া মাদ্রাসা ও আক্‌বুঘাইয়া মাদ্রাসাকে নূতন নূতন অট্টালিকা দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি মসজিদের গৃহাদির অন্যান্য সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করা ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদন সরবরাহেরও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অল-জবর্ত্তী বলিয়াছেন,—ইহাদের প্রতিষ্ঠাতার এক যুগ পরে প্রায় ১২২০ হিজরীতে (১৮০৫ খৃঃ) তাঁহার সময়ে এই সকল পুণ্যবৃত্তির অধিকাংশই অবহেলার মধ্যে পতিত হয়।

পরে শীঘ্রই ফরাশি-অভিযান উপস্থিত হয়, এবং আজহারিয়ানগণ বহু কষ্ট ভোগ করেন। মোহাম্মদ আলির সময়ে জাতীয় সমুত্থান প্রথমতঃ আজহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয় নাই। পরবর্ত্তী খেদিবগণই এই সম্মানিত প্রাসাদের যশঃ অক্ষুন্ন রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলি মোবারক ইহার বিস্তৃতি এবং ইহার মক্‌সুরা, দ্বারসমূহ, মেহ্‌রাব্‌, হোজ্‌রা, স্নানাগার, প্রাঙ্গন, মিনার, সূর্য্য ঘড়ী, উপরোক্ত মাদ্রাসাদ্বয়, আরওয়েক্বা (রেওয়াক সকল Loggias), বাসগৃহ, চৌবাচ্চা, প্রদীপমালা, মাদুর এবং গালিচা প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ বর্ণনা দ্বারা বর্ত্তমান অট্টালিকার প্রকৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (অল-খেতাত অল-জদিফা—৪র্থ ভাগ, ১৪—২৬ পৃঃ)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের প্রয়োজনীয় অনেকগুলি দ্রব্য—যথা কায়েৎবেগের তোরণমার্গ, মাদ্রাসা অল-তায়বার্সিয়ার মেহরাব প্রভৃতি ফ্রাঙ্গপাশার 'কায়রো' নামক গ্রন্থে চিত্রের সহিত পুনর্প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ব্বিতন আভ্যন্তরিন বন্দোবস্ত।—আমরা আজহারের প্রাসাদাদির ইতিহাস উত্তমরূপে অবগত হইয়াছি বটে, কিন্তু প্রাথমিক সময় সংসৃষ্ট মসজিদ ও কলেজের আভ্যন্তরিন বন্দোবস্ত সমূহ জ্ঞাত হইবার উপাদানের বড়ই অভাব। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, ফতেমিয়াদিগের সমকালীন ইহা নগর ও দেশের একটি আদি মস্‌জিদ। আয়ুবিদদিগের শাসনকালে সুন্নিদিগের প্রতিক্রিয়ার কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভূমিকম্প ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে ইহার সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন সংঘটন হওয়া সত্বেও মামলুক সুলতান বার্ব্বরী যখন ইহার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন, তখন ইহার গুরুত্ব প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়। এমন কি, মধ্যযুগে অতিদূরবর্ত্তী দেশ সকল হইতেও ছাত্রগণ এবং পুণ্যাত্মা দর্শকগণ এখানে আগমন করিতেন এরূপ শুনা

যায়। বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র মোস্‌লেমজগতে আজহার শিক্ষামন্দিররূপে অন্যান্য মাদ্রাসা সমূহের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ সমুন্নত মর্য্যাদা লাভ করিবার কারণগুলির মধ্যে মিশরের বহির্ভাগে মোঙ্গল জাতির রাজত্বকাল ও তাহার পতন এবং স্পেনদেশে আরব সভ্যতার বিনাশের কথা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে অন্যান্য কারণও দেওয়া যাইতে পারে। ইহার কেন্দ্রস্থানিক অবস্থান, হেজাজের সান্নিধ্য, বিশুদ্ধ আরবীয় ভাব, দেশের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা, আফ্রিকার বিস্তীর্ণ হিণ্টার ভূমি এবং সর্ব্বশেষ কিন্তু সর্ব্বোপরি নীলনদির উপত্যকাভূমির প্রাচীন জ্ঞান-চর্চ্চা ইহার উন্নতি সাধনের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এরূপ স্থান কর্ম্মপরিচালন ক্ষমতা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রানুশীলনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। আজহার কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা অতঃপর আলোচনা করা হইবে।

আজহারের পবিত্রতা সম্বন্ধে এরূপ জানা যায় যে, মধ্যযুগে ইহাকে আশ্রিতগণের আশ্রম বলিয়াই প্রায় উল্লেখ করা হইত। (এবনে আইয়াস দ্রষ্টব্য)।

সাধারণতঃ ভয়ানক প্লেগ বা দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য কোরান শরীফ বা বোখারী শরীফ হইতে কোন কোন অংশ সর্ব্বসাধারণ্যে পঠিত হইত। ৭৯৮ হিজ্‌রীতে (১৩৯৫—১৩৯৬ খৃঃ) দুর্ভিক্ষের সময় সেরাজ-অল-দীন (ওমর-বিন্‌-রসলান) অল-বল্কিনী ইহাতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিজরী ১১৭২ (১৭৫৮—১৭৫৯ খৃঃ) সালে কায়রো নগরের প্রচণ্ড প্লেগ নিবারণোদ্দেশ্যে ছাত্রগণ তাহাদিগের অধ্যাপককে বোখারী শরীফ হইতে ওয়াজ (বক্তৃতা) করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। (আলি মোবারক কৃত 'খিতাত-অল-জদিদা' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এখানে প্রধান সুফী ওমর-বিন-অল-ফরিদের অবস্থানের কথাও 'এব্‌নে আইয়াসে' উল্লেখিত আছে। সংসারত্যাগী তাপস ও পরম ধার্ম্মিক বা পুণ্যবান ব্যক্তিদিগের জন্য এখানে প্রথমেই বৃত্তিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু ধর্ম্মের ভান করিয়া সকল শ্রেণীর দুর্নামগ্রস্ত (বা নিন্দনীয়) ব্যক্তিরাও তথায় আশ্রয়লাভ করিত বলিয়া বোধ হয়। এরূপ উল্লেখিত আছে যে, বড় বড় উৎসব বা পর্ব্বদিনে বিশেষতঃ রাত্রিতে দস্যুতা, কলহ ও নীতি-বিগর্হিত ব্যাপার সকল সংঘটিত হইত। এ কারণে, একদা আজহারের তত্ত্বাবধায়ক আমির সুদুব্‌ হিজরী ৮১৮ (১৪১৫—১৪১৬ খৃঃ) সালে গৃহসজ্জা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত আজহারের ছাত্র, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর স্থায়ী লোক-

দিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার ফলপ্রদ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে সকলেই তাঁহার উপর ক্রোধান্বিত হন। এমন কি সুলতান (অল্-মো'য়ায়েদ) রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধৃত করত দামস্কসে কারাবদ্ধ করেন। এই উপলক্ষে মহৎ মহৎ দান ও বৃত্তি স্থাপনের কথাও উল্লেখিত আছে। তত্ত্বাবধায়ক ও আমির বাহাদুরের সময়ে হিজরী ৭৮৪ (১৩৮২—১৩৮৩ খৃঃ) সালে ছাত্র-জীবনের অন্য একটি বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি সুলতান বর্‌কুকের নিকট হইতে এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন যে, আজহারের যে সকল ছাত্র কোনরূপ আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী ব্যতিরেকে মৃত্যুলাভ করিবে তাহাদের সম্পত্তি অন্যান্য ছাত্রদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। এই আদেশ-পত্র প্রস্তরে খোদিত করিয়া বৃহৎ নীল-তোরণ দ্বারোপরি স্থাপিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। (মক্রিজীর 'খিত্তাত' দ্রষ্টব্য)।

ক্রমশঃ।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

দস্যুর কাণ্ড।

দুই লক্ষ টাকা

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আহার্য্য মুখে দিতে দিতে রণরাও বলিল, "মিত্রজা, তোমায় কষ্ট করিয়া আর স্বরযমলের বাড়ীতে যাইতে হইবে না,—সে ব্যাপার মিটিয়া গিয়াছে।"

মিত্রজা বিস্মিতভাবে রণরাওর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি ?"

রণরাও হাসিয়া বলিল, "মিত্রজা, এত বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। সেখানে আর এক মিত্রজার সহিত স্বরযমলের সবিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছে,—তাহার পরামর্শানুসারে স্বরযমল তাহার চুরির জন্য আর পুলিশকে বিরক্ত করিবে না,—সে দুই লক্ষ টাকা দিয়া তাহার জহরত ফেরত লইবে। বোধ হয়, এতক্ষণে সে তাহার জহরত ফেরত পাইয়াছে—সে সংবাদও এইমাত্র পাইলাম—"

মিত্রজা প্রায় লম্ফ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে সংবাদও এই মাত্র পাইয়াছ ?"

রণরাও বিনীত ভাবে বলিল, "হাঁ,—পত্রখানা আপনার সম্ভ্রমের জন্য আপনার সম্মুখেই পড়ি নাই, তবে আপনার আপত্তি না থাকে—"

"তুমি এইমাত্র পত্র পাইয়াছ, রণরাও তোমার সর্ব্বদাই কৌতুক—"

"কৌতুক নয়।"

এই বলিয়া রণরাও সম্মুখস্থ অর্দ্ধ-সিদ্ধ খেচরান্ন সরাইয়া তাহার ভিতর হইতে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাগজ তুলিয়া লইল। পড়িল, "কাজ শেষ হইয়াছে। স্বরযমল নগদ দুই লক্ষ টাকা দিয়া জহরত ফেরৎ লইয়াছে!"

"দুই লক্ষ টাকা ?"

রণরাও হাসিয়া বলিল, "ইহা কি বেশি হইল ?—সময় কেমন,—আমার খরচ পত্রও অনেক ; অসংখ্য লোকের খরচ জোগাইতে হয়। কত টাকা মাসে মাসে আমায় দিতে হয়, শুনিলে মিত্রজা তুমি অবাক্ হইয়া যাইবে।"

মিত্রজা সম্পূর্ণরূপেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। মনে মনে জেল কর্ম্মচারীদিগের উপরও বিশেষ রাগত হইয়াছিলেন। তিনি কোন কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শীঘ্রই মিত্রজার বিরক্তি ভাব দূর হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, রণরাওর মত লোক লইয়া এক্ষণে কি করা উচিত। যে জেলে থাকিয়া সে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার ঘটাইতে পারে, সে জেলের সমস্ত কর্ম্মচারীকে কি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পদচ্যুত করা উচিত নহে ?

অবশেষে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যের বিষয় তোমার জোড়া নাই! নতুবা আমাদের অনেক কাল পূর্ব্বে দোকান বন্ধ করিতে হইত!"

রণরাও অতি বিনীত ভাব ধারণ করিল। বলিল, "কি করি মিত্রজা মহাশয়, আপনারা আমায় এখানে এই ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—সময় আর কাটে না, কোন রকমে সময়টা তো কাটাইতে হইবে, বিশেষতঃ জেলে না আটক থাকিলে এ কাজটা সুসম্পন্ন হইত না।"

মিত্রজা বলিলেন, "এখনও তোমার বিচার হয় নাই,—বিচার সময়ে কি বলিবে কি করিবে,—তাহা ভাবিবার জন্যই তো যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন, ইহাতেও কি তোমার সময় কাটিতেছে না ?"

রণরাও বলিল, "দুঃখের বিষয় মিত্রজা, বিচার সময়ে আমি উপস্থিত থাকিব না, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়াছি।"

মিত্রজা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বটে! বটে!"

রণরাও অধিকতর গম্ভীর হইয়া দৃঢ়ভাবে বলিল, "মিত্রজা,—আমি বিচার সময়ে উপস্থিত থাকিব না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রণরাওর দৃঢ়তা দেখিয়া, তাহার গম্ভীর স্বর শুনিয়া মিত্রজা হাসি বন্ধ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ তিনি রণরাওর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "বটে!"

রণরাও বলিল, "মহাশয় কি মনে করিতেছেন যে, আমি আপনার সহিত উপহাস করিতেছি? আপনি কি মনে করেন যে রণরাও আজীবনটা আপনার এই ঘরে এই কম্বলের উপর শুইয়া কাটাইবে? যে এ কথা ভাবে, সে আমার অপমান করে মাত্র। রণরাও সে পাত্র নহে;—যতক্ষণ তাহার প্রয়োজন, ততক্ষণই কেবল রণরাও জেলে থাকে, তাহার এক মিনিট অধিক থাকে না!"

মিত্রজা শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "এরূপ অবস্থায় জেলে একেবারে না আসাই বুদ্ধিমানের কাজ হইত।"

রণরাও বলিল, "মিত্রজা, তুমি আমায় উপহাস করিতেছ? বোধ হয় মহাশয়ের স্মরণ হইতেছে যে, আপনিই আমায় গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন,—সুতরাং আপনাকে বলিতে আপত্তি নাই যে, আপনি বা আপনার মত এক সহস্র লোকও কখন রণরাওর কেশস্পর্শ করিতে পারিত না,—তবে হঠাৎ একটা বিশেষ কারণ ঘটিয়া পড়িয়াছিল, তাহাই রণরাও এখানে।"

মিত্রজা কখনও রণরাওকে এত সবেগে কথা কহিতে শুনেন নাই। সেজন্য তিনি একটু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন "তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

রণরাও বলিল, "হাঁ, বুঝা একটু কঠিন আছে। একটি স্ত্রীলোকের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেজন্য আমি—আমাতে আর আমি ছিলাম না। সুতরাং আজ আমি এখানে।"

মিত্রজা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হইতেছে অনেক কালই এখানে বসবাস করিতে হইতেছে!"

মিত্রজার কথায় কান না দিয়া রণরাও বলিল, "আমি তাহাকে প্রথমে ভুলিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম,—মিত্রজা হাসিও না, আমারও হৃদয় নামে একটা সামগ্রী আছে। এই জেলেও তাহার কথা ভাবিয়া, তাহার কথা মনে করিয়া

সময় সময় অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি। জীবনে নানা সুখ দুঃখ আছে, ভালবাসার যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা। এ অবস্থায় কোন থানে নির্জ্জনে বাস করিতে পারিলেই প্রাণে অতুল শান্তি লাভ হয়,—তাহাই দিন কত নির্জ্জনে বাস করিতে এখানে আসিয়াছি। এরূপ নির্জ্জন স্থান আর কোথায় পাইব? এখন কতকটা সে প্রেম-রোগ সারিয়াছে,—আর এখানে নির্জ্জন বাসের আবশ্যকতা দেখিতেছি না।"

মিত্রজা বলিলেন, "রণরাও,—সব সময়েই কি তোমার উপহাস?"

রণরাও অতি গম্ভীর ভাবে বলিল, "মিত্রজা, আজ শুক্রবার, আগামী বুধবার সন্ধ্যার সময় তোমার বাড়ী গিয়া তামাক খাইব।"

মিত্রজা হাসিয়া বলিলেন, "রণরাও, তোমার সমুচিত অভ্যর্থনা করিতে আমার কখনই ত্রুটি হইবে না।"

মিত্রজা উঠিলেন,—দুইজন বিশেষ বন্ধুও বোধ হয় এরূপ ভাবে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় হয় না।

দ্বার পর্য্যন্ত গেলে রণরাও মিত্রজাকে ডাকিল, মিত্রজা ফিরিয়া বলিলেন, "আর কোন কথা আছে?"

রণরাও বলিল, "তোমার ঘড়িটা ভুলিয়া ফেলিয়া যাইতেছ।"

মিত্রজা তাড়াতাড়ি নিজের পকেটে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার ঘড়ি?"

রণরাও বিনীত স্বরে বলিল, "হাঁ, মহাশয়ের ঘড়িটা ভুলক্রমে দেখিতেছি আমারই টেঁকে আসিয়া পড়িয়াছে।"

রণরাও মিত্রজাকে ঘড়িটা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "আমার যথাসর্ব্বস্ব ইহারা কাড়িয়া লইয়াছে, আমার ঘড়িটা এখন জেলের আফিসে আছে বলিয়া যে আমি আপনার ঘড়িটা লইব, ইহার কোন মানে নাই। বিশেষতঃ সময় দেখিবার মত একটা ঘড়ি আমার কাছেই আছে।"

রণরাও বস্ত্রমধ্য হইতে একটা সুন্দর সোনার ঘড়ি বাহির করিল,—দেখিয়া মিত্রজা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"কাহার পকেট হইতে এটি মহাশয়ের কাছে আসিয়াছে?"

রণরাও ঘড়িটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে;—যে হাকিমের কাছে আমার বিচার হইতেছিল, তাঁহারই পকেটে ছিল,—লোকটি বেশ লোক!"

সম্পূর্ণ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

রত্ন-চয়ন।

ধর্ম্ম কি ও তাহার মূল কোথায়?

(কাউণ্ট টলষ্টয়ের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।)

(৫)

মানস-শক্তির তিন প্রকারের অনুপ্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ সমস্ত কার্য্যে রত হয়। প্রথম, খেয়াল বা অপরিস্ফুট বোধশক্তি; দ্বিতীয় বিচার-শক্তি; তৃতীয় কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিবার শক্তি। ডাক্তারেরা যাহাকে সম্মোহন-ক্রিয়া বা হিপ্‌নটিজম্ নামে অভিহিত করেন, এই শেষোক্ত শক্তিটি তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। কখনও কখনও মানুষ শুধু খেয়ালের বশে কাজ করে—কেবল ঈপ্সিত দ্রব্য পাইবার নিমিত্ত হাত বাড়ায়। কখনও কখনও মানুষ একমাত্র বিচারশক্তির নির্দ্দেশ মত কাজ করে—যুক্তি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তাহাই করে। অপর, কখনও কখনও এবং প্রায়শঃ মানুষ নিজের পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমূহ হইতে কাজ করিবার যেরূপ অভ্যাস লাভ করিয়াছে, অথবা অন্য লোকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া কাজ করিবার যেরূপ সঙ্কেত মনের ভিতর ধারণা করিয়াছে, অজ্ঞাতসারে সেই অভ্যাস বা সেই সঙ্কেতের অনুসরণ করিয়া কাজ করে। জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় এই তিনটি অনুপ্রেরণাই কোন কার্য্যের দিকে মানুষের গতি-নিয়োগ করাইতে সমভাবে ক্রিয়াশীল। প্রথমতঃ খেয়াল বা অপরিস্ফুট বোধ-শক্তি কোন একটি কার্য্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; দ্বিতীয়তঃ, বিচার-শক্তি বর্ত্তমান অবস্থা, অতীত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ পরিণামের আলোকে তাহার বিচার করে; তৃতীয়তঃ খেয়াল ও বিচার-শক্তি ছাড়া অপর একটি শক্তি-প্রভাবে মানুষ খেয়ালের বশে যে কাজ করিবার সংকল্প করিয়াছে এবং যুক্তির দ্বারা যাহার ইতিকর্ত্তব্যতা মীমাংসা করিয়া লইয়াছে সেই কাজ সাধন করিয়া ফেলে। যদি এই অপরিস্ফুট বোধ-শক্তি না থাকিত তাহা হইলে মানুষ কখন কি যে করিবে তাহা সে খুঁজিয়াই পাইত না। তারপর বিচার-শক্তি যদি না থাকিত তাহা হইলে মানুষ দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় কখনও

এ খেয়াল কখনও সে খেয়ালের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনার ও অন্যের প্রভূত ক্ষতি করিয়া বসিত। স্বকীয় অভ্যাস ও অন্যদীয় নির্দ্দেশের অনুকরণ করিয়া চক্ষুঃ বুজিয়া সহজ ভাবে একাদিক্রমে কাজ করিয়া যাইবার শক্তি যদি মানুষের না থাকিত, তাহা হইলে প্রতিমুহূর্ত্তেই কোন বিশেষ কার্য্যের প্রতি মানুষের প্রবৃত্তি-নিয়োগের এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রবৃত্তি বিশেষের উপযোগিতা নির্দ্ধারণের আবশ্যক হইয়া পড়িত। এই নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কার্য্যসাধনের জন্যও এই তিনটি অনুপ্রেরণার একান্ত আবশ্যক। মনে কর কেহ একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতেছে। এমতাবস্থায় প্রথমতঃ বোধ-শক্তি তাহাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ যুক্তি এই প্রবৃত্তিকে অনুমোদন করিয়া ইহার সাধনের নিমিত্ত উপায় প্রদর্শন করিয়াছে (যেমন একটি বিশেষ রাস্তায় পদক্ষেপ করা); তৃতীয়তঃ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ এই উপায়ের অনুসরণ করিতেছে; এবং এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার ফলে মানুষ নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতে পারিতেছে। যতক্ষণ সে গমনকার্য্যে নিযুক্ত আছে ততক্ষণ তাহার বোধ-শক্তি ও যুক্তি অন্যকার্য্যে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত বিরাম লাভ করিতেছে। অভ্যাসকে সহজ ভাবে অনুগমন করিয়া চলিবার ক্ষমতা মানুষের না থাকিলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না। সমস্ত জীবনব্যাপারেই এইরূপ ঘটে, এবং অপর সকল ব্যাপারের ন্যায় মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারেও এইরূপ ঘটে। প্রথমতঃ বোধ-শক্তি ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা জাগাইয়া তুলে; দ্বিতীয়তঃ যুক্তি সেই সম্বন্ধের লক্ষ্য ও প্রসার নির্দ্দিষ্ট করে; এবং তৃতীয়তঃ পন্থাবিশেষের অনুগমন করিয়া একাদিক্রমে কাজ করিয়া যাইবার শক্তি এই সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্য্যের দিকে মানুষের গতি নিয়োগ করে। যতদিন ধর্ম্ম অনাবিল থাকে, ততদিন এইরূপই চলে। যখনই ধর্ম্মে আবিলতা আরম্ভ হয়, তখনই অভ্যাসগত অনুগমনের দ্বারা ধর্ম্মক্রিয়ার যে অংশটুকু সম্পন্ন হয় তাহা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে বর্দ্ধিততর হইতে থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বোধ-শক্তি ও বিবেচনা-শক্তির দ্বারা কার্য্যের যে অংশ সম্পন্ন হয় তাহা ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়ে। যে যে প্রণালীর সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধনের অযত্নসঞ্চিত সহজ প্রবণতা মানুষ লাভ করে, তাহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র একই প্রকারের। জীবনের যে যে সময়ে অতি সহজে মানস-ক্ষেত্রে অভ্যাসের বীজ উপ্ত হইতে পারে, সেই সেই সময়ের সুবিধা লইয়া এই সকল প্রণালী প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন শিশুকাল, এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময়—যথা মৃত্যু, জন্ম, বিবাহ। ইহা ভিন্ন কলাবিদ্যা সমূহের সাহায্যেও বিশেষ বিশেষ অভ্যাসের দিকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়; ইহার মধ্যে ভাস্কর-বিদ্যা, স্থপতি-বিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা এবং নাটকাভিনয় প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশেষে যে যে অবস্থায় মানবমন এরূপ কোমল, তরল ও নমনীয় হইয়া পড়ে যে অতি সহজেই সমস্ত বিষয় আয়ত্ত হইয়া যায়, সেই সেই অবস্থার সাহায্য লইয়াও যে ভাবে সম্মোহনক্রিয়াবলে মানুষের দ্বারা যথাভিলাস কার্য্য সাধন করিয়া লওয়া যায় সেই ভাবে, পরিচালক স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী যে কোন শিক্ষায় মানুষকে দীক্ষিত করিয়া লয়েন।

এই প্রক্রিয়া যাবতীয় প্রাচীন ধর্ম্মেই পরিদৃষ্ট হয়। এই উপায়েই অতি উন্নত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কালে অসংখ্য মন্দিরে ছত্রিশকোটি মূর্ত্তির সংকীর্ত্তন ও ধূপ-ধুনা প্রজ্বলনোত্থিত ধূম্রদান সহকারে পূজা-উৎসব-সংবলিত জঘন্য পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়। এই প্রকারেই তত্ত্ববাহকদের প্রচারিত প্রাচীন হিব্রুধর্ম্ম কালে চিত্তরঞ্জন বিচিত্র শোভাসম্পদপূর্ণ মন্দিরে সঙ্গীত ও লোকসমারোহের বাহ্যা-ড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত ঈশ্বরারাধনায় পরিণত হয়। এই পদ্ধতিতেই উন্নত ধরণের বৌদ্ধধর্ম্ম পরিবর্ত্তন-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে বৌদ্ধমঠ, বুদ্ধমূর্ত্তি ও ধর্ম্মের অসংখ্য ঘটাপূর্ণ উৎসবকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে করিতে অবশেষে কূলশূন্য লামাধর্ম্মের স্রোতে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই কারণেই তও-ধর্ম্ম (Taoism) পরিশেষে কুহকবিদ্যা ও মন্ত্রতন্ত্রের গভীর আবর্ত্তনে নিপতিত হইয়াছে।

সর্ব্বদাই—সমস্ত ধর্ম্মশিক্ষারই অধঃপতনের সময় দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মগুরুগণ মানুষকে কালক্রমে বিচারশক্তির ক্ষীণাবস্থাপূর্ণ এক ভীষণ অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। মানুষের এই অবস্থার সুবিধা লইয়া ধর্ম্মগুরুগণ তাহাদের উদ্দেশ্যপরিপূরক যে কোন মত বা শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ প্রভাবে সার্ব্বজনীন বিশ্বাস-উৎপাদনে সফলপ্রযত্ন হইয়াছে। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ধর্ম্মেরই অধঃপতন তিনটি মূল কারণ আশ্রয় করিয়া সম্ভব হইয়াছে,—যেন অধোগামী ধর্ম্মের সমস্ত কদাচার কদভ্যাসের ভিত্তি এই তিনটি মূল কারণ-সমবায়েই গঠিত। প্রথমতঃ মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে, এরূপ এক বিশেষ শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা কেবলমাত্র মানুষ ও ঈশ্বরের

মধ্যে মধ্যবর্ত্তিতা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ এই সকল মধ্যবর্ত্তিগণ যে সকল উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন, তৎসমূহের সত্যতা প্রমাণ ও দৃঢ় করিতে যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইয়াছিল তাহা যে সত্য, এরূপ বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়; এবং এখনও নূতন অলৌকিক কার্য্যকলাপ প্রদর্শনপূর্ব্বক উহার পোষকতা করা হয়। তৃতীয়তঃ মানুষের মনে এরূপ সংস্কার উৎপন্ন করিয়া দেওয়া হয় যে, ঈশ্বর বা দেবগণের অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা প্রকাশক মুখে-মুখে প্রচলিত বা পুস্তকলিখিত এরূপ কতকগুলি পবিত্র সনাতন বচন আছে, যাহা মানুষের পক্ষে অলঙ্ঘ্য। যে মুহূর্ত্তে সম্মোহন-শক্তির প্রভাব বশতঃ এই বিষয় তিনটিতে মানুষ আস্থা স্থাপন করে, সেই মুহূর্ত্তেই এই মধ্যবর্ত্তি-গণ যে সমস্ত কথা বলেন তাহাও পবিত্র সত্য বলিয়া মানুষের বিশ্বাস জন্মে। এবং এইরূপে সমস্ত মানুষের সমতারূপ সনাতন বিধির বিলোপসাধন করিয়া ধর্ম্মের অধঃপতন সাধনের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হয়। শুধু সমতার বিলোপসাধন নয়, মানুষের মধ্যে খুব বড় রকমের অসমান অধিকারের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন জাতিতে জাতিতে বিভেদস্থাপন করা হয়, মানুষের মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরের মনোনীত শ্রেণীতে কাহাকেও অমনোনীত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তখন একদলকে ধর্ম্মপ্রাণ আখ্যা দেওয়া হয় এবং অপর দলকে ধর্ম্ম-দ্রোহী বলা হয়। একদলকে সাধুপুরুষ ও অপর দলকে পাপাত্মা আখ্যা প্রদান করা হয়। ইহাই বর্ত্তমান খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। মানবজাতির মধ্যে পূর্ণ অসমতা যেন স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষা বুঝিবার ক্ষমতা-ভেদে যাজক ও বৈষয়িকগণের মধ্যেই যে শুধু প্রভেদস্থাপন করা হইয়াছে তাহা নহে, সামাজিক পদগৌরব অনুসারেও এরূপ বিভাগ করা হইয়াছে যে একদলকে সকল ক্ষমতাময় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং অপর দলকে পূর্ব্বোক্ত দলের ক্ষমতাধীন হইয়া চলা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শেষোক্ত বিভাগটিকে পলের (St. Paul) শিক্ষানুসারে ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

নবীনওয়াজ খান।

জেব-উন্নেসা বেগম।

অদ্য কোহিনূরের পাঠক পাঠিকাগণকে যে মহামনস্বিনী মহিলাকুলশিরোমণি, মোগলকুল-সৌদামিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার কবিত্বশক্তি তৎকালীন কবি-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই বিদুষী মহিলারত্নের সম্মোহন বীণার ঝঙ্কারে মহারাজাধিরাজের সুরম্যহর্ম্ম্য হইতে দীনহীনের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জেব-উন্নেসার কবিতা-নির্ঝরিণীর উৎসারিত ভাব-সুধা পানে বিভোর হইয়া পারস্য-সম্রাট তাঁহাকে "তুতিয়ে হিন্দ" বা "হিন্দুস্থানের তুতি" এই উপাধি-ভূষণে ভূষিত করত তাঁহার পিতার লেখনীপ্রসূত কাঞ্চনমসিতে লিখিত মওলানা জালালউদ্দিন রুমীর পারস্য কাব্য "মস্‌নবী শরীফ" ও রজতমসিতে লিখিত আর একখানি "দেওয়ান হাফেজ" এবং আরও কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ এবং বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতুল কবিত্বপ্রতিভা ভারত ও পারস্যের যাবতীয় কবিসম্প্রদায়কে হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছিল। স্ত্রী জাতির মধ্যে ভারতে তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্না অদ্বিতীয়া বিদুষী মহিলা আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচিত কাব্য গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক স্তুত্রে, প্রত্যেক ছত্রে, প্রত্যেক কবিতায়, প্রত্যেক শব্দে ও প্রত্যেক অক্ষরে নবরঙ্গের সংমিশ্রণ এবং গভীর ভাবের বিকাশ ও জলন্ত শক্তি প্রতিভাত।

ইনি যে শুধু সাহিত্য-চর্চ্চাতেই কালাতিপাত করিতেন তাহা নহে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অতি উচ্চপদে সমাসীন থাকিয়া সেই চিন্তায় মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেন। রাজনৈতিক জ্ঞান তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, সম্রাট আলমগীরও সময় সময় তাঁহার ভয় করিতেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেন। মোগল-অন্তঃপুরের বা বেগমমহলের শাসনভার জেব-উন্নেসার হস্তে ন্যস্ত ছিল। দুর্গাভ্যন্তরের সমস্ত বিচারকার্য্যও তাঁহাকেই সম্পন্ন করিতে হইত এবং সকলেই সুবিচার প্রাপ্ত হইত। মুসলমানগণ তাঁহাকে "মাদারে মেহেরবান" অর্থাৎ "দয়াবতী জননী" এবং হিন্দুগণ "দয়াময়ী বেগম" নামে সম্বোধন করিত। দয়াদাক্ষিণ্যেও তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন।

সাহিত্য-চর্চ্চায় জেব-উন্নেসা যে তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার শত্রুগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

কুলমহিলা হইয়া তিনি রাজভাষা পারশীতে যে প্রকার অগাধ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, ভারতীয় কবিবৃন্দের মধ্যে কবিসম্রাট আমির খসরু ও পারস্যের কবিগণের মধ্যে মহাকবি সাদি ও হাফেজ ব্যতীত অন্য কাহারও ভাগ্যে তদ্রূপ ঘটে নাই। তাঁহার এক একটি কবিতার ভাব এবং ভাষা এমনই সরস ও কলাময় যে তাহার ভাবোদ্ধার করিতে বড় বড় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরও মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃত ভাবোদ্ধার হইলে আবার অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত হয়। তাঁহার অমৃতবর্ষিণী কবিতামালা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইতে হয় এবং একটির পর আর একটি—যেন আরও অধিকতর রসমাধুর্য্য ও ভাবপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহার রচিত "দেওয়ান মখ্ফী" নামক কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতে বসিলে মনে হয় যেন প্রত্যেকটি কবিতায় এক একজন ভানুমতি তাহার যাদুর ভাণ্ডার খুলিয়া পাঠক পাঠিকার চর্ম্মচক্ষে ভেল্কা লাগাইয়া দিতেছে।

জেব-উন্নেসার রচিত সর্ব্বপ্রধান কাব্য 'চরখে গর্দ্দ' অর্থাৎ 'ঘূর্ণায়মান আকাশ' আজ কাল পাওয়া যায় না। কারণ সেই কাব্যখানি দারা, মোরাদ ও আওরঙ্গজেবের যুদ্ধবৃত্তান্ত, শাজাহানের কারাবাস এবং তদীয় স্বামী সোলেমান শেকুর বৃত্তান্তে পূর্ণ ছিল। মনের আবেগে ন্যায়ের তুলিকা সাহায্যে তিনি সত্যের এমনই হৃদয়বিদারক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন যে তাহা পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। কিন্তু কাব্যখানিতে আওরঙ্গজেবের অসন্তোষজনক বিষয় থাকায় উহা বাজেয়াপ্ত ও দগ্ধীভূত হয় এবং জেব-উন্নেসা কারারুদ্ধ হন। কেবল যে একখানি গ্রন্থ পারস্য-সম্রাটকে প্রেরণ করা হইয়াছিল সেইখানি বর্ত্তমান ছিল। তাহা হইতে আজকাল পারশ্য দেশীয় লিথোতে মুদ্রিত গ্রন্থ দুই একখানি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একখানি আকবর আবাদ নিবাসী মৌলবী হাসান আলী সাহেবের নিকট আছে। আর একখানি মিঃ মুর আফগানিস্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর একখানি গ্রন্থের কতকাংশ পঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।* গ্রন্থখানি ফেরদৌসির শাহানামার অনুকরণে রচিত। জেব-উন্নেসার রচিত আর একখানি কাব্যের নাম "পাদশা-নামা", কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

জেব-উন্নেসা শেষকালে একরূপ সংসারবিরাগিনী তপস্বিনীর ন্যায় হইয়া-

---

* এই গ্রন্থের একখানি পারস্যের প্রেসে মুদ্রিত আমার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা আমার বগুড়ার বাড়ী লুণ্ঠিত হইবার সময় অপহৃত হইয়াছে। (লেখক।)

ছিলেন। অন্যায় কারাবাসে তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়াছিল। পাপতাপ-ময় সংসারের স্বার্থপরতা দর্শনে তাঁহার হৃদয়-উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। 'দেওয়ান মখ্‌ফীর' ছত্রে ছত্রে সেই ভাব প্রকটমান। একস্থানে আছে,—

"দোখ্‌তরে শাহাম অলেকেন রো ব-ফকুর আওর্দ্দা আম।
জেব ও জিনাত বস্‌ হামিনম নামে মন জেবুন্নেসা আস্ত॥

"আমি সম্রাট তনয়া, কিন্তু দীনহীন ভাব অবলম্বন করিয়াছি। বেশভূষা এইই যথেষ্ট, যেহেতু আমার নাম জেব-উন্‌-নেসা অর্থাৎ রমণীকুলের সৌন্দর্য্য-দায়িনী।"

সম্রাট মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগীরের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন। জেব-উন্নেসা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল জিবিন্দান্নেসা; পরে নাম হয় জেব-উন্নেসা। জেব-উন্নেসা বেগম ১০৪৮ হিজরীর ১০ই শওয়াল তারিখ শুক্রবার রাত্রি সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময় জন্মগ্রহণ করেন। মোগল বাদশাহ্‌গণের নিয়মানুসারে জেব-উন্নেসা শৈশবে উচ্চবংশীয়া কয়েকজন সুশিক্ষিতা মহিলার তত্ত্বাবধানে মিয়াবাই নাম্নী ধাত্রীর দুগ্ধপান করিয়া অতি যত্নের সহিত লালিত পালিত হন। তাঁহার তিন বৎসর বয়সের সময় যখন মিয়াবাই উপাসনা অন্তে পবিত্র কোরান পাঠ করিতেন, তখন এই ক্ষুদ্র বালিকা যেন সংসার ভুলিয়া তাহাই নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিতেন—শিশুসুলভ ক্রন্দন বা অন্য কোনরূপ উৎপাত না করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। তদ্দর্শনে এই বালিকার ভবিষ্যৎজীবন অতি মঙ্গলজনক বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছিল এবং আলমগীরও এই সুলক্ষণা কন্যা-রত্নের সুশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

জেব-উন্নেসার বয়স যখন চারি বৎসর তিন মাস, তখন সম্রাটপরিবারের স্থায়ী শিক্ষক মোল্লা জিউন সাহেবের নিকট তাঁহার প্রাথমিক বর্ণমালা শিক্ষা আরম্ভ হয়। এবং দুই বৎসর তিন মাস মধ্যে তিনি পবিত্রগ্রন্থ কোরান শরীফ পাঠ শেষ করেন। আট বৎসর কয়েক মাস বয়ঃক্রমের সময় জেব-উন্নেসা সমগ্র কোরান শরীফ কণ্ঠস্থ করিয়া "হাফেজ" উপাধি লাভ করেন। ইহাতে সম্রাট আলমগীর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিংশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা শিক্ষার্থী ছাত্র ও দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করেন। অধিকন্তু এরূপ অল্পবয়স্কা বালিকার অতুল প্রতিভা প্রদর্শন ও বিঘোষিত করিবার নিমিত্ত সম্রাট প্রফুল্লান্তকরণে সমগ্র ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, স্বাধীন ও অধীন রাজা-মহারাজা, নবাব এবং আমীর-

গণকে এক দরবারে আহ্বান করিয়া জেব-উন্নেসার কোরান শরীফ কণ্ঠস্থ করার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। চতুর্দ্দিকে বালিকা জেব-উন্নেসার ধন্য ধন্য জয় জয়কার পড়িয়া যায়।

অতঃপর আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভার্থ জেব-উন্নেসাকে সালেহ শাহ্ রুস্তম গাজীর পুত্র মোল্লা সাইদ আশরাফ সাহেবের নিকট অর্পণ করা হয়। তৎকালে মহাত্মা সাইদ আশরাফ সাহেব আরব্য ও পারস্য ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই এই অমূল্য কন্যারত্ন আরবী ও পারসী ভাষায় অগাধ জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

জেব-উন্নেসার কোরান পাঠের লালিত্য ও মাধুর্য্য অতি চমৎকার ছিল। যখন তিনি পবিত্র কোরান শরীফ পাঠ করিতেন, তখন নিতান্ত নির্ম্মম ও পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও নয়নদ্বয় অশ্রুষিক্ত হইয়া যাইত।

পারসী ভাষায় কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভের পর হইতেই সম্রাট তনয়া পদের মিল (Rhymed) সংযুক্ত কথা বলিতেন। যখন পারসী ভাষায় পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইল, তখন জেব-উন্নেসা গোপনে গোপনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। শিক্ষকের ভয়ে চুপে চুপে রচনা করিতেন এবং নিজেই পাঠ করিয়া সুখী হইতেন ; অন্য কাহাকেও দেখাইতেন না। একদা কোন ক্রমে সেই পুস্তকখানি তদীয় শিক্ষকের হস্তগত হয়। তিনি উহা পাঠ করিয়া জেব-উন্নেসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জেব! এই হস্তাক্ষর কি তোমার নয়?"

জেব-উন্নেসা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া লজ্জিত ভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ কেবলা (মহাশয়)! ইহা আমারই হাতের লেখা।"

শিক্ষক—এ যে নূতন কবিতা দেখিতেছি, কোন্ কেতাব হইতে নকল করিয়াছ?

জেব—কোন কেতাব হইতে নকল করি নাই।

শিক্ষক—তাইত, তবে কি তুমিই এরূপ উৎকৃষ্ট রচনা করিতে শিখিয়াছ?

জেব—হাঁ, হজরত! এ বাঁদীই ইহা রচনা করিয়াছে।

শিক্ষক বলিলেন, "জেব! আমার চক্ষের পুত্তলি! তোমার ন্যায় অতুল প্রতিভাময়ী ছাত্রীর শিক্ষক হইয়া আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। তুমি এখন হইতে নির্ভয়ে স্বাধীন ভাবে কবিতা রচনা করিতে থাক। আমি সাধ্যানুসারে তোমার সাহায্য করিব। এ রচনা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।"

সেইদিন হইতে জেব-উন্নেসার সাহস ও উৎসাহ চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল এবং নিত্য নূতন রচনা করিয়া শিক্ষক সমীপে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র।

সম্রাট তনয়াকে কাব্যরচনার প্রতি অনুরাগিনী ও কবিত্বশক্তি লাভের যোগ্যা দর্শন করিয়া তদীয় সহৃদয় শিক্ষক তাঁহাকে কোন উপযুক্ত কবির অধীনে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সম্রাটকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। সমগ্র হিন্দুস্থান অনুসন্ধান করিয়া মীর নাসের আলী-সার-হিন্দকে আনয়ন করা হইল। তিনি তৎকালে একজন সুপ্রসিদ্ধ ও অসীম প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় ভাবুককবি ছিলেন। কিন্তু আগ্রায় আসিয়া জেব-উন্নেসার কবিতাবলী পাঠ করিয়া তিনি মত প্রকাশ করিলেন "আমার সমগ্র কাব্য জেব-উন্নেসার একটি মাত্র কবিতার পরিবর্ত্তে উৎসর্গ করিতে পারি। আমি এ অগাধ প্রতিভাসম্পন্ন কবিত্বশক্তিশালিনী মহিলার শিক্ষক হইব কিরূপে? বরং তাঁহার ছাত্র হইতে পারি।" সম্রাট আলমগীর ভারতবর্ষ ও পারশ্য হইতে বহু কবিকেই জেব-উন্নেসার শিক্ষকতা করিবার জন্য আনয়ন করিলেন; কিন্তু সকলেই জেব-উন্নেসার অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার নিকট হীনপ্রভ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। সমগ্র ভারতে আর জেব-উন্নেসার শিক্ষক জুটিল না। ক্রমশঃ।

নুরুল হোসেন কাশীমপুরী।

প্রার্থনা।

জগদীশ, চাহ তুমি আজ আঁখি তুলি'
পদতলে তব অসহায় শিশুগুলি
কাঁদিছে কাতরে তব করুণা যাচিয়া,—
শত ঘৃণা অপমান সহি' বারবার
ভেঙে গেছে সবাকার সুকোমল হিয়া,
শীতল সলিল-আশে জলদে সেবিয়া
ধরিয়াছে বুকে হায়, অশনি অপার!
কৃপাময়, কৃপা-কণা আজি বিতরিয়া
মুছাও সবার আঁখি, দাও জনে জনে
অমর-মিলন ভবে, বুক ভরা বল;—
তারা যেন মৃত হয়ে রহে না ভুবনে,
পূজি' শুধু তব দেব, চরণ-কমল
তারা যেন ফিরে পায় নূতন পরাণ
তোমারি জগত মাঝে গৌরবে মহান্।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৯। [৪র্থ সংখ্যা।

ইঙ্গিত।

তোমারে পূজিতে দেবী, অর্ঘ্য হাতে যবে
একাকী বাহিরি আসি ঊষা-স্নিগ্ধ ভবে
তোমারি মন্দির দ্বারে, চৌদিক মুখরি
দিশে দিশে বিলাইয়া সুস্বর-লহরী
নব জাগরিত কত বিহঙ্গনিকর
গেয়ে উঠে সুধা-কণ্ঠে মোহি চরাচর
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে কলি, বহে সমীরণ
মৃদু মন্দ—কি আনন্দে করিয়া লুণ্ঠন
প্রতি চুম্বনেতে তার ফুল্ল পরিমল!—
নিশির শিশির ঝরে শ্যাম তৃণদল
আর্দ্র করি স্নেহ ভরে, সবাই ইঙ্গিতে
তোমারে জানায় যেন অয়ি শুচিস্মিতে,
প্রাণের অঞ্জলি মোর অর্পিতে ও পায়
আমি আসিয়াছি—আমি আসিয়াছি হায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

কোরান শরীফের নীতি।

কোরান শরীফের বিধিসমূহ দুইভাগে বিভক্ত। (১) আন্তরিক কর্ত্তব্য; ইহাকে ইমান বা ধর্ম্মবিশ্বাস বলে। (২) শারীরিক কর্ত্তব্য—যাহা হস্ত পদাদির দ্বারা সাধ্য। ইহাকে 'আমল সালেহ্' বা সৎকর্ম্ম বলে। কার্য্যের সংকল্প ইহার অন্তর্গত। সংকল্প মানসিক কার্য্য হইলেও তাহাতে বাহ্য কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য বিদ্যমান্ আছে। আমাদের সৎকর্ম্মগুলিকে দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ স্রষ্টৃ সম্পর্কীয়—উপাসনা, উপবাস ইত্যাদি; ইহার সাধারণ নাম ধর্ম্মকর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি সম্পর্কীয়—ইহার নাম নীতি। নীতি পাঁচ প্রকার,—আত্ম-সম্পর্কীয়, আত্মীয়সম্পর্কীয়, শত্রুসম্পর্কীয়, সাধারণসম্পর্কীয় ও ইতরজন্তু সম্পর্কীয়।

মুসলমান, খৃষ্টান, য়াহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মের বিভিন্নতা ও ধর্ম্মবিশ্বাস ধর্ম্মকর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ হইয়া থাকে, নীতির পার্থক্য বশতঃ নহে। এমন কি এক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে নৈতিক আচরণের বিভিন্নতা এমন কি সম্পূর্ণ অভাবও থাকিতে পারে। অতএব ধর্ম্মবিশ্বাসও ধর্ম্মকর্ম্মকে সাধারণতঃ ধর্ম্ম (Religion) নামে অভিহিত করা হয়।

[ধর্ম্ম ও নীতির সম্পর্ক]

ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে সাধারণতঃ ধর্ম্মেরই প্রাধান্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহা ন্যায্য বটে। ধর্ম্মাচরণদ্বারা নৈতিক জীবন লাভ হয় এবং নীতির ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত না হইলে স্থায়ী হয় না। নীতিশূন্য ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে।

[ধর্ম্মবিশ্বাস ও সৎকর্ম্মের সম্পর্ক]

ধর্ম্মবিশ্বাস ও সৎকর্ম্ম—বিধিসমষ্টির এই দ্বিধা বিভাগ কেবল সুবিধার জন্য। নচেৎ বিধি মাত্রেই আল্লার উদ্দেশ্যে। কোরান শরীফে ধর্ম্মবিশ্বাস ও সৎকর্ম্মের সম্পর্ক অতি উত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিয়াছে, ফিরদৌস স্বর্গে তাহাদের আতিথ্য হইবে" (সুরা কহফ, শেষ রুকু)। "নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিয়াছে" এইরূপ উক্তি প্রশংসিত কোরানে পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্যের শুভ পরিণাম উক্ত হইয়াছে। কোরান শরীফের সুরা কহফে আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন, "অনন্তর যে ব্যক্তি খোদা-দর্শনের অভিলাষী, সে যেন

শুভকার্য্য করে এবং আল্লার সেবায় কাহাকেও অংশী না করে।" (কহফ, শেষরুকু)। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে ধর্ম্ম বিশ্বাস দ্বারা আমাদের কর্ম্ম নিরূপিত হয়। পবিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস সৎকর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ। যদি জগৎস্রষ্টাকে আমরা নিষ্ঠুর, কামুক, প্রবঞ্চক বলিয়া বিশ্বাস করি কিম্বা আমরা আল্লা বা পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকার করি, তবে আমাদের বিশ্বাস নিশ্চয়ই আমাদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। কোন ব্যক্তিবিশেষ নাস্তিক হইয়াও যে চরিত্রবান্ হয়, তাহার কারণ এই যে তাহার আস্তিক পূর্ব্বপুরুষগণের প্রবণতা (Tendency) তাহাতে বর্ত্তমান আছে এবং আস্তিক সমাজের প্রভাব তখনও তাহার উপর প্রবল। কিন্তু সমগ্র সমাজ কি সমগ্র দেশ নাস্তিক হইলে সামজিক প্রভাবের অভাব হয় এবং নাস্তিকতার কয়েক পুরুষ পরে আস্তিক পূর্ব্বপুরুষদিগের নীতিপ্রবণতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। তখন সেই নাস্তিক-সমাজে ঘোরতর চরিত্রহীনতা উপস্থিত হয়। উত্তম ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর নীতির ভিত্তি স্থাপিত বলিয়া কোরান শরীফে ধর্ম্মবিশ্বাস বা ইমানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হইয়াছে। "এবং যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছে তাহাদের কর্ম্ম সকল, পিপাসু যাহাকে জল মনে করে সেই প্রান্তরের মৃগতৃষ্ণার ন্যায় ; এ পর্য্যন্ত যখন সে তাহার নিকট উপস্থিত হয় কিছুই প্রাপ্ত হয় না, এবং আল্লাকে আপনার নিকটে (শাস্তিদাতৃরূপে) প্রাপ্ত হয় ; অনন্তর আল্লাহ্ তাহার হিসাব (বিচার) পূর্ণ করেন, এবং আল্লাহ্ হিসাবে সত্বর।" (সুরা নূর, ৫।৩৯) কিন্তু সৎকর্ম্ম ব্যতিরেকে ধর্ম্মবিশ্বাস যে কেবল কপটতা কোরান শরীফে তাহাও উক্ত হইয়াছে। যথা—"কি ? লোক কি মনে করে 'আমরা বিশ্বাস করিয়াছি' বলিলেই তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইবে এবং তাহারা পরীক্ষিত হইবে না ?" (সুরা অনকবূত, ১ রুকু ২য় আয়ত)।

কোরান শরীফে ঈশ্বর-তত্ত্ব যেরূপ শিক্ষা দেয়, কোন দার্শনিক তদপেক্ষা উত্তমরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইতে পারিবেন না। যাহা হউক ইহা আমার প্রবন্ধের বিষয় নহে। কোরান শরীফ যে ধর্ম্মবিশ্বাস শিক্ষা দেয়, তাহা নৈতিক জীবন গঠনে কিরূপ সাহায্য করে, এস্থলে তাহাই আলোচ্য। আল্লাহ্‌কে কোরান শরীফে দয়াময় (রহমান), প্রেমিক (অদুদ), পবিত্রতম (কুদ্দূস), শান্তিদাতা (সালা'ম) অভয়দাতা (মোমেন), ন্যায় বিচারক ('আদেল), ক্ষমাকারী (গফূর), দাতা (ওহ্‌হাব), রক্ষক

[ধর্ম্ম বিশ্বাস।]

(হাফিজ), সহিষ্ণু (হালীম), কৃতজ্ঞ (শকূর), ন্যায়পরায়ণ (বর) প্রভৃতি উত্তম নাম দেওয়া হইয়াছে। হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লার গুণে গুণান্বিত হও।" অন্যান্য ধর্ম্মের আদর্শ মনুষ্য, কিন্তু ইস্‌লামের আদর্শ স্বয়ং পূর্ণ ভগবান্। সেই আদর্শকে অনুকরণ করিতে হইলে একজন শিক্ষকের অনুসরণ কর্ত্তব্য। সেই শিক্ষক হজরত মোহাম্মদ। কোরান শরীফে উক্ত হইয়াছে "হে মোহাম্মদ, তুমি (লোকদিগকে) বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে প্রেম কর, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রেম করিবেন এবং তোমাদের অসম্পূর্ণতা দূর করিবেন। নিশ্চয় তিনি ত্রুটি মার্জ্জনাকারী ও দয়ালু।"

কোরান শরীফে যেমন একদিকে উক্ত হইয়াছে আল্লাহ্ 'দয়াময়' (রহমান্) 'দয়ালুদিগের অপেক্ষা দয়ালু, (আর্‌হামুর্ রাহিমীন), 'তিনি আপনাতে দয়া লিখিয়াছেন'; "আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিবিষ্ট"; "যখন আর্ত্তব্যক্তি আহ্বান করে, তখন আল্লাহ্ ভিন্ন কে শুনিয়া থাকে এবং দুঃখ দুর করিয়া থাকে" ইত্যাদি—তেমনই আবার অন্যদিকে আল্লাহ্‌কে পরাক্রান্ত (আজীজ), বিজয়ী (কাহ্‌হার), প্রতিশোধদাতা (মুন্‌তাকীম) "আল্লাহ্‌কে ভয় করিও, জানিও তিনি মহাশাস্তিদাতা" (বকর, ২৪।১৯৬) ইত্যাদিও কথিত হইয়াছে। শান্ত ও রৌদ্রগুণের সমাবেশে আল্লাহ্ কোমল কঠোর। আল্লার উক্তি।--"আমার দাসদিগকে সংবাদ দান কর যে আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু এবং আমার [যাহা] শাস্তি তাহা দুঃখজনক শাস্তি।" (হেজর, ৪।৫০)। এই আশা ও ভয় সৎকর্ম্মের উত্তেজক।

মৃত্যুঅন্তে আল্লার নিকটে আমাদের কৃতকার্য্যের হিসাব নিকাস দিতে হইবে এবং কর্ম্মফল অনুযায়ী অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক জগতে আল্লার নিকট ছিলাম, পরে তথা হইতে কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে আসিয়াছি। পরে তাঁহার দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পার্থিব জীবন একবার মাত্র। এই জীবন হারাইলে চিরকাল অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। এই বিশ্বাস—এই তীব্র অনন্ত জাগ্রত বিশ্বাস—আমাদিগকে জীবনের দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করিবার কিছুমাত্র অবসর দেয় না। সুতরাং ইহা পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস অপেক্ষা সৎকর্ম্মের অধিক প্রবর্ত্তক। মনে করুন একটি মাত্র পরীক্ষা আছে। তাহার ফল অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখ। এ ক্ষেত্রে আমরা এই একমাত্র

পরীক্ষার প্রতিই বেশী মনোযোগী হইব, না যেখানে অসংখ্য পরীক্ষাদানের অধিকার এবং তাহার ফল দু'দিনের সুখ বা দু'দিনের দুঃখ তৎপ্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করিব? আল্লাহ্ বলিতেছেন "তোমরা কি মনে কর যে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তোমরা আমার দিকে ফিরিয়া আসিবেনা?" অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—"পাপিগণ নরকে চীৎকার করিয়া বলিবে, প্রভু আমাদের, ইহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। যেমন কর্ম্ম করিতেছিলাম তাহা আর করিব না। আমরা এবার সৎকর্ম্ম করিব। (আল্লা বলিবেন) তোমাদিগকে কি এমন আয়ু দেই নাই যে উপদেশ লইতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে উপদেশ লইতে পারিতে? এবং তোমাদের প্রতি সতর্ককারী উপস্থিত হইয়াছিল।" (সুরা ফাতের, ৪।৩৭)। "যে ব্যক্তি অণুপ্রমাণ সৎকর্ম্ম করিবে, সে তাহা দেখিবে এবং যে ব্যক্তি অণুপ্রমাণ দুষ্কর্ম্ম করিবে, সেও তাহা দেখিবে।" (সুরা জেলজাল)।

কোরান শরীফ আল্লার সান্নিধ্য শিক্ষা দেয় এবং আরও শিক্ষা দেয় যে কেরামন্ কাতেবিন নামক দুই স্বর্গীয় দূত সর্ব্বদা মানুষের সঙ্গে থাকিয়া তাহার সদসৎ কর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতেছে। এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে থাকিলে আমরা কিরূপে অন্যায়াচরণ করিতে পারি? আল্লাহ্ বলিতেছেন "সত্য আমি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমি জানি তাহার মন তাহাকে কি পরামর্শ দেয়। আমি যে তাহার প্রাণবাহিনী শিরা অপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী। (স্মরণ কর) যখন দুই উপবিষ্ট গ্রহণকারী (স্বর্গীয় দূত) দক্ষিণ ও বাম হইতে (বাক্যাদি) গ্রহণ করিতে থাকে। মনুষ্য কখন এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করে না যে [তাহা লিপিবদ্ধ করিতে] তাহার নিকট সতর্ক রক্ষক থাকে না।" (কাফ, ২।১৬-১৭)।

কোরান শরীফ মানুষকে আল্লার অংশ বলে না। এমন কি হজরত মোহাম্মদকেও আদেশ করা হইয়াছে "বল, আমি তোমাদের মত মনুষ্য।" কোরানে ঈশা মসীহকে মনুষ্য কিন্তু পয়গম্বর (আল্লাহ্ প্রেরিত মহাপুরুষ) বলা হইয়াছে। কোরান অনুযায়ী মানুষ পৃথিবীতে আল্লার প্রতিনিধি এবং স্বর্গীয় দূত অপেক্ষা তাহার আসন উচ্চ। মানবাত্মা পরমাত্মার অংশ নহে, কিন্তু তাহা হইতে সম্ভূত। মানুষের জন্য সমস্ত জগৎ কিন্তু মানুষ আল্লার জন্য। মানব জন্মানুসারে পবিত্র কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা তাহার আত্মা

মলিন হয়। এই শিক্ষা মানুষের মনে আত্মমর্য্যাদা জাগ্রত করিয়া তুলে। আত্মসম্মানবোধ যে অনেক পরিমাণে পাপের প্রতিরোধক ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

ক্রমশঃ।

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্।

আরবজাতির ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমিন ও মামুনের চরিত্র।

যে ভ্রাতৃযুগল শীঘ্রই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্রগত পার্থক্য অবগত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় এই স্থানে তাহা বিবৃত হইতেছে। উভয় ভ্রাতাই তৎসাময়িক শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমিন তাঁহার মাতা ও মাতুল ইসার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। জনৈক পারশিক মহিলা মামুনের গর্ভধারিণী ছিলেন। মামুনের বাল্যাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তিনি হতভাগ্য মন্ত্রী জাফরের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। উভয়ে এই প্রকারে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরিশ্রম সহকারে তৎকাল প্রচলিত আইন, হাদিস ও অলঙ্কার শাস্ত্রাদি শিক্ষা করেন। কিন্তু মামুন অতীব মনোযোগ সহকারে শিক্ষকগণের যাবতীয় শিক্ষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে আমিনের চঞ্চল ও আমোদপ্রিয় অন্তঃকরণে উহা আদৌ কার্য্যকরী হয় নাই।

বক্তৃতাশক্তি আরবকুমারগণের একটি প্রয়োজনীয় গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। উভয় ভ্রাতাই উহাতে সমক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু মামুন ব্যবহার এবং দর্শনশাস্ত্রেও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি পবিত্র কোরান কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং উহার উত্তম ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। খলিফা রশিদ পূর্ব্ব হইতেই ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রগত

পার্থক্য অবগত ছিলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের ভবিষ্যৎ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অতীব যত্নের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ স্বীয় মৃত্যুর পূর্ব্বে উহার ভাবী ফল দেখিতে পাইয়াছিলেন।

খোরাসানে খলিফা যে সৈন্যদল ও ধনাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল যেন উহা মামুনের অধিকারে থাকে; কারণ পূর্ব্বদেশীয় প্রদেশগুলি রক্ষার জন্য উহার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে আমিনও বাগ্‌দাদে বহুসংখ্যক সেনাদলের অধিকারী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আমিন তদীয় পিতার অনুশাসনপত্রের সর্ত্ত প্রতিপালন করিতে সম্মত ছিলেন না, তজ্জন্য তিনি খলিফার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খোরাসানের সৈন্যদিগকে গোপনে হস্তগত করার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করেন। কোষাধ্যক্ষ ফজল-বিন-রাবি খলিফা রশিদের মৃত্যু সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং জাফর বারমেকীর হত্যার পর তিনিই কার্য্যতঃ মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে আমিনের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহার (আমিনের) চরিত্রগত দুর্ব্বলতা অবগত ছিলেন বলিয়া তিনি (ফজল) স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে কার্য্যতঃ তিনি নিজেই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। খলিফা রশিদ খোরাসানের সৈন্যদলকে মামুনের নিকট বশ্যতার শপথ গ্রহণ করাইয়াছিলেন; ফজল-বিন-রাবি এক্ষণে তাহাদিগকে ঐ শপথ পরিত্যাগ করিতে সম্মত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি খোরাসানের সৈন্যদল ও ধনাদি সঙ্গে লইয়া আমিনের নিকট আগমন করায় আমিন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান এবং সৈন্যদিগকে অগ্রিম দুইবৎসরের বেতন প্রদান করেন।

ফজল-বিন-রাবি মামুনকে সৈন্যদল ও অর্থাদি হইতে বঞ্চিত করায় অধীনস্থ করদ রাজগণ যখন বিদ্রোহিতার ভাব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল তখন তিনি ভয়ানক বিপদে পতিত হন, কিন্তু কতিপয় দক্ষ পরামর্শদাতা কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি তেজস্বিতার সহিত ঐ সমস্ত প্রদেশের রাজগণ ও অধিবাসীদিগকে দমন করিতে মনোযোগ প্রদান করেন। তাঁহার এই বিপদের সময় পারশ্যবংশসম্ভূত ফজল-বিন-সহল নামক এক অতীব দক্ষ ব্যক্তি তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা রূপে

দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যুবক মামুনের উপর স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তারের বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রখ্যাতনামা হার ছামা এবং তাহের-বিন হোসায়েন (আলখুজেই) নামক এক উদীয়মান সৈনিক পুরুষ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। মামুন রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি উদার ও সস্নেহ ব্যবহার প্রদর্শন করত সাধারণ-করের পরিমাণ হ্রাস করেন। এইকারণে এবং অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যের জন্য তৎপ্রতি জন সাধারণের ভক্তি আকৃষ্ট হয় ও তাহারা সকলে 'স্বীয় ভগ্নীর সন্তানের ন্যায়' তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে; কিন্তু তিনি একাল পর্য্যন্ত তদীয় ভ্রাতা খলিফা আমিনের প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণ, রাজভক্ত ও তাঁহার হিতচিকীর্ষু ছিলেন।

যৎকালে মামুন তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশের শাসন শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সময় খলিফা আমিন তাঁহার শাসিত সাম্রাজ্যের দ্রুত ধ্বংস সাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অর্থলোলুপ অনিয়মিত বেতনার্থী সৈন্যদিগের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য তিনি রাজকীয় ধনাগার নিঃশেষিতপ্রায় করিয়া ছিলেন। এই সৈন্যদলকে যতই অর্থরাশি প্রদান করা হইত, ততই তাহারা জলৌকার রক্তশোষণ প্রকৃতির ন্যায় আরও অর্থের জন্য খলিফাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। ঐন্দ্রজালিক, বিদূষক এবং দৈবজ্ঞ দিগকে রাজ্যের সকল স্থান হইতে আহ্বান করা হইয়াছিল। অনুপম সুন্দরী নর্ত্তকীদল, প্রখ্যাত নামা গায়িকা অথবা বাইজান টাইন রীতির অনুকরণে খোজা ভৃত্যদের নিয়োগে অপরিমিত অর্থের অপচয় হইতেছিল। এই সময় এই বাইজান টাইন সাম্রাজ্যে এই খোজা ভৃত্যের বহুল প্রচলন হইয়াছিল এবং তথাকার অভিজাতবর্গ তাহাদিগকে যোষিৎ-বর্গের প্রহরাকার্য্য ব্যতীত রাজকার্য্য পরিচালন জন্যও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় এই সময় খলিফা আমিনের ব্যক্তিগত আদেশে প্রকৃত যাত্রা সঙ্গীতের দল সৃষ্ট হয়। এক শত সুন্দরী বালিকা মূল্যবান চাকচিক্যশালী পোষাক পরিধান করত মুক্তা ও হীরকাদিতে অলঙ্কৃত ও সমুজ্জ্বল হইয়া সুন্দর সঙ্গীত লহরীর তানলয় যুক্ত একতান ছন্দে নৃত্য করিত। তাহারা খর্জ্জুর বৃক্ষের পত্র দোলাইয়া নৃত্য করিতে করিতে একবার অগ্রগামী হইত ও পিছাইয়া যাইত, তৎপর সকলে একত্র হইয়া পেঁচবিশিষ্ট গোলাকার ব্যূহের আকার ধারণ করত উজ্জ্বল সুন্দরী

পরীদলের ন্যায় শরীর বাঁকাইয়া ইতস্ততঃ নৃত্য করিত ও বৃত্তাকারে ঘুরিত। টাইগ্রিস (দজলা) নদীতে আমোদোৎসব করার উদ্দেশ্যে খলিফা আমিন সিংহ, হস্তী, ঈগল, সর্প ও অশ্বমূর্ত্তি বিশিষ্ট পাঁচখানা কেলিনৌকা প্রস্তুত করাইয়া ঐগুলি মূল্যবান ধাতুদ্বারা মণ্ডিত করেন। এবং ভোজনোৎসব ও আমোদ প্রমোদ করার উদ্দেশ্যে বাইজানটাইন রীতির অনুকরণে সর্ব্বদা নর্ত্তকী, গায়িকা ও চাটুকারগণ পরিবেষ্টিত থাকিয়া রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য উচ্চাভিলাষী ও অনুপযুক্ত মন্ত্রী ফজল-বিন-রাবির হস্তে অর্পণ করেন। ফলে ইস্‌লামের শত্রুদল চতুর্দ্দিকে বলসম্পন্ন হইতে থাকে।

রোমক সম্রাট নাইসফোরাস বুলগেরিয়াবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তদীয় পুত্র ইস্ত্রিব্রাক (Stauracius) সিংহাসনের অধিকারী হন। অল্পকাল রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে রোমকগণ জর্জ্জের (Gurjis) পুত্র মিকাইলকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেন। এই ব্যক্তি ইস্ত্রিব্রাকের কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহাহউক কোন কারণ বশতঃ তিনি লিয় নামক নিজের জনৈক সেনানীকে রাজসিংহাসন প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। লিয় সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য লুণ্ঠণ করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে প্রজার কষ্টের দিকে খলিফা আমিনের আদৌ দৃষ্টি ছিলনা। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য শক্তিনিয়োগ করার পরিবর্ত্তে তিনি তদীয় ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। যদি মামুন সিংহাসনে উপবেশন করেন, তাহা হইলে তিনি ফজল-বিন-রাবির বিশ্বাস ঘাতকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া ফজল মামুনকে ভবিষ্যৎ সিংহাসন লাভ হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে খলিফা আমিনকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। প্রথমে নবীন খলিফা তাঁহার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু ফজল-বিন-রাবি তাঁহার সমতুল্য আলী-বিন-ইসা-বিন-সাহাল নামক অদূরদর্শী পারিষদের কুপরামর্শের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ খলিফাকে অনুরোধ করত পরিশেষে তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। মামুনকে খোরাসান হইতে বাগ্‌দাদে আহ্বান করা হইলে, তিনি তাঁহার শাসিত রাজ্যের দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না বলিয়া আপত্তি প্রদর্শন করেন। ইহাতে খলিফা আমিন তাঁহাকে উক্ত প্রদেশের শাসনকার্য্য হইতে বিচ্যুত

এবং উপাসনাকালীন খোৎবায় তাঁহার নামোচ্চারণ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। কাসেম যে সমস্ত প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনিও উহা হইতে বঞ্চিত হন।

মামুনকে দমন করার উদ্দেশ্যে আমিন তদীয় শিশু পুত্রকে 'নাতেক-বিল-হক' (সত্যঘোষণাকারী) উপাধিতে ভূষিত করিয়া ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং উহার কিছুকালপর তদীয় দ্বিতীয় পুত্রকে 'কায়েম-বিল-হক' (সত্যস্থ) উপাধি প্রদান করিয়া তৎপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করেন। (১৯৫ হিজরী, ৮১১ খৃঃ)। মামুন এই কার্য্যকে শপথ ভঙ্গ-করন বলিয়া তাঁহার অধিকারের পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। বাগ্‌দাদ হইতে গুপ্তচর যাইয়া গোপনে তাঁহার প্রজাবর্গকে হস্ত-গত করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি পরীক্ষাব্যতীত কোন ব্যক্তিকে খোরাসানে প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। এইরূপে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। খলিফা রশিদ পবিত্র কাবামন্দিরে উভয় ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বরূপ যে দলিল দুইখানি রাখিয়াছিলেন, আমিন তাহা আনয়ন করিয়া ছিন্ন করেন।

এক্ষণে আলী-বিন-ইসা-বিন-সাহালের নেতৃত্বে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য রায় নগরের দিকে প্রেরিত হইল। এখানে তাহারা মামুনের প্রেরিত তাহের-বিন-হোসায়েন কর্ত্তৃক শোচনীয়রূপে পরাজিত হয় ও তাহাদের সৈন্যাধ্যক্ষ আলী-বিন-ইসা নিহত হন। তাঁহার সৈন্যদলের কিয়দংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে, কিয়দংশ তাহেরের সহিত যোগদান করে। জুলিয়াস্ সিজর যে প্রকার তাঁহার বিজয়সংবাদ সংক্ষেপে রোমান সেনেটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহের-বিন-হোসায়েনও তদ্রূপ স্বীয় বিজয়-সংবাদ সংক্ষেপে খলিফা আমিনের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আলী-বিন-ইসার মস্তক আমার সম্মুখে, তাঁহার অঙ্গুরী আমার অধি-কারে (অর্থাৎ বিজয়চিহ্ন স্বরূপ তদীয় অঙ্গুলিতে) এবং তাঁহার সৈন্যদল আমার অধীনে"। ২৫০ ফারসাঙ্গ (৭৫০ মাইল) পথ তিন দিনে অতিক্রম করিয়া এই সংবাদ খলিফা আমিনের নিকট বহন করা হইয়াছিল।

খলিফা রশিদ মামুনকে একলক্ষ দিনার ব্যক্তিগত ভাবে দান করিয়াছিলেন। মামুনের অল্পবয়স্ক পুত্রদ্বয়ের অভিভাবক নফালের তত্ত্বাবধানে উক্ত অর্থ ও তাঁহার সমস্ত গুপ্তসম্পত্তি রক্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে ফজল-বিন-রাবি ঐ সম-

স্তই রাজসরকারে গ্রহণ করেন। এই অনধিকার কার্য্য করাতে দুর্ব্বল খলিফা আমিন ও তদীয় অর্থলোলুপ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিদ্রূপ বাক্য বর্ষিত হইতেছিল। খলিফা আমিনের চাটুকারগণ তাঁহাকে এপ্রকার পরামর্শ দিয়াছিল যে, মামুনের পুত্রদ্বয়কে প্রতিভূস্বরূপ রাখা হউক, তাহাতে যদি তিনি (মামুন) সম্মত না হন, তবে উক্ত পুত্রদ্বয়কে হত্যা করা হউক। কিন্তু খলিফা আমিন এই পরামর্শের কেবল নিন্দাবাদ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বরং যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহাকে এই লজ্জাস্কর পরামর্শ দান করিতে সাহসী হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন।

বাগ্‌দাদ হইতে আরও কয়েকদল সৈন্য মামুনের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারাও পূর্ব্বের ন্যায় সেনাপতি তাহেরের হস্তে পরাজিত হয়। এক্ষণে মামুনের সৈন্যাধ্যক্ষ তাহের পার্ব্বত্যপ্রদেশ শত্রুশূন্য করিয়া কাজইন (Kazwin) অধিকার করত হলওয়ানে উপনীত হন এবং উহাকে প্রধান সেনানিবাসে পরিণত করেন। অন্যতম সেনাপতি হারছামাকে উত্তর প্রদেশে রাখিয়া তিনি এস্থান হইতে আহওয়াজের দিকে অভিযান করেন। মামুন এক্ষণে 'আমীরুল মুমেনীন' বিশ্বাসীদিগের নেতা) উপাধিতে বিভূষিত হইয়া সমগ্র পারস্যবাসী কর্ত্তৃক খলিফাপদে বরিত হন। তিব্বত হইতে হামাদান এবং ভারত মহাসাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র রাজ্যের শাসন ভার ফজল-বিন-সহলের প্রতি অর্পিত হয়। মামুন সমর বিভাগীয় মন্ত্রীর (আমীরুল হরব) ও রাজকোষাধ্যক্ষের (আমীরুল খেরাজ) কার্য্য একত্র মিশ্রিত করেন। আলী-বিন-হিশাম সমর বিভাগের মন্ত্রীর পদে, নুয়েম-বিন খাজিম রাজস্ব-সচিবের পদে এবং হাসান-বিন-সহল উক্ত রাজস্বসচিবের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।

যৎকালে খোরাসান প্রদেশে এবম্প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, সেই সময় প্রথম মাবিয়ার জনৈক বংশধর* কর্ত্তৃক বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সিরিয়া দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি তাঁহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছিলেন। ঠিক এই সময় বীরবর মাসলামার পৌত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফারূপে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু উভয়ের সহকারিগণ শীঘ্রই তাঁহাদের পক্ষ পরিত্যাগ করায় তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হন।

---

* এই ব্যক্তির নাম আলী-বিন-খালেদ-বিন-এজিদ-বিন-মাবিয়া। ইনি সুফিয়ানী নামে

এই সময়ের মধ্যে মামুনের সেনাপতি আহওয়াজ, ইমামা—বাহরেন ও ওমান প্রদেশ স্ববশে আনয়ন করত উত্তরাভিমুখে বক্র অভিযান করিয়া ওয়াসিত নগরী অধিকার করেন। তিনি অতীব দ্রুত অভিযান ও আরব সাগরের উপকূলভাগ অধিকার করায়, অন্যান্য স্থানের অধিবাসী দিগের উপর ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। খলিফা আমিনের নিয়োজিত কুফার শাসনকর্ত্তা হাদীর পুত্র আব্বাস মামুনের বশ্যতা স্বীকার করেন। বসোরার শাসনকর্ত্তা মাহদির পুত্র মনসুর এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনার শাসনকর্ত্তা ইসার * পুত্র দায়ুদ তাঁহার পথানুসরণ করেন। তাঁহারা সকলেই সদয় ব্যবহারের সহিত স্ব স্ব পদে দৃঢ়ীকৃত হন। সেনাপতি তাহের তৎপর উত্তরাভিমুখে অভিযান করেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত নগরী মাদান অধিকার করিয়া বাগ্‌দাদের শহরতলীতে উপনীত হন। অন্যদিকে অন্যতম সেনাপতি হারছামাও উত্তর প্রান্ত হইতে রাজধানীতে আগমন করেন। মোসেবের পুত্র জাহের নামক অন্য একজন সৈন্যধ্যক্ষ ঠিক এই সময় তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। এবং উক্ত সেনাপতিত্রয় একত্রে বাগ্‌দাদ অবরোধ করেন। (১৯৭ হিজরী, ৮১৩ খৃঃ)। তাহের আনবার তোরণের সম্মুখে উদ্যানের মধ্যে এবং হারছামা সুরবিন তোরণের সম্মুখে নদী অবতরণের পথে সৈন্য স্থাপন করেন। অবরোধকার্য্য কয়েকমাস পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। যে সমস্ত সাধারণ লোক খলিফা আমিনের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং নিয়মিত সৈন্যদিগকে ধন বিতরণ করিতে তিনি রাজকীয় ধনাগার নিঃশেষ করেন। পরিশেষে স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র একত্র গলাইয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বিদিগের মধ্যে বিতরণ করত দানকার্য্য শেষ করেন। অবরোধ কালে বাগ্‌দাদ নগরীর বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। যে সকল অট্টালিকা উভয়পক্ষের আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার পথে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল সেগুলিকে ভূমিসাৎ করা হইয়াছিল। অর্দ্ধেক নগরী ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় অধিবাসিগণের আর্ত্তনাদে হৃদয় বিগলিত হইতেছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ খলিফা আমিনকে পরিত্যাগ করিতে

খ্যাত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম নফিসা, তিনি আলীর পুত্র আব্বাসের দৌহিত্রী ছিলেন। এই আলী হজরত এমাম হোসায়েনের সহিত কারবালায় নিহত হইয়াছিলেন।

* এই ইসাকে খলিফা মনসুর ভবিষ্যৎ সিংহাসনলাভ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোক সকল অতীব দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিতেছিল। পরিশেষে আমিন তদীয় গর্ভধারিনী সহ টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে খলিফা মনসুরের নির্ম্মিত এক দুর্গে * আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এখানেও তিনি অরক্ষণীয় অবস্থায় পতিত হওয়ায় এপর্য্যন্ত যে কয়েকজন পরামর্শদাতা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সিরিয়াভিমুখে প্রস্থান করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁহাকে মামুনের নিকট প্রেরণ করা হইবে এই সর্ত্তে তিনি আত্মসমর্পন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কারণ মামুনের ভ্রাতৃভক্তির উপর তিনি বিশেষরূপ আস্থাবান ছিলেন। এতদনুসারে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপনের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে কিন্তু সেনাপতি তাহের পুনঃ পুনঃ জেদ প্রকাশ করেন যে খলিফা আমিনকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতেই হইবে। অপরপক্ষে হতভাগ্য খলিফাও একচক্ষুহীন † তাহেরের নিকট আত্মসমর্পন করিতে তুল্যরূপে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কারণ তিনি তাহেরকে অবিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাকে ব্যক্তিগত শত্রু বলিয়া জানিতেন। তিনি তদীয় পিতার বিশ্বস্ত সেনাপতি হারছামার নিকট আত্মসমর্পন করার প্রস্তাব করেন। পরিশেষে এই বিষয় নিম্নলিখিতরূপে মীমাংসিত হয় - খলিফা আমিন হারছামার নিকট কেবল আত্মসমর্পণ করিবেন এবং তাহেরকে হজরত পয়গম্বরের মোহরযুক্ত অঙ্গুরী, অঙ্গ-রাখা ও তরবারী প্রদান করিবেন। তাহা হইলে উভয় সেনাপতিই তাঁহার আত্মসমর্পণের গৌরব লাভ করিতে পারিবেন। ১৯৮ হিজরীর ২৬শে মহরম রবিবার রাত্রিতে খলিফা আমিন তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সকরুণ বিদায় গ্রহণ করিয়া সেনাপতি হারছামার নৌকায় গমন করেন এবং সেখানে তিনি মামুনের সেনানিগণ কর্ত্তৃক সসম্মানে ও সাদরে অভ্যর্থিত হন। হারছামা নৌ-চালকদিগকে দ্রুতগতিতে নৌকা পরিচালিত করিয়া স্বীয় শিবিরের দিকে লইতে আদেশ করেন। কতকগুলি নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন পারশ্যবাসী সৈনিক পুরুষ সেই সময় প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল, তাহারা খলিফা আমিনকে যাইতে দেখিয়া

---

* এই দুর্গকে 'মেদিনাতুল মনসুর' বলিত।

† ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাহের একচক্ষুহীন হইলেও সব্যসাচীর ন্যায় তাহার উভয় হস্ত সমভাবে কার্য্যক্ষম ছিল। এজন্য তাহার এই অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ সাধিত হইয়াছি ।

তাঁহার নৌকায় প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের মধ্যে একজন টাইগ্রীসের ঐ ক্ষুদ্র কেলিনৌকায় এক প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করায় উহা জলপূর্ণ হইয়া উল্টিয়া পড়ে। জনৈক মাল্লার সহায়তায় হারছামা অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহার সঙ্গী খলিফা আমিন ও নগরাধ্যক্ষ সন্তরণ পূর্ব্বক অতি কষ্টে কূলে উপনীত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও তাঁহারা পার্শী সৈনিকগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিকটবর্ত্তী একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে কারারুদ্ধ হন। খলিফা আমিন শীতে কাঁপিতে থাকিলে নগরাধ্যক্ষ তাঁহাকে স্বীয় জামাদ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং উভয়ে ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন। গভীর রাত্রিতে কয়েকজন পার্শী সৈনিকপুরুষ উক্ত গৃহের দ্বার ভঙ্গ করত সবেগে খলিফা আমিনের উপর আপতিত হয়। তিনি স্বীয় উপাধান দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও হত্যাকারিগণ তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। (২৩শে মহরম ১৯৮ হিঃ, ৮১৪ খৃঃ)। পরদিন প্রত্যুষে হত্যাকারিগণ হতভাগ্য আমিনের মস্তক বাগ্‌দাদের প্রাচীরে জনসাধারণকে প্রদর্শন করে।

মামুন তদীয় ভ্রাতার এইপ্রকার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে তাঁহাদের উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্যের ফল এতদূর ভয়াবহ হইবে। তিনি খলিফা আমিনের হত্যাকারীদিগকে শাস্তিপ্রদান জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর আংশিক ক্ষতিপূরণ করার উদ্দেশ্যে তাঁহার পুত্রদিগকে স্বকীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করত তাহাদিগকে রাজমাতা জোবেদার তত্ত্বাবধানে রাখেন এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে স্বীয় কন্যাগণের সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে একজন অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ব্যতীত মামুন খলিফা আমিনের পরিবারবর্গ ও ভৃত্যদিগকে তাহাদের অধিকৃত সম্পত্তি উপভোগ করার আদেশ প্রদান করেন।

এই প্রকারে খলিফা আমিন অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে চারি বৎসর আট মাস দুঃখপূর্ণ রাজত্বের পর ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহ্‌মদ্।

☞ আরবজাতির ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে, তজ্জন্য এই স্থানেই এই প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল।—সম্পাদক।

প্লিনি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ভারতীয় জীবজন্তু।

হস্তীচালক তাহার নিজ হস্তী সহ যূথভ্রষ্ট কোন হস্তীর নিকট যাইয়া তাহাকে আঘাত করিতে থাকে। আঘাতে যখন বন্য হস্তী কাতর হইয়া পড়ে, তখন তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে। হস্তীরা গ্রীষ্মকালে ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতীয় দিগের পণ্যকুটীর ধ্বংশ করে। ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার হস্তী ও সর্প পাওয়া যায়। হস্তী ও সর্পে অনবরত বিবাদ চলে। সর্পগুলি এত বৃহৎ যে তাহারা অনায়াসে হস্তীকে জড়াইয়া ফেলিতে পারে। এই যুদ্ধে উভয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কেন না হস্তী পরাজিত হইয়া যখন পড়িয়া যায় তখন বিজড়িত সর্পও তাহার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবর্ষে দ্রুতগামী ব্যাঘ্রও পাওয়া যায়। ভারতীয় জন্তুগুলির খুর দ্বিখণ্ডিত নহে এবং উহাদের মাত্র এক একটি শৃঙ্গ। আসিস নামক অন্য একটি জন্তুও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে বানর ও Unicorn পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত জন্তুর মস্তক হরিণের ন্যায়। হস্তীর ন্যায় উহার পদ, শূকরের ন্যায় পুচ্ছ—অন্যান্য অবয়ব অশ্বের ন্যায়। মস্তকে মাত্র একটি শৃঙ্গ— উহা দুই হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই জন্তুকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করা যায় না। ভারতবর্ষে শজারুও পাওয়া যায়। শীত ঋতুতে ইহাদিগকে দেখা যায় না। নিসা পর্ব্বতের টিকটিকিগুলিও ২৪ ফীট দীর্ঘ এবং বিভিন্ন বর্ণের।

ভারতীয় সমুদ্রে নানাপ্রকার জলজন্তু পাওয়া যায়। চারি জুগেরা দীর্ঘ বেলিনি ও দুই শত হাত লম্বা প্রিসটিস উল্লেখযোগ্য। চারি হাত দীর্ঘ কর্কট এবং তিন ফীট দীর্ঘ বানমৎস্য গঙ্গায় পাওয়া যায়। অয়নান্তের সময় সমুদ্রে এই সকল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কেন না এই সময়ে ঘূর্ণিবায়ু প্রবাহিত হয়, বৃষ্টি পড়ে, ঝটিকা আরম্ভ হয় এবং সমুদ্রে এরূপ তরঙ্গ হইতে থাকে যে, সমুদ্র-গর্ভে লুক্কায়িত জন্তুগুলি বাহির হইয়া পড়ে। অন্য সময়ে এত অধিক টানিক দেখা যায় যে আলেকজান্দারের রণতরী সমূহকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। কেন না দীর্ঘ বর্ষা দ্বারা আঘাত করিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করা হইয়াছিল। অন্য কোন প্রকারেই তাহারা ভীত হইয়া পথ পরিত্যাগ করে নাই। আলেকজান্দারের নৌসেনানিগণ বলেন যে আরাবিস নদীতীর-

বর্ত্তী গেদ্রোসিয়ানগণ মৎস্যের চোয়াল দ্বারা দরজা নির্ম্মাণ করে। ভারতীয় সমুদ্রে এরূপ কচ্ছপ পাওয়া যায় যে তাহাদের দাঁড়ায় গৃহনির্ম্মাণ হয়। গঙ্গায় প্লাটানিস্টা বলিয়া ষোল হাত লম্বা এক প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। অন্য এক প্রকার কীট গঙ্গায় পাওয়া যায় তাহা ষাইট হাত লম্বা। ইহা দেখিতে নীলবর্ণ এবং এরূপ বলশালী যে. তাহাদের পক্ষ দ্বারা তাহারা জল পানোদ্যত হস্তীশুণ্ড ধরিয়া তাহাকে জলে টানিয়া লয়।

ভারতবর্ষে বর্ণনাতীত সুন্দর সুন্দর পক্ষী পাওয়া যায়। অনেক পক্ষী আছে যাহারা মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে। ইহারা ইহাদের প্রভুকে অভিবাদন করে এবং শিক্ষা না করিলে তাহাদের মস্তকে লৌহদণ্ড দ্বারা আঘাত করা হয়।

ভারতীয় অশ্বতর একশৃঙ্গ বিশিষ্ট। ভারতবর্ষে সুবর্ণপ্রসূ পিপীলিকা পাওয়া যায়। ইহাদের রং মার্জ্জারের ন্যায় এবং ইহারা আকারে ভল্লুকের ন্যায়। ইহারা শীতকালে যে সুবর্ণ সংগ্রহ করে, ভারতীয়গণ গ্রীষ্মকালে তাহা অপহরণ করে। কেননা গ্রীষ্মকালে উত্তাপের জন্য পিপীলিকাগুলি মৃত্তিকা-গর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু পিপীলিকাগুলি তস্করের গন্ধ পাইবা-মাত্র বহির্গত হয় এবং যদিও তস্করেরা দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে থাকে, তত্রাপি অনেক সময় তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করে—ইহারা এতই দ্রুতগামী ও হিংস্র।

ভারতবর্ষীয় কুম্ভীরগুলিও বৃহদাকারের। লবণাক্ত করিয়া তাহাদিগকে আমাদের দেশে আনয়ন করা হয়।

ভারতীয় বৃক্ষাদি।

ভারতীয় বৃক্ষগুলিও অত্যন্ত বৃহদাকারের এবং তাহাদের দেশে পশম উৎপাদক এক প্রকার বৃক্ষ আছে। ইবনি বৃক্ষ ভারত ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু হেরোডোটাস বলেন যে,—ইহা ইথিওপিয়ায় পাওয়া যায়। ইবনি দুই প্রকারের—একপ্রকার নিকৃষ্ট, ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। অন্য প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল; সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ভারতীয় ডুমুর বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডুমুর জন্মে। ডুমুরের ডালগুলি বড় হইয়া পুনরায় নত হইয়া ভূমিস্পর্শ করে এবং তখন উহাতে শিকড় হয়। এইরূপ বৃক্ষতলে পশু-চারকগণ গ্রীষ্মাতিপাত করে। প্রায় দুই ষ্টাডিয়া স্থান জুড়িয়া ইহার ছায়া হয়। ডুমুরগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু। আকিসাইন

নদীতীরেই এইগুলি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইহাপেক্ষা বৃহৎ আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে—এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়াই ঋষিরা জীবন ধারণ করেন। এই শেষোক্ত বৃক্ষের পাতা তিন হাত লম্বা ও দুই হাত প্রস্থ এবং দেখিতে পক্ষীদের পাখার ন্যায়। বৃক্ষে যে ফল হয় তাহা অত্যন্ত সুস্বাদু এবং এরূপ বৃহৎ যে একটি ফলে চারিজনের ভূরি-ভোজন হইতে পারে। এই বৃক্ষকে পালবৃক্ষ এবং ইহার ফলকে আরিয়েনা বলে। এই ফল সিদ্রাকি দেশেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য একটি বৃক্ষ আছে তাহার ফল ইহাপেক্ষাও সুস্বাদু, কিন্তু খাইলে পেটের পীড়া হয়। এই ফল স্পর্শ করিতেও আলেকজান্দার নিষেধ করিয়াছিলেন। মাসিদোনিয়ানগণ অনেক প্রকার বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু অধিকাংশেরই নামোল্লেখ করে নাই। ভারতীয় ওলিভ গাছে ফল ধরে না। তথায় সর্ব্বত্রই মরিচের গাছ জন্মে। লঙ্কামরিচ আলেকজান্দ্রিয়ার সরিষার সহিত মিশ্রিত করা হয়। মরিচ ও আদা প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষে জন্মে এবং আমরা এই সকল দ্রব্য আমাদের দেশে সুবর্ণ রৌপ্যের ন্যায় ক্রয় করি। ভারতবর্ষে অন্য একপ্রকার শস্য পাওয়া যায় তাহা দেখিতে মরিচের ন্যায়, কিন্তু মরিচ অপেক্ষা ক্ষণভঙ্গুর এবং বৃহৎ। ঐ দেশেই কাঁটা গাছে মরিচের ন্যায় অন্য একটি শস্য জন্মে তাহা অত্যন্ত ঝাল। এই গাছের শিকড় ও শস্য তাম্রপাত্রে সিদ্ধ করিলে লিকিয়ন নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। উষ্ট্র বা গণ্ডারের চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রে করিয়া ভারতবাসীরা এই ঔষধ আমাদের দেশে প্রেরণ করে। আমরা মাকিরও ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা একপ্রকার বৃক্ষের ত্বক। এই ত্বকের কাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে আমাশয়ের ঔষধ হয়। আরব দেশেও চিনি হয়, কিন্তু ভারতীয় চিনিই অধিক পছন্দ করা হয়। ইহা এক প্রকার মধু; নলের মধ্যে পাওয়া যায় এবং দাঁত দিয়া ভাঙ্গিতে পারা যায়। ইহা কেবলমাত্র ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে একপ্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায় তাহারা লজ্জা নিবারণ করিতে পারে। একপ্রকার শিকড় ও পাতাকে ভারতবাসীরা সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। শিকড় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে গন্ধ পাওয়া যায়। পাটল দ্বীপে দুই প্রকার শিকড় পাওয়া যায়—একটি কৃষ্ণবর্ণ, অন্যটি শ্বেতবর্ণের। ইহা প্রতি পাউণ্ড পাঁচ দিনার মূল্যে বিক্রীত হয়।

যে সকল গুল্ম হইতে প্রলেপ প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে নাদিসের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইহা কটু এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র ঘনসন্নিবিষ্ট। গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে যে নার্ভ জন্মে উহা অকিঞ্চিৎকর। এক পাউণ্ড স্পাইক-নার্ভের মূল্য একশত দিনারী। ভারতবর্ষে আঙ্গুরও ব্যবহৃত হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভারতবাসীরা তালের রসকে মদ্যে পরিণত করে। বাদাম, তিল এবং যোয়ান হইতে ভারতবাসীরা তৈলনির্য্যাস প্রস্তুত করে। ইকথি ও য্যাগির মৎস্য হইতে তৈল বাহির করে। ভারতবর্ষ হইতে তিল আমদানী হয়। এই শস্য দেখিতে সাদা। ভারতবর্ষে যে যব পাওয়া যায় তদ্দ্বারা রুটি ও Porridge প্রস্তুত হয়। ভারতবাসীরা ভাতকেই অধিক পছন্দ করে। ধানের গাছ এক হাত লম্বা, পুষ্প বেগুণে রংয়ের ও শিকড়গুলি মুক্তার ন্যায়। ভারত-বাসীরা একপ্রকার ফল হইতে সূত্র প্রস্তুত করে। ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট Lycium পাওয়া যায়; ইহা অত্যন্ত তিক্ত।

ভারতীয় খনিজপদার্থ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি।

ভারতবর্ষে লবণের পর্ব্বতও আছে। সুবর্ণ ও মুক্তা হইতে যে লাভ না হয়, যে সকল রাজার এই সকল লবণের পর্ব্বত আছে তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক লাভ করেন।

আমাদের দেশে মুক্তার যেরূপ আদর করা হয়, ভারতবর্ষে প্রবালের সেইরূপ আদর হয়। তাহাদের দেশীয় গণককারগণ প্রবালের কবচ সকল বিপদ হইতে রক্ষা কর, এইরূপ মনে করে। সেইজন্য গহনার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়। অল্পদিন হইতে ভারতবর্ষ হইতে নীল আমদানি হইতেছে। ইহার দর পাউণ্ড প্রতি সতেরো দিনারী।

নীলও ভারতবর্ষ হইতে আমদানি হয়। ইহা কয়েক প্রকার নলের গায় জমিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার আটাল পদার্থ। দেখিতে ইহার কাল বর্ণ কিন্তু জলের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা গাঢ় নীল বর্ণ বিশিষ্ট হয়। কেহ কেহ খাঁটি নীলের সহিত পারাবতের বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া ভেজাল করে। নীলের দর পাউণ্ড প্রতি বিংশ সেশটারসিস। ঔষধার্থ ব্যবহার করিলে ইহা জ্বর, কম্পন ও ক্ষতের উপকার করে।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই আমাদের দেশে কাচ আসে এবং ভারতীয় কাচকেই অধিক পছন্দ করা হয়। Amber ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।

টিসিয়াস বলেন যে, ভারতবর্ষে হাইপোবোরাস নামে একটি নদী আছে। হাইপোবোরাস অর্থে Bearer of all food things. ইহা উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বসমুদ্রে পড়ে। এই সমুদ্রের নিকটস্থ পর্ব্বতে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহাতেই Amber জন্মে। ভারতীয় হীরক সুবর্ণে নিহিত থাকে না, কিন্তু ইহা কাচের ন্যায় এক প্রকার পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায়। এই দ্রব্যও দেখিতে কাচের ন্যায়। ভারতীয় মুক্তাকেও অত্যন্ত আদরের চক্ষে দেখা হয়। ভারতবর্ষে Beryls'ও পাওয়া যায়। অন্যত্র ইহা পাওয়া যায় না। Opal'ও ভারতীয়। এই সকল প্রকার মূল্যবান মণিমুক্তা কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। Opal দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর বলিয়া অনেক গ্রন্থকার ইহাকে পিডিরস বলিয়াছেন। জেনোথিমিস বলেন যে, এই সকল প্রস্তর এত বৃহৎ, যে ইহাদের দ্বারা অনায়াসে তরবারির বাঁট নির্ম্মিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতবাসীরা এই সকল প্রস্তরকে আদর করেন না। আমারই ভারতবাসীদিগকে ইহার আদর শিখাইয়াছি।

তৎপরে প্লিনি নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরাদির উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মেফিয়া হস্তে।

(গল্প।)

লোকে বলে উপন্যাসোচিত অদ্ভুত ঘটনাবলী এ জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু বিগত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শীতঋতুতে ভিনিস নগরে আমার যে আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে আমার ধারণা অন্যরূপই হইয়াছে।

কার্য্যোপলক্ষে আমি এই সময় ইতালি দেশীয় বড় বড় সহরগুলি পরিদর্শন করিতে ছিলাম। ভেনোরা হইতে যে দিন ভিনিসে যাই-তেছি, সে দিন একজন ইতালিয়ান যুবকমাত্র আমার সহযাত্রী ছিলেন। যুবকটি দেখিতে কদর্য্য, পরিধানে একটি সবুজবর্ণের লম্বা কোট, সচরাচর সে প্রকার পরিচ্ছদ প্রায় নয়নগোচর হয় না। আমরা পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করি নাই, শীতের তীব্রতায় জড়সড় হইয়া আমি এক কোণে

শয়ন করিয়াছিলাম; আর মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম যে আমার সহযাত্রীর মত একটি বেশ গরম ওভারকোট সঙ্গে আনার মত বুদ্ধিটুকু যোগাইলেই বড় ভাল হইত।

জাগ্রত হইয়া দেখিলাম আমরা ভিনিসের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। গাড়ীতে আর জন প্রাণী নাই। যুবকটি কোথায় অবতরণ করিলেন, জানিতে পারিলাম না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার ওভারকোটটি গাড়িতে পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচ্ছদটি নূতন, গরম কাপড়ের আস্তর দেওয়া। ভাবিলাম ভিনিসে পৌঁছিয়া তাহা রাজপুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করিব। ততক্ষণ শীতের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমি উহা গায়ে চড়াইয়া লইলাম। ট্রেণ দশ মিনিট পরেই ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ষ্টেসনে পৌঁছিল। জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ সবেগে নামিয়া পড়িলাম।

গাড়ীতে সে দিন লোকের অভাব ছিল না। আরোহীর আধিক্যে পাছে নৌকা পাওয়া না যায়, পাছে নিজের জিনিসগুলি গোলমালে পর হস্তগত হইয়া যায়, এইরূপ ব্যস্ততায় অন্য লোকের পোষাক যে আমার গাত্রে বিলম্বিত রহিয়াছে—তাহা যে বেওয়ারিস মালের আফিসে জমা দিতে হইবে, তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

ষ্টেশনের বাহিরে দলে দলে ভাড়াটিয়া নৌকাওয়ালাগণ তাহাদের চিরাভ্যস্ত স্তোক বাক্যে আরোহী সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। সকলের মুখেই ব্যস্ততার চিহ্ন, একটা মহা গোলমাল হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছে। ষ্টেশনের আলোকমালা গাঢ় কৃষ্ণ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন এক অপূর্ব্ব ভৌতিক দৃশ্যের অবতারণা করিতেছে। অনতিবিলম্বে এক নৌকাওয়ালা আমার সম্মুখবর্ত্তী হইল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হুজুরকে হোটেলে লইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি কি?" আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার দ্রব্যাদি সহিত আমি নৌকাভ্যন্তরে গিয়া সুখোপবিষ্ট হইলাম। দেখিতে দেখিতে তরণী জনতা পার হইয়া গেল। আমরা বিস্তীর্ণ জলরাশির বক্ষঃভেদ করিয়া নিম্নাভিমুখে চলিতে লাগিলাম।

প্রখর শীতের রাত্রি। এক প্রকার জলার্দ্রকুয়াশা মিশ্রিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের মত শোঁ শোঁ করিয়া তীব্র বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে ততক্ষণ বেশ করিয়া গায়ে কোট আঁটিয়া দিয়াছি। এমন সময়ে একটি ঝাঁকুনি খাইয়া আমার মনে পড়িয়া গেল, রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের হস্তে পোষাকটি অর্পণ করিতে আমি একবারেই বিস্মৃত হইয়াছি। ভাবিলাম "কি ভয়ানক ভুল! যাহা হউক আগামী কল্য প্রাতে একজন লোক মারফত হোটেল হইতে উহা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

যে হোটেলে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা ভিনিস উপসাগর হইতে অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র সাগর শাখার উপর অবস্থিত। দেখিতে দেখিতে আমরা সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে লাগিলাম। দূরে ঘূর্ণ্যমান আলোকমালা থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। মসীকৃষ্ণ জলরাশির উপর সেই কম্পিত আলোক রশ্মি নিপতিত হইয়া আমাদের পথ ঈষৎ আলোকিত করিতেছে। ভিনিসের নৈশদৃশ্য বড় নীরব নিস্তব্ধ। সমস্ত জড় প্রকৃতি শান্ত, সুখ-সুপ্ত। কোথায়ও সাড়া শব্দ নাই। কেবল কদাচিৎ দু'একখানি নৌকা আমাদের পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। আর থাকিয়া থাকিয়া আমার নৌচালকদের একঘেয়ে গান শ্রুত হইতেছিল।

এদিকে আমার হোটেলে পৌঁছিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ভিনিসে আসি নাই সুতরাং কিছু বলিতেও পারিতেছি না।

যাহা হউক আমরা কিয়ৎকালের মধ্যেই একটি ভগ্ন জেটীর নিকট উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে একটি দুর্গাকার সৌধ ঊর্দ্ধে শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, সমস্ত অর্গল দৃঢ়রূপে বদ্ধ। গৃহটি বহু বর্ষের পুরাতন বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলাম "এটা নিশ্চয়ই হোটেল নয়? দেখিলে কারাগৃহ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।" নৌকাওয়ালা বিনীত ভাবে উত্তর করিল "আজ্ঞে না, রাস্তার বাম পার্শ্বে কতকটা নীচের দিকে যাইয়া আপনার হোটেল। যথাস্থানে আপনাকে লইয়া যাইতেছি।"

সে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া একটি প্রস্তর স্তম্ভে রজ্জু দ্বারা নৌকাটিকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া এক সঙ্কীর্ণ পথে আমাকে লইয়া চলিল।

ইতিপূর্ব্বে সে পথটি আমি দেখিতে পাই নাই। দূরে পথপ্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। পথপ্রদর্শক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল এই আপনার হোটেল। ভেনোরাস্থ যে বণিক বন্ধুটি আমাকে এরূপ কদর্য্য স্থানে আসিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, মনে মনে তাঁহাকে কতই তিরস্কার করিতে লাগিলাম।

অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে আমার মাথার উপর কি যেন একটা পরাইয়া দেওয়া হইল। কয়েকটি অস্পষ্ট আদেশ কর্ণে প্রবেশ করিল। এবং দৃঢ় মুষ্টিতে কে যেন আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া চলিল।

আমার দৃষ্টিশক্তি রোধ হইয়া গিয়াছিল, অতি কষ্টে শ্বাস বহিতেছিল। কোনপ্রকার নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে যে আমাকে নিপীড়িত করা হইবে, ইহা অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম। এই বিস্তীর্ণ জলরাশির জনহীন নিভৃত বক্র পন্থায়, এই বহু পুরাতন গৃহাভ্যন্তরে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া যত প্রকার অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সমস্তই যেন একে একে আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া তুলিল। অতিমাত্র ভয়ে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

অনতিবিলম্বে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর সবলে আমাকে শায়িত করা হইল। গৃহদ্বার অবরুদ্ধ হইল। সে ঘরে আর জন প্রাণী নাই। আমি উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলাম। যে অত্যল্প কালের মধ্যে আমি এই গৃহে নীত হইতে ছিলাম, সেই অবসরে কারারক্ষকগণ আমার হস্তপদ বন্ধন করিয়াছিল; সুতরাং আমার নড়িবারও শক্তি ছিল না।

এই সময়ে আমার মনে কত প্রকার বিষাদময়ী চিন্তাই উদিত হইতে ছিল! যদি জীবিতাবস্থায় এ কারাগৃহ হইতে আর বহির্গত হইতে না পারি তবে জগতের একটি প্রাণীও ইহার বিন্দু বিসর্গ অবগত হইতে পারিবে না। এই চিন্তা আমার মনকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিতেছিল।

অধিকক্ষণ এরূপ অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হয় নাই। অনতিবিলম্বে অদূরে পদ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। আমার মস্তকাবরণ ছিন্ন ও পদবন্ধন উন্মুক্ত করিয়া একটি মুখোসপরা বীভৎস প্রেতাকার মনুষ্য আমাকে গৃহান্তরে লইয়া গেল। স্পেন দেশীয় একটি ডিটেক্‌টিভ সম্প্রদায়ের জনৈক সভ্যের সহিত তাহার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া মনে ভীতির সঞ্চার হইতেছিল। আমরা একটি উজ্জ্বল আলোক বিভাসিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। গৃহটি

জনতায় পরিপূর্ণ। অনেকেই কৃষ্ণবর্ণ মুখোশ ও মস্তকাবরণ পরিহিত। আমি কারাধ্যক্ষ কর্তৃক গৃহে নীত হইবামাত্র জনতার মধ্য হইতে একটি উচ্চ বজ্রগম্ভীর নিনাদ উত্থিত হইল এবং আমার সমীপবর্ত্তী লোকেরা মুষ্টিবদ্ধ হস্তে আমাকে প্রহার করার ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। সহসা কক্ষের অপর পার্শ্ব হইতে একটি দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকের লোকেরা তখন সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নির্নিমেষ নয়নে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পরে ক্রুদ্ধভাবে কারাধ্যক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন "এই প্রকার মূর্খতার কারণ কি ? তুমি অন্য একটি লোককে লইয়া আসিয়াছ।"

এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র সকলেই একবারে অতিমাত্র ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। একে একে তাহারা আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। কারাধ্যক্ষও আত্মদোষক্ষালনার্থ অনেক কথা বলিতে লাগিল। এতাবৎকাল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—পর্য্যায়-ক্রমে দ্রুতবেগে এত বিভিন্ন ঘটনা ঘটিতেছিল যে আমি একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক্ষণে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। বলিলাম—"কেন যে এই প্রকার নির্য্যাতনে আমাকে নিপীড়িত করা হইতেছে, আমি তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। যদি আমার পরিচয় সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ থাকে ত বলিতেছি, আমি একজন ইংরেজ, নাম চার্লস রোমাণ্ড, অস্ত ভেনারা হইতে আসিতেছি। এই বাক্যের স্বার্থকতা প্রমাণোপযোগী কাগজ পত্র আমার পকেটে আছে।"

সেই মণ্ডলীর অধিনায়ক এই কথা শ্রবণ করিয়া ইঙ্গিতে আমাকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইতে আদেশ করিলেন। কলের মত তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, আপনার নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা চাহিতে এবং এই সমস্ত ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু এই সবুজ বর্ণের কোটটি আপনি কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন তাহাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের জিজ্ঞাস্য। আমি সংক্ষেপে কোট সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইলাম। মুখোসের অন্তরাল হইতে তাঁহার চক্ষুঃ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। তিনি বলিলেন—

"আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি কেমন করিয়া এই সমস্ত ঘটনা ঘটিল। আমাদের সমাজস্থ জনৈক সভ্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পূর্ব্বক তদীয় সহযোগিগণের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। তিনি আমাদের কয়েক জন বিশিষ্ট সভ্যের নিকট মাত্র পরিচিত। সাধারণ সভ্যগণকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে কোন সবুজ বর্ণের লম্বা কোট পরিহিত ব্যক্তি তোমাদের নয়নগোচর হইলেই তাঁহাকে এই স্থানে লইয়া আসিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রম বশতঃ আপনাকে যে কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। আর ইহাও পরিতাপের বিষয় যে, সেই বিশ্বাসঘাতক কিছুকালের জন্য আমাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবে। কত দূরে আসিয়া সে গাড়ি হইতে অবতরণ করিল আপনি বলিলেন?"

যতদুর সম্ভব আমি তাঁহাকে সে কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "তাহাতে বেশী কিছু উপকার দর্শিবে না, পাষণ্ড অনতিদুরেই ধৃত হইবে।"—"আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি" তিনি বলিতে লাগিলেন—"আপনি আমাদের সবিশেষ পরিচয় পাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। আমরা কে এবং কি করি ইহাই বোধ হয় আপনার জিজ্ঞাস্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। আপনি আপনার জাতীয় গৌরবের নামে শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করুন যে অদ্য রাত্রির ঘটনা ভিনিসে কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। অপনার স্বজাতীয়গণ নিজ বাক্য সর্ব্বপ্রযত্নে পালন করিয়া থাকেন। আপনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে আমরা অনতিবিলম্বে আপনাকে হোটেলে প্রেরণ করিব এবং আনন্দের সহিত আপনার সমস্ত কষ্টের ক্ষতি পূরণ করিব।" লোকটি আচরণে একান্ত ভদ্র। আমি তাঁহার শিষ্টাচারে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম সুতরাং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।

তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক দু'একটি কথা বলিয়া আমার মস্তকে সেই আবরণটি পুনর্ব্বার পরাইয়া দিলেন। পূর্ব্বোক্ত সুবৃহৎ আলোকিত কক্ষের অভ্যন্তর দিয়া আমি মুহূর্ত্তমধ্যে সেই পুরাতন বাঁধা ঘাটে অবতরণ পূর্ব্বক নৌকারোহণ করিলাম।

"তবে আসুন মহাশয়, আমি আপনার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম"

পরে মৃদুতর স্বরে বলিলেন, "মেফিয়াদের বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করা অতি অল্প সংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।" দশ মিনিট পরে মাঝি আমার মস্তকাবরণ বিদূরিত ও হস্তবন্ধন উন্মোচিত করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাকে দ্রব্যাদি সহ হোটেলে নামাইয়া দিয়া সজোরে ক্ষেপণীচালনপূর্ব্বক নৌকাওয়ালা নিশীথের নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। গৃহস্বামী আমার বিলম্ব দেখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক বিনা বাক্যব্যয়ে অচিরে শয্যা গ্রহণ করিলাম। বস্ত্রত্যাগকালে আমার কোটের পার্শ্বস্থ পকেট হইতে একখানি এনভেলপ্ পড়িয়া গেল। আমি তাহা হস্তে তুলিয়া লইয়া দেখিলাম প্রায় ১৩ পাউণ্ড মূল্যের কয়েকখানি ইতালিয়ান নোট তাহার মধ্যে রহিয়াছে। এনভেলপের ভিতরে চিঠিপত্র কিছুই ছিল না। সুতরাং অনুমান করিলাম ক্ষতিপূরণ স্বরূপে এগুলি আমার পকেটে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দুই দিবস পরে Rialtoর সন্নিকটবর্ত্তী একটি সওদাগরী আপিসে বসিয়া আমরা কথোপকথন করিতেছি, এমন সময়ে তাঁহার ডেস্কের উপরিস্থ একখানি ইতালিয় ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রের একটি স্তম্ভের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় লিখিত রহিয়াছে,—"একজন অজ্ঞাতকুলশীল লোক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া সেদিন ভেনোরায় ধৃত ও অবরুদ্ধ হয়। পরদিন দেখা গেল তথাকার কারাগৃহের অভ্যন্তরে তাহার বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকাবিদ্ধ মৃতদেহ নিপতিত রহিয়াছে। সেই ছুরিকার উপর খোদিত অক্ষর দৃষ্টে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে এই হত্যাকাণ্ড নৃশংস মেফিয়াদের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে।"

বণিক সেই কাগজের দিকে চাহিয়া ভীতিবিহ্বল কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন —"একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, কারাগৃহের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া হত্যা করা কি ভয়ানক কাণ্ড! মেফিয়াদের হস্তে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই।"

আমারও সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।*

শ্রীনলিনাক্ষ রায় চৌধুরী।

---

* ইতালিয় সমাজের সমস্ত শাখাপ্রশাখায় মেফিয়া নামধারী এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত, অর্দ্ধ-রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতি আছে। দলস্থ সভ্যেরা অধিকাংশ স্থলেই পরস্পরের নিকট

নিগ্রো-জীবন

আফ্রিকার পুরাতন ধরণের একটি পল্লী। পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি কুটীর ভিন্ন আর কিছুই নাই। প্রত্যেকটি কুটীরের চাল দেওয়ালের বাহিরে এত নামিয়াছে যে গৃহস্বামী তাহার নীচে বৃষ্টি বা আতপ নিবারণ করিয়া বসিতে পারে। দরজা খুব নীচু। ভিতরে যাইতে হইলে গুড়ি মারিয়া যাইতে হয়। একটিও জানালা নাই। প্রতি বাড়ীতে একটি মাত্র ঘর। ঘরের মাঝখানে সর্ব্বদা একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহা নিবিতে পায় না, কারণ তাহা একাধারে—আঁধারের আলোক, পরিচারক ভৃত্য, সঙ্গী—এমন কি গৃহ দেবতাও বটে। চারিপাশ হইতে যে অস্বাস্থ্যকর-বাস্প উঠে, তাহা ইহা দ্বারা শোধিত হইয়া যায়। ছাদ ও দেওয়াল গুলা ধূমশুষ্ক, কিন্তু বেশ মার্জ্জিত। একদিকে বেশ পরিষ্কার করিয়া কাটা আটিবাঁধা কাঠ সাজান আছে। আর এক কোণে খুব বড় একটি জলপূর্ণ জালা—তাহাতে একটি অলাবুপাত্র ভাসিতেছে। দেওয়ালের গায়ে অনেকগুলি সড়্কি, ধনুক, তূণ এবং মাছ ধরিবার জাল প্রভৃতি টাঙ্গান আছে। এখন রাত্রিকাল; চারি পাঁচ জন কৃষ্ণাকৃতি মানুষ আগুনের দিকে পা করিয়া চক্রাকারে শুইয়া আছে, আর দুইটা কুকুর কাণ খাড়া করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ ধূমায়মান অগ্নিকুণ্ডের অতি নিকটে ঘেঁসিয়া আসিতেছে।

রাত্রি পোহাইয়া গেল; দেওয়ালের ফাটল দিয়া অস্ফুট আলোক প্রবেশ করিতেছে। নিদ্রোত্থিতেরা তাহাদের বিছানা অর্থাৎ এক এক খানি মাদুর ও বর্ত্তুল কাষ্ঠখণ্ড গুটাইয়া রাখিল। পুরুষের তাহাদের তীরধনু পাড়িয়া লইল, কুকুরের গলায় কাঠের মালা পরাইয়া দিয়া বনে চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা আগুনে কাঠ দিল, এবং তাহার পরে একটি উল্টান ঝুড়ি তুলিয়া ধরিল। ভিতর হইতে একটি কুক্কুট স-শাবক বাহির হইয়া খাদ্যান্বেষণে চলিয়া গেল। তারপর কেহ বা কোদাল লইয়া আবাদের

অপরিজ্ঞাত। প্রধান প্রধান নগরস্থ বিশিষ্ট সভ্যদের নিকট সকলেই কিন্তু সুপরিচিত। এবং সমিতির কার্য্যোপলক্ষে সকলেই নিজ নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দলস্থ কোন ব্যক্তি সামান্য মাত্র অপরাধে অপরাধী হইলেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইতে এই সমিতি রাজকীয় বিচার ও শাসনচেষ্টা ব্যর্থ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। সুখের বিষয় স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই ভয়াবহ সমিতির ধ্বংসের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। (লেখক।)

কাছে গেল, কেহ কলসীতে জল ভরিতে নদীতে চলিল। তাহাদের কোমরে সম্মুখে ও পশ্চাতে একটু করিয়া আবরণ আছে—গাছের ছাল ভিজাইয়া ও পিটিয়া বেশ এক রকম নরম চামড়ার মত করিয়া পরিয়াছে। প্রত্যেক নিগ্রোর কুটীরের চতুষ্পার্শ্বে এই রকম কাপড়ের গাছ আছে। অবিবাহিতাদের এ টুকু লজ্জাও আবশ্যক হয় না। কিন্তু তাহাদের অন্য ভূষণ আছে। তাহারা লোহার বালা ও মল পরে, কাণে ফুল গুঁজিয়া প্রবালের মত রক্তবর্ণ এক প্রকার ফলের কণ্ঠহার পরে, কটীতে সাদা কড়ি গাঁথিয়া দেয়, এক প্রকার আঠায় কেশ প্রসাধন করে এবং কখন কখন ভস্ম দিয়া সাদা সিঁথি-রেখা টানিয়া দেয়। গৃহিণীরা কলসী করিয়া জল আনে এবং সকাল বেলায় স্নানের সময় আপনাপন স্বামীর দোষগুণ আলোচনা করে।

বায়ু সজল ও শীতল ; ঘাসে ও বৃক্ষপত্রে শিশির জমিয়া আছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে রৌদ্র উঠিতেই শিশির কণাগুলি বড় বড় ভারী বৃষ্টিবিন্দুর মত ঝরিয়া পড়িতেছে। পাখী ডাকিতেছে—ফুলেরা ঘুমভাঙ্গা-দল খুলিয়া ভ্রমর ও প্রজাপতির প্রভাতনিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছে। সমস্ত বনস্থলী যেন বিশাল কারখানার মত প্রাত্যহিক কর্ম্মের বিচিত্র গুঞ্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

সূর্য্য যখন মাথার উপর উঠিল, তখন বালকেরা বন হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের সঙ্গে তাড়ী মদ, কাঠপাত্রের মুখে ফেনাইয়া উঠিতেছে।

আফ্রিকদিগের মদ্যভাণ্ডার, তাহাদের পানপাত্র, তৈজস এবং বসনাগার সবই বৃক্ষে। গ্রামের মধ্যভাগে একটি ছাউনি আছে। শুদ্ধ কয়েকটি খুঁটির উপর একখানি চালা। এটা তাহাদের সভাগৃহ। এই সময়ে এইখানে বৃদ্ধেরা বসিয়া শাসনব্যবস্থার মন্ত্রণা করে। প্রত্যেক সভ্য বর্শাহস্তে বক্তৃতা করে এবং বসিবার সময়ে তাহা নিজের সম্মুখে মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখে। বক্তৃতা করা আফ্রিকদিগের একমাত্র কলাবিদ্যা। তাহাদের কথন বেশ দ্রুত এবং বক্তৃতাগুলি যদিও অকারণ দীর্ঘ, তবুও তাহার মধ্যে মধ্যে অনেক কথা উদ্দাম কবিত্বময়।

এই চালাখানিই আবার বয়োবৃদ্ধদের 'চণ্ডীমণ্ডপ'। কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া গেলে এই খানেই তাহারা দিবসের তাপ যাপন করে। যে কাষ্ঠ খণ্ডের উপর তাহারা বসে, তাহা বহুকাল ব্যবহারে মসৃণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিপ্রহরের সময় স্ত্রী অথবা পুত্রকন্যা তাড়ীমদ আনিয়া

দেয়, সম্মুখে জানুর উপরে তাহা ধরিয়া থাকে, এবং সম্মানসূচক করতালি-ধ্বনি করে।

এখন চারিদিক স্তব্ধ; শুধু নীরবতা ও শান্তিরসের অবসর। আকাশের মধ্যভাগে খরসূর্য্য দীপ্তমহিমায় বিরাজ করিতেছে এবং পৃথিবীর উপর অজস্র শুভ্র আলো ঢালিয়া দিয়াছে। খড়ের চালখানি রূপালি তুষারের মত ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। বন নিস্তব্ধ, প্রকৃতি নিদ্রালসা।

তারপর সূর্য্য পশ্চিমে নামিয়া গেলে রশ্মিগুলি ঊর্দ্ধদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শিকারীর দল গৃহে ফিরিল। যাহারা আপনার জন, তাহারা ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিল; যেন কতকাল তাহাদিগকে দেখে নাই। শিশুর মত অসম্বদ্ধ অস্ফুট ভাষায় কত ভালবাসা জানাইল,—আদরের নাম ধরিয়া ডাকিল,—দক্ষিণহস্ত আকর্ষণ করিল,— মুখ ধরিয়া আদর করিল. বক্ষে মৃদু আঘাত করিতে লাগিল, কত প্রকারে আলিঙ্গন করিল; কেবল চুম্বন করিল না। কারণ আফ্রিকদিগের মধ্যে চুম্বনপ্রথা নাই। এইরূপে পরস্পরের সহিত ক্রীড়া, স্নেহবাহুল্যব্যঞ্জক অর্থহীন আলাপ এবং কলহাস্যে কিয়ৎকাল কাটে। ক্রমে সূর্য্য সিন্দূর-লোহিত হইয়া আসে, আলোক অস্বচ্ছ হয় এবং পথের উপর প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়া দীর্ঘায়ত হইয়া পড়ে। মৃত্তিকা হইতে একপ্রকার সুগন্ধ উত্থিত হয়, জোনাকি জ্বলিতে থাকে এবং বন হইতে ধূসরপক্ষ শুক সকল তীব্র চিৎকার করিয়া চারিদিকে উড়িয়া যায়—মনুষ্যের আবাস সান্নিধ্যে তাহারা রাত্রি যাপন করিবে। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর জন্য অলাবুপাত্রে কদলী অথবা জঙ্গলের আলু সিদ্ধ করিয়া লইয়া আসে, তাহা প্রচুর লঙ্কা এবং মৎস্য বা মৃগমাংস সংযোগে উপাদেয়। এই অনাড়ম্বর ভোজনব্যাপার সাঙ্গ হইলে ঢাক বাজিয়া উঠে, বাঁশের বাঁশিতে সুমিষ্ট আলাপ আরম্ভ হয় এবং যুবক যুবতীরা গান গাইতে থাকে। একটি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন স্থানে তাহারা একত্র হইয়া মহোল্লাসে নৃত্য করে। যুবকেরা এক সারিতে ও যুবতীরা আর এক সারিতে মুখামুখী হইয়া দাঁড়ায় এবং অতি মনোহর অঙ্গসঞ্চালন সহকারে একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে পদচালনা এবং শূন্যে বাহুবিক্ষেপ করে। পরিশেষে একটা বিকট অমানুষিক আর্ত্তনাদের শব্দ হয় ও বন হইতে লাফাইতে লাফাইতে মাম্বো-জাম্বো বাহির হইয়া আসে। তাহার খে একটা ভীষণদর্শন মুখোস ও হস্তে দীর্ঘ বেত্র। যে স্ত্রী সেদিন

স্বামীর জন্য রন্ধন করে নাই বা তাহার সহিত বাচালতা করিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই; কারণ মাম্বো-জাম্বো স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র পরীক্ষক। যাহারা কোনও অপরাধ করিয়াছে, তাহারা তাহাকে দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া পলাইতে থাকে। তারপর আবার নৃত্য আরম্ভ হয় এবং যামিনী যদি জ্যোৎস্নাময়ী হয় তবে সারারাত্রি আর তাহার বিরাম নাই। অসভ্যজীবনের সৌন্দর্য্য এইটুকু, কিন্তু তাহা সমগ্রভাবে সুন্দর নয়—সে শুধু উপরটা, চর্ম্মের উপরে যেমন রংটি লাগিয়া থাকে।

একবার পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করা যাক্। কুটিরের মধ্যে এক যুবকের পদ কাষ্ঠ দণ্ডে বদ্ধ, দক্ষিণ হস্তটি রজ্জুর দ্বারা কণ্ঠে সংলগ্ন রহিয়াছে। তাড়ীমদ, নিশীথরাত্রের উন্মাদক নৃত্য এবং মোহিনীর গুপ্তকুহকে সে আত্মসংযম করিতে পারে নাই; ধরা পড়িয়া এক্ষণে কাষ্ঠদণ্ডে বন্দী হইয়াছে। যদি তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার জন্য অর্থদণ্ড বহন না করে, তবে সে দাসরূপে বিক্রীত হইবে। যদি সে দেশে কাহারও দাসের প্রয়োজন না থাকে, তবে তাহাকে হত্যা করা হইবে। তাহার বন্ধুবর্গ তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। সে যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে পারিত, তাহা কেন চুরি করিতে গেল! সে কি বুঝিতে পারে নাই, যে তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল সে তাহার স্বামীর ফাঁদ মাত্র!

আবার এক এক দিন 'চণ্ডীমণ্ডপ'টি জুয়ার আড্ডায় পরিণত হয়। গ্রামের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞ বৃদ্ধ অতিরিক্ত বাজি রাখিয়া খেলিয়া যাইতেছে। মদের মাত্রা বেশী হওয়ায় নিজের অবস্থা ঠিক করিতে পারিতেছে না। তাহার মাদুর, অস্ত্রশস্ত্র, ছাগ, পক্ষী, আবাদ, গৃহ, যৌবনকালে যুদ্ধধৃত দাসদাসী, পত্নীর দল, পুত্রকন্যা, এমন কি যে মা তাহাকে স্তন্য দুগ্ধে পালন করিয়াছে—সব একে একে হারিয়া গেল। তখন তাহার চক্ষুঃ স্ফীত এবং রক্তবর্ণ হইয়াছে, হাত কাঁপিতেছে, তবুও এবার নিজকে বাজি রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিল। দক্ষিণ পদ হারিয়া গেল, না উদ্ধার করিয়া লইলেও তাহা নাড়িতে পর্য্যন্ত পাইবে না। অবশেষ দুই পদই হারিয়া গেল; দেহটা বাজি রাখিল, তাহাও হারিয়া গেল। সে এক্ষণে দাস, তাহাকে বিক্রয় করিবে।

আরও একটি দৃশ্য উদ্ধৃত করিব। কোনও এক বিবাহিত যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। সমস্ত গ্রামখানি ভয়ে ও দুঃখে অভিভূত। কারণ মানুষ

যে বৃদ্ধ না হইয়া মরিবে ইহা তাহাদের ধারণায় অস্বাভাবিক। ইহাতে কোনও দুষ্টশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তবে কি সে না জানিয়া কোনও দুষ্ট ভূতের কোপে পতিত হইয়াছিল? না, ইহা কোন ডাইনীর কর্ম্ম? প্রসিদ্ধ মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ ভুতুড়িয়াকে ডাকিয়া পাঠান হইল। শীঘ্রই তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মায়া-টুপিতে বড় বড় পালক, পরিধানে নানাবর্ণের পরিচ্ছদ এবং সর্ব্বাঙ্গে মন্ত্রগুণ-বিশিষ্ট বহুপ্রকার দ্রব্য যথা—একজাতীয় পার্ব্বত্য জন্তুর শিং, শামুকের খোলা, একপ্রকার বিষবৃক্ষের পাতায় মোড়া চিতাবাঘের যকৃৎ ইত্যাদি। তাহার মুখে মৃতদেহের মস্তিষ্করসের শাদা প্রলেপ। গ্রামে প্রবেশ করিবার সময়ে সে এক লৌহঘণ্টা বাজাইতে থাকে; সেই সময়ে আবার ঢাক বাজিয়া উঠে। ঢাকের শব্দ অনেক প্রকার। এই শব্দের সাহায্যে দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা ব্যাপার কি বুঝিতে পারে। তালে তালে উত্তেজনাপূর্ণ বাদ্য হইলে নাচের নিমন্ত্রণ বুঝিতে হইবে। গভীর বজ্র নির্ঘোষের মত শব্দ হইলে যুদ্ধ বা অগ্নিভয় বুঝিতে হইবে—তখন অতি উচ্চে ও দ্রুত তালে বাজিতে থাকে। আবার এখন যেরূপ বাজিতেছে তাহাতে কাহারও বিচার এবং আসন্নমৃত্যু সূচিত হইতেছে। ভুতুড়িয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিল; বলিল,—ডাইনীতে এরূপ করিয়াছে। তখন গ্রন্থিযুক্ত একটি দড়ি লইয়া সে গণনা আরম্ভ করিল। কত মন্ত্র পড়িল, তাহার পর গ্রামস্থ সকলের সম্মুখে একবার ঘুরিয়া গেল এবং অবশেষে একজনকে দোষী বলিয়া দেখাইয়া দিল। এরূপ স্থলে সচরাচর এরূপ কোনও বৃদ্ধা স্ত্রীলোককেই দেখাইয়া দেওয়া হয়, যাহাকে পূর্ব্ব হইতেই সকলে সন্দেহ করিয়াছে এবং দণ্ড দিবার জন্য প্রস্তুত। তাহাকে কিন্তু পরীক্ষায় নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে দেওয়া হয়। একটি অলাবু পাত্রে তাহাকে 'লালজল' পান করিতে বলা হয়। যদি সে নির্দ্দোষী হয়, তবে তাহা বমি হইয়া যাইবে। যদি দোষী হয়, তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইবে। তখন তাহাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলা হয়। সমস্ত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া বা পুড়াইয়া ফেলা হয়। নদীতে অল্পজলে বাঁধিয়া রাখা হয়, জোয়ার আসিলে ডুবিয়া মরিবে। সর্ব্বাঙ্গে মধু মাখাইয়া প্রখর রৌদ্রে ফেলিয়া রাখে অথবা তাহাকে একটা পিপীলিকার গহ্বরে পুঁতিয়া ফেলা হয়।

মোটের উপর এই অসভ্য জাতির জীবনে সুখ অল্প। তাহারা সর্ব্বদাই ভয়ের মধ্যে বাস করিতেছে। প্রাতঃকালে পুরুষেরা যখন শিকারে বাহির হয় বা স্ত্রীলোকেরা নদীতে জল আনিতে যায়, তখন তাহারা যে আবার গৃহে ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই। চারিদিকে শত্রু বা হিংস্র বন্য পশু ওৎ পাতিয়া আছে। কখন যে গুপ্তস্থান হইতে আক্রমণ করিবে, তাহা কে জানে? ইহাত' বাহিরের অবস্থা। মানসিক অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহাদের অপরিণত মস্তিস্কশক্তি এক অন্ধ কারাগার গড়িয়া তুলিয়াছে। চারিদিকে বিভীষিকা, ভূত প্রেত তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে। তাহারা আপনি আপনার জন্য যে কুসংস্কার ও বিকৃতকল্পনার জাল বুনিয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং আজীবন আপনার শাসনে আপনি পীড়িত হইয়া মৃত্যুর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

প্রেম-প্রতিমা।

১

আমি দেখিতাম শুধু তারে!
মধুর চাঁদনীময়ী গভীরা যামিনী!
শশধর হাসিত অম্বরে!
সে তখন ধীরে ধীরে, এ'সে এই নদী তীরে
গাইত প্রেমের গীত মাতায়ে ধরণী!
তাহার মধুর স্বরে,
মুকুতা পড়িত ঝ'রে,
নীরবে বহিয়া যে'ত আকুলা তটিনী!
আমি দেখিতাম শুধু তারে!

২

সে আমার সুখে দুঃখে প্রাণের সঙ্গিনী!
তারি তরে বেঁচে আছি ভবে!
জীবন জলধি পাড়ে,　　আর কি পাইব তারে;
এক দুই ক'রে আমি মাস দিন গণি!

সে চাঁদ উঠে না আর,
ঢালে না সে সুধা ধার,
আমি তার সে আমার শুধু এই জানি!
সে আসিবে কবে!

৩

তাহারি চরণ চুমি বন-কমলিনী
ফুটিয়া উঠিত থরে থরে!
সে নিতি উন্মুক্ত কেশে, ফুল-রাণী বেশে এ'সে
দাঁড়াইয়া এই সরঃ তীরে!
গাইত প্রেমের গান,
আকুল করিয়া প্রাণ
বিহগ শিখিত সেই প্রেমের রাগিণী!
আমি দেখিতাম সুধু তারে!

৪

সে সদা কুসুম-সাজে এলাইয়া বেণী!
আমার এ প্রাণ নিত কে'ড়ে!
চারি ধারে পুষ্প-তরু, বায়ু ব'ত ঝুরু ঝুরু
কোকিলা তুলিত কত "কুহু কুহু" ধ্বনি!
হেরি তার রূপ রাশি,
হেরি তার প্রেম-হাসি,
পাপিয়া আকুল প্রাণে হ'ত পাগলিনী!
আমি দেখিতাম শুধু তারে!

৫

তাহারি রূপের ছটা উজলি ধরণী
ঝরিয়া পড়িত চারি ধারে!
আকাশে চন্দ্রমা তারা, তারি প্রেমে মাতোয়ারা,
নয়নে খেলিত তার চঞ্চলা দামিনী!
বুকেতে অমৃত-খনি,
কণ্ঠে সুধা-নিঝ'রিণী
সৌন্দর্য্য সরসে সে যে ফুটন্ত নলিনী!
আমি দেখিতাম শুধু তারে!

কায়কোবাদ।

রত্ন-চয়ন।

ধর্ম্ম কি ও তাহার মূল কোথায় ?

(কাউণ্ট টলষ্টয়ের ইংরাজি অনুবাদ হইতে।)

৬

মানব সকলের মধ্যে অসমতা শুধু যাজকবৈষয়িকভেদে নহে, ধনীনির্ধন-ভেদে, প্রভুভৃত্যভেদে, অন্যান্য ধর্ম্ম যেরূপ নির্দ্দিষ্ট ও প্রকটভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাজকীয় খৃষ্টানধর্ম্মও সেইরূপ করিয়াছে। তত্রাচ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আদিম শিক্ষা সম্বন্ধে সুসমাচার গ্রন্থগুলি হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, সেই জ্ঞান অনুসারে বিচার করিলে মনে হয়, যে যে প্রধান প্রধান উপায়ে অন্যান্য ধর্ম্মের অধঃপতন সাধন করা হইয়াছিল, সেই সেই উপায় সম্বন্ধে যেন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্থাপক পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তাহাই বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের সম্বন্ধে পরিষ্কার সতর্কবাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন। যাহাতে ভবিষ্যতে একটি পুরোহিত সম্প্রদায় গঠিত হইয়া না উঠে তাহার জন্য সোজাকথায় বলা হইয়াছিল যে, কেহ যেন কাহারও গুরু হইয়া না দাঁড়ায় (যথা—'কাহাকেও তোমার ফাদার বা ধর্ম্মপিতা বলিও না—অথবা তোমারাও কেহ যেন প্রভু বলিয়া অভিহিত হইও না')। গ্রন্থবিশেষকে আপ্ত বাক্য বলিয়া গণ্য করা না হয় এজন্য বলা হইয়াছিল—কথার ভাবই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়—অক্ষর নহে ; বলা হইয়াছিল পুরুষ-পরম্পরাগত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে ; আরও বলা হইয়াছিল যে যাবতীয়, পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশবাণীকে এই একটিমাত্র কথায় নিবদ্ধ করা যাইতে পারে—অন্যের নিকট হইতে তুমি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাহার প্রতিও সেইরূপ কর। অলৌকিক কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে যদিও কোন কথা লিপিবদ্ধ নাই, এবং এমনকি সুসমাচার পুস্তকগুলিতে পর্য্যন্ত এরূপ কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য বর্ণিত আছে, যাহা যীশুখৃষ্টের নিজের কৃত বলিয়া লোকে মনে করে। তবুও যীশু যে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ করিতে যাইয়া কতকগুলি কুহকরহস্যের উপর দণ্ডায়মান না হইয়া বরং তাঁহার ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔদার্য্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শিক্ষার মূলসূত্রটি হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় ('যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা সাধন করিতে আগ্রহান্বিত হয়, এই

শিক্ষার মর্ম্ম তাহার বোধগম্য হইবে, সে ইহা ঈশ্বরের বাণী কি আমার বাণী ইহা লইয়া কোন ইতস্ততঃ করিবে না')। মোটের উপর, খৃষ্টান-ধর্ম্ম মানবসাধারণের সাম্যের ভাবকে আর পূর্ব্বের ন্যায় অনন্তের সহিত মানুষের সম্বন্ধের মূলভাব হইতে পরিগৃহিত সিদ্ধান্তবিশেষরূপে জগতের সম্মুখে প্রচার না করিয়া, এই সাম্যের ভাবটিকেই সমস্ত মনুষ্যের ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই ভ্রাতৃভাব—মানবসমুদায়কে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারিলে, সহজেই প্রতিভাত হয়।

এই জন্যই, খৃষ্টানধর্ম্মের যে এরূপ দারুণ অধঃপতন সংঘটিত হইবে, খৃষ্টানধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ মানবসমুদায়ের সাম্যের শিক্ষা যে এইরূপে পদদলিত হইবে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি বড় চপল। এমন এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবিত হইল (জ্ঞাতসারেই বা অজ্ঞাতসারেই হউক) যাহার তমসজালে সুসমাচার বহিগুলিতে লিপিবদ্ধ সতর্কবাক্যগুলি ও মানবসমুদায়ের সাম্যের এই সরলশিক্ষা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই কৌশল প্রভাবে প্রথমতঃ কতকগুলি গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করা হইল। পরে কতকগুলি মানুষকেও অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইয়া যাজক সম্প্রদায় গঠিত হইল। স্বকীয় মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই যাজক সম্প্রদায় অভ্রান্ততার অধিকার বিস্তার করিতে পারিবে ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া হইল।

সুসমাচার বহিগুলিতে কিছু জোড়াতাড়া লাগান হইল। এইরূপে গল্প ফাঁদা হইল যে যীশু স্বর্গে প্রতিগমনের প্রাক্কালে কতকগুলি লোককে তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তারের একমাত্র অধিকার দিয়া গিয়াছেন। পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষাদানই যে তাহাদের একমাত্র কার্য্য এরূপ নহে। কোন্ কোন্ লোক মার্জ্জনার অধিকারী হইবে ও কাহারা হইবে না তাহা নির্দ্ধারণের ভারও তাহাদের উপর থাকিবে; আরও এই শেষোক্ত ক্ষমতা তাহারা ইচ্ছানুসারে অন্যকেও প্রদান করিতে পারিবে। (সুসমাচার গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ অনুসারে যীশু তাহাদিগকে আরও একটি অধিকার প্রদান করিয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। সর্পদংশনে বা বিষপ্রয়োগে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইবে না, ইহাই এই অধিকার। সচরাচর এই অধিকার খাটান হয় না *)। ফলে দাঁড়াইল. যে মুহূর্ত্তে একটি কলেবর-

* 'সমস্ত পৃথিবীতে তোমরা প্রবেশ কর, এবং সুসমাচার প্রচার কর......এবং বিশ্বাসিগণের

বদ্ধ যাজকসম্প্রদায়ের ধারণা সমাজে বদ্ধমূল হইল, সেই মুহূর্ত্তেই খৃষ্টের ধর্ম্মমতকে দুর্নীতির কলুষপঙ্ক হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত সতর্কবাণী উক্ত হইয়াছিল তাহা ধূলিসাৎ হইয়া পড়িল। মানুষের বিচারশক্তি অপেক্ষা, পবিত্র বলিয়া সম্মানিত ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা, যাজক সম্প্রদায়ের মতাদির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। যুক্তিতর্ক পাপমূলক বলিয়া লোকে মনে করিল, এবং সহজ জ্ঞানানুসারে সুসমাচার বহিগুলির ব্যাখ্যা না করিয়া যাজক সম্প্রদায়ের সুবিধা অনুসারে সে গুলির ব্যাখ্যা করা হইল।

এইরূপে ধর্ম্মের অধঃপতন সাধনের পূর্ব্বকথিত তিনটি উপায়—পৌরাহিত্য, অলৌকিক কার্য্য, এবং ধর্ম্মগ্রন্থের অভ্রান্ততা—এই তিনটি উপায়ই খৃষ্টানধর্ম্মের মধ্যে সবলে আধিপত্য বিস্তার করিল। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে অনেকগুলি মধ্যবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা করা হইল। যেহেতু যাজক সম্প্রদায় এইরূপ কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী স্থাপনের উপযোগীতা ও সমীচীনতা বুঝিতে পারিল। অলৌকিক কার্য্যকলাপের সত্যতা স্বীকৃত হইল, যেহেতু অভ্রান্ত যাজকসম্প্রদায় তাহাতে একযোগে সাক্ষ্য দিল। বাইবেলের পবিত্র অপার্থিবত্বও স্বীকৃত হইল, যেহেতু যাজক সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিল।

এইরূপে অন্যান্য ধর্ম্ম যেরূপে অধঃপতিত হইয়াছিল, খৃষ্টান ধর্ম্মও সেইরূপে অধঃপতিত হইল। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মের অধঃপতনের সহিত তুলনায় খৃষ্টানধর্ম্মের অধঃপতনের এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। খৃষ্টানধর্ম্ম অতি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের সন্তানস্বরূপে সমস্ত মানুষের সমতাকে উহার ভিত্তি-মূলক ধর্ম্মমত বলিয়া ঘোষনা করিয়াছিল। এই জন্যই এই ভিত্তিমূলক ধর্ম্মমত বিনষ্ট করিতে যাইয়া বিনষ্টকারীদিগকে খৃষ্টের সমস্ত শিক্ষার একযোগে উৎসন্ন সাধন করিতে হইয়াছিল। এই কলেবরবদ্ধ, ধর্ম্ম-শিক্ষাদানের একমাত্র অধিকারী, ভুলভ্রান্তি-অন্যায়-অধর্ম্মের গ্রাস হইতে চিরনির্ম্মুক্ত যাজকসম্প্রদায়ের প্রভাববশতঃই অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অধঃপতন বড় গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। এই হেতুই বাস্তবিকপক্ষে যাজকীয় খৃষ্টধর্ম্ম যত অন্যায়, অসঙ্গত, সমসাময়িক-জ্ঞান-বিরুদ্ধ প্রবচনকে ধর্ম্মমত বলিয়া প্রচার করিয়াছে, এত আর কোন ধর্ম্ম করে নাই।

এই সকল লক্ষণ থাকিবে; আমার নামে......তাহারা সর্প হাতে লইবে; এবং যদি তাহারা কোন প্রাণনাশক পাদার্থ পান করে, তাহাদের কোন অনিষ্ট হইবে না।

—মার্ক। ১৬শ।১৫-১৮।

ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বা প্রাচীন-বিধান-পুস্তকে ত ভূরি ভূরি অসম্ভব কাল্পনিক ঘটনা নিরাপদে স্থান পাইয়াছে। সূর্য্য সৃষ্টির পূর্ব্বে আলোকসৃষ্টি হইল, ষষ্ঠিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, নোহার তরণীতে যাবতীয় জীবজন্তুর স্থান সংকুলান হইয়াছিল। অনেক ভীষণ অধর্ম্মের কথা পর্য্যন্ত সহজ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যেমন 'ঈশ্বরাদেশে নিঃসহায় শিশুগণের ও একটি সমগ্র লোকসমাজের নিপাত করা হইল।' তারপর যীশুর মৃত্যু-স্মৃতি-উপলক্ষে পিষ্টক-মদিরা ভক্ষণের অলীক স্যাক্রামেণ্ট (Sacrament) প্রথা ত সমাজের প্রচলিত অবশ্য প্রতিপাল্য রীতি হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় এই স্যাক্রামেণ্টপ্রথার উল্লেখ করিয়া ভলটেয়ার (Voltaire) বলিতেন যে, জগতে অনেক অন্যায় অসম্ভব ধর্ম্মমত স্থান পাইয়াছে. কিন্তু উপাস্য দেবতাকে ভক্ষণ করাই প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান, এরূপ বিসদৃশ ধর্ম্মমত কোথায় শুনা গিয়াছে? যাহা হউক এসব কথা লইয়া আমি এখানে আলোচনা করিব না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অসম্ভব মিথ্যা কথা আর কি হইতে পারে যে—উপাস্য দেবতার মাতা গর্ভ্ভধারিণী হইলেন অথচ কুমারী রহিলেন; আকাশ উন্মুক্ত হইল ও সেখান হইতে বাণী নিঃসৃত হইল; যীশু উড়িয়া স্বর্গে গেলেন এবং সেখানে তাঁহার পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন; ঈশ্বর এক এবং তিন এই উভয়ই, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের মত তিন ঈশ্বর নহেন, এক অথচ তিন এই রকমের? ক্রুদ্ধ ও প্রতিহংসাপরায়ণ ঈশ্বর আদমের পাপের জন্য সমস্ত মানবজাতির দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তারপর মনুষ্যকর্ত্তৃক যীশুর প্রাণনাশ ও তাহার ফলে মানুষের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ সম্বন্ধে বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই অবগত থাকিয়াও যীশুকেই মানবোদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলেন—এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা অপেক্ষা অধর্ম্মের কথা আর কি হইতে পারে? আরও, পবিত্র জলে স্নান করিয়া খৃষ্টান-ধর্ম্মগ্রহণ ব্যতীত মুক্তির আর আশা নাই, পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবচন সমূহে অচল বিশ্বাস স্থাপন না করিলে কাহারও উদ্ধার হইবে না এবং মানুষের উদ্ধারোদ্দেশেই ঈশ্বর-পুত্রের প্রাণনাশ সংঘটিত হইয়াছিল এ কথায় পুরা আস্থাস্থাপন ব্যতীত এবং যে কেহ ইহা অবিশ্বাস করিবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহাকে ভীষণ যন্ত্রনাভোগ করিতে হইবে এই কথা স্বীকার করা ভিন্ন কেহ পাপমুক্ত হইবে না—এই সমস্ত বাক্য অপেক্ষা অন্যায় বাক্যই বা কি হইতে পারে?

এই হেতু খৃষ্টানধর্ম্মের মূল ধর্ম্মমতগুলির অনুসংশ্লিষ্ট যে সমস্ত পদার্থকে কেহ কেহ উত্তরকাল-প্রসূত নব সংযোজনা বলিয়া মনে করেন, ('যেমন স্মৃতিচিহ্নরূপে রক্ষিত মহাপুরুষগণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, ভিন্ন ভিন্ন আকারে নির্ম্মিত ঈশ্বরমাতা মেরির মূর্ত্তিসমূহ, * স্বার্থের বাসনায় বিশেষ বিশেষ প্রভাববান সাধুপুরুষের উদ্দেশ্যে পঠিত প্রার্থনা সমূহ ; প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্ম-কথিত মানবগণের পূর্ব্ব-নিরুপিত দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট লইয়া জন্মগ্রহণের কথা এখানে না তুলিলেও চলে) সে সমস্ত একেবারে বাদ দিলেও এই ধর্ম্ম দোষস্পর্শ শূন্য হয় না। নিকিয়ার সভায় (Council of Nicaea) সমবেত ধর্ম্মপ্রধানগণ খৃষ্টান-ধর্ম্মের ভিত্তিমূলক উপদেশরূপে যে সকল মানিয়া লইয়াছিলেন এবং যে সকল উপদেশ এখন নিসিয়ার বিধানের (Nicene Creed) মধ্যে সংগৃহিত আছে, খৃষ্টানধর্ম্মের সেই প্রধান শিক্ষাগুলির সম্বন্ধে কি বলিতে হইবে? সেই মূল উপদেশগুলি এরূপ বিসদৃশ ও জঘন্য, সৎপ্রবৃত্তি ও ও সহজবুদ্ধির এত বিরুদ্ধ যে মানুষ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। মানুষ তাহার ওষ্ঠের সাহায্যে যে কোন রকমের বুলি আওড়াইতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ের কোন অর্থ নাই তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারে না। ওষ্ঠের সাহায্যে আওড়ান যাইতে পারে যে 'পৃথিবী ষষ্টি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল ইহা আমি বিশ্বাস করি' অথবা 'যীশু আকাশে উড়িয়া গিয়া পিতৃ-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ইহা আমি বিশ্বাস করি' অথবা 'ঈশ্বর এক এবং একই সময়ে তিন'—কিন্তু এ সমস্ত কথায় বাস্তবিক কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না, কারণ ইহারা অর্থশূন্য। এইজন্যই বলিতে হয়, আধুনিক জগতের যাহারা আপনাদিগকে এই অধঃপতিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কিছুই বিশ্বাস করে না ; এবং ইহাই আমাদের কালের আশ্চর্য্য লক্ষণ।

নবীনওয়াজ খান।

—

* কাজান, আইবিরিয়ান ও অন্যান্য ঈশ্বর-মাতার প্রতিমূর্ত্তি, যিশুমাতা মেরির ছবিমাত্র রুশিয়া দেশে লোকে এই সমস্ত ছবিতে অনেক অলৌকিক শক্তি আরোপ করিয়া থাকে।

জেব-উন্নেসা বেগম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

জেব-উন্নেসার শৈশবাবস্থাতেই দারা শেকুর পুত্র সোলেমান শেকুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের রসাস্বাদন করিবার পূর্ব্বেই রাজনৈতিক বিসম্বাদের ফলে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটে। জেব-উন্নেসা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া যখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারেন, তখন সেই দয়াবতী মহিলারত্ন পতি—পিতৃব্য—দেবর ও ভ্রাতৃগণের শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবিয়া হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেন। তাঁহার অন্তঃকরণে অভাবনীয় বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তাই তিনি আর বিবাহ না করিয়া পৃথিবীর পাপতাপ হাহাকার ও স্বার্থপরতার লহরী-মালা দেখিতে দেখিতে জীবনাতিবাহিত করিতে স্থিরসংকল্প হন। সম্রাট আলমগীর কন্যাকে পুনরায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পরিলেন না। একবার আওরঙ্গজেব পারশ্যসম্রাটের কবিত্বশক্তিশালী সুপণ্ডিত এক পুত্রকে জেব-উন্নেসার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য আগ্রায় আনয়ন করেন। কিন্তু জেব-উন্নেসা উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হন। আলমগীর অত্যন্ত পিড়াপিড়ি করিলে জেব-উন্নেসা বলিলেন, "অবশ্য আমি পারশ্যশাহ্‌জাদাকে বিবাহ করিতে পারি, যদি তিনি আমাকে পাণ্ডিত্যযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন, নতুবা নহে।"

দরবার আহূত হইল; পাণ্ডিত্যআহব আরম্ভ হইল। কিন্তু পারশ্যশাহ্‌জাদা পরাজিত হইলেন। সেই তর্কযুদ্ধে যে সমস্ত কবিতা দ্বারা যুদ্ধ হইয়াছিল, এস্থলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা প্রদান করিতেছি। ইহা হইতেই জেব-উন্নেসার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও সরস রসিকতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

যখন দরবার আহ্বান করা হইল, তখন যে মহলে দরবার বসিয়াছিল তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে জেব-উন্নেসা ছিলেন। দরবারগৃহটি অনা-বৃত ছিল এবং একপার্শ্বে পর্দ্দার অন্তরালে জেব-উন্নেসা ও অন্যান্য বেগমগণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জেব-উন্নেসা কঠিন অবরোধপ্রথার বিরোধী ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতিণী ছিলেন। দরবারের একপার্শ্ব দিয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে সকলের সম্মুখ দিয়া তাঁহার যাইবার সময় পারশ্য শাহ্‌জাদা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"সোবারা শরম মিআয়েদ বরুয়ে গুল নেগাহ্ করদন।"

অর্থাৎ "পুষ্পের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে উষা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতেছে।"

জেব-উন্নেসা তাঁহার কবিতার মর্ম্ম বুঝিলেন এবং সকলের সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন বলিয়াই যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন তিনি চলিয়া যাইতে যাইতে কবিতার অপরাংশ এইরূপ ভাবে পূর্ণ করিলেন--

"কে রেখ্‌্তে গোঞ্চারা দাহ্ করদ নাতওয়া নাস্ত তেহ্ করদন॥"

"কেননা প্রাণপণ চেষ্টাতেও প্রসূনের আবরনকে বিদূরিত করিতে অক্ষম। (তাই উষা লজ্জায় ম্রিয়মাণ)।"

যাহা হউক অনেক তর্কবিতর্ক--প্রশ্নোত্তররূপ যুদ্ধের পর পারশ্যশাহ্‌জাদা পরাজিত ও ভগ্নমনোরথ হইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে যখন দরবারগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে ছিলেন, তখন মনের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া এই কবিতা উচ্চারণ করিলেন--

"মোকরর্‌র কর্‌দম ইঁ দরদেল আজিঁ দরগা না খাহামরফ্‌ত।

সর ইঁজা সেজদা ইঁজা বন্দেগী ইঁজা করার ইঁজা।"

অর্থাৎ "মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, এ পবিত্রস্থান হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। মস্তক এখানে (রাখিয়া) সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত এখানেই করিব, কেন না আমার উপাসনাও এখানে, শান্তিও এখানে।"

জেব-উন্নেসা অবিলম্বে নিম্নলিখিত কবিতায় তাহার উত্তর প্রদান করিলেন --

"চে আসান দি দাই জাহেদ তরিকে এশ্‌ক বাজীরা।

তপ ইজাঁ, আ'তসে আখগর ইঁজা শোওয়ালা ওনার ইজাঁ।"

"হে ধার্ম্মিক প্রবর (এখানে) প্রেমরঙ্গ ব্যবস্থার তুমি কি সুখ দেখিয়া মোহিত হইয়াছ! অগ্নিকণাও এখানে, জলন্ত হুতাশনও এখানে আছে। শুধু) তাপ, অগ্নিকাণ্ড ও জ্বলন্ত হুতাশনের লহলহ শিখা॥"

পারশিকশাহ্‌জাদা অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

জেব-উন্নেসা বেগমের প্রত্যুৎপন্নমতি শক্তিও অসীম ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিপুল ধীশক্তির আভাস পাওয়া যাইত। বাল্যকালে একদা তিনি আগ্রার আকবরাবাদদুর্গে শাজাহানের মহলের নিকটবর্ত্তী স্থানে ক্রীড়া করিতেছিলেন। প্রাচীরের গাত্রে একটি ছিদ্র দেখিয়া বালিকাসুলভ চপলতাবশতঃ ঐ ছিদ্রে হস্তস্থিত লেখনী প্রবেশ করাইয়া অন্যমনস্কভাবে কথন

লেখনী ভিতরে দিতেছিলেন এবং কখনও বাহির করিতে ছিলেন। এবং এই বাক্যটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন—

"নিমে দরু নিমে বেঁরু।"

অর্থাৎ "অর্দ্ধেক ভিতরে, অর্দ্ধেক বাহিরে।"

পূর্ণবয়স্কা চপলমতি রহস্তপ্রিয়া পরিচারিকাগণ এই কথাটিকে অন্তভাবে গ্রহণ করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল এবং এতাদৃশ বাক্য বলার নিমিত্ত সম্রাট-তনয়াকে রহস্যবিদ্রূপ করিতে লাগিল কিন্তু জেব-উন্নেসা তখনও বালিকা, অস্ফুটন্ত কলিকা। তিনি পরিচারিকাগণের হাস্যবিদ্রূপের মূলকারণ অবশ্য বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এইমাত্র মনে মনে অনুভব করিলেন যে, একট কোন অন্যায় কথা বলিয়াছেন এবং তজ্জন্যই পরিচারিকাগণ উচ্চহাস্যে মহল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। উচ্চ কোলাহল ও গোলযোগ শ্রবণকরিয়া অন্ধসম্রাট শাজাহান কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল, কেহই কিছু বলিতে পারিল না। বৃদ্ধ শাজাহান তদীয় পৌত্রীকে আনিয়া কৌতুহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেব-উন্নেসা তুমি কি বলিতেছিলে?" মনস্বিনী বালিকা জেব-উন্নেসা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা! আমি বলিতেছিলাম যে—

"আজ্ হয়বতে শাহজাহাঁ লরজদ জমিঁ ও আছমাঁ।
আঙ্গোস্ত হয়রৎ দর দাহাঁ নিমে দরু নিমে বেরুঁ॥

"শাহ্জাহানের ভয়ে স্বর্গমর্ত্ত প্রকম্পিত হইতেছে। (সকলে) আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুখে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দন্তদ্বারা অঙ্গুলী কাটিতেছে; (সেই অঙ্গুলী) অর্দ্ধেক ভিতরে, অর্দ্ধেক বাহিরে।"

সম্রাট অতীব প্রীত হইয়া জেব-উন্নেসাকে ক্রোড়ে ধারণ করত চুম্বন করিলেন। এবং তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

নূরুল হোসেন কাশীমপুরী।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩১৯। [৫ম সংখ্যা।

আবাহন।

হে কল্যাণী, কবি-প্রিয়া, স্বর্গলোক হ'তে
মর্ত্ত্যবাসী কবি প্রতি চাহ একবার ;—
বক্ষ ভরা ব্যথা লয়ে দগ্ধ মরু-পথে
ফিরিব নিঃসঙ্গ কাঁদি কত কাল আর !

তুমি এস আজি দেবী, শারদ ঊষায়
সুমধুর সুনির্ম্মল রশ্মি-রেখা ধরি',—
তব পুণ্য-প্রভা মোর তমান্ধ হিয়ায়
সহস্র সুবর্ণ-ধারে পড়ুক ঠিকরি' !

তুমি এস সুধা-স্পর্শ স্নিগ্ধ সমীরণে
দোলাইয়া তরঙ্গিয়া কোমল অঞ্চল ;
তুমি এস বিহঙ্গের গীতি-প্রস্রবণে
মুছাইয়া অন্তরের বেদনা সকল !

তুমি এস প্রসূনের ফুল্ল হাসি ভরি'
প্রীতি-প্রেমে লই তোমা আলিঙ্গন করি !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কোরান শরীফের নীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ধর্ম্মকর্ম্ম চারিটি। নমাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। এই গুলিও নীতির সহিত সুজড়িত এবং নৈতিক জীবন গঠনের সহায়। নমাজ বা উপাসনার দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। (১) আল্লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। যিনি আমার অস্তিত্বের কারণ, আমার সর্ব্ব-সুখের বিধায়ক, তাঁহার নিকট ভক্তিভরে মস্তক অবনত করার নাম উপাসনা।

[ধর্ম্ম কর্ম্ম।]

আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেন, "নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমা ব্যতীত উপাস্য নাই; অতএব আমাকে অর্চ্চনা কর এবং আমার স্মরণের জন্য নমাজ প্রতিষ্ঠিত রাখ।" (সুরা তাহা, ১।১৫) আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা হইতে আমরা মনুষ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে শিক্ষা পাই। (২) আল্লার নৈকট্য অনুভূতি। "আমি গ্রীবার শিরা অপেক্ষা মনুষ্যের নিকটবর্ত্তী।" (সুরা কাফ) আল্লাহ্ তা'লা এত নিকটবর্ত্তী হইলেও সর্ব্বদা আমাদের তাহা স্মরণ থাকে না। যদি স্মরণ থাকে তবে আমরা তিমিরাবৃতা রজনীতে কিংবা নির্জ্জন প্রদেশে কোন স্থানে কখনই কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারি না। নমাজে প্রত্যহ পাঁচ বার আল্লার সান্নিধ্যানুভূতির অনুশীলন হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সেই ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। তখন উপাসক পাপ হইতে বিরত না হইয়া থাকিতে পারে না। নমাজের ফল সম্বন্ধে স্বয়ং পবিত্র কোরানই বলিতেছেন,—"নিশ্চয় উপাসনা নির্লজ্জ ও ঘৃণিত কার্য্য হইতে রক্ষা করে।" (সুরা অন্‌কবুৎ) যে ব্যক্তিকে প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ বার আল্লার দরবারে উপস্থিত হইতে হয়, সে কি প্রকারে পাপে নিমজ্জিত হইতে পারে ?

উপবাসে তিনটি নৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। (১) আল্লার প্রতি ভাল-বাসা উৎপাদন। (২) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। (৩) পাপাভ্যাস ত্যাগ। (১) নিতান্ত ভালবাসার পাত্র না হইলে কেহ কাহারও কথায় পানভোজন ত্যাগ করে না। রোজায় যখন কোন জোর জবরদস্তি নাই, তখন আল্লার প্রতি কাহারও ভালবাসা না থাকিলে এরূপ কষ্ট স্বীকারে কেহ অগ্রসর হয় না। অন্ততঃ এইরূপ উপবাস করিতে করিতে আল্লার প্রতি স্বতঃই ভালবাসা আসিয়া উপস্থিত হয়। (২) ক্ষুধাতৃষ্ণায় ধৈর্য্য ধারণ দ্বারা কষ্টসহিষ্ণুতা এবং ইন্দ্রিয়সংযমের অভ্যাস

জন্মে। আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেন, "হে বিশ্বাসিগণ, যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের জন্য রোজা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে তোমরা ধার্ম্মিক হইবে।" (সুরা বকর, ২৩।১৮৩) যখন প্রত্যেক সৎকার্য্যে ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক, তখন ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যস্ত হইলে সৎকার্য্য করা বাস্তবিকই সহজ হইয়া উঠে। (৩) একাদশ মাসে আমাদের কতকগুলি কদভ্যাস জন্মে। অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে জীবনযাত্রার প্রণালীও কিছু পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। নতুবা, আমার জীবন যে ভাবে চলিতেছিল, আমি সেই ভাবেই চলিব, অথচ কদভ্যাস ত্যাগ করিব, ইহা অতি অসম্ভব ব্যাপার। যিনি কখনও চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত আছেন। যদি কেহ এক মাস কাল পাপত্যাগ করে কিংবা পাপত্যাগের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে, তবে তাহার মধ্যে এমন একটি উত্তম অভ্যাসের উদ্ভব হইবে, যাহা তাহাকে রোজার পরেও পাপ হইতে রক্ষা করিবে। যদি আবশ্যক হয় তবে কেহ অতিরিক্ত (নফল) রোজা করিতে পারে। আমি রোজা আছি, ইহা প্রত্যেক ব্রতধারী ব্যক্তির মনে থাকে। রোজার সময় কোন পাপকার্য্য করিতে নাই ইহা যে ব্যক্তি জানে, সে কখনই অনায়াসে পাপকার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং পাপত্যাগের অভ্যাস গঠিত হয়। এই জন্য হজরত মোহাম্মদ (দ) বলিয়াছেন, "রোজা ঢাল স্বরূপ।"

হজের তিনটি অতি মহান্ উদ্দেশ্য আছে। (১) আল্লাহ্ প্রেম (২) মুসলমানদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব (৩) পাপাভ্যাস ত্যাগ। (১) এই যে অতি দূর-দূরান্তর হইতে হজ যাত্রিগণ প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকার করিয়া গিরি-নদী-মরুভূমি অতিক্রম করত গৌরবান্বিত মক্কা ধামে উপস্থিত হয়, ইহা কি প্রেমময়ের প্রতি তাহাদের প্রাণের আকুল আকর্ষণের পরিচয় নহে? (২) যখন চীন, মঙ্গল, মালয়ী, জাভাবাসী, বর্ম্মী, সিংহলী, ভারতবাসী, আফগান, পারসী, তুর্কী, আরব, মিসরী, কাফরি, য়ুরোপীয় এবং মার্কিন মুসলমানগণ একই উদ্দেশ্যে একই ভাবে প্রণোদিত হইয়া একই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন স্বতঃই কি তাহাদের মুখ হইতে এই মহাবাণী নির্গত হয় না, "নিশ্চয়ই বিশ্বাসি-গণ ভাই ভাই"? (সুরা হোজরাত) (৩) যখন কোন পাপী হজযাত্রী হয়, তখন তাহার পাপ-স্মৃতির সহিত জড়িত সঙ্গিগণ ও পাপাচরণের ক্ষেত্র সমূহ তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া যায় এবং আত্মীয়পরিবার বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া আল্লার উদ্দেশে ছুটিয়া যাইতেছি এই ভাব তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা

জাগ্রত থাকে। সুতরাং তাহার পক্ষে পাপত্যাগ সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। হজ্ সম্বন্ধে কোরান শরীফের উক্তি এই—"হজ্ ক্রিয়ার মাস সকল নির্দ্ধারিত। অনন্তর যে ব্যক্তি তখন হজ্ কর্ম্মে ব্রতী হয়, সে হজ্ ক্রিয়াকালে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না ও দুষ্কার্য্য করিবে না, পরস্পর বিবাদ করিবে না এবং তোমরা যে সৎকর্ম্ম কর আল্লাহ্ তাহা জ্ঞাত হন; অপিচ পাথেয় গ্রহণ করিও, পরন্তু নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ পাথেয় ধার্ম্মিকতা এবং হে জ্ঞানবান্ লোকসকল তোমরা আমাকে ভয় করিও।" (সূরা বকর, ২৫।১৯৭)

জাকাত বা ধর্ম্মার্থ দান। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন মুসলমান বাৎসরিক আয়ের ১/৪০ ভাগ দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকে দান করিতে বাধ্য। ইহা খোদাতা'লার ইন্‌কম ট্যাক্স। জাকাতের সহিত যে নীতির নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে নিশ্চিত উপলব্ধি হইবে যে, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মকর্ম্ম নীতির প্রাণ স্বরূপ। হাদীস শরীফেও উক্ত হইয়াছে, "কলেমা (ধর্ম্মবিশ্বাসের বচন), নমাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত—এই পাঁচটির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।"

এক্ষণে আমরা কোরান শরীফের নীতির আলোচনা করিব। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নীতিগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—আত্ম সম্পর্কীয়, আত্মীয় সম্পর্কীয়, শত্রু সম্পর্কীয়, সাধারণ-ব্যক্তি সম্পর্কীয় এবং ইতর জন্তু সম্পর্কীয়।

আত্ম সম্পর্কীয় নীতি।

মানবের পক্ষে অন্যের প্রতি যেমন, তদ্রূপ নিজের প্রতিও কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। "এবং আপনাদের জীবনকে বধ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াবান্।" (সূরা নিসা ৫।১৯) কুপ্রবৃত্তি দমন নৈতিক জীবন লাভের একমাত্র উপায়। এই বিষয়ে পবিত্র কোরানে বহু আদেশ রহিয়াছে। "তুমি তাহাকে কি দেখিয়াছ যে স্বীয় বাসনাকে স্বীয় ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে?" (সূরা ফোরকান ৪।৪৫) "এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর স্থানে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং পাপ প্রবৃত্তি হইতে আত্মাকে রক্ষা করে, অনন্তর নিশ্চয়ই স্বর্গ তাহার আশ্রয়স্থান" (সূরা নাজি'আত) "বল, গুপ্ত পাপ প্ররোচকের অনিষ্ট হইতে মনুষ্যের প্রভুর—মনুষ্যের

রাজার—মনুষ্যের উপাস্তের আশ্রয় লই। যে (পাপ প্ররোচক) মনুষ্যের অন্তরে পাপ প্ররোচনা দান করে এবং যে জিন ও মনুষ্য জাতীয়।" (সুরা নাস)।

আত্মশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে কোরান শরীফে বহু বিধি আছে। "তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি কামনা করে যে, সম্পদের উদ্যানে আনীত হইবে? না না, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে যাহা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তাহারা অবগত আছে। (সুরা মারেয ২।৩৯) অর্থাৎ অপবিত্র শুক্র হইতে মনুষ্যের জন্ম। আত্ম-শুদ্ধি না করিলে কেহই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না। "এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তুমি তাহার অনুসরণ করিও না; নিশ্চয় চক্ষু ও কর্ণ এবং অন্তঃকরণ এ সকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করা হইবে।" (সুরা বনি ইস্রাইল ৪।৩৬) "(হে মোহম্মদ) বিশ্বাসী পুরুষদিগকে বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকল বদ্ধ করে ও স্ব স্ব গুপ্তেন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখে, ইহা তাহাদের জন্য বিশুদ্ধতর; তোমরা যাহা করিয়া থাক নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার তত্বজ্ঞ। এবং বিশ্বাসিনী নারীদিগকে বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকলকে বদ্ধ করে ও স্ব স্ব গুপ্তেন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখে এবং স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা হইতে ব্যক্ত হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত প্রকাশ না করে। (সুরা নূর ৪।৩০-৩১)।

শোক দুঃখে অভিভূত চিত্ত সৎকর্ম্মের অন্তরাল। এইজন্য কোরানে উক্ত হই-য়াছে, "এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ভয় ও অন্নাভাব ও ধনহানি ও প্রাণ-হানি এবং ফলহানি ইহার কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করি; এবং সহিষ্ণুদিগকে সুসংবাদ দান কর, যখন তাহাদের নিকট বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তাহারা বলে, "নিশ্চয় আমরা আল্লারই ও নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাগমন-কারী।" (সুরা বকর, ১৯।১৫৫—১৫৬) "এমন কোন বিপদ ধরাতলে ও তোমাদের জীবনে উপস্থিত হয় না যে, তাহা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থে (অদৃষ্টে) লিখিত হয় নাই; নিশ্চয় ইহা আল্লার পক্ষে সহজ। যেন তাহাতে যাহা নষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তোমরা শোক না কর এবং যাহা তোমাদের প্রতি সমাগত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আহ্লাদিত না হও। আল্লাহ্ সমুদয় গর্ব্বিত আত্মাভিমানীকে প্রেম করেন না। (সুরা হদীদ, ৩।২২—২৩)।

ক্রোধ বশতঃ হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। এইজন্য কোরান শরীফে ক্রোধদমন করিবার আদেশ আসিয়াছে। "যাহারা সুখে দুঃখে দান করে ও ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোককে ক্ষমা করে, আল্লাহ্ (সেই সকল) সৎকর্ম্মশীল লোককে ভালবাসেন।" (সুরা আলইম্রান, ১৪।১৩৪)।

পাপের প্রবর্ত্তক বলিয়া সুরাপান এবং দ্যূতক্রীড়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। "হে বিশ্বাসিগণ সুরা, দ্যূতক্রীড়া, দেবাধিষ্ঠানভূমি (নসব) এবং মূর্ত্তি (আজলাম) শয়তানের অপবিত্র ক্রিয়া ভিন্ন [অন্য কিছু] নহে। অতএব এগুলি হইতে নিবৃত্ত হও, হয় ত তোমরা মুক্ত হইবে। সুরা ও দ্যূতক্রীড়াতে তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন এবং তোমাদিগকে আল্লার স্মরণ হইতে ও উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখা শয়তান ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করে নাই, অনন্তর তোমরা কি নিবৃত্ত হইবে ?" (সুরা মায়দা, ১২।৯০—৯১)।

সাংসারিক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মানুষ অনেক দুঃখ ভোগ করে এবং সময় সময় অনেক দুষ্কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে হয়। তাই আল্লাহ্ তা'লা সংসার-পাশে আবদ্ধ মনুষ্যগণকে অনুজ্ঞা করিতেছেন, "নারীর প্রতি, সন্তানগণের প্রতি, পুঞ্জীভূত রজতকাঞ্চনভাণ্ডারের প্রতি, উত্তম অশ্ব, চতুষ্পদ এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি মনুষ্যের শারীরিক প্রেম সজ্জীকৃত, এ সকল পার্থিব জীবনের সম্পত্তি এবং আল্লার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন শুভ। (সুরাআল্‌ইমরান, ২।১৪) কিন্তু সংসার ত্যাগ করিতে কোরান শরীফে নিষেধ আছে। "হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ যাহা তোমাদের জন্য বৈধ করিয়াছেন, তোমরা সেই পবিত্র বস্তুকে অবৈধ করিও না এবং সীমা লঙ্ঘন করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারিগণকে ভালবাসেন না।" (সুরা মায়দা, ১২।৮৭) "বল, আল্লার সেই শোভাকে যাহা তিনি আপন সেবকদিগের জন্য বাহির করিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ উপজীবিকা সকল কে অবৈধ করিল ?" (সুরা এরাফ, ৪।৩৩)।

সাংসারিক ব্যয় বিষয়ে কোরান শরীফ অমিতাচারিতা ও কৃপণতা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেয়। "এবং যাহারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না ও কৃপণতা করে না এবং এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়।" (সুরা ফোরকান, ৬।৬৭)।

কোরান শরীফ গর্ব্ব ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়। "এবং লোকের প্রতি তুমি মুখ ফিরাইও না; এবং ভূমিতলে বিলাসের ভাবে পরিভ্রমণ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমুদয় বিলাসী অভিমানী লোককে ভালবাসেন না। আপন গতি সম্বন্ধে মধ্যপথ অবলম্বন কর। আপন স্বরকে নিম্ন কর। নিশ্চয় গর্দ্দভের শব্দ কুৎসিৎ শব্দ।" (সুরা লোকমান ২।১৮-১৯)।

ক্রমশঃ।

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

ফ্লোরা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নদী-নীরে।

"না, না ফ্লোরা, আর কেন? সব আশাই তো ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হই-তেছে! তবে আর কোন্ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় এ অভাগা বাঁচিয়া থাকিবে? ফ্লোরা, ফ্লোরা, আমায় সুখে মরিতে দাও।"

"কেন, কেন ক্লোডেন, তুমি অত অব্যবস্থিতচিত্ত হইতেছ? জীবন কি তোমার এতই বিড়ম্বনাময় হইয়াছে—"

"ফ্লোরা, তুমি এখনও বালিকা, কিন্তু তুমি তো জান যে এ অভাগাকে স্নেহ করিতে মাতা নাই, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্ব নাই, যত্ন করিতে ভগিনী নাই! কিন্তু ফ্লোরা, তোমাকে লাভ করিতে পারিলে আমি একাধারে সব পাইব মনে করিয়াছিলাম; তাহা যখন ভাগ্যবৈগুণ্যে ঘটিল না তখন আর এ ছার জীবন রাখিয়া কি করিব?"

"তবে আত্মহত্যাই স্থিরসঙ্কল্প! কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ তাহা কি তোমার বিদিত নাই? পরলোকের ভীষণ নরকাগ্নি কি তুমি জ্ঞাত নহ? এই কি তোমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় ক্লোডেন?"

"ফ্লোরা ইহলোকে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি—তোমাকে না পাইলে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে—নরকের ঘোর যন্ত্রণা বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অধিকতর তীব্র হইবে না। ফ্লোরা, আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি তুমি আর বাধা দিও না; তুমি হাসিমুখে বিদায় দিলে এ জ্বালাজর্জ্জরিত হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করে! ফ্লোরা, ফ্লোরা, নীরব কেন? সে সুখেও কি এ অভাগা বঞ্চিত হইবে?"

ফ্লোরা আর থাকিতে পারিল না; সে প্রথমে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা ক্লোডেনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল মাত্র, তাহা ব্যর্থ দেখিয়া আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিল "ক্লোডেন, ক্লোডেন, তবে কি অভাগিনীকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া যাইবে? আমি যে তোমা বই আর কাহাকেও জানি না ক্লোডেন! ক্লোডেন আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি পিতামাতা তো দূরের কথা সমস্ত পৃথিবী যদি প্রতিবাদী হয়, তবুও তুমি আমি এক। তোমার আমার মিলন বিধিনিয়োজিত; কার সাধ্য

তাহা খণ্ডন করে? ঐ অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তুমি আমি এক, পদপ্রান্তে প্রবাহিতা ঐ কলনাদিনী স্রোতস্বতীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তুমি আমি এক, ঐ উদীয়মান শশধরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তুমি আমি এক—জীবনে মরণে তুমি আমি এক! কার সাধ্য মোদের সে বিধিনিয়োজিত মিলনের অন্তরায় হয়?"

"তবে—তবে ফ্লোরা, চল আমরা পুণ্যালোক-উদ্ভাসিত সেই দেশে যাই—যথায় হিংসা নাই, দ্বেষ নাই,—যথায় পবিত্র প্রেমে প্রতিবন্ধকতা নাই,চল ফ্লোরা, আমরা সেই পবিত্র স্থানে মহাপ্রস্থান করি।"

"উত্তম তবে তাই হউক; চল প্রাণেশ্বর, সেই পবিত্র পুণ্যভূমিতে আমরা দু'টিতে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিয়া অপ্রতিহতভাবে তোমার পদসেবা করি গে।"

"ফ্লোরা, ফ্লোরা, তোমার ন্যায় এই ফুটনোন্মুখী কুসুমবল্লরী এ অভাগার সহিত ধরাপৃষ্ঠ হইতে অকালে ঝরিয়া পড়িবে ইহা ভাবিলেও যে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, ফ্লোরা!"

"ক্লোডেন, জীবনেমরণে পত্নী পতির অনুগামিনী; তুমি যথা আমি তথা, কার সাধ্য ইহাতে বাধা দেয়?"

"ফ্লোরা, ফ্লোরা তবে চল সেই মহা পুণ্যালয়ে প্রস্থান করি"—বলিতে বলিতে উভয়ে উভয়ের কটিদেশ ধারণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরক্ষণেই উত্তালতরঙ্গমালা তাহাদিগকে কোথায় লইয়া গেল কে জানে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়ে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ফ্লোরা ও ক্লোডেনের নাম বারম্বার উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাদের এক্ষণে পরিচয়ের আবশ্যক। উল্লিখিত ফ্লোরা স্কটলণ্ডের কোনও নগরের জনৈক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। একমাত্র সন্তান বলিয়া ফ্লোরা মাতাপিতার বড় আদরের ধন; বস্তুতঃ ফ্লোরা মাতাপিতার নয়নের পুত্তলি স্বরূপ। ফ্লোরাকে কিছুক্ষণ না দেখিলে তাঁহারা যেন পাগল হইয়া উঠেন। মাতাপিতার যত্নে ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় ফ্লোরা আজ সুশিক্ষিতা। তাহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর হইবে; কৈশোরে ও যৌবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। ফ্লোরা সুন্দরী—তন্বী; কিন্তু যৌবন সমাগমে তাহার সুকুমার দেহ দিন দিন সুগঠিত হইয়া উঠিতেছে। সে উন্নতদেহে মুক্তার ঢলঢল লাবণ্য ও হীরকের উজ্জ্বল

জ্যোতিঃর একত্র সমাবেশ বড়ই মধুরিমাময়—বড়ই শোভনীয়। নীলোৎপল সদৃশ আকর্ণবিস্তৃত বিশাল লোচনদ্বয়ের স্থির কটাক্ষ বড়ই চিত্তাকর্ষক। মস্তকের স্বর্ণাভ ঝল্‌মলে কেশরাজি বড়ই মনোমুগ্ধকর। এক কথায় ফ্লোরা মুনিজন-মনোহরা!

আর ক্লোডেন? ক্লোডেন সেই নগরের সম্ভ্রান্তবংশীয় জনৈক যুবক; তাহার বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ। ক্লোডেন তেজস্বী, নির্ভীক, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। বিশাল বক্ষঃস্থল, সুদীর্ঘ বাহু, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখশ্রী তাহার তেজস্বিতার পরিচায়ক। ক্লোডেনের পিতা একজন ধনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ক্লোডেনের পিতার সহিত ফ্লোরার পিতার বেশ সদ্ভাব ছিল। বাল্যকালে ক্লোডেন ও ফ্লোরা একই শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়ন করিত। তখন হইতেই তাহাদের সুকুমার হৃদয়ে কি একটা কিসের দাগ পড়িয়াছিল। কেহ কাহারো চক্ষুর অন্তরাল হইলে যেন তাহারা অস্থির হইয়া উঠিত। ফ্লোরার আয়ত নয়নদ্বয় ক্লোডেনকে দেখিতে বড় ভালবাসিত, তাহার ছোট হৃদয়খানি ক্লোডেনের কথা ভাবিতে বড় আরাম বোধ করিত; ক্লোডেনও তদ্রূপ। তাহাদের এইরূপ ভাবগতিক দেখিয়া ক্লোডেনের পিতা ও ফ্লোরার পিতা স্থির করিয়াছিলেন যে ক্লোডেনের সহিত ফ্লোরার বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে সুখী দেখিয়া, নিজেদের বার্দ্ধক্যকাল সুখে অতিবাহিত করিবেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহারা উহাদের পবিত্র প্রণয়ে বাধা দিতেন না। আর তাহাদের প্রণয়ও বাধা না পাইয়া অনবরুদ্ধ জলস্রোতের ন্যায় উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

ক্লোডেন যখন দ্বাদশ বৎসরের তখন ক্লোডেনের পিতা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে কোনও স্বাস্থ্যকর দ্বীপে গিয়াছিলেন। ক্লোডেনের লেখাপড়ার ক্ষতি হইবে বিবেচনায় এবং ক্লোডেনের আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই—ফ্লোরার পিতার হস্তে তাহার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে যখন তাঁহারা স্ববাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে কোনও স্থানে নিমজ্জমান শৈলস্তূপের সংঘর্ষে তাঁহাদের জাহাজের তলদেশ বিদীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অসম্ভাবিত বিপৎপাতে ক্লোডেনের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল; সেই দিন হইতে তাহার সুখ-সূর্য্যের অস্ত আরম্ভ হইল। বালক ক্লোডেন কিন্তু তখন তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক কিছুদিন ক্লোডেন ফ্লোরার পিতার গৃহে যত্নে ছিল, তৎপরে সে দিন দিন অনাদৃত হইতে লাগিল। প্রত্যহ

তাহাকে যে কত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত তাহার অন্ত নাই; বেচারা নীরবে সহ্য করিত! ক্লোডেন যে বুক পাতিয়া সে সব অকাতরে সহ্য করিত সে কেবল ফ্লোরার জন্য। ফ্লোরার জন্য সে সমস্ত সহ্য করিতে পারিত। মরুভূমিতে একটি মাত্র স্রোতস্বিনীর ন্যায় ফ্লোরার মধুমাখা কথাগুলি আর তাহার সুন্দর বদনখানি ক্লোডেনের উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিত। কিন্তু ক্রমে সে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল। একদিন ফ্লোরার পিতা ক্লোডেনকে বলিলেন, "ক্লোডেন, তুমি আর ফ্লোরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে না, যদি তোমাকে পুনরায় ফ্লোরার নিকট দেখি তবে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিব।"

ক্লোডেন আর সহ্য করিতে পারিল না, সে নীরবে গৃহত্যাগ করিল। এবং প্রাগুক্ত নদীতীরে যাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হইল। কিন্তু ফ্লোরা পিতার এই আসুরিক ব্যাপারের কথা জানিতে পারিয়া ত্বরিত পদে নদীতীরে উপস্থিত হইল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে পাঠক পাঠিকা অবগত আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অতীতালেখ্যে।

সে অনেক দিনের কথা। ফ্লোরা তখন বৎসর দশেকের হইবে, সুতরাং ক্লোডেন তখন চৌদ্দ বৎসরের। সেই সময়ে একদিন ক্লোডেন একাকী নিকুঞ্জ-কাননে বসিয়া নিজের ভাগ্যবিপর্য্যয় ভাবিয়া তীব্র অন্তর্দ্দাহনে দগ্ধ হইতেছিল; এমন সময় তাহার সেই নয়নানন্দদায়িনী, তাহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ দিক হইতে তথায় আসিয়া, স্বীয় মৃণালগঞ্জিত পেলব বাহুলতা দ্বারা ক্লোডেনের নয়নাবৃত করত কোকিল কণ্ঠে বলিল, "আমি কে বল দেখি?"

ক্লোডেন তখন তীব্র অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিল; ফ্লোরার বীণা ঝঙ্কারবৎ কথা শুনিয়া তাহার চিন্তা-বহ্নি-দগ্ধ হৃদয় শান্ত ও শীতল হইল। তখন ক্লোডেন ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে বলিল, "যে সুহাসিনী বাল্যকাল হইতে আমার অন্ধকারময় হৃদয়কন্দর সুমধুর হাস্যচ্ছটায় আলোকিত করিয়া আসিতেছেন, যে হৃদয়স্নিগ্ধকারিনী বাক্যসুধালহরী দ্বারা কৈশোর হইতে আমার সন্তাপিত প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, যে মনোমোহিনী মরুভূমিতে একমাত্র প্রস্রবণের মত আমার হৃদয়-মরুভূমি চিরকাল প্রেমাভিসিক্ত করিয়া আসিতেছেন সেই সুন্দরী-কুলগঞ্জনা-কারিনী সর্ব্বসন্তাপনাশিনী ফ্লোরা আজ আমার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধরিয়াছেন।"

ফ্লোরা। আচ্ছা ভাই ক্লোডেন, আমি যে তোমার চক্ষু ধরিয়াছি তাহা তুমি জানিলে কেমন করিয়া?

ক্লোডেন। যে আমার জাগরণে ধ্যান, যে আমার নিদ্রায় স্বপন, যে আমার কল্পনা-মন্দিরের হৈম মূর্ত্তি, যে আমার মানস-কাননের কনকলতা, যে আমার হৃদয়-সরোবরের প্রফুল্ল নলিনী, যে আমার হৃদয়াকাশের শারদীয় পূর্ণশশী, যে আমার আঁধার হৃদয়ের অত্যুজ্জ্বল প্রেম-প্রদীপ সেই মানস-তোষিণীকে জানিলাম কি করিয়া? ফ্লোরা, তোমার ঐ মুখে ঐ কথা বেশ শুনায় ফ্লোরা!

এই বলিয়া যুবক সাদরে ফ্লোরার চিবুক ধরিয়া তাহার রক্তাভ গণ্ডস্থলে চুম্বন করিল; আরক্ত-মুখী ফ্লোরা দূরে পলাইয়া গেল।

*   *   *   *   *

আর একদিন বসন্তকালে ক্লোডেন ও ফ্লোরা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে উদ্যান-বাটিকায় প্রবেশ করিল। তখন ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে উদ্যানে নানা-জাতীয় ফুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর প্রেমিক পবন সেই সমস্ত গন্ধ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং মজা দেখিবার জন্য কোথাও খানিকটা সুবাস ছাড়িয়া দিতেছে! ভ্রমরা-ভ্রমরী গুঞ্জন সহকারে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যাইতেছে, বৃক্ষাবলি হরিৎবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, সে কি নেত্রস্নিগ্ধকর অনির্ব্বচনীয় শোভা!

ফ্লোরা এক ফুল হইতে অন্য ফুলের নিকট ছুটাছুটি করিতে লাগিল; তাহার পৃষ্ঠদেশবিলম্বিত সেই গুচ্ছ গুচ্ছ স্বর্ণাভ অলকশ্রেণী ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় ক্রীড়াশীল বোধ হইতে লাগিল। মালা গাঁথা শেষ হইলে ফ্লোরা বলিল "আচ্ছা ভাই ক্লোডেন তুমি আমার কে?" ক্লোডেন ফ্লোরার এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিল কিন্তু কি বলিতে যাইতেছিল পারিল না বলিয়া নীরবে ফ্লোরার মুখপানে একবার সকরুণ নেত্রপাত করিল—সে দৃষ্টিতে যে কত স্নেহ, কত প্রীতি, কত প্রেম, কত ভালবাসা ব্যক্ত হইতেছিল তাহা সেই বাসন্তী উদ্যানে দাঁড়াইয়া সেইভাবে না দেখিলে তাহার স্বরূপ অনুভূত হয় না। বুদ্ধিমতী ফ্লোরা বুঝিল; তবু রহস্য করিবার জন্য আবার বলিল "অহো বুঝিয়াছি, তুমি আমায় ভালবাস না—"

ক্লোডেন তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক আবেগভরে বলিল "ফ্লোরা, ফ্লোরা, তুমি অত নিদারুণ হইও না।"

ফ্লোরা বলিল "আচ্ছা আর একটা পরীক্ষা করিয়া দেখি তুমি আমায় কেমন

ভালবাস। ভাই ক্লোডেন! তুমি ঐ মালাটা লইয়া কি করিবে?" ক্লোডেন তো ভাবিয়াই আকুল, সে নীরবে ফ্লোরার মুখ পানে আবার সেইরূপে তাকাইল! ফ্লোরা তখন বলিল, "এবার তুমি আমাকে ঐ প্রশ্ন কর দেখি?"

ক্লোডেন উৎফুল্ল হইয়া বলিল "ফ্লোরা ঐ মালাটা লইয়া তুমি কি করিবে?"

"কেন, তোমার গলায় পরাইয়া দিব"—এই বলিয়া বালিকা সত্য সত্যই ক্লোডেনের গলায় তাহার হস্তস্থিত মালাটি পরাইয়া দিয়া করতালি সহ হাসিয়া উঠিল।

এইরূপ দিন দিন যে কতই চলিতেছিল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সায়ংকাল সমাগত; সান্ধ্য অন্ধকার ধীরে ধীরে পৃথিবী-পৃষ্ঠে পদার্পণ করিতেছে: গোক্ষুরোত্থিত ধূলিকণা গগন প্রান্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে; অস্তাচলগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরশ্মি নদীবক্ষে পতিত হইয়া তন্মধ্যে সহস্র সূর্য্যের সৃজন করিয়াছে। সায়ংকাল সমাগতে দু'একটা রাত্রিচর আরণ্য জন্তু বিবর হইতে বহির্গত হইয়া উল্লম্ফন প্রদান করিতে করিতে আহারান্বেষণে প্রধাবিত হইতেছে। নদীবক্ষে ভাসমান দু'একটা ক্ষুদ্র নৌকা সান্ধ্য পবনে আন্দোলিত হইতে হইতে মন্থর গমনে চলিয়াছে এবং তন্মধ্য বিনিঃসৃত মাঝিদের সুমধুর গীতিধ্বনি সায়াহ্ন-পবনে রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দূরে—বহুদূরে কোন বিদেশীয় বণিকের শুভ্র অর্ণবযান আরব্য-উপন্যাসে বর্ণিত সিন্ধবাদের চক্ষে রকপক্ষীর ডিম্বের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিল—পূর্ণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ বিমল রজতকৌমুদী নদীবক্ষস্থিত বীচিমালাকে কোটী হীরকাভরণে সজ্জিত করিল।

প্রকৃতির এই রম্য সময়ে একখানি সুন্দর শুভ্র পান্‌সি দূর হইতে আসিতেছে দেখা গেল। কৌমুদী-স্নাত নদীবক্ষের উপর রজত-শুভ্র পান্‌সিখানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত কোনও নগরে লর্ড ষ্টুয়ার্ট নামে জনৈক গণ্যমান্য লোকের বাস। ষ্টুয়ার্ট পত্নী সখিজন পরিবৃতা হইয়া নদীতে সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতে আসিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় এক্ষণে গৃহে

প্রত্যাগমন করিতেছেন। এই সুন্দর পান্‌সি তাঁহারই। 'জলকল্লোল কোলাহল কুতূহলা' সেই সখিগণের সুকণ্ঠ বিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি নৈশপবন ভেদ করিয়া নদীবক্ষঃ মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, সহসা তাহাদের সঙ্গীতধ্বনি থামিয়া গেল! দূরে কি একটা ভাসমান শুভ্র পদার্থ দেখিয়া কর্ত্রীর আদেশানুসারে তাহারা সেইদিকে নৌকা লইয়া গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল একটি মরণোন্মুখী বালিকা সেইদিকে ভাসিয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহাকে পানসিতে তুলিয়া লইল এবং সত্বর বাটী আনিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিকে যে প্রক্রিয়ায় বাঁচাইতে হয় সেইরূপ করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। লর্ড ষ্টুয়ার্টের একমাত্র পুত্র ব্যতীত অন্য সন্তান ছিল না; এই সহায়হীনা বালিকাকে দেখিয়া ষ্টুয়ার্ট পত্নীর কোমল হৃদয়ে বাৎসল্য রসের আবির্ভাব হইল; তিনি বালিকাকে নিজ কন্যার ন্যায় গ্রহণ করিলেন। সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ করিলে তিনি বালিকা বা কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তোমার অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর কর। মা, আমার কন্যা নাই, তুমি আজ হইতে আমার কন্যা সদৃশী হইলে; অতএব মা তুমি আমার নিকট কিছু গোপন করিও না।"

কিশোরী নীরব। তাহাকে নীরব দেখিয়া বুদ্ধিমতী ষ্টুয়ার্ট পত্নী আর কিছু জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না; কেবল বলিলেন "মা তোমার নামটি কি?"

কিশোরী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "ফ্লোরা।"

*　　　*　　　*

আর ক্লোডেন? যখন ক্লোডেন ও ফ্লোরা উভয়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল তখনই একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। উভয়ে একবার ডুবে একবার উঠে, এইরূপ করিতে করিতে ফ্লোরার তো শীঘ্রই উদ্ধার সাধন হইল। আর ক্লোডেন? ক্লোডেন নদী মধ্যে পতিত হইয়া তরঙ্গাঘাত পাইয়া দেখিল যে প্রাণবিসর্জ্জন খুব সহজ কাজ নহে, সুতরাং সম্মুখে একখণ্ড ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া তাহাই ধৃত করিয়া জলের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। ক্রমে ক্রমে শীতে শরীর অবশ হইয়া আসিল, এইরূপে অতিকষ্টে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে একটা নৌকা তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে তুলিল। মাঝিরা উত্তাপাদি দ্বারা তাহাকে বাঁচাইল। তখন মধ্যরাত্রি, আকাশে চন্দ্র নাই, ঘোরা তিমিরা প্রকৃতি শাঁ শাঁ করিতেছে। দূরে দু'একটা রাত্রিচর আরণ্য পশুর বিকট চীৎকার সেই নিস্তব্ধ নিশীথিনীর মৌনব্রত ভঙ্গ করিতেছিল। সংজ্ঞালাভ

করিয়া ক্লোডেন যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। মাঝিদের প্রত্যেকেরই পশুত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিয়া তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। ভয়ে সে একপার্শ্বে যাইয়া শুইয়া পড়িল। শীতে অবসন্ন-দেহ ক্লোডেন শয়ন মাত্র নিদ্রিত হইল, কতক্ষণপর চেতনালাভ করিয়া যাহা শুনিল তাহাতে সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইল। ক্লোডেন শুনিতে পাইল মাঝিরা বলাবলি করিতেছেঃ—

প্রথম মাঝি। না, না উহাকে সেই চা-বাগানের অধ্যক্ষের নিকট বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাইব।

দ্বিতীয় মাঝি। কোন্ চা-বাগানের অধ্যক্ষের নিকট?

প্রথম মাঝি। ওরে সে—সেই আর একবার একটা যার কাছে বেচিয়াছিলাম।

তৃতীয় মাঝি। না না, আমি বলি শুন, একটা নূতন হোটেল হইয়াছে, উহাকে সেই হোটেলের ম্যানেজারের নিকট বিক্রয় করিলে আরও অনেক টাকা পাইব। শুনিতেছি তথায় বালকের বড় দাম বেশী, তাহাতে এ আবার সুন্দর যুবক; বড় বড় লোকের খানসামাগিরি করিবে।

তখন সকলেই শেষোক্ত মাঝির কথার অনুমোদন করিল। স্থির হইল প্রাতে যুবককে দাসত্বে বিক্রয় করা হইবে।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, আপনারা নিজের হৃদয় দিয়া অভাগা ক্লোডেনের মানসিক অবস্থা বুঝুন, আমরা লেখনীমুখে তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

প্রাতে ক্লোডেনকে উক্ত হোটেলের অধ্যক্ষের নিকট বিক্রয় করিয়া পাষণ্ডেরা প্রচুর অর্থ লইয়া চলিয়া গেল। অভাগা ক্লোডেনের সমস্ত আশা ভরসার এইস্থানে ইতি হইল।

হোটেলের অধ্যক্ষ একজন যমদূত। তাহার ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক মহীতলে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কুলিশ-হৃদয় পাষণ্ডের অধীনে পড়িয়া ক্লোডেনের যে কষ্ট হইতে লাগিল তাহা আমরা বর্ণনা করিতে চাই না। একে ক্লোডেনের মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয়, তাহার উপর কায়িক পরিশ্রমে অভাগা মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া পড়িল।

খোন্দেকার হোসেন রেজা।

জীবনময়ী।

১

এ'স গো জীবনময়ি,
প্রেমের অমিয়-ধারা!
নিরখি ও মুখ তব,
হইব আপন হারা!
ও মুখে প্রেমের জ্যোতিঃ
যখনি গো ফুটে উঠে!
আমাতে থাকিনে আমি
প্রাণের বাঁধন টুটে!

২

এ'স তুমি, এ'স এ'স
এ'স এ হৃদয়-মাঝে!
আমার এ হৃদি-যন্ত্রে
তোমারি সঙ্গীত বাজে!
সুখে দুঃখে তুমি মোর
জীবন সঙ্গিনী-সখি!
বিশ্বের সৌন্দর্য্য মাঝে
তোমারি সৌন্দর্য্য দেখি!

তুমি কি বাসনা ভাল,—
—কেন তবে আছ দূরে?
এ'স তবে প্রাণময়ি,
এ'স এ হৃদয়-পুরে!
দিও না যাতনা আর
বধ'না বিরহ-বানে!
একটি চুম্বন দিয়ে
জাগাও এ মৃতপ্রাণে!

৪

হৃদয়ে হৃদয় যবে
মি'শে যাবে চিরতরে!
মৃত সঞ্জীবনী সুধা
তখনি পড়িবে ঝ'রে!
তোমারি বুকেতে শু'য়ে
দেখিব স্বপন ঘোর!
অতীতের কত স্মৃতি
জাগিবে হৃদয়ে মোর!

৫

তোমারে হৃদয়ে পে'লে
সব দুঃখ ভুলে যাই!
চাইনে স্বর্গের সুখ
যদি গো তোমারে পাই!
তোমা ভিন্ন এ জগতে
কিছুই লাগে না ভালো!
তুমি যে প্রাণের প্রাণ
আঁধার জীবনে আলো!

কতবার কাব্য নিয়ে
পড়িতে ব'সেছি আমি!
কেবলি দে'খেছি প্রিয়ে
তোমারি সে মুখখানি!
চকিতে মু'দেছি আঁখি
তবুও তোমারি মুখ
দে'খেছি হৃদয় মাঝে
কাঁপিয়া উঠেছে বুক!

এক তিল না দেখিলে
হ'তে পাগলিনী তুমি !
আজি কোথা প্রাণময়ি ?—
—হৃদি যে শ্মশান ভূমি !
সে প্রেম সে ভালবাসা
এখনো জাগিছে প্রাণে,
কোথা তবে প্রেমময়ি ?—
—আছ এবে কোন্ স্থানে ?

৮

এ মরু জীবনে মোর
আবার ফুটাও ফুল !
হৃদয়ে হৃদয়ে রে'খে
জাগাও প্রাণের ভুল !
প্রেমের সঙ্গীতে তব
হ'বে বিশ্ব ভরপুর !
প্রত্যেক শিরায় মম
বাজিবে তোমারি স্বর !

৯

এ শুষ্ক হৃদয়-কুঞ্জে
আবার আসিবে মধু !
সাজা'য়ে ফুলের ডালা
ডাকিবে যে পিক-বধূ !
মধুর মলয় বায়ু
ঝুর ঝুর ব'য়ে যাবে !
পাপিয়া বুল্ বুল্ শ্যামা
তোমারি আরতি গা'বে !

১০

এ'স তবে প্রাণময়ি,
এ'স এ হৃদয় মাঝে !
পাতিয়া রে'খেছি হৃদি
এ'স গো কুসুম-সাজে !
তোমারি সৌন্দর্য্যে ডু'বে
আপনা ভুলিয়ে যা'ব !
তোমারি তপস্যা ক'রে
জনমে জনমে পা'ব !

১১

সুরভি কুসুম দিয়ে
গাঁথিয়া প্রেমের মালা !
তোমারি চরণে আমি
দিব গো প্রেমের ডালা !
তুমি গো প্রাণের প্রাণ
প্রেমের জীবন্ত ছবি !
সারাটি জীবন ভ'রে
তোমারে পূজিছে কবি !

১২

তুমি গো হৃদয়-নিধি
প্রেমের অমিয়-ধারা !
তোমারে না দে'খে আমি
ফণী যেন মণি হারা !
এ'স গো হৃদয়-কুঞ্জে
এ'স এ'স ফুল-রাণি !
হৃদয়ে রে'খেছি এঁ'কে
তোমারি সে মুখখানি !

কায়কোবাদ

জামে অল-আজহারের ইতিহাস।

(৩)

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এমন কি মধ্যযুগেও পাঠার্থিগণ কিয়দংশে আজহারের মধ্যে ও কিয়দংশে বাহিরে বাস করিত বলিয়া বোধ হয়। দেশীয় ছাত্রবৃন্দ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলে বিভক্ত ছিল; তাহাদের মধ্যে অনেকেরই স্ব স্ব 'হারা' ও 'রেওয়াক' ছিল এবং আজ পর্য্যন্তও আছে। 'হারা' বলিতে থাকিবার কক্ষকেই বুঝায়, এখানে ছাত্রেরা তাহাদের আসবাবাদি রাখিয়া এবং প্রায়ই বাহিরে 'রেওয়াকে' বা প্রাঙ্গণে যেখানে লাইব্রারী থাকিত সেইখানে নিদ্রা যাইত। ঠিক কথায় বলিতে গেলে 'রেওয়াক' দুই স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বুঝায়। পূর্ব্বতন সময়ে এইখানেই অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর (class) শিক্ষা কার্য্য চলিত; এখানেই 'জেকের' বা জপনার অনুষ্ঠান, বাদানুবাদ ও আলাপ-আপ্যায়ন হইত। বর্ত্তমান সময়ে আটত্রিশটি 'রেওয়াক' ও পনরটি 'হারা' আছে। সেগুলি এইরূপ—(১) অল্-স'আয়েদা—উচ্চ মিশর হইতে সমাগত ছাত্রগণের জন্য বৃহৎ ও মহৎ আবাস;—ইহা মালেকী সম্প্রদায়ের প্রধান আবাস; (২) অল্-হর্ম্মায়েন—মক্কা ও মদিনার ছাত্রগণের জন্য; (৩) অল-দকারিনা (দকার্না)—সেন্নার, দার্ফোর, ওয়াদাই প্রভৃতি দেশ হইতে সমাগত তক্রুরবাসী তকারিরদিগের জন্য; (৪) অল্-শওয়াম—সিরিয়ার ছাত্রদিগের জন্য; (৫) অল-জাওয়া—জাবা ও অন্যান্য দূরতর স্থানের ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জন্য; (৬) অল-সোলেমানিয়া—আফগানিস্থান ও খোরাসান হইতে আগত ছাত্রদিগের জন্য; (৭) অল-মঘারিবা—উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাবাসী ছাত্রদিগের জন্য;—ইহা বৃহৎ এবং প্রভাবশালী; (৮) অল-সেন্নারিয়া—মোহাম্মদ আলি কর্ত্তৃক স্থাপিত; (৯) অল-আত্রাক—তুর্কীছাত্রদিগের জন্য; (১০) অল-বির্নীয়া—বোর্নু ও তৎসন্নিহিত দেশ হইতে আগত ছাত্রদিগের জন্য; (১১) অল্-জবর্‌তিয়া—সোমালি উপকূলনিবাসী ছাত্রদিগের জন্য; (১২) অল-ইয়ামেনিয়া—দক্ষিণ আরবের ছাত্রদিগের জন্য; (১৩) অল-আক্রাদ—কুর্দ্দী-ছাত্রদিগের জন্য; (১৪) অল-হনুদ—ভারতবাসী ছাত্রদিগের জন্য; (১৫) অল-বঘ্‌দাদিয়া (বোগ্দাদিয়া)—এরাকের ছাত্রদিগের জন্য; (১৬) অল-বেহেরিয়া—নীল ব দ্বীপের উত্তর পশ্চিম হইতে সমাগত ছাত্রদিগের জন্য; (১৭) অল-ফায়েয়ুমিয়া (ফয়মা)—ফাইয়ুম-ওয়েসিস হইতে সমাগত ছাত্রদিগের জন্য; (১৮) অল-আকবোঘাইয়া (এব্‌তি-ঘাওইয়া)—প্রাগুক্ত মাদ্রাসার অন্তর্ভুক্ত; (১৯) অল-শনাওয়ানিয়া—দক্ষিণদিকস্থ ব দ্বীপনিবাসী ছাত্রদিগের জন্য; (২০) অল্-হানিফীয়া—হানিফী সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগের জন্য; (২১) অল-ফেশ্‌নিয়া—মধ্য

মিশরের ছাত্রদিগের জন্য ; (২২) এবেন্ মো 'আম্মর—একটি অপ্রকাশ্য স্থায়ী বৃত্তিভাণ্ড, সকল জাতির পক্ষেই অবারিত ; (২৩) অল-বরাবিরা (বেরাব্রা)—নিউবিয়া দেশীয় পাঠার্থিগণের জন্য ; (২৪) দকার্নত্ সেলিহ—চাঁদ হ্রদের চতুর্দ্দিকস্থ দেশ হইতে আগত ছাত্রগণের জন্য ; (২৫) অল-শর্কওইয়া—পূর্ব্বোত্তর ব দ্বীপ হইতে আগত শিক্ষার্থিগণের জন্য ;—ইহা আব্দুল্লাহ্-অল-শর্কাওয়াইর সম্মানার্থ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ; (২৬) অল-হনাবিলা (হাম্বেলী)—এবনে হাম্বেলির ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদিগের জন্য। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে 'রেওয়াকে'র মধ্যে যে বিভাগ আছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে জাতীয় ভাব ও কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্মসম্প্রদায়ানুসারে এবং কচিৎ বিশেষ বৃত্তিদানানুসারে করা হইয়াছিল।

মস্‌জিদের সহিত ছাত্রগণের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকায় তাহাদিগকে 'মোজাবের' এবং শিক্ষার্থী বলিয়া 'তালেব-অল-এল্‌ম্' 'জ্ঞানানুসন্ধানকারী' বলা হয়। শিক্ষক বা অধ্যাপকগণ 'মোদাররেস্' বা শিক্ষক নামে পরিচিত, কিন্তু তাঁহারা 'খাদেম্-অল-এল্‌ম্' 'বিদ্যা-সেবক' এই বিনীত উপাধি ধারণ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। ইঁহারাও সাধারণতঃ ছাত্রদিগের ন্যায় যতদূর সামান্যভাবে অবস্থান করা সম্ভব সেই ভাবে অবস্থান করেন। অধ্যাপকগণ খলিফা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ ও বিভিন্ন বৃত্তির আয়ের সাহায্যে প্রতিপালিত হন। অতি অল্পসংখ্যক অধ্যাপকই স্বচ্ছন্দ অবস্থায় বাস করেন। ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ পৈতৃক বা আত্মীয় স্বজনের উপায় দ্বারা ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই দানভাণ্ডার হইতে পরিমিত জীবিকা প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ইচ্ছাপত্র দ্বারা নিষ্পন্ন দান হইতে যে আয় উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা পর্য্যাপ্তরূপে ছাত্রদের ব্যয় সঙ্কুলন হয় না বলিয়া ছাত্রেরা কেহ কেহ স্ব স্ব উপার্জ্জনের উপরও নির্ভর করে। তাহারা গৃহস্থ বাটীতে বা বাজারে কোরানপাঠ, শিক্ষাদান ও এমন কি হস্তদ্বারা সম্পাদিত শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি সামান্য সামান্য কার্য্য করিত। 'খেদিব লাইব্রারী' সংস্থাপনের পরবর্ত্তী সময় হইতে অনেকেই তথায় প্রতিলিপিকর বা নকলনবীশের কার্য্য করিত। বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে তাহারা মিতব্যয়ের আদর্শ। স্বাস্থ্যরক্ষার ততদূর ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। সময় সময় ছাত্রদিগের মধ্যে কলহ বিবাদও উপস্থিত হইত। ইহা কখন কখন জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা হেতুও ঘটিত। কখন কখন টাকার পরিবর্ত্তন দ্রব্যাদি ও অন্যান দান লইয়াও হইত। শেষোক্ত স্থলে

অর্থগৃধ্ন ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনাশূন্য অধ্যক্ষ তাহাদিগকে দান হইতে বঞ্চিত করায় গোলযোগের উৎপত্তি হইত। ছাত্রগণের মধ্যে কলহ-বিবাদের বিবরণে প্রায়ই অসভ্য উচ্চ মিশরীয়, অশান্ত সিরীয়া দেশবাসী, ধর্ম্মোন্মত্ত মঘার্ব্বা এবং পূর্ব্বোক্ত অন্ধদিগের ভজনালয়াধিবাসিগণের নামই উল্লিখিত দেখা যায়।

প্রতীচ্য দেশের বর্ত্তমান প্রচলিত বিদ্যানুশীলন ও শিক্ষাপ্রণালী হইতে আজহারের বিদ্যাচর্চ্চা ও শিক্ষাপদ্ধতি অতি বিভিন্নভাবে সম্পাদিত হইত; পরন্তু এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা ইউরোপের পূর্ব্বতন শিক্ষাপ্রণালীর অনুরূপ বলিয়া জানা যায়। ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান হইতে উৎপন্ন স্বমতপোষক নিষেধাজ্ঞা যাহা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে নিষ্ক্রিয় ও নির্জ্জীব ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা তথায় অদ্যাপি অপ্রশমিত কঠোরতার সহিত বিদ্যমান রহিয়াছে। গবেষণা, প্রমাণ, পরীক্ষা বা সংশোধন করা শিক্ষার উদ্দেশ্য তত নহে, পরন্তু ধর্ম্মালোচনা করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন বিদ্যা বা বিজ্ঞানের যথোচিত আলোচনা হইয়া থাকে। জ্ঞানশাস্ত্রের "পরম্পরাগত" শাখাগুলি যথা 'অল্-উলুম-অল্-নকলিয়া' অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যা, স্মৃতিশাস্ত্র, হাদিস এবং অধ্যাত্মবিদ্যা সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বুদ্ধি বিষয়ক বিদ্যাগুলি যথা 'অল্-উলুম্-অল-আকলিয়া' ভাষাতত্ত্ব, ছন্দশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র এবং জ্যোতিষ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। অন্যান্য বিদ্যা ও কাব্য উপন্যাসাদি চারু সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বাস্তবিকই দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত;—কিন্তু মধ্যযুগের পর সেগুলি ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্ভাগে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের যাহা কিছু চর্চ্চা আজ পর্য্যন্ত বজায় আছে তাহা সাধারণতঃ অপ্রচলিত ও অযোগ্য পাঠ্যপুস্তক হইতেই নির্ব্বাহ করা হয়। অল-তন্তাওয়ে যিনি প্রায় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে আজহারে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তিনি সেণ্টপিটার্সবর্গে যাইবার পূর্ব্বে হারিরির মকামাত ও যওজানির সটীক মো'আল্লাকার সংক্রান্ত তাঁহার বক্তৃতা গুলি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যতদূর তিনি অবগত আছেন তাঁহার পূর্ব্বে কেহই তথায় এই বিষয় আলোচনা করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে মৈশরিকগণ ইউরোপের প্রভাবে লৌকিক বা সাংসারিক বিদ্যাসমূহের চর্চ্চার জন্য যে অসাধারণ উত্তেজনা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে কিন্তু আজহারিয়ানগণের কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। এই বিষয় পরে আলোচনা করা যাইবে।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

মরণের পথ।

(১)
মর্ম্মাহত ঘৃণিত পতিত
অভাজন আমি এ ধরার,
তিল মাত্র নাহি স্থান, বৃথা
দুর্ব্বহ এ বহি দেহ ভার।

(২)
ওগো কোথা কতদূরে মোর
জীবনের চরম বিশ্রাম—
যেথা গেলে চিরশান্তি পাব
হব ধন্য পূর্ণ মনস্কাম।

(৩)
সংসার অরণ্যে চারিদিক্
মুখরিত চির হাহাকারে,
দিক্ ভ্রান্ত আসিয়াছি ভুলে
শুধু মাত্র ল'য়ে আপনারে।

(৪)
নিত্য হেথা হিংস্র ভয়ানক
নর-পশু করে বিচরণ,
লেলিহান রসনা বিস্তারি
আসে বক্ষঃ করিতে দারণ!

(৫)
কুহকিনী আশার ছলনে
শান্তি আশে আসিয়া হেথায়,
প্রতারিত হ'য়েছি বিষম
কি হবে আমার গতি হায়!

(৬)
কে আছ গো দাও দেখাইয়া
কতদূর কতদূরে আর—
লক্ষ্যস্থলে মম প্রাণারাম
জীবনের কোথা পরপার।

(৭)
সেথা যেতে সহায় ভরসা
মরণের পথ মাত্র গতি,
সেই পথ করিতে আশ্রয়
বড় সাধে জানাই মিনতি।

(৮)
সে পথে নাহিক কিছু ভয়
মরণের ক্ষত ব্যথা গুলি—
বিস্মৃতি মুছায় সযতনে
করে ল'য়ে অমৃতের তুলি।

(৯)
সেথা নিত্য দেববালাগণ
নাচে গায় অমর সঙ্গীত,
অধরে প্রেমের হাসি রেখা
পান্থচিত্ত করিতে মোহিত।

(১০)
সেথা প্রেম প্রীতি শান্তি দয়া
ফুল বীথি ফোটে থরে থরে,
নব নব নিত্য আয়োজনে
পথিকের মনঃ প্রাণ হরে।

(১১)
হিংসা দ্বেষ স্বার্থ মলিনতা
ভেদ বুদ্ধি মান অভিমান—
সেথা নাই আবর্জ্জনা রাশি
জন্ম পাশ করিতে বিধান।

(১২)
সেথা হাত ধরাধরি করি
যায় মিলি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল,
এক লক্ষ্যে ধায় সেথা দিয়া
কোটিপতি নির্ধন কাঙ্গাল।

(১৩)
মরণের সেই পুণ্য পথে
হাত ধরি ল'য়ে যেতে কত,
মুক্ত আত্মা আনন্দে বিভোর
স্বর্গ ছাড়ি আসিছে নিয়ত।

(১৪)
প্রেমময় কে আছ কোথায়
গম্যস্থল দাও দেখাইয়া,
ভ্রষ্ট-লক্ষ্য মন্দ অভাজনে
বার বার যাচি গো কাঁদিয়া।

শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী।

মৈস্মর-তত্ত্ব।

ভূমিকা।

পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে বৈশাখী বাতাসের মত বিপুল বেগে হিল্লোলে হিল্লোলে কম্পিত হইয়া মৈস্মর-সাগর-তরঙ্গ কখন যে ভারতের বক্ষেঃ আঘাত করিয়াছে, সে কথা ঠিক বলিতে পারি না। তবে আমার অন্তর-রাজ্যে যখন তাহার একটি ফেনিল বুদ্ধুদ আসিয়া পতিত হয়, সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা।

একদিন দেখিলাম আমার সম্মুখে আমারই একজন উচ্চ শিক্ষিত বন্ধুকে জনৈক মেস্‌মেরাইজার (Mesmeriser) বা সম্মোহক তন্দ্রাভিভূত করিয়া নানারূপ অদ্ভুত ক্রিয়া কাণ্ডাদি দেখাইলেন। সেই দিন হইতেই আমার মনে একটা চিন্তা আসিয়া জুটিল,—একজন স্বাধীন চিন্তাশক্তি সম্পন্ন মনুষ্যকে কিরূপে অন্য একজনে এরূপ কলের পুতুলের মত পরিচালিত করিতে পারে? এই রহস্য উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে মনে প্রাণে লাগিয়া পড়িলাম। জগতপিতার অনুগ্রহে যতটুকু রহস্য অবগত হইয়াছি, "কোহিনূরে"র পাঠকগণের অবগতির জন্য আজ তাহা বিবৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অনেকে হয়ত বলিবেন ইহা শিক্ষা করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, যে বিদ্যা শিক্ষার ফলে আমাদের কোন সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া আত্মরক্ষা করত ক্ষণকালের জন্যও একজনের ভাগ্যবিধাতা হইতে পারা যায় বা সবলের হাত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা বা ব্যথিতের ব্যথা মোচন করা যায়, অথবা রোগীর রোগ যন্ত্রণা বিদূরিত করা যায়, সে বিদ্যা শিক্ষার সাধনা কি একেবারে পণ্ডশ্রম? স্বীকার করি ইহার মধ্যে এমন একটু প্রবঞ্চনামূলক হাতসাফাই আছে যে প্রায় প্রত্যেক মেস্‌মেরাইজারই দর্শকগণকে তাক্ লাগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে অভূতপূর্ব্ব, অসম্ভব এবং অভিনব ক্রিয়াদি প্রদর্শন করাইতেই আমোদ উপভোগ করেন—সত্য বটে কোন কোন মেস্‌মেরাইজার সুধু ঐন্দ্রজালিকের মত বুজরকী দেখাইতেই সমধিক প্রয়াসী হন—মানুষের চক্ষে ধূলি দিয়া এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভেল্কী প্রদর্শন করা অবশ্য নীতিশাস্ত্রের কঠোর নিয়মানুসারে হেয় ও দূষণীয়, কিন্তু এইরূপ আপাততঃ অসম্ভব ব্যাপারের কৌশলপূর্ণ সংসাধনের ভিতরেও মানবশক্তির যে অত্যাশ্চর্য্য বিস্ফুরণ আছে তাহা কি

একটা ভাবিবার বিষয় নহে ? এই বিষয়টি পাশ্চাত্য জগতে আজ কাল বড়ই একটা হুজুগ তুলিয়াছে; তৎসম্বন্ধে নানারূপ গবেষণাও হইতেছে। আমাদের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতবর্ষ অন্নসংস্থান জ্বালাতেই ব্যতিব্যস্ত, অন্য বিষয় ভাবিবার অবসর কোথায় ? সাধারণতঃ এই শক্তিটি হিপ্‌নটিজম (Hypnotism), মেস্‌মেরিজম (Mesmerism), সাইকোপ্যাথী (Psycopathy) থট্ ট্রান্সফারেন্স (Thought-transferance), টেলিপ্যাথী (Telepathy), স্পিরিচুয়ালিজম্ (Spritualism) এবং উইল-ফোর্স (Will-force) প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত,—একই শক্তির নানারূপ বিশ্লেষণ। পাঠকবর্গকে সমস্তগুলির সহিতই ক্রমে ক্রমে পরিচয় করাইয়া দিব। যদি এ সম্বন্ধে কেহ বিশেষরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তবে সাইকিক রিসার্চ সোসাইটি (Psychic Research Society)র পুস্তকগুলি পাঠ করিলে বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন।

১ম অধ্যায়।

হিপ্‌নটিজম।

এই কথাটি ইংরাজী অভিধানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে (Hypnos—to sleep) 'যোগনিদ্রা' অর্থে সংযোজিত হয়। কিন্তু বাইবেল পাঠ করিলে জানা যায় এই শব্দটি খ্রীষ্টধর্ম্মীদের নিকট নূতন হইলেও ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু আভাস অতি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। 'পীড়িতের উপর হস্ত স্থাপন কর, তাহারা আরোগ্য লাভ করিবে।' (মার্ক; ১৪শ।১৮)। 'Lay hands upon the sick and they shall recover' (Mark XIV. 18) হিব্রু এবং এসিরিয়ানদের মধ্যেও ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়; যথা—"নায়মন বলিল, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, সে দণ্ডায়মান হইয়া রুগ্ন স্থানে হস্ত সঞ্চালন করিয়া কুষ্ঠ রোগগ্রস্তকে আরোগ্য করিবে" (দ্বিতীয় রাজাগণ; ৫ম।১১)। "Noaman said, I thought he would stand and strike (his hand) up and down over the place, and recover the leper" (2 kings V. 11) "ঈশ্বর মুসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নুনের পুত্র যশুয়াকে গ্রহণ কর; তাহার উপরে আধ্যাত্মিক শক্তি আবির্ভূত হইবে; এবং তাহার উপরে তোমার হস্ত রক্ষা কর। তাহাকে পুরোহিত ও ধর্ম্মসভার সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহার নিমিত্ত উপদেশ প্রার্থনা কর। এবং তিনি (অর্থাৎ মুসা) ঈশ্বরের এই আদেশ অনুসরণ পুরঃসর তাঁহার

উপরে হস্ত স্থাপন করিলেন। এবং যশুয়া জ্ঞানের অধ্যাত্ম শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, যেহেতু মুসা তাঁহার উপরে হস্ত রক্ষা করিয়াছিলেন" (কবিতা-মালা ; ২৭শ।১৮,২৩)। "The Lord said unto Moses, Take Joshua, the son of Nun, a man on whom is the spirit, and lay thy hands upon him, set him before the priest and congregation, and ask counsel for him. And he laid his hands upon him as the Lord commanded. And Joshua was full of the spirit of wisdom, because Moses has laid his hands upon him" (Numbers XXVII. 18, 23.)

হিন্দুদের নিকট মহাভারতে ইহা 'চাক্ষুষী' যোগবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছিল। অতীতের কথা পরিত্যাগ করিলে বর্ত্তমান সময়েও আমাদের অনেক ফকির সাহেবদিগকে স্বধু হস্তস্পর্শে বা তদ্রূপ অন্যান্য ক্রিয়ায় অনেক রোগ আরোগ্য করিতে দেখা যায়। যাহা হউক জ্ঞাত থাকিয়াও সাধনার অভাবে ইহা এতকাল অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় এন্থমি মেসমার নামক এক সাহেব ইহাকে সভ্য জগতের বিশ্ব-সভায় উপস্থাপিত করিলেন। এই মহাত্মা এন্থমি মেসমার ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে চাইন নদীতীরস্থ ষ্টেইন (Stein) নামক ক্ষুদ্র নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ইনি অল্প বয়সেই 'ভিয়েনার' উচ্চ ডিক্রীর অধিকারী হন। একদা ফাদার হেল (Father Hehl) নামক একজন পাদরীকে কোন অজ্ঞাত শক্তিতে অনেক রোগীকে আরোগ্য করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন চিন্তা 'প্রদীপের ক্ষীণ-আলোক-রশ্মির প্রথম আভাসের মত' আবির্ভূত হইল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে যুবক ডাক্তার মেসমার ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হীন হইয়া স্বাধীন ভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ফাদার হেলের নিকট হইতে রোগ-আরোগ্যকারী কৌশল বা শক্তির আংশিক রূপ শিক্ষা করিয়া ইনি স্বয়ং ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করেন। কিছুদিন পর 'ভিয়েনা' পরিত্যাগ করিয়া জর্ম্মনী, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যেক স্থানেই অভূতপূর্ব্ব শক্তিকৌশল দেখাইয়া সকলকে বিস্ময়-মোহিত করেন। কি ধনী কি দরিদ্র, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-কণ্ঠে তাঁহার যশঃ-সৌরভ মধু-গন্ধা নৈশ সুন্দরী 'হাসনা হেনা'র মত দিগদিগন্ত আমোদিত করিয়া তুলিল। অতঃপর তিনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে উপস্থিত হন। এখানে প্রতিভা-সুন্দরী বিজয়-মালা হস্তে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইল। কর্ম্ম তাঁহাকে কীর্ত্তির

স্বর্ণ-সিংহাসনে আসন পাতিয়া দিল। বিশ্ববাসী তাঁহাকে গৌরবের উজ্জ্বল-কিরীটে ভূষিত করিল। তাঁহার অপূর্ব্ব-দৃষ্ট ক্রিয়া-কলাপ জনসাধারণকে এতদূর বিস্ময়-মোহিত করিয়া তুলিল যে কয়েকজন সুপণ্ডিত একটি সমিতিবদ্ধ হইয়া এই গুপ্তবিদ্যা শিক্ষার জন্য মেসমারের শরণাপন্ন হইলেন। এই প্যারিসেই এই বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয় এবং মেসমারের নামানুসারে ইহাকে মেস্‌মেরিজম আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

সাধারণতঃ এই শক্তির প্রকার ভেদে ছয়টি অবস্থা ভেদ আছে।

১ম—জাগ্রত অবস্থা।—এই অবস্থায় ক্রিয়াধীন ব্যক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সজ্ঞান থাকে। তাহার স্বাভাবিক শক্তি বা বৃত্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না বা মেস্‌মেরাইজারের কোন আদেশই কার্য্যকরী হয় না।

২য়—অবসাদক অবস্থা।—এই অবস্থায়ও ক্রিয়াধীন ব্যক্তিটি সম্পূর্ণরূপে মেসমেরাইজারের বশীভূত হয় না। তাহার সমস্ত মানসিক শক্তি বা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে ইন্দ্রিয় কিছু অবসন্ন হয় বটে; কিন্তু চক্ষু প্রায়ই ক্রিয়াধীন ব্যক্তির বশীভূত থাকে না।

৩য়—ঘুমন্ত অবস্থা।—এই অবস্থায় ক্রিয়াধীন ব্যক্তির কোন স্বাধীন ইন্দ্রিয় পরিচালনা শক্তি থাকে না। সুতরাং বেদনাদি অনুভব শক্তিও বিলুপ্ত হয়। মেস্‌মেরাইজার যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাকে সেইরূপই করিতে পারেন।

৪র্থ—স্বপ্নাবস্থা।—এই অবস্থায় ক্রিয়াধীন ব্যক্তি নিদ্রাগত হইলেও, যেন আপনাকে বেশ জাগ্রত রাখে। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি—যেমন শ্রবণ, স্পর্শন ইত্যাদি এমন কি মনোবৃত্তিও সম্পূর্ণরূপে মিসমেরাইজারের আয়ত্তীভূত হয়। তিনি যাহা আদেশ করেন বা যেরূপ ভাবে পরিচালিত করেন অকুণ্ঠিত চিত্তে মিডিয়ামকে * তাহাই করিতে হয়। কোন প্রকার বাধা দেওয়ার শক্তি থাকে না।

৫ম—স্পষ্ট স্বপ্নাবস্থা।—এই সময় ক্রিয়াধীন ব্যক্তির অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-শক্তি জন্মে। ভাব-পরিচালন (Thought-Transferance) প্রভৃতি এই সময়েই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়। এই অবস্থায় ক্রিয়াধীন ব্যক্তি তাহার দৈহিক, মানসিক ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কর্ম্মফল যথাযথ রূপে বলিতে সক্ষম হয়। দূরদর্শন শক্তিবলে অপরিচিত ব্যক্তির নাম ধাম বলিতে পারে এবং পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তির রোগাদি নির্ণয়

* অভিভূত বা ক্রিয়াধীন ব্যক্তিকে মিডিয়ম (Medium) বলে।

এমন কি উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেও সমর্থ হয়। মেস্‌মেরাইজার তাহাকে উক্ত যে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে বলেন, সে তাহাতেই নিযুক্ত হয়।

৬ষ্ঠ—স্বাধীন অবস্থা।—এই অবস্থায় ক্রিয়াধীন ব্যক্তি যেন এক অজ্ঞাতরাজ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সমস্ত কার্য্য করিতে থাকে। মেস্‌মেরাইজারের কথাও এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় নিস্ফল হয়। সাধারণ ক্রিয়াধীন ব্যক্তিগণের প্রায় ৪র্থ অবস্থা পর্য্যন্তই শেষ অবস্থা। কদাচিৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠের অবস্থায় ক্রিয়াধীন ব্যক্তিকে পৌঁছিতে দেখা যায়। তবে এ সমস্ত শক্তির উদ্বোধন উন্নত ও অবনত মনভেদে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হয়। যদি ক্রিয়াধীন ব্যক্তি এবং মেস্‌মেরাইজার সদ্বংশজাত, শান্ত, সরল ও শিষ্ট হন, তবেই শেষোক্ত অবস্থাদ্বয় প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। ক্রমানুশীলনে চাতুর্থিক অবস্থার ব্যক্তিদিগকেও সময় সময় পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থায় উপনীত করা যায়।

ক্রমশঃ

জেব-উন্নেসা বেগম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সান্ধ্য সমীরণ সেবন মানসে জেব-উন্নেসা একাকী যমুনা তীরস্থ উদ্যানে দূর্ব্বাদল সজ্জিত শয্যায় উপবেশন করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কুলুকুলুনাদিনী যমুনার লহরীমালার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের ভাবলহরীমালা নাচাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে পাঠ করিতেছিলেন—

চার চিজ্‌ জে দেলগম বোরাদ—কোদাম চাহার।
শরাব ও সবজা ও আবরুবাঁ ও রুয়ে নেগার॥

চারিটি বস্তু মানবের অন্তঃকরণ হইতে দুঃখ অপসারিত করিতে পারে; সেই চারিটি কি? মদিরা, উদ্যানের সুরম্য তরুরাজী, স্রোতস্বতীর কুলুকুলু নাদ এবং প্রিয়জনের বদনচন্দ্রমা।"

তিনি এই কবিতাটি রচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! অনতিদূরে তদীয় পিতৃদেব সম্রাট আলমগীর দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন তাঁহারই মুখ-নিঃসৃত কবিতা শ্রবণ করিতেছেন। জেব-উন্নেসার মস্তক ঘুরিয়া গেল, তাঁহার ভাবপূর্ণ হৃদয়ে

মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল; কিন্তু তিনি নিতান্ত সপ্রতিভ ভাবে তৎক্ষণাৎ কবিতার শেষাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই ভাবেই নদীর লহরী মালার দিকে চাহিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—

চার চিজ্‌ স্তে দেলগম বোরাদ—কোদাম চাহার।
নমাজ ও রোজা ও তস্‌বি ও ত ওবা আস্তাগ্‌ফার ॥

"চারিটি বস্তু মানবের অন্তঃকরণ হইতে দুঃখ অপসারিত করিতে পারে ; সেই চারিটি কি ? নমাজ (উপাসনা), রোজা (ধর্ম্মার্থে উপবাস), তস্‌বি (বিভুর নাম-জপ) এবং তওবা আস্তাগফার অর্থাৎ জগৎ পিতার নিকট কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা।" সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

অন্য একদিন দুর্গাভ্যন্তরে জনৈক বাজীকর-ভামিনী বাজী দেখাইতেছিল। সম্রাট, আমীর, পণ্ডিত, কবি এবং বেগম মহলের সকলেই ক্রীড়া দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত ছিলেন। বালারুণসদৃশা অতুললাবণ্যময়ী বাজীকর-ললনা যখন বংশদণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া প্রসিদ্ধ "বাঁশবাজী" খেলিতেছিল এবং বংশদণ্ডের অগ্রভাগের লৌহবর্ষার উপর নাভিদেশ রক্ষা করিয়া চরখীর ন্যায় ঘুরিতেছিল, তখন একজন রাজকবি প্রীত হইয়া বাজীকর-ললনার সুখ্যাতি সূচক এই কবিতাটি রচনা করিয়া পাঠ করিলেন—

ঈ লোবাৎ বুল-আজব চুঁ মাহে পরদাস্ত।
ইয়া তাজা গোলে কে বর সেরে শাখ রানাস্ত ॥

"এই বাজীকর-ললনা অত্যন্ত চমৎকার !—যেন একটি দীপ্যমান চন্দ্র ! একটি পুষ্পতরু শাখার অগ্রভাগে অথবা তরুশাখাগ্রে দোদুল্যমানা সদ্যস্ফুট অন্য একটি প্রসুন!" জেব-উন্নেসা বেগম তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা রচনা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

নে, নে, গলতাস্ত-কে আফ্‌তাবে মাহ্‌শর।
বর নেজা বর আমদা—কিয়ামত বরপাস্ত ॥

"না, না, ভুল ! ইহা শেষ বিচারের দিনের (মানব মস্তকের) বর্শা প্রমাণ উর্দ্ধে আসিয়াছে—মহাপ্রলয় সমুপস্থিত।"

জেব-উন্নেসার অন্তঃকরণ দয়া দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ছিল। তাঁহার দুর্ব্যবহার বা রূঢ়বাক্যে কখনও কোন ব্যক্তির প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া কেহ প্রকাশ করেন নাই। দাসদাসীদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহাদিগের প্রতি কোন দিন কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। যদ্যপি কখন কোন দাসী তাঁহার

কোন ক্ষতি করিয়া ফেলিত, তথাপি তিনি তাহা সহ্য করিতেন। চীন-সম্রাট ভারত-সম্রাটকে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ একটি বহুমূল্য দর্পণ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাট আলমগীর তাহা স্নেহের তনয়া জেব-উন্নেসাকে প্রদান করেন। দর্পণটি বৈজ্ঞানিক কৌশলে বিনির্ম্মিত ছিল। বিহিত উপায় অবলম্বন করিলে শত সহস্র বৎসরের মৃত ব্যক্তিদেরও আকৃতি তাহাতে প্রতিফলিত হইত। একদা কোন পরিচারিকা গোপনে ঐ দর্পণে স্বীয় আকৃতি দর্শন মানসে দর্পণ উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তাহা উচ্চ হইতে নিম্নে প্রস্তরচত্বরে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। দর্পণ পতনের শব্দ শ্রবণে অন্যান্য পরিচারিকাগণ তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই বহুমূল্যবান দর্পণ ভগ্নকারিণী পরিচারিকাকে ধৃত করিয়া জেব-উন্নেসার সম্মুখে উপস্থিত করিল। দয়াবতী বেগম সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে হাস্য করিয়া বলিলেন, "উহাকে ছাড়িয়া দাও! জগৎপিতা সংসারের বিলাসিতা পছন্দ করেন না, তাই বিলাসিতার উপকরণ স্বরূপ এই বহুমূল্য দর্পণখানি জেবউন্নেসার নিকট রাখিতে তিনি অনিচ্ছুক। অতএব দর্পণ ভগ্ন হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। ইহা আমার প্রতি দয়াময়ের নিতান্ত অনুগ্রহ। উহাকে ছাড়িয়া দাও।"

আগ্রা নগরীতে বেগম সাহেবা একটি "জানানা-মাদ্রাসা" স্থাপন করেন। তাহাতে শিল্প বিভাগ ও সাজোয়ারী বিভাগ পর্য্যন্ত ছিল। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য পারশ্য ও কাশ্মীর রাজ্য হইতে শিক্ষয়িত্রী আনয়ন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে পাঁচ শতেরও অধিক ছাত্রী শিক্ষালাভ করিত।

জেব-উন্নেসা আগ্রা ও লাহোর নগরীতে আতুরাশ্রম ও অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য ও লোকহিতৈষণার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি রাজকোষ হইতে যে পরিমাণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, তাহার যৎসামান্য নিজের জন্য ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ ঐ চারিটি আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিতেন। লাহোরে তাঁহার বিস্তৃত জায়গীর ছিল। তাহার আয়ও প্রোক্ত সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। আতুরাশ্রমের দুই ভাগে তিনটি বিভাগ ছিল। হিন্দুর জন্য এক ভাগে পৃথক একটি প্রকাণ্ড সৌধ ও মুসলমানের জন্য অন্য ভাগে আর একটি প্রকাণ্ড সৌধ নির্দ্দিষ্ট ছিল। হিন্দু আশ্রমের কর্ম্মচারী পাচক-পাচিকা ও পরিচারক-পরিচারিকা হিন্দু এবং মুসলমান আতুরাশ্রমের কর্ম্মচারী, পাচক-পাচিকা, পরিচারক-পরিচারিকা মুসলমান ছিল। আশ্রমের তিনটি পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল। প্রথম বিভাগে অন্ধগণ, দ্বিতীয় বিভাগে খঞ্জগণ এবং তৃতীয় বিভাগে কুষ্ঠরোগীরা বাস করিত।

ইহাদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত ছিল। রাজকোষ হইতে আংশিক ব্যয় প্রদত্ত হইত। অনাথ আশ্রমেও হিন্দু মুসলমানের জন্য দুইটি ভাগ ছিল। প্রত্যেক ভাগে তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে সৎবংশীয়া অনাথ-অনাথা বালক-বালিকাগণ, দ্বিতীয় বিভাগে বারনারী গর্ভজাত ও অবৈধভাবে জাত বালক-বালিকাগণ এবং তৃতীয় বিভাগে অনাথা ও সহায়সম্বলহীনা বৃদ্ধাগণ বাস করিত। জেব-উন্নেসা বেগম তাহাদের অন্ন বস্ত্র প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত বালক-বালিকাগণকে লেখাপড়া ও শিল্পবিদ্যা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আগ্রা, দিল্লী, লাহোর এবং মফস্বলের বহুস্থানে এই দয়াবতী সম্রাটতনয়া দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত চিকিৎসালয় "শাফা-খানায়ে জেবন্নেছা বেগম" নামে কথিত হইত এবং প্রত্যহ তাহাতে অসংখ্য রোগীকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হইত। এজন্য তিনি পঞ্জাবে আর একটি জায়গীর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি নিজে আড়ম্বরহীন সামান্য পোষাক পরিধান করিতেন। কিন্তু পরি-চারিকাগণকে কারুকার্য্যবিশিষ্ট বহু মূল্যবান রেশমী পোষাক পরাইতেন। তিন লহর বিশিষ্ট একগাছি মুক্তামালা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন অলঙ্কার ছিল না; কিন্তু পরিচারিকাগণকে তাহাদের পদমর্য্যাদা অনুসারে বহুমূল্য প্রস্তরখচিত রজত ও কাঞ্চন-অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া রাখিতেন। তাঁহার যোল জন পরি-চারিকা সমগ্র কোরান শরিফ কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। তিনি কোন পরিচারিকার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না। কিন্তু একবার উপাসনা না করিলে, স্বহস্তে দশটি বেত্রাঘাত করিতেন। তাহা হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। প্রত্যেক মাসে একবার সমুদয় পরিচারিকাগণকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে স্বামী গ্রহণের জন্য বলিতেন। তাহাতে কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বা মৌন থাকিলে কোন উপযুক্ত পাত্রের সহিত তাহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের পরিমাণ বৃত্তি প্রদানে মহলের বাহিরে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। কিন্তু যে পুরুষ বিবাহ করিত তাহাকে অনাথ বা আতুর আশ্রমের কোন কার্য্য করিবার জন্য বাধ্য করা হইত।

ক্রমশঃ।

নুরুল হোসেন কাশিমপুরী।

ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণের একাংশ।

দিল্লীর সম্রাটগণের ইতিহাস।

(১ম বর্ষ—১২শ সংখ্যা—চৈত্র মাসের প্রকাশিত অংশের পর।)

৯। সুলতান আলাউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ্।—আলাউদ্দিন সিংহাসনে উপবেশন করত প্রায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। হিন্দুস্থানবাসী সকলেই আলাউদ্দিনের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। তিনি রাজকার্য্য সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতেন। কথিত আছে একদা সম্রাট রাজকর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন বাজারে মাংসের দর অতিরিক্ত হওয়ার কারণ কি? তাঁহারা বলিলেন—'সরকার হইতে প্রত্যেক ছাগ প্রভৃতির উপর কর আদায় করা হইতেছে, সেই জন্য দর বৃদ্ধি হইয়াছে।' সম্রাট তদ্দণ্ডে ঐ প্রকারের যে সকল কর আদায় করা হইত তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। সওদাগরদিগকে রাজকোষ হইতে অর্থ দিয়া ছাগাদি আনয়ন করত বিনা করে বিক্রয় করিতে বলিলেন এবং ঐ ছাগ বিক্রয় করিয়া সরকারী অর্থ রাজকোষে প্রদান করিবার আদেশ দিলেন। ঐরূপ যে সকল বস্ত্র দৌলতাবাদ হইতে আনয়ন করত অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হইত, তাহারও সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এক সময়ে গম, চাউল প্রভৃতি শস্যের * মূল্য অধিক হওয়ায় সম্রাট রাজভাণ্ডারস্থ

* সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাস হইতে সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজী পর্য্যন্ত যে সময়, এই সময়ে মোগল সৈন্যগণ এসিয়া ও ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্ত যে প্রকার বিদ্ধস্ত করিয়াছিল এবং হত্যা ও লুণ্ঠন দ্বারা দেশ সমূহে যে অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছিল, যদি সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাস, গিয়াসউদ্দিন বলবন ও আলাউদ্দিন খিলিজীর ন্যায় উপযুক্ত সম্রাটগণ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত না থাকিতেন, তাহা হইলে মোগল সৈন্যগণের অশ্বপদতলে পড়িয়া এদেশের শ্যামল শস্যক্ষেত্রগুলি যে মরুভূমিতে এবং নগর পল্লীসমূহ মানবের পরিবর্ত্তে শৃগাল কুক্কুরের আবাস স্থলে পরিণত হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সময় সুলতান দেবালপুর ও মুলতানের সীমায় অধিক পরিমাণে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া দেশ শাসন করিয়াছিলেন। কসলু খাঁ, শের খাঁ (বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র) খানশহীদ ও গাজী তোগলক প্রভৃতি বীরগণের উপর সীমা রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। গাজী তোগলক বলিয়াছেন যে, তিনি চতুর্বিংশতিবার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে 'গাজী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মোগলসৈন্যের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ দর্শনে সম্রাট আলাউদ্দিন অধিক পরিমাণে সৈন্য রক্ষা

শস্যাদি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিবার আদেশ দেন। এদিকে বাজার দরও সুলভ হইল। কিছুদিন পরে সম্রাট প্রত্যেক দ্রব্যের একটি নির্দ্দিষ্ট দর স্থির করিয়া বাজারের মহাজনদিগকে ঐ মূল্যে বিক্রয়ের আদেশ দেন। কিন্তু দোকানদারগণ ঐ দরে বিক্রয় করিতে অস্বীকার করে। অবশেষে রাজভাণ্ডারস্থ শস্যাদি ঐ মূল্যে বিক্রয় করিতে আদেশ দেন। এইরূপ ভাবে ৬ মাস কাল ক্রয় বিক্রয় চলে। এ দিকে মহাজনদিগের শস্যাদিতে কীট ধরিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া, তাহারা পুনরায় ঐ দরে বিক্রয়ের আদেশ প্রার্থী হইলে সম্রাট তদপেক্ষা আরও কম মূল্যে বিক্রয়ের আদেশ দিলেন। অবশেষে তাহারা ঐরূপ কম মূল্যেই বিক্রয় করিতে লাগিল।

সম্রাট কখন ভ্রমণে বাহির হইতেন না। কারণ সম্রাটের সুলেমান * নামক একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। একদা

কর্ত্তব্য মনে করেন। ঐ সকল সৈন্যদিগের বেতন অল্প ধার্য্য করিয়া, তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যাহাতে অল্প অর্থের আবশ্যক হয়, সেই জন্য তিনি বাজারের শস্যাদির দর নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই সৈন্যগণ ঐরূপ অল্প বেতন দ্বারা সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। সম্রাট এই সময় প্রায় পৌনে পাঁচ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একটি অশ্ব, এক সওয়ার ও সহিস প্রভৃতিতে ২৩৪, টাকা ব্যয় হইত। দুইটি অশ্ব, দুই সওয়ার ও সহিস প্রভৃতিতে ৩১২, টাকা ব্যয় হইত। শস্যাদির দর গম প্রত্যেক মণ (পাকী ১৪ সের) সাড়ে সাত জিতেল অর্থাৎ এখনকার দুই আনা মাত্র। যবের মণ ৪ জিতেল, চাউলের মণ ৫ জিতেল এবং বুটের মণ ৫ জিতেল। এইরূপ প্রত্যেক দ্রব্যেরই দর নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। মহাজনগণ ঠিক এই দরে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে কি না তাহা পরিদর্শন জন্য সম্রাট রীতিমত প্রহরীর বন্দোবস্ত করেন। যদি কেহ এই দরে কম ওজন দিয়া বিক্রয় করিত তাহাদিগকে রীতিমত শাস্তি দেওয়া হইত। এমন কি সময় সময় সম্রাট স্বয়ং অর্থ দিয়া ছোট ছোট বালকের দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, কম ওজন দিয়াছে কি না তাহা দেখিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিতকালেও এই দরে দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়াছে। সম্রাট রাজকোষ হইতে অর্থ প্রদানে অন্যান্য স্থান হইতে শস্যাদি ক্রয় করত রাজধানীতে আনয়ন করিতেন এবং ঐ সকল শস্যাদি গুদামজাত করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে ঐ দরে বিক্রয় করিতে আদেশ দিতেন। অন্যান্য স্থানে ঐ দরে বিক্রয়ার্থ তথাকার সুবাদার ও জমিদারদিগের উপর আদেশ দিয়াছিলেন এবং ঐ দরে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে কি না পরীক্ষার্থ স্থানীয় কাজীদিগের উপর তদন্তের আদেশ ছিল।

* সুলেমান—বাদাউনী ইঁহার উপাধি আকত্ খাঁ লিখিয়াছেন। তুর্কি ভাষায় 'আকত্' অর্থ ছোট এবং 'আলগ' অর্থ বড়। ঐ সময়ে আমীরুল ওমরাদিগকে "আলগ্ খাঁ" বা "আকত্ খাঁ" উপাধি দেওয়া হইত। নাসিরুদ্দিন মহমুদের সময় বলবনের "আলগ খাঁ" উপাধি ছিল।

সম্রাট সুলেমানকে সঙ্গে করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হন। সুলেমান মনে করিলেন সম্রাট স্বীয় পিতৃব্যের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমারও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে সম্রাট জলযোগার্থ বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় সুলেমান তীর নিক্ষেপ করিলে সম্রাট মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ সম্রাটের ভৃত্য এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। সুলেমান নিকটে আসিলে ঐ ভৃত্য বলিল যে সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে। সুলেমান কালবিলম্ব না করিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করেন। সম্রাটের সংজ্ঞা লাভ ঘটিলে তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হয়। শেষে সুলেমানকে নিহত করা হয়। এইজন্য সম্রাট আর মৃগয়ার্থ গমন করেন না। সম্রাটের পাঁচ পুত্র; যথা—খেজের খাঁ, সাদি খাঁ, আবুবক্কার খাঁ, মোবারক খাঁ (ইঁহার দ্বিতীয় নাম কুতব উদ্দিন) এবং সাহাবুদ্দিন। সম্রাট কুতব-উদ্দিনকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি দেখিতে কুৎসিত ও অল্প বুদ্ধির লোক ছিলেন। একদিন সম্রাট কুতব-উদ্দিনকে বলিলেন, "আমি তোমার ভ্রাতাদিগকে যেরূপ উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছি, সেইরূপ পদের জন্য তুমি আশা কর না কি?" কুতব-উদ্দিন বলিলেন, "আমি ঈশ্বরের নিকট আশা করি; আপনার নিকট নহে।" শেষে সম্রাট কুতব-উদ্দিনের উপর বিরূপ হন। ইতিমধ্যে সম্রাট পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার জ্যেষ্ঠাপত্নী মাহক (খেজের খাঁর মাতা) আপন ভ্রাতা সনজরকে * বলেন যে, এখন সম্রাটের মুমূর্ষ অবস্থা। আমার পুত্র খেজের খাঁ যাহাতে সিংহাসনে উপবেশন করে, আপনি এখন হইতে তাহার চেষ্টা করুন। সনজর শপথ

আলাউদ্দিন খিলিজীর সময় তাঁহার ভ্রাতা আলমাছেরও "আলগ খাঁ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সুলতান মোহাম্মদ তোগলক স্বীয় পিতার জীবিতকালে "আলগ খাঁ" উপাধিতে বিভূষিত হন। বহু ইতিহাসে ভ্রমবশতঃ "আলফ খাঁ" লিখিত হইয়াছে। "আলফ খাঁ" উপাধি ঠিক নহে। বহু ইতিহাসবেত্তা "আলপ" "আলগ" ও "কতলগ" প্রভৃতি শব্দের সঠিক ব্যবহার না করিয়া অন্যপ্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। বহু ইতিহাসে "আলপ খাঁ" (বাহাদুর) স্থলে "আলফ খাঁ" লিখিত আছে। ঐরূপ "আলগ খাঁর" নামোল্লেখে বর্ণিত আছে—"তিনি সম্রাটকে তীর দ্বারা হত্যা করিয়া দিল্লী আগমন করেন এবং সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু মহলে প্রবেশ কালে মহল-রক্ষক বলেন যে, 'যে পর্য্যন্ত সম্রাটের মৃতদেহ না দেখিব, সে পর্য্যন্ত মহলে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না।' এমন সময় সম্রাট আসিয়া পড়েন।"

* সনজর—ইঁহার উপাধি আলপ খাঁ ছিল। আলপ খাঁ, আলগ খাঁ (সম্রাটের ভ্রাতা), জাফর খাঁ এবং নসরত খাঁ এই চারিজন সম্রাটের প্রধান অমাত্য ছিলেন।

করিয়া চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সম্রাটের নায়েব মালেক আলফি * এই ঘটনা সম্রাটকে বলিলে সম্রাট সনজরকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। ঐ দিবস খেজের খাঁ † সাধু পুরুষগণের সমাধীস্থলে গমন করিয়া পিতার আরোগ্য

* সম্রাট ইঁহাকে সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই জন্য সকলে তাঁহাকে আলফি বা হাজার-দিনারী বলিত। কেহ কেহ 'মালেক নায়েব কাফুর'ও বলিতেন।

† খেজের খাঁ—এই ঘটনা সম্বন্ধে বতুতা, ফেরেস্তা এবং বাদাউনী পৃথক পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন। জিয়ায়ে বর্ণী এই ঘটনার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বাদাউনী লিখিয়াছেন—সম্রাট খেজের খাঁকে শৈলশিখরস্থ হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন। সম্রাটের সুস্থ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি দিল্লীর সাধুপুরুষগণের সমাধি দর্শন মানসে লগ্নপদে পদব্রজে দিল্লী আগমন করেন। সম্রাটের নায়েব সম্রাটকে এইভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, "খেজের খাঁ এবং তাঁহার মাতুল আলপ খাঁ উভয়ে এইরূপ পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন যে, সম্রাটের মৃত্যু হইলে খেজের খাঁ সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। এইজন্য খেজের খাঁ হস্তিনাপুর এবং আলপ খাঁ গুজরাট হইতে আগমন করিয়াছেন।" সম্রাট এই ঘটনা সত্য মনে করিয়া আলপ খাঁকে নিহত এবং খেজের খাঁকে আমরুহা প্রেরণ করেন। তিনি কিছুদিন পরে আমরুহা হইতে প্রত্যাগত হন। এই সময় সম্রাট সন্তানকে স্নেহ-চক্ষে নিরীক্ষণ করেন এবং তাহাকে আপনার নিকট অবস্থান করিতে আদেশ দেন। আবার কিছুদিন পরে নায়েব সম্রাটকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করত খেজের খাঁকে বিতাড়িত করেন। এই সময় সম্রাট খেজের খাঁ ও সাদি খাঁ উভয়কে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন—"সম্রাট পীড়িত হইলে খেজের খাঁ ও তাঁহার মাতা ভালরূপ সেবা-শুশ্রূষা করেন নাই। এই জন্য সম্রাট নায়েব ও আলপ খাঁকে গুজরাট হইতে আনয়ন করেন। নায়েব এই অবসরে আলপ খাঁ, রাজ্ঞী ও খেজের খাঁর সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। সম্রাট এইজন্য খেজের খাঁকে আমরুহা প্রেরণ করেন এবং বলেন, আমি আরোগ্যলাভ করিয়া তোমাকে আনয়ন করিব। খেজের খাঁ আমরুহা গমন কালে এই বলিয়া মানস করিয়াছিলেন যে, 'যদি শীঘ্র খোদাতালা পিতাকে আরোগ্য দেন, তাহা হইলে আমরুহা হইতে লগ্নপদে পদব্রজে দিল্লীর সাধু পুরুষগণের সমাধি স্থানে উপস্থিত হইব।' তিনি যখন পিতার আরোগ্য সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া লগ্ন পদে হাঁটিয়া আমরুহা হইতে দিল্লী আগমনপূর্ব্বক সাধুপুরুষগণের সমাধি জিয়ারত করেন। খেজের খাঁ সম্রাটের অনুমতি না লইয়া একাকী কেন চলিয়া আসিলেন, সম্রাট স্নেহমমতা হেতু সে বিষয় জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিছুদিন পরে নায়েব মালেক কাফুর সম্রাজ্ঞী, খেজের খাঁ, সাদি খাঁ এবং আলপ খাঁর সম্বন্ধে দোষারোপ করত সম্রাটকে জানাইলে, সম্রাট খেজর ও সাদি খাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ, সম্রাজ্ঞীকে বহিষ্কৃত এবং আলপ খাঁকে নিহত করেন।" জিয়ায়ে বর্ণী এ সকল বিষয়ের কোনই উল্লেখ করেন নাই। কেবল এইমাত্র লিখিয়াছেন যে, মালেক কাফুর প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সম্রাটের নিকট হইতে এইরূপ আদেশ লইয়াছিলেন যে, আলপ খাঁকে হত্যা করা হইবে এবং খেজের ও সাদি খাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইবে; আর সম্রাজ্ঞীকে লালকুঠী নামক অট্টালিকা

লাভ জন্য প্রার্থনা করিবার মানসে দিল্লীর এক মঞ্জেল দূরস্থ সন্দপত (সনপত) * গমন করেন। এখানে তিনি তাঁহার মাতুলের হত্যা সংবাদ শ্রবণ করেন এবং মনে নিতান্ত দুঃখ হওয়ায়, স্বীয় পরিধেয় জামার দামন ছিন্ন করিয়া ফেলেন। হিন্দুস্থানবাসীদিগের মধ্যে প্রচার আছে যে, নিজের কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে (গেবেরান চাক) জামার গেরেবান ছিঁড়িয়া ফেলে। এই সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। পরে খেজের খাঁ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বন্দি করিয়া গালিয়র (গোয়ালিয়র) দুর্গে প্রেরণ করা হয়। এই সুদৃঢ় দুর্গ দিল্লী হইতে ১০ মঞ্জেল দূরে অবস্থিত। আমি কিছুদিন পর্য্যন্ত এই দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলাম। এই দুর্গে খেজের খাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া রাখা হইয়াছিল। পুনরায় সম্রাট পীড়িত হইলেন এবং দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি খেজের খাঁকে সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া তাঁহাকে আনয়নের আদেশ দিলেন। কিন্তু নায়েব ও আর আর কর্ম্মচারীদিগের শৈথিল্য বশতঃ খেজের খাঁর আগমনের পূর্ব্বেই সম্রাটের মৃত্যু ঘটিল। ক্রমশঃ।

মোহাম্মদ হাফিজল হাসান।

হইতে বিতাড়িত করা হইবে। বর্ণী লিখিয়াছেন,—'যে দিবস এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই দিবসই আলাউদ্দিনের রাজত্ব ও বংশের একরূপ শেষ হইয়াছিল।' কবিবর আমীর খসরু আসিকাহ নামক পুস্তকে যেস্থানে খেজের খাঁ ও দেবলরাণীর প্রণয় প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন ঐ স্থানে উপরোক্ত বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ কবিবর সেই সময়ে রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন; এবং তিনি খেজের খাঁর একজন পরম বন্ধু ছিলেন। কাজেই তিনি সেই সময় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্য বলিয়া ধারণা হয়।

* সন্দপত—সম্ভবতঃ সোনিপথই হইবে বলিয়া বোধ হয়। সোনিপথ এই স্থানটি দিল্লীর ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী এবং লাহোরের পুরাতন বর্ত্মের সান্নিধ্যে বর্ত্তমান। কোনও সময়ে যমুনা নদী এই নগরের পাদদেশে প্রবাহিত হইত। এখন তাহার একটি শাখাকে 'বড়নালা' বলা হইয়া থাকে। নগরটি অতি পুরাতন। প্রবাদ আছে যে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট যে পাঁচটি স্থান চাহিয়াছিলেন তন্মধ্যে ইহাঁও একটি। সায়েরল মতাখরিন উল্লেখ করিয়াছেন যে "ঐ পাঁচটি নগরের নাম কেথেল, আনদরী, ইন্দ্রপ্রস্থ, কর্ণাল এবং বর্ণী।" আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে, অর্জ্জুনের ত্রয়োদশ বংশে রাণীসোণী এই নগর স্থাপন করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরে ৬০ কিম্বা ৭০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নদেশে সূর্য্যদেবতার একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। কথিত আছে এই নগর বারশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরের এক স্থান হইতে প্রায় এক সহস্র পরিমাণ পুরাকালীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। নগরটি এক মাইলের কম নহে। নগরের উচ্চ ভাগকে 'কোট' এবং নিম্নভাগকে 'মসহদ' বলে। এই নগরে সৈয়দ নাসিরুদ্দিন ও মিরমকন্দের সমাধি রহিয়াছে। কথিত আছে নাসিরুদ্দিন দিল্লী অধিকারের পূর্ব্বে (পৃথিরায়ের সময়ে) কতকগুলি অশ্ব বিক্রয়ার্থ আনয়ন করেন। এই নগরে পৃথিরায়ের জামাতা অশ্বগুলি কাড়িয়া লন এবং তাঁহাকে নিহত করেন।

বিবাহ বিপ্লব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিঃ এন্ সেন।

বোধ হয় চেষ্টা করিলে পুলিস বিভাগে পুনরায় কার্য্য পাইতে পারিতাম। তিন বৎসর পুলিসে দারোগাগিরি করিয়া কিন্তু পুলিস বিভাগের উপর তেমন একটা মমতা জন্মায় নাই। সুতরাং সামান্য কারণে কর্ম্মচ্যুত হইলেও সে কর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মায় নাই।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—এ একটা মামুলি কথা। সময় অপেক্ষা করিলেও করিতে পারে কিন্তু মানব দেহের জঠর নামক অঙ্গ বিশেষটি সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতে অদ্যাবধি ধৈর্য্য নামক সদ্‌গুণের আধার বলিয়া কখনও প্রশংসিত হয় নাই। সুতরাং পোড়া পেটের জন্য একটা কি করিতে হইবে—এ প্রশ্নটা দিন দিন বেশ গুরুতর আকার ধারণ করিয়া আমার মানসপটে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিল। কেরাণীগিরি সংগ্রহ করা ভীষণ সমস্যা, ব্যবসা বাণিজ্য করিতে গেলে মূলধনের অভাব, ডাক্তারি বা ওকালতি পেশায় ইউনিভারসিটির চাপরাস ও ভাগ্য ইত্যাদি নানারূপ অসম্ভব সামগ্রীর আবশ্যক।

আমার এক বাল্যবন্ধু নরেশচন্দ্র পশ্চিমে কার্য্য করিত। সেও পশ্চিম ছাড়িয়া নামকাটা সেপাহি হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিল। উভয়ে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলাম কি উপায়ে পরের তোষামোদ না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে।

নরেশ বলিল—বাস্তবিক ভাই দেখছি মরণ হ'লে পুনর্জ্জন্ম হয়, কিন্তু চাকুরি গেলে আর চাকুরি হয় না।

আমি বলিলাম—আর ভাই চাকুরির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর্‌ছি না। বরং না খেয়ে মারা গিয়ে আবার পুনর্জ্জন্মের চেষ্টা করিব।

উভয়ে খুব হাসিলাম। কষাইয়ের দোকান, মড়ার খাটের ব্যবসা, বিলাতী মতে ধোবাখানা, মুরগীর চাষ, পরিত্যক্ত টিনের কানেস্তার ও নিলামী মাল খরিদ

বিক্রয় প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যবসার বিষয় আলোচনা করিলাম, কিন্তু প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা আপত্তি বিরাট আকার ধারণ করিয়া বসিল।

নরেশ বলিল—আমি তো বৈদ্য। শেষে না হয় পাড়াগাঁয়ে কোথাও গিয়ে নাড়িটেপার ব্যবসা ধর্‌ব! আজকাল তো বদ্দির ঘরের মূর্খ ছেলেরাই কবিরাজ হয়।

আমি বলিলাম—তা' হলে আমি একটা শিবমূর্ত্তি স্থাপন করে পূজারি সেজে বসি, বামুনের ছেলের পক্ষে বৃত্তিটা মন্দ হ'বে না।

শেষে এই শিবমূর্ত্তি কলেজ ষ্ট্রীটের ধারে হইলে অধিক উপার্জ্জন হইবে, না আদালতের ধারে হইলে বেশী লাভের সম্ভাবনা, সে কথা লইয়া বাদানুবাদ চলিল। শেষে ঠিক হইল ধর্ম্মের নামে জুয়াচুরি করা অবিধেয় এবং পেটের দায়ে নরেশের পক্ষে মানুষ মারা মহাপাপ।

নরেশ বলিল—না, ও সব কথা ঠিক না। তুমি তিন বছর পুলিসে কাজ ক'রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমিও সওদাগরী আফিসে কাজ ক'রে কতকটা কাজ শিখেছি। সে শিক্ষারও সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

নরেশের কথায় আমার একটা নূতন চিন্তা উদিত হইল। বাস্তবিক আমার পুলিসের অভিজ্ঞতাটা কি কোনও প্রকারে অর্থকরী বৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে না? আমাদের দেশে পুলিসের হস্তে যেরূপ বহুবিধ কার্য্যভার ন্যস্ত, তাহাতে তাহাদের দ্বারা কোনও জটিল মামলার তদন্ত হওয়া অসম্ভব। বিলাতে বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভের ব্যবসা বেশ সাধারণের হিতকর অথচ অর্থকরী। এ দেশে সে ব্যবসায় কেন সফলতা লাভ করিবে না?

রমেশের সহিত অনেক বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, আমরা উভয়ে একটি বে-সরকারী গোয়েন্দার ব্যবসা খুলিব।

আমার বাল্যসহচর নরেশচন্দ্রকে অংশীদার করিয়া লইবার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভাবিলাম যদি আমি স্বয়ং ডিটেক্‌টিভ সাজিয়া বসি তাহা হইলে সকলেই আমাকে চিনিয়া ফেলিবে। যদি চোর জুয়াচোর জালিয়াৎ প্রভৃতি আমাকে দেখিবামাত্র সাবধান হইয়া যায় তাহা হইলে পদে পদে আমাদের কর্ম্মে বিফলমনোরথ হইতে হইবে। সরকারী পুলিস এই কারণেই অনেক সময় চতুর অপরাধীর সন্ধান করিতে পারে না। পুলিস যেমন অপরাধীদিগের উপর গোয়েন্দাগিরি করে, সন্দেহচিত্ত অপরাধীগণও তেমনি তাহাদিগের চিরশত্রু পুলিসের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আপনাদের আত্মরক্ষার বিধান করে।

আমি বলিলাম—নরেশ, তুমি ডিটেক্‌টিভ সাজিয়া শিখণ্ডি হইয়া বসিবে, আমি তোমার আড়াল থেকে বাণক্ষেপ ক'রে কাজ ফতে কর্‌ব।

নরেশ বলিল—আপত্তি নেই। আমি ডাক্তারখানার জানালার ধারের মোটা সাজান বোতল হ'য়ে বসব এখন।

'শুভস্য শীঘ্রম্' ভাবিয়া সাতদিনের মধ্যে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটি অফিস খুলিয়া সাইন বোর্ড মারিলাম—Mr. N. C. Sen. Private Detective.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্ম-প্রশংসা।

ভেক না হইলে ভিক্ষা মিলে না। একটা কোন প্রকার স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে গেলে কতকটা বাহ্যিক আড়ম্বর অত্যাবশ্যক; তাহা না হইলে, প্রথম প্রথম পসার জমান কঠিন। সুতরাং নেহাৎ সেই মামুলি একটা আমকাষ্ঠের তক্তপোষ, দুইটি মলিন জীর্ণদেহ তাকিয়া সম্বল করিয়া অফিস না খুলিয়া একটু বিলাতী ধরণে টেবিল চেয়ার দিয়া গৃহ সুসজ্জিত করিয়া অফিস খুলিয়াছিলাম। সমস্ত আশবাব সরঞ্জম গুলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবারও সুবন্দোবস্ত করিয়া-ছিলাম। অবশ্য এরূপ ভাবে গৃহাদি সজ্জা করিতে প্রথমতঃ একটু মূলধনের আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু ফলে আমাদিগের কর্ম্মস্থল একটা বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

আমরা যে বাটীতে অফিস খুলিয়াছিলাম তাহার প্রধান দরজা ছিল কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরে। সেই দরজাটিতে প্রবেশ করিলেই মক্কেলগণ আমাদিগের অফিস ঘরে আসিতে পারিত। এবাটীর পশ্চাতে গলির পথে একটি ক্ষুদ্র প্রবেশ-দ্বার ছিল। সেই পথে দ্বিতলের গৃহগুলিতে আমরা যাতায়াত করিতাম। নরেশ স্বয়ং ডিটেক্‌টিভ সাজিয়া বাহিরে অফিস ঘরে আমাদিগের সাহায্যপ্রার্থী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং আমরা তাহার অন্তরালে থাকিয়া ভিতরের গৃহ হইতে কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতাম। আমাদের প্রধান মন্ত্রণাগৃহ ছিল দ্বিতলে একটি কামরায়। সেস্থানে আমরা দুইজন এবং আমাদিগের একটি সহকারী ডিটেক্‌টিভ রাখালচন্দ্র ব্যতীত কেহ প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। রাখালের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও "ষট্‌কর্ণৈঃ ভিদ্যতে মন্ত্রঃ" এই নীতি

অনুসরণ করিয়া তাহাকে আমাদিগের সকল যুক্তি মন্ত্রণার মধ্যে প্রবেশ করিবার উচ্চ অধিকার প্রদান করিতাম না।

আমাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য কোন ব্যক্তি আসিলে প্রথমে তাহাকে নরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। নরেশের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে তবে আবশ্যক মত আমি নরেশের সেই অফিস গৃহে তাহার নিকট পরিচিত হইতাম। এই রুদ্ধদ্বার গৃহে যখন একজন মক্কেল নরেশের সহিত মন্ত্রণা করিত, তখন অপর সকলকে বারান্দাস্থিত দুইখানি বেঞ্চের উপর অপেক্ষা করিতে হইত। আমাদিগের এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার বিশেষ একটি কারণ ছিল। আমাদিগের দেশে উকিল বাবুরা প্রায়ই পাঁচ সাতটি মোকদ্দমার ভিন্ন ভিন্ন লোক একত্রে লইয়া একস্থানে বসিয়া পরামর্শ করেন। অনেক সময় বিপক্ষ কি পরামর্শ করিতেছে তাহা জানিবার জন্য চতুর প্রতিযোগী মক্কেল সাজাইয়া নিজ পক্ষের লোককে বিপক্ষের উকিলের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং তাহাদিগের মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিপক্ষ কিরূপ যুক্তিমন্ত্রণা করিতেছে তাহা এইরূপ কৌশলক্রমে অবগত হইয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লয়। এই জন্যই আমাদিগের অফিসের নিয়ম ছিল যে এককালে একজনের অধিক মক্কেল মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না।

সমস্ত দিবসের কর্ত্তব্য সারিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা দুইজনে অফিস-গৃহে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম; বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল; আমরা উভয়ে চা পান করিতেছিলাম। আষাঢ়ের জলধারার অত্যাচারে সদা জনমানব পরিপূর্ণ নিত্য কোলাহলময় কলিকাতার রাজপথগুলি একপ্রকার জনহীন হইয়াছিল; কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট জলমগ্ন হইয়াছিল। কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক খানা গাড়ি শব্দ করিতে করিতে অতিশয় মন্থরগতিতে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া গমনাগমন করিতেছিল।

হস্তস্থিত চায়ের পাত্রটি টেবিলের উপর রাখিয়া নরেশ সেন বলিল,—সতিশ তুমি ভাই বেশ ব্যবসা খুলিয়াছ। এই সামান্য ছয় মাসের মধ্যে আমাদের নামটা বেশ জাহির হইয়াছে, এমন কি ট্রামগাড়িতে অবধি আমাদিগের কার্য্য-কলাপ লোকের প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রকম?

"সেদিন আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্যামবাজারের ট্রামে অফিসের দিকে আসিতে-ছিলাম। ট্রামখানি কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাগমনপ্রয়াসী যাত্রীতে পূর্ণ। একজন

ভদ্রলোকের কিছু টাকা চুরি গিয়াছিল, তিনি নিজের দুঃখের কথা অপর একজন সহযাত্রীকে বলিবামাত্র তিনি বলিলেন, আপনি কেন আপনার কেসটি ডিটেক্‌টিভ এন, সেনের হস্তে অর্পণ করুন না।"

নরেশের কথা শুনিয়া আমি একটু হাঁসিলাম। বলা বাহুল্য, একটু গর্ব্বিত হইলাম। নরেশ আবার বলিতে লাগিল,—"অমনি আমাদের কথা ট্রামের লোকেদের মধ্যে গল্পের প্রসঙ্গ হইয়া উঠিল। বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না, যে সকল কেসের কথা আমরা কখন শুনিই নাই সেই সকল অপরাধ তদন্ত করিবার যশঃ আমাদিগের ভাগ্যে পড়িল।

আমি হাঁসিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে বাজারে নাম হওয়া পেশাদার লোকের পক্ষে বাস্তবিকই হিতকর। আর ট্রামের গল্প ঐপ্রকারই হইয়া থাকে। গল্প করিয়া অপরকে পরাস্ত করিবার বাসনাটা আমাদিগের জাতীয় বৃত্তি বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। সুতরাং আমাদিগের কৃতিত্ব সম্বন্ধে লোকে দু'একটি গল্প সৃষ্টি করিয়া অপরকে বলিবে তাহাতে বিচিত্রতা কোথায়? তবে নিন্দা বা অপযশ না রটাইয়া লোকে যে আমাদিগের ফারম সম্বন্ধে সুখ্যাতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আমাদিগের ভবিষ্যত উন্নতির ইহা একটি সোপান।

নরেশ বলিল,—সেই পার্শেল চুরির কেসটি তোমার স্মরণ আছে ত? অবশ্য তুমি যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সহিত সে তদন্তটি সম্পন্ন করিয়াছিলে তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু সে কেসটায় তোমার দক্ষতার কথা যদি ট্রামের আরোহীর নিকট শুনিতে তো তোমারও হাঁসি আসিত।

বাহিরে প্রাবৃটের নীরদমালা নিদাঘ-সূর্য্যতাপক্লিষ্ট ধরণীর উপর সমভাবে বারিসিঞ্চন করিতেছিল। পথিপার্শ্বস্থিত দুই একটি গ্যাসবাতি অতি ম্লানভাবে কর্ত্তব্যপালন করিতেছিল। পাইপের ভিতর জল প্রবেশ করিতেছিল বলিয়া কতকগুলা একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল। এরূপ দুর্য্যোগের দিনে কাজ কর্ম্মের কোন আশা ভরসা ছিল না সুতরাং আমার অংশীদারের নিকট প্রশংসা শ্রবণ করিয়া আত্মাভিমান বাড়াইতেছিলাম। মুখে আলবোলার নল দিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া নরেশের গল্প শুনিতে লাগিলাম। তাহার মুখে পার্শেল চুরির কেসের উল্লেখ শুনিয়া একবার সে ব্যাপারের ঘটনাগুলা মনে মনে স্মরণ করিয়া লইলাম। তাহাদিগের চিরন্তন প্রথা অনুসারে ভাগলপুরের ভোতা-রাম বুধমল নামক ফারম একটি কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে পুরিয়া নগদ সাতসহস্র

টাকা রেলযোগে কলিকাতায় চালান দিয়াছিল। ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ঐ সকল মূল্যবান পার্শেলের রেলের রসিদ দুই পয়সার সাধারণ ডাকে কলিকাতার গদিতে পাঠাইয়া থাকে। ভোতারাম সূক্ষ্মবুদ্ধি চালিত হইয়া এক্ষেত্রেও উক্তরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল। কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ জুয়াচোরপুঙ্গব পোষ্ট পিয়নের সাহচর্য্যে সেই রসিদ হস্তগত করেন। কষ্ট করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি ভোতারাম বুধমল প্রেরিত সেই বাক্সটি হাওড়ার রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে খালাস করিয়া লইয়া আত্মসাৎ করেন। আমি দশদিনের মধ্যে চোর ও পাঁচ সহস্র টাকা ধরিয়া দিয়াছিলাম। এই গল্পটি বাজারে কিরূপ আকার ধারণ করিয়া প্রচলিত হইতেছিল তাহা জানিবার জন্য একটু আগ্রহান্বিত হইয়া নরেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গল্পটা ট্রামে কিরকম ভাবে উল্লেখিত হইতেছিল ?

নরেশ বলিল—"ট্রামে শুনিলাম দুই সহস্র গিনি পূর্ণ একটি বাক্স জাল রেল রসিদ দেখাইয়া বড়বাজারের একদল প্রসিদ্ধ জুয়াচোর খালাস করিয়া লইয়া যায়। এ রহস্যের কেহ কিছু মীমাংসা করিতে পারে না, শেষে কেসটা আমার হস্তে সমর্পিত হয়, আমি কেবল পায়ের দাগ ধরিয়া—মনে থাকে যেন ঘটনার একমাস পরে—চোরের আড্ডায় পৌঁছাই। সেই দস্যুদল তখন প্রেমারা খেলায় উন্মত্ত ছিল আর ভোতারাম বুধমলের সেই ধনপূর্ণ অপহৃত বাক্সটা গৃহে পড়িয়াছিল। আমি শার্দ্দূল বিক্রমে রোষকষায়িতনেত্রে দুই হস্তে দুইটি রিভল্‌বার ধারণ করিয়া বেগে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম"—

নরেশের কথা শুনিয়া আমি হাঁসিয়া উঠিলাম। স্মিতমুখে নরেশ বলিল—আর হাঁসিও না, আমি ত লক্ষ্মণের মত মেঘনাদের যজ্ঞ গৃহে প্রবেশ করিলাম। দস্যুগুলা ছোরা ছুরি লাঠি সোটা বাহির করিল। আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। আমার আজ্ঞার অপেক্ষায় সশস্ত্র সরকারী পুলিস বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া আমার সাঙ্কেতিক বাঁশিটির শব্দ করিলাম, তখন সদলবলে সরকারী পুলিস গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়পক্ষে একটা বেশ গুরুতর রকমের মারপিট হইল, শেষে দুর্বৃত্তেরা ধৃত হইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইল।

আমরা উভয়ে খুব হাঁসিলাম। আমি বলিলাম—কি জান সাধারণ লোকের দোষ নাই। একশ্রেণীর দেশী ও বিলাতী ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস আছে যাহাতে লাঠী সোটা গুলি গোলা মারপিট প্রভৃতি যত অসম্ভব আজগুবি ব্যাপার সন্নিবেশিত থাকে।

এই সকল লেখকই পাঠকদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দেয়। আমার বিশ্বাস সেই সকল লেখকগণও মামলা তদন্ত সংক্রান্ত কোন কথাই বোঝেন না এবং সাধারণ পাঠকবর্গ একটু স্থির হইয়া বিচার করিয়া দেখে না যে, বাস্তব জগতে সে শ্রেণীর কার্য্য কয়টা সংঘটিত হইয়া থাকে, সুতরাং ট্রামগাড়ির যাত্রীদিগের মধ্যে মনোরঞ্জক দুই একটি আজগুবি গল্প জন্মিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে।

নরেশ বলিল—বাস্তবিক তোমার তদন্তের প্রথা বড় চমৎকার। কার্য্য কারণের সম্বন্ধ ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রতি পদে পদে হিসাব করিয়া চলিলে অতি সত্বরে এবং প্রকৃত সাফল্যের সহিত সত্যে পৌছান যায়। কিন্তু—

ঠিক সেই সময় আমাদিগের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে একটি ভদ্রলোক সত্বরই আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আমরা পূর্ব্বেই অশ্বপদ বিক্ষিপ্ত জলের শব্দ পাইয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ দুর্য্যোগের দিনে সেই গাড়িখানি যে আমাদিগেরই কার্য্যস্থলে যাত্রী লইয়া আসিবে, সে সন্দেহ আমাদিগের মনে মুহূর্ত্তের জন্য উপস্থিত হয় নাই।

আমাদিগের আদেশ মত ভৃত্য বাহিরে ভদ্রলোকটিকে ডাকিতে গেলে নরেশ বলিল—আর কেন? পেচক বৃত্তি অবলম্বন কর, কক্ষান্তরে যাও।

আমি বলিলাম,—এমন দিনে যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারে তাহার প্রয়োজন যে নিতান্ত গুরুতর সে বিষয়ে মতভেদ নাই। এরূপ লোককে প্রথম হইতে নির্ভীক চিত্তে বিশ্বাস করিতে পারা যায়। সুতরাং আমি স্বয়ং ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।

ক্রমশঃ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩১৯। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

আজান।

বিশ্বরাজের আহ্বানবাণী আজানের মহাধ্বনি শুনিয়াছ কি?—শুনিয়াছ কি সেই বিরাট সুমহান নিনাদ—মস্‌জিদে মস্‌জিদে, গৃহে গৃহে প্রাণবাণীর সেই সুগম্ভীর ঝঙ্কার—দিবসে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায়, নিশীথে সেই প্রাণশিহরণ 'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাহো আকবর' মহারব? যদি না শুনিয়া থাক, তবে কিছুই শুন নাই।

মোহময় মানবজীবনে আজান চৈতন্যের মহাবাণী, পূজার আহ্বান, কল্যাণের মন্ত্র, সাধনার প্রেরণা। আজানের ভাব গভীর হইতে গভীর, মধুর হইতে মধুর। প্রতিদিন আজানের ধ্বনিতে ধ্বনিতে অনন্তের সত্তা জাগে, আজানের সুরে সুরে মর্ম্মে মর্ম্মে পুলক ছুটে, প্রভু-পূজার আহ্বানরবে প্রাণের পর্দ্দায় পর্দ্দায় ঝঙ্কার উঠে, হৃদয় ভরিয়া নিবেদনের আবেগ চঞ্চল হইয়া প্রকাশ পায়। একদিন বাঙ্গালী পরিব্রাজক কনষ্টাণ্টিনোপোলের প্রাসাদ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজানের মহাধ্বনি শুনিয়াছিলেন, শুনিয়া শুনিয়া সেই উদাত্ত গম্ভীর মধুর স্বরে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়াছিলেন। * এমন প্রাণারাম ধ্বনি যদি না শুনিয়া থাক, যদি জীবনে একবার মুহূর্ত্তের জন্যও ইহার আভ্যন্তরীন মহাভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া না থাক, তবে কিছুই শুন নাই, কিছুই বুঝ নাই।

* শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেনের 'ভূপ্রদক্ষিণ'।

আজানের ধ্বনি গম্ভীর ও মধুর, প্রাণভেদী ও প্রাণারাম। একদিকে যেমন ইহা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত ও প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে, অপর দিকে তেমনই সমগ্র প্রাণ অপূর্ব্ব আনন্দরসে সিক্ত ও পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। যখন ধ্বনির পর ধ্বনিতে মহাশূন্য মথিত করিয়া আজানবাণী ধীরে গম্ভীরে উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন নিদ্রার মোহ, সুপ্তির সুখ, স্বপ্নের আবেশ স্বপ্নের ন্যায় মিলাইয়া যায়, মোহাবিষ্ট অবশ মন চৈতন্য-পুলকে জাগ্রত হইয়া উঠে; তখন সংসারের কুহকমন্ত্র বিস্মৃতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়, বিশ্বপ্রকৃতি বিচিত্র রূপ-রস, বর্ণ-গন্ধ,ছন্দ-লীলা ও কল-সঙ্গীতের মোহিনী মায়া লইয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়ায়—ভক্তের প্রাণমন ভরিয়া শুধুই বাজিতে থাকে 'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাহো আকবর'; তখন অরূপ আসিয়া রূপ ঢাকিয়া ফেলে, অনন্ত আসিয়া সান্ত ভরিয়া দেয়, মানসে নয়নে শুধুই ভাসে 'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাহো আকবর'; তখন মানুষ সুস্থ হইয়া স্বস্থ হইয়া নিবেদনের জন্য—সাধনার জন্য—কল্যাণের নিমিত্ত ধ্যানের মন্দিরে আকুল ভাবে ছুটিয়া যায়। তাই আজান চৈতন্যের বাণী, সাধনার প্রেরণা।

আজান-ধ্বনি দিন-যামিনী এই কথাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলে, মর্ম্মদ্বারে বারে বারে এই বারতাই ছুটিয়া ছুটিয়া বহিয়া আনে—কে কোথায় আছ মুগ্ধ সুপ্ত বিস্মৃত মানুষ, কে কোথায় সংসারের স্বার্থকোলাহলে ডুবিয়া আছ, কে কোথায় সংসারের কুহকমন্ত্রে আত্ম হারাইয়া অনন্ত ভুলিয়া সান্তে মজিয়া আছ, ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, ফিরিয়া এস, আত্মরূপে আপন ভাবে ফিরিয়া এস; হে বিস্মৃত মানুষ! প্রভুর আহ্বান আসিয়াছে, মোহমায়া হইতে জাগ্রত হও—প্রভুই শ্রেষ্ঠ, প্রভুই কাম্য—প্রভুর সকাশে ফিরিয়া এস; তোমার শত মোহ-গ্লানি, ক্লেদ-কলুষ, মিথ্যা ছলনা পশ্চাতে ফেলিয়া কল্যাণ লাভের জন্য ছুটিয়া এস; এইখানেই তোমার রূপ, এই খানেই তোমার সত্ত্বা—হে প্রবাসি! স্ববাসে এস; দূর হইতে নিকটে, মিথ্যা হইতে সত্যে, সান্ত হইতে অনন্তে ফিরিয়া এস; আপনাকে নিবেদন করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইবার জন্য ছুটিয়া এস।

জোহর বা মধ্যাহ্নের আজানে আজান-ধ্বনির এই মর্ম্মবাণী পরিষ্কার রূপে উপলব্ধ হয়। তখন শুধু পৃথিবীর দৈনিক জীবনের চরম প্রকাশ নহে, তখন শুধু সূর্য্যের রশ্মিমালা ষোলকলায় উদ্ভাসিত নহে, মানুষের সাংসারিক জীবনেরও তখন মধ্যাহ্ন। কর্ম্মের কোলাহলে বিশ্বের অণু-পরমাণু শব্দায়মান।

স্বার্থের সাধনায় মানুষের চিত্ত নৃত্যমুখর পদ্মার মত চঞ্চল। চাহিয়া দেখ বিশ্বের অঙ্গ ভরিয়া কর্ম্মের কি উদ্দাম উচ্ছ্বাস! কি ব্যস্ততা! কি চঞ্চলতা! এক অবিরাম ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে বিশ্বভুবন কর্ম্মোন্মাদনায় ভরপুর। ক্ষেত্রে চত্বরে, ইস্কুলে আফিসে, বাজারে বিপনিতে কর্ম্মের অপার আকুলতা। মানুষ কর্ম্মচেষ্টায় অশ্রান্ত ভাবে ছুটিতেছে, ঘুরিতেছে, লুটিতেছে। কোথায়ও চিন্তা করিবার অবসর নাই—সজ্ঞানতার লেশ নাই। সাংসারিক স্বার্থ সাধনার অবিরাম কর্ম্ম-কোলাহলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জমান। মধ্যাহ্নের খরতাপে মানুষের বাহ্য প্রকৃতিতেই শুধু একটা বিহ্বলতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, পরন্তু তাহার সমগ্র অন্তরও এক অবশ পার্থিব কর্ম্মানুগামিতার ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়াছে। সংসারের মোহে মানুষ মুগ্ধ ও বিস্মৃত। তাহার আধ্যাত্মিক ভাব সর্ব্ব প্রকারে সুপ্ত ও বিলয়মান।

এমন সময়ে বিশ্বের এই কর্ম্মময় ভাবস্রোত চঞ্চল ও স্তম্ভিত করিয়া হঠাৎ ভেরীধ্বনির মত বাণী উঠিল—'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাহো আকবর'। বাহ্য জগৎ এই মহারব শুনিবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মানব সংসারের সার্ব্বজনীন ভাবের সহিত ইহার কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই; ইহা মাধ্যাত্মিক বিশ্বের কর্ম্মমুখর স্বার্থময় ভাবস্রোতের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ও অভিনব সুর। যেন বহমান বারিধি-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সহসা আগ্নেয়গিরির অনলোচ্ছ্বাস গর্জ্জিয়া উঠিল, যেন সহসা মেদিনী ভেদিয়া, দিগন্ত মথিয়া, আকাশ ভাঙ্গিয়া ভীম দৈববাণী হইল। সে মহাধ্বনিতে বিশ্বের কর্ম্মস্রোত মুহূর্ত্তে রুদ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল; মানুষ চমকিত হইয়া শুনিল, 'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাহো আকবর'—'মহান আল্লা' 'মহান পাতা' তাঁহার অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, আর কিছু গরিষ্ঠ নাই। বিশ্ব তাঁহার, কর্ম্ম তাঁহার, রূপ তাঁহার, সুখ তাঁহার, ধন তাঁহার, ধান্য তাঁহার, জ্ঞান তাঁহার, মান তাঁহার; তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পাতা; তিনিই প্রধান, তিনিই গরীয়ান। পার্থিবতার ভাবস্রোত মহাবেগে প্রতিহত করিয়া আবার ধ্বনি উঠিল, 'আশ্‌হাদো আন্ লাএলাহা এল্লাল্লাহ্', 'আশ্‌হাদো আন্ লাএলাহা এল্লাল্লাহ্'—যেন সহসা চৈতন্যবাণী মূর্ত্ত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, যেন সর্ব্বব্যাপী মোহাবেশের মধ্যে সহসা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিশ্ব-আত্মা মুহুর্মুহু বলিয়া উঠিল— 'আমার সাক্ষ্য, আল্লা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই', 'আমার সাক্ষ্য, প্রভু ভিন্ন আর কিছু কাম্য নাই'; মুগ্ধ মানুষ! কিসের সেবায় আত্ম হারাইয়াছ? তাঁহাকে

ছাড়িয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছ ? তিনি রাজার রাজা, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ রাজার উপাসনা করিতেছ ? তিনি ধনের ধাতা, তাঁহাকে ভুলিয়া কোন্ ধনের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছ ? তিনি মানের মালিক, তাঁহাকে ত্যজিয়া কোন্ মানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছ ? হে সত্যস্বরূপ ! মিথ্যা ঐ ধন ও মান ; তুচ্ছ ঐ যশ ও ক্ষমতা ; ঐ ছায়ার পশ্চাতে ঘুরিয়া মরিও না, ঐ অনিত্যের সেবায় জীবন ক্ষয় করিও না ; অনন্ত নিত্য পরম সত্য প্রভুই মাত্র উপাস্য, প্রভুই একমাত্র সাধনা ও আরাধনার ধন। 'হাই আলাচ্ছালাহ'—'এস হে প্রভুর পূজায় ছুটিয়া এস', 'হাই আলাচ্ছালাহ'—প্রভুর সেবায়, সত্যের সাধনায়, অনন্তের আরাধনায় ছুটিয়া এস। 'হাই আলাল ফালাহ্'—'কল্যাণ লাভের জন্য ছুটিয়া এস।' মানুষ ! ঐ হর্ষ ও হাস্য, দর্প ও দীপ্তি, স্বার্থসাধনার ঐ চল চল ছল ছল অপার অনাহত কর্ম্মস্রোত, উহাতে মঙ্গল নাই ; ঐ সমস্তই বুদ্বুদের উপর রবিরশ্মির ক্রীড়ারাগ ; মিথ্যা ও অনিত্য, ছায়া ও মায়া। প্রভুর সেবাই মাত্র কল্যাণ ; ইহাতেই সত্তা, ইহাতেই সুখ, ইহাতেই শুদ্ধি ও ইহাতেই মুক্তি। যে আসিবে, যে সেবা করিবে, সাধনা করিবে, ডুবিবে ও মজিবে, অনন্ত জীবন—অনন্ত সুখ—অনন্ত হর্ষ তাহারই। ইহাই মোক্ষ, ইহাই কল্যাণ ; 'হাই আলাল ফালাহ্'—'কল্যাণ লাভের জন্য ছুটিয়া এস'। এই আহ্বান যাহারা শুনিল ও বুঝিল, তাহাদের গতি ফিরিয়া গেল, বিশ্বের কর্ম্মস্রোত তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ ও মিথ্যা হইয়া গেল ; তাহারা সকল ফেলিয়া, সকল ভুলিয়া আকুল হইয়া প্রভুর পূজায় ছুটিয়া গেল।

এমন চৈতন্যের স্বর, এমন আনন্দময় আশ্বাসময় পরিপূর্ণ কল্যাণ-বাণী আর কোথায়ও শুনিয়াছ কি ? এই মিথ্যা ও ছলনার সংসারে সত্য সাধনা ও কল্যাণের দিকে এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া আর কেহ ডাকিয়াছে কি ? ইহা শঙ্খের মন্দ্রে নাই, ঘণ্টার ধ্বনিতে নাই, হার্ম্মোনিয়ামের সুরে ইহার ঝঙ্কার পাওয়া যায় না।

আজান মিলনের মন্ত্র—প্রেমের প্রেরণা। সাপুড়িয়ার বাঁশীর সুরে যেমন করিয়া সর্প ঢুলিয়া আসে, নবঘনের গুরু গুরু নাদে ময়ূর নৃত্য করে, চাতক উধাও হইয়া গগনে ছুটে, আজানের আহ্বানে আল্লার পানে মানুষ তেমনই ভাবে ছুটিয়া যায়। যখন মধুরে গম্ভীরে আজানের ধ্বনি উঠে, যখন ধ্বনির পর ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত পুলকিত করিয়া আল্লার আহ্বান ছুটিতে থাকে তখন অন্য চিন্তার অবসর থাকে না, অন্য কর্ম্মের সময় মিলে না ; তখন আকুল হইয়া প্রভুর

মিলনে সেবক ছুটিয়া যায়, সাগর-মিলনে তটিনী ধায়, সান্ত অনন্তে প্রয়াণ করে।

আজানের মধ্যে এই মহিমাময় বিরাট মিলনাহ্বান ব্যতীত মিলনের আরও একটা সুর আছে; তাহাও সার্থক ও সুন্দর। যখন আজানের আহ্বান উঠে, তখন পৃথক পৃথক উপাসনা হয় না, গৃহে গৃহে নিঃসঙ্গে নিবেদন চলে না; তখন উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ভুলিয়া, ধনের গর্ব ও পদের মহিমা পশ্চাতে ফেলিয়া সেবার জন্য সমান ভাবে প্রভুর প্রাঙ্গনে আসিয়া মিলিত হইতে হয়; প্রভু-মিলনের মধ্য দিয়া ভাইয়ের সহিত ভাইএর, মানুষের সহিত মানুষের মিলন সার্থক হইয়া উঠে। এক আনন্দময় গভীর প্রেমতরঙ্গ সকল ভেদিয়া, সকল ঘিরিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে।

এই গভীর-মধুর মিলন-বাণী, এই চৈতন্যময় কল্যাণময় আজান-ধ্বনি যদি না শুনিয়া থাক, তবে আর শুনিয়াছ কি? যদি বুঝিতে চাও আজান কি মহাভাবের প্রতিধ্বনি, কি গভীর গম্ভীর চৈতন্যের সুর, কি অমৃতময় মধুর বাণী, তবে মোহ ও জীবন, আলো ও অন্ধকারের বেলাভূমে দাঁড়াইয়া ফজর বা উষার আজান ধ্বনি নীরব হইয়া শ্রবণ কর।—এখনও অন্ধকার ভেদিয়া আলোকমালা উছলিয়া উঠে নাই, এখনও বিশ্বের অণু-পরমাণু ছন্দে ছন্দে বাজিয়া উঠে নাই—তবু মূর্চ্ছার শেষ, অন্ধকারের অবসান। বিশ্বভুবন নব জীবনের প্রতীক্ষায় নীরব। বৃক্ষ নীরব—পক্ষী নীরব, গৃহ নীরব—গৃহী নীরব, প্রাণ নীরব—প্রাণী নীরব; বিরাট বিশ্ব বিরাট ব্যোমের আলিঙ্গনে স্থির গম্ভীর নীরব! এই গম্ভীর নীরবতার মধ্যে নবজীবনের সুরভিশ্বাস; প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে স্নিগ্ধ শান্তির জীবন-সঞ্জীবন সুধা-ধার। এমন মহামুহূর্ত্তে ঐ শুন মহাবাণী—ঐ শুন বিশ্বব্যোম আলোড়িত করিয়া, নীরব মাধুরী মথিত করিয়া, জীবনের স্পন্দন ছুটাইয়া ধ্বনি উঠিতেছে, 'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাহো আকবর'; শুন, কান পাতিয়া প্রাণ ভরিয়া শুন —দূরশ্রুত বীণাধ্বনির মত মধুর, দৈববাণীর ন্যায় গম্ভীর মর্ম্মভেদী মহাবাণী— 'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাহো আকবর'; মরণতন্দ্রার অবসানে বিশ্বের প্রথম জীবন-বাণী, হর্ষ ও কৃতজ্ঞতার মধুর মধুর প্রণব স্বর; যেন শান্তি, সৌরভ ও পবিত্রতার সুধাধারার মধ্যে জাগ্রত হইয়া বিশ্বপতির উদ্দেশে বিশ্বচিত্ত কৃতজ্ঞতার পরিশুদ্ধ পুলকে কম্পিত হইতেছে; ভক্ত প্রাণ ভরিয়া বলিতেছে, 'জয় জয় আল্লা', 'জয় বিশ্বরাজ'—মহিমায় মহান, করুণায় গরীয়ান আল্লার জয়, আল্লার জয়; বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, জীবের যিনি পাতা, সেই পরম প্রভু আল্লার জয়,

আল্লার জয়। তাঁহারই মহিমায় আঁধারের অবসান, মরণের শেষ; তাঁহারই করুণায় আঁধার ভেদিয়া নবীন জীবনের জ্যোতি ফুটিতেছে, তাঁহারই কৃপায় নিদ্রার মৃত্যু-মোহ ভাঙ্গিয়া কণায় কণায় জীবনের পুলক জাগিতেছে। 'আশ্‌-হাদো আন্‌ লাএলাহা এল্লাল্লাহ্‌', 'আশ্‌হাদো আন্‌ লাএলাহা এল্লাল্লাহ্‌'—'আমার সাক্ষ্য, সেই পরম পাতা প্রভুই মাত্র উপাস্য', 'আমার সাক্ষ্য, সেই প্রভুই মাত্র আরাধনার ধন'। শুন শুন, জীবন-প্রভাতে প্রাণবাণীর ঝঙ্কার শুন; শুভ্র শান্ত সুপবিত্র মহামুহূর্ত্তে মহিমাময় বিশ্বরাজের সমীপে মানবের জীবন-সাধনার সাক্ষ্য শুন; বিগতমোহ, বিগতগ্লানি, শুদ্ধ বুদ্ধ মানুষ জীবনযাত্রার প্রারম্ভ-ক্ষণে বলিতেছে,—জীবনে একমাত্র প্রভুকেই আরাধনা করিব, প্রভুকেই কামনা করিব, প্রভুরই সাধনা করিব; 'আশ্‌হাদো আন্‌ লাএলাহা এল্লাল্লাহ্‌'—'আমার সাক্ষ্য, পরমপাতা আল্লা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই।' এত বড় সাক্ষ্য-বাক্য জগতে আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই। এমন সম্ভ্রমময় মহা মুহূর্ত্তে এত বড় সাক্ষ্য ভিন্ন আর কোন বাক্য হইতে পারে না। তাই এই সাক্ষ্য-বাক্য মর্ম্মে মর্ম্মে মধু ঢালিয়া দিল, প্রভাত-পবনে শান্ত নীরব ভুবন ভরিয়া সাক্ষ্য বাজিল, "লাএলাহা এল্লাল্লাহ্‌","লাএলাহা এল্লাল্লাহ"। আবার আবার—সুরতরঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিল, 'আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদার্‌ রসুলুল্লাহ্‌', 'আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদার্‌ রসুলুল্লাহ্‌'—'আমার সাক্ষ্য, নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লার প্রেরিত'; বিশ্বের যিনি পাতা, আলোক যাঁহার কৃপা, জীবন যাঁহার করুণা মোহাম্মদ সেই পরম প্রভুর দয়ার ছায়া, মোহাম্মদ সেই আল্লার স্নেহের পরম দান। এ ছায়ায় যে আসিবে, এ দান যে বরণ করিবে, অনন্ত করুণায় সে স্নাত হইবে, জীবন জনম সফল হইবে। শুন, পাপী শুন, তাপী শুন; নিরাশায় কাহার বুক ভাঙ্গিয়াছে,কাহার পথের আলো নিবিয়া গিয়াছে—আশ্বাসবাণী শুন, সান্ত্বনা-ময় সাক্ষ্য শুন; 'নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লার প্রেরিত'; নিশ্চয় উদ্ধার করিবার জন্য, জীবন দিবার জন্য আল্লার করুণারূপে তিনি প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয় লও,দয়াল ধাতার সন্ধান মিলিবে। 'হাই আলাচ্ছালাহ্‌', 'হাই আলাচ্ছা-লাহ্‌'—'এস এস, প্রভু-পূজায় ছুটিয়া এস', 'আল্লার আরাধনার জন্য ছুটিয়া এস'। জীবনদাতা পরম পাতা দয়াল ধাতার সমীপে জীবন-প্রভাতে প্রাণের নিবেদন জানাইবার জন্য ছুটিয়া এস। 'হাই আলাল ফালাহ্‌', 'হাই আলাল ফালাহ্‌'—কে কল্যাণ চাও, কে নিদ্রাবসানে নব জীবনের শান্তি সৌরভ ও মাধুরী চাও, কে মহানিদ্রা শেষে অনন্ত জীবন ও অনন্ত হর্ষ চাও,

প্রভু-পূজায় ছুটিয়া এস ; কল্যাণের তরে ছুটিয়া এস। 'আস্‌সালাতো খায়রোম্ মেনান্ নত্তম', 'আস্ সালাতো খায়রোম্ মেনান্ নত্তম'; শুন শুন, সুপ্ত মুগ্ধ মানুষ শুন, 'নিদ্রাপেক্ষা প্রার্থনা উত্তম'; বিলাসবিভোর ধনী শুন, সুখাবিষ্ট যুবক যুবতী শুন, বালক বালিকা বৃদ্ধ শুন, চৈতন্যের আহ্বান শুন, কল্যাণের প্রেরণা শুন, 'নিদ্রাপেক্ষা প্রভু-পূজা পরমোত্তম'; কি ছার মূর্চ্ছাসুখে মজিয়া আছ, সজ্ঞান হইয়া স্বস্থ হইয়া প্রভুর পূজায় ছুটিয়া এস, অমৃতের আস্বাদ পাইবে ; কি ক্ষণিক শ্রান্তিতে আত্ম হারাইয়াছ, আল্লার আরাধনায় এস, অনন্ত শান্তি পাইবে ; কি স্বপ্নের সুখাবেশে বিভোর হইয়া আছ, প্রিয়তমের সদনে এস, কল্প কল্প নিত্য সত্য আনন্দ পাইবে। কে মোহ-নিদ্রায় ডুবিয়া আছ, কে স্বপ্ন-মায়ায় মজিয়া আছ, কে সুখাবেশে ঢলিয়া আছ, জাগ, উঠ, প্রভু-পূজায় ছুটিয়া এস। 'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাহো আকবর', 'আল্লাই শ্রেষ্ঠ', আল্লাই শ্রেষ্ঠ'। 'লাএলাহা এল্লাল্লাহ্', 'আল্লাই মাত্র উপাস্য',—প্রভুই মাত্র কামনার ধন।

এইরূপে আজানের মধুর গম্ভীর স্বর-লহরী শান্ত নীরব বিশ্ববক্ষে জীবনের স্পন্দনা তুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছুটিয়া গেল ; আল্লার আহ্বান-রবে মর্ম্মে মর্ম্মে চৈতন্য জাগিল। মানুষ হৃদয় ভরিয়া আনন্দ লইয়া, সজ্ঞান ইন্দ্রিয় লইয়া, নির্ম্মল চিত্ত লইয়া, নবীন জীবন লইয়া প্রভু-পূজায় ছুটিয়া গেল ; বিশ্বভুবন নবজীবনের আলোক, পুলক ও ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ হইল।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী।

কোরান শরীফের নীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আত্মীয়-সম্পর্কীয় নীতি।

কোরান শরীফের নির্দ্দেশ, "পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করিবে ; যদি তাহাদের একজন বা উভয়েই তোমার নিকটে বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়, তবে তুমি তাহাদের প্রতি ধিক্কার-বাণী বলিও না ও তাহাদিগকে ধমক দিও না এবং তাহাদিগের সহিত সসম্মানে কথা বলিও ; এবং তাহাদের জন্য দয়ার নিমিত্ত স্বীয় বিনয়ের বাহুকে নত করিও ও বলিও 'হে আমার প্রতিপালক, তাহারা

যেমন আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছে, তদ্রূপ তুমি তাহাদিগকে দয়া কর।" (সুরা বনিইস্রাইল)। পিতামাতাকে সম্মান করা কোরানের বিধি,কিন্তু তাহাদের অন্যায় আজ্ঞা পালন করিতে কোরান শরীফে নিষেধ আছে ;—"এবং যে বস্তু সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই, যদি তাহারা আমার সঙ্গে তাহাকে অংশী করিতে তোমাকে অনুরোধ করে, তবে তুমি তাহাদের অনুগত হইও না। তুমি সংসারে বিধিমতে তাহাদের সঙ্গ কর।" (সুরা লোকমান ২।১৫)।

"এবং তোমরা আপন সন্তানদিগকে দরিদ্রতার ভয়ে বধ করিও না ; আমি তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকি। সাবধান! নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা গুরুতর পাপ।" (সুরা বনিইস্রাইল, ৪।৩১)। কোরান শরীফের এই আয়ত হইতে আরব দেশে ও পৃথিবীর মুসলমান রাজ্য সমূহ হইতে শিশুহত্যা চিরকালের তরে উঠিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় পূর্ব্বে আরব দেশে এই বর্ব্বর প্রথার বহুল প্রচলন ছিল।

আইনের চক্ষে বিবাহ একটি চুক্তি মাত্র ; তাই বলিয়া চুক্তি কথায় কোন ঘৃণার ভাব নাই। কারণ কোরান শরীফ অনুসারে প্রত্যেক অঙ্গীকার অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র। যথা—"এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিও ; নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।" (সুরা বনিইস্রাইল ৪।৩৫)। তথাপি কোরান শরীফে বিবাহ আল্লার একটি বিশেষ দানরূপে কথিত হইয়াছে :—"তাঁহার নিদর্শনের মধ্যে এই (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে ভার্য্যা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাদিগেতে সুখী হও ; এবং তোমাদের মধ্যে স্নেহ ও প্রণয় সৃজন করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল দলের নিমিত্ত নিদর্শন সকল (বিদ্যমান) আছে।" (সুরা রূম ৩।২৩)। স্ত্রী-পুরুষের স্বত্ব বিষয়ে আল্লাহ্ তালা বলিতেছেন, "পুরুষদিগের যেরূপ সেই স্ত্রীগণের উপর বৈধাচারে (স্বত্ব), স্ত্রীগণেরও তদ্রূপ ; কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠতা। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা।" (সুরা বকর ২৮।২২৮)। "হে বিশ্বাসিগণ, বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সত্ব লওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নহে এবং উহাদিগকে যাহা কিছু তোমরা দিয়াছ, তাহা লইবার জন্য উহাদিগকে আবদ্ধ করিও না ; কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে কুকার্য্য করিলে (ঐরূপ করিতে পার)। এবং স্ত্রীসহ সদ্ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। যদি তাহারা তোমাদের মনোনীত না হয়, তবে হইতে পারে যাহা তোমাদের অমনোনীত, আল্লাহ্ তাহাতে বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন। (সুরা নেসা ৩।১৯)।

তালাক প্রথা কোরান শরীফের অনুমোদিত। বাস্তবিক তালাক অবস্থা বিশেষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। সুখ শান্তির জন্য বিবাহ। যখন দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রী পুরুষের একত্র বসবাস করা অসম্ভব হয়, তখন তালাক দ্বারা উভয়ে অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। তালাক তিন বার দিতে হয়। ইহাতে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। শেষ তালাকের পূর্ব্বে দুইবার তালাক দ্বারা পরীক্ষা করা হয় যে অলঙ্ঘনীয় শেষ তালাকের পর তাহারা অনুতপ্ত হয় কি না এবং মিলন সম্ভব কি না। তালাক, বিধবা বিবাহ এবং পর্দ্দা এই তিনটি দ্বারা মুসলমান সমাজের পবিত্রতা রক্ষিত হইতেছে। জগতের ধর্ম্ম শাস্ত্রগুলির মধ্যে কোরান শরীফই নারীকে তাহার প্রকৃতির উপযোগী স্বত্ব দান করিয়াছে।

অনাথদিগের সম্বন্ধে কোরান শরীফের আদেশ ;—"এবং তাহারা অনাথ-দিগের সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে ; বল, তাহাদের কুশল সম্পাদন শ্রেয়ঃ ; যদি তাহাদের সঙ্গে তোমরা বাস কর, তবে তাহারা তোমাদের ভ্রাতা।" (সুরা বকর ২৭।২২১)। "নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার করিয়া অনাথদিগের ধনভোগ করে, তাহারা নিজের পাকস্থলীতে অগ্নি ভিন্ন ভোজন করে না এবং অবশ্য তাহারা নরকে যাইবে" (সুরা নেসা ১।১০)।

আত্মীয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেন, "এবং আত্মী-য়তা সম্বন্ধে ভীত হও।" (সুরা নেসা ১।১)। "এবং তুমি স্বগণকে ও দরিদ্রকে ও পথিককে তাহার স্বত্ব প্রদান কর।" (সুরা বনিইস্রাইল ৩।২৬)। উপকার প্রাপ্তি বিষয়ে আত্মীয়দিগের স্বত্ব সর্ব্বপ্রথম। যথা—"এবং পিতামাতা, স্বগণ, নিরাশ্রয়, দরিদ্র, স্বজন প্রতিবেশী, পরজন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গী ও পরি-ব্রাজক, এ সকলের প্রতি এবং তোমাদের হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর ; যাহারা অহঙ্কারী আত্মাভিমানী হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভাল বাসেন না।" (সুরা নেসা ৬।৩৬)।

শত্রু-সম্পর্কীয় নীতি।

শত্রুর প্রতি ব্যবহার-বিধি হইতে কোন ধর্ম্মের নীতির প্রকৃতি অবগত হওয়া যায়। শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। যদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্র শত্রুকে ভাল বাসিতে বলে, তবে তাহার মানব চরিত্রানভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। ভালবাসা একটি মনোবৃত্তি ; ইহার উপর কাহারও হাত নাই। তবে প্রতিশোধের একটি সীমা নির্দ্দেশ ও শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার—এইটুকু মানব

প্রকৃতিজ্ঞ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান হইতে পারে। বিচারক বাদীকে ক্ষমায় বাধ্য করিতে পারেন না। কোরান শরীফও কাহাকেও ক্ষমায় বাধ্য করে না; তবে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করে। যথা—"এবং অপকারের নিমিত্ত তৎসদৃশ অপকার; পরন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও সন্ধি স্থাপন করে, পরে আল্লার নিকট তাহার পুরস্কার আছে। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদিগকে ভালবাসেন না।" (সুরা শূরা ৪।৪০)।

কোরান শরীফ শত্রুকে শুধু ক্ষমা করিতে উপদেশ দেয় না, শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেও উপদেশ দেয়। যথা—"এবং শুভ ও অশুভ তুল্য নয়, যাহা অতীত শুভ তদ্দ্বারা তুমি (অশুভকে) দূর কর, (এরূপ করিলে) পরে সেই ব্যক্তি যাহার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে অকস্মাৎ যেন সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়। এবং যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করে তাহারা ব্যতীত (অন্য কাহাতেও) এই (প্রকৃতি) সংলগ্ন করা হয় না ও যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী তাহাদিগকে ব্যতীত ইহা সংলগ্ন করা হয় না।" (সুরা হামীম সিয্‌দা ৫।৩৪, ৩৫)। ক্রমশঃ।

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজপুরুষগণ প্রজাকুলের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণরজেনারল লর্ড হেষ্টিংস তাহাদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার যত্নে কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে সংস্কৃত, আরবী এবং পারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, ভাষা, আচার ব্যবহার সমস্তই মান্য করিতেন। রাজপুরুষগণ এই সমস্ত বিষয়ে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের সূচনা করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতবর্ষের বিদ্যালয় সমূহে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা প্রদান করিলে ভারতীয়গণের ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইবে এবং আদালত সমূহে পারসীর বিনাশ সাধন করিয়া ইংরেজী ভাষা প্রচলন করিলে তাহাদের রক্ষণশীলতা আঘাত প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ রাজপুরুষগণ ভারতবাসীদিগের বিরাগভাজন হইয়া ব্রিটিশ আধিপত্যের মূল শিথিল করিবার আশঙ্কায় তাদৃশ কার্য্য অসমীচীন বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এক দল নব্য ইংরেজ রাজপুরুষ ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য অভিলাষী হন এবং তদর্থে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে শিক্ষা বিস্তারার্থ কর্তৃপক্ষের যত্ন ও ব্যয় প্রসারতা লাভ করিতে থাকে, অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনাভিলাষী সম্প্রদায় শক্তিশালী হইয়া উঠেন। অবশেষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দুই দলের বিরোধ এরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার মীমাংসা করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজের শিক্ষা-নীতি অবধারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবাসীদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত জন্য এক কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটীর সদস্যবৃন্দ সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "Half of the committee, called the orientalists, were for the continuation of the old system of stipends tenable for twelve or fifteen years to students of Arabic and Sanskrit and for liberal expenditure on the publication of works in these languages. The other half, called the anglicists, desired to reduce the expenditure on stipends held by 'lazy and stupid school boys of 30 and 35 years of age' and to cut down the sums lavished on Sanskrit and Arabic learning.

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুরুষগণ আগ্রা নগরীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রাগুক্ত শিক্ষা সমিতি এই নব স্থাপিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধীয় মতদ্বৈধ নিবন্ধন তাঁহারা আগ্রা বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হন। পাঁচজন সদস্য সংস্কৃত, আরবী এবং পারসী ভাষার পক্ষাবলম্বী ছিলেন, অপর পাঁচজন সদস্য ইংরেজী ও প্রাদেশিক ভাষার প্রচলন করিয়া কেবল ভারতবাসীদিগের রক্ষণশীলতা পরিতৃপ্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সংকল্প স্থির করিয়াছিলেন।

তাদৃশ শিক্ষা সঙ্কট কালে চিরখ্যাত লর্ড মেকলে ভারতীয় মন্ত্রী সভার আইন-সভ্যের পদ লাভ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তদীয় অগাধ বিদ্যার খ্যাতি ভারতীয় ইংরেজ সমাজে সুবিদিত ছিল। এজন্য তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে ভারতবর্ষে আগমন

মাত্র শিক্ষা সমিতির সভাপতির পদে বরণ করেন। কিন্তু শিক্ষাদানের ভাষা সম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসার পূর্ব্বে তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষা এবং বিদ্যার প্রচলন জন্য তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল; তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া নবীন ইংরেজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষা প্রচলনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। আমরা নিম্নে এই মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি।

"প্রাচ্য ভাষার পক্ষপাতী সম্প্রদায় যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার যথার্থতা স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে অর্থ ব্যয় হইতেছে, এই অর্থ অন্য ভাবে ব্যয় করিলে তাহা অপব্যয় মাত্র হইবে। তাঁহাদের এই তর্ক যুক্তিহীন। একটি স্থান স্বাস্থ্যকর বিবেচনা করায় তথায় স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইল, কিয়ৎকাল পরে দেখা গেল ঐ স্থান স্বাস্থ্যকর নহে, তখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইবে। ঐ স্থানে অর্থ ব্যয় হইয়াছে বলিয়া অস্বাস্থ্যকর হইলেও ভবিষ্যতে সেখানেই অর্থব্যয় করিতে হইবে, এরূপ নির্দ্ধারণ কখনও সমীচীন নহে। সরকার পক্ষ একবার প্রাচ্য ভাষার বিস্তার জন্য অর্থব্যয় করিয়াছেন বলিয়া অন্য প্রকার শিক্ষা প্রণালীর অবলম্বন অসমীচীন, এরূপ নির্দ্দেশ যুক্তি-মূলক নহে।

"ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা সমূহ যে সাতিশয় দুরবস্থাপন্ন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে এই সকল ভাষার সৌষ্ঠব সাধন করিতে হইবে। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহের সৌষ্ঠব সাধন জন্য যে পরকীয় ভাষার সহায়তা গ্রহণ করা আবশ্যক, ইহাতে তাহাতে সন্দেহ নাই। একদল বলিতেছেন, আরবী এবং সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে; আর একদল বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাষার সহায়তা আবশ্যক। কোন্ মত সমীচীন, তাহাই বিবেচ্য। আমি সংস্কৃত অথবা আরবীতে অভিজ্ঞ নহি, কিন্তু এই দুই সাহিত্যের সারবত্তা কতদূর, তাহা অবধারণ করিবার জন্য যথাবিহিত যত্ন করিয়াছি। আমি অধিকাংশ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। বিলাতে এবং এখানে প্রাচ্য ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের সহিত আলাপ করিয়াছি। তাঁহারা এই দুই সাহিত্য যতদূর সারবান বলিয়া বিবেচনা করেন,

আমিও ততদূর বিবেচনা করিতে স্বীকৃত আছি। কিন্তু ভারতবর্ষ এবং আরবের সমগ্র গ্রন্থ এক সেল্‌ফ উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য গ্রন্থের তুল্য নহে। প্রাচ্য ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীও এই মত যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন। সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্যের কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ইউরোপের মহাজাতি সকলের উৎকৃষ্ট কাব্যের সহিত সংস্কৃত ও আরবী কাব্যের তুলনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু কল্পনা মূলক গ্রন্থের বিষয় ছাড়িয়া বাস্তব-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা করিলে ইউরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্য অপেক্ষা যে কতদূর উৎকৃষ্ট, তাহা অবধারণার অতীত।

"আমরা ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়াছি ; কিন্তু ভারতবাসী-দিগকে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান করা সম্ভবপর নহে ; পরকীয় ভাষার সহায়তা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কোন্ ভাষার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই মীমাংসার বিষয়। এখন আমার বক্তব্য এই যে, ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেই হইবে। ইউরোপীয় ভাষা সকলের মধ্যেও ইংরেজী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইংরেজী কাব্যরাজি গ্রীক সাহিত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যমালা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রত্যেক বিষয়েই ইংরেজী উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষে ইংরেজী শাসকসম্প্রদায়ের ভাষা। ভারতবর্ষের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ রাজকার্য্যোপলক্ষে এই ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র এসিয়া খণ্ডে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে এই ভাষা ব্যবহৃত হইবে। যদি ভাষার উৎকর্ষ অথবা ভারত-বর্ষের অবস্থার বিষয় বিবেচনা করি, তবে আমাদিগকে ইংরেজী ভাষার পক্ষে অবশ্যই মত প্রদান করিতে হইবে।

"ইংরেজী ভাষা অবলম্বন করিয়া ভারতবাসীদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে ; এরূপ অবস্থায় কুসংস্কারদুষ্ট ইতিহাস (এই ইতিহাসে ত্রিশ ফিট দীর্ঘ রাজা এবং ৩০ হাজার বৎসর ব্যাপী রাজত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে), ভূগোল (এই ভূগোলে দধি সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্রের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়), জ্যোতিষ (এই জ্যোতিষের বিবরণ আমাদের বিদ্যালয়ের বালিকাদের হাস্যোৎ-পাদন করে) প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া কদাচ সঙ্গত নহে। পশ্চিম ইউরোপের ভাষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রুশিয়া দেশ উন্নত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে ইংরেজীও হিন্দুজাতির উন্নতি সাধন করিবে।

"সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুজাতির আইন কানুন এবং আরবী ভাষায় মুসলমান

জাতির আইন কানুন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই দুই ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু এইরূপ যুক্তি গ্রহণ-যোগ্য নহে। পার্লিয়ামেণ্টের আদেশ অনুসারে হিন্দু মুসলমানের আইন কানুন সংগ্রহ করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। কমিশনের কার্য্য শেষ হইলে ঐ সমস্ত ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইবে। অতএব সদরআমীন মুন্সেফ প্রভৃতি বিচারকদের পক্ষে শাস্ত্র বা হাদিস অধ্যয়ন অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে।

"সংস্কৃত ও আরবী ভাষার পক্ষে আর একটি যুক্তি এই যে,ভারতীয় প্রকৃতি-পুঞ্জের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল এই দুই ভাষায় লিখিত এবং তজ্জন্য উহাদের অনুশীলন আবশ্যক। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মমত এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; ইহা কর্ত্তব্যও বটে। কিন্তু যে সাহিত্যের সারবত্তা অতি সামান্য, যে সাহিত্য কেবল নানা প্রকার প্রমাদ ও কুসংস্কার পূর্ণ, তাহার অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা সুযুক্তি এবং নীতিসঙ্গত নহে। প্রাচ্য সাহিত্যের অনুশীলন সুফলপ্রদ নহে; এরূপ স্থলে তাহা কেবল ভীষণ কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়াই যদি আমরা তাহার শিক্ষা দানে নিরত থাকি, তবে আমাদের সে কার্য্য নিশ্চয়ই সভ্যজাতির অনুপযোগী হইবে। আমাদিগকে মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা জ্যোতিষ, মিথ্যা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি ভারতবাসীদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে বিরত রহিয়াছি এবং সর্ব্বদাই বিরত থাকিব। কিন্তু গর্দ্দভ স্পর্শ করিলে কিরূপ ভাবে পবিত্র হইতে হইবে এবং মেষ হত্যা করিলে বেদের কোন্ শ্লোক আবৃত্তি করিতে হইবে, যদি এই শিক্ষা প্রদান করিয়া শিক্ষার্থীদের সময় নষ্ট এবং রাজকোষের অর্থ অপচয় করা হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক এবং বিসদৃশ হইবে।

"সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে,আমরা ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও আরবী ভাষার অনুশীলন ও চর্চ্চা বিস্তার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহি, ইচ্ছামত শিক্ষা কার্য্যে রাজ-কোষের অর্থ ব্যয় করিতে আমাদের স্বাধীনতা রহিয়াছে। যে ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার শিক্ষার জন্যই রাজকোষের অর্থ ব্যয় করা কর্ত্তব্য; সংস্কৃত অথবা আরবী অপেক্ষা ইংরেজীই সুফলপ্রদ; ভারতবাসীরাও ইংরেজী শিক্ষা করিতে অভি-লাষী; আইন কানুন অথবা ধর্ম্মের খাতিরে সংস্কৃত এবং আরবীর অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান অনাবশ্যক; ভারতবাসীদিগকে ইংরেজীতে সুশিক্ষিত করা সম্ভব-পর এবং তদর্থেই আমাদের যত্ন করা আবশ্যক।"

সেই সময়ের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ ভারতবন্ধু মেটকাফ এই মন্তব্য পাঠ করিয়া লিখিলেন, "আমার বোধ হয় ইংরেজী ভাষার যোগেই আমরা ভারতবাসীর উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইব।"

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষে আগমনাবধি ইংরেজী ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লর্ড মেকলের মন্তব্য পাঠ করিয়া সমস্ত সন্দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে মীমাংসা করিলেন।

মহামনা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সমকালে আর দুইটি বিষয় মীমাংসা করিয়াছিলেন; প্রথম, আফিস আদালতে ইংরেজী ভাষার প্রচলন, দ্বিতীয় ভারতবাসীদিগকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিয়োগ। শেষোক্ত দুইটি বিধান প্রথমোক্ত বিধানের ফলস্বরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতবাসীদিগের হিতকল্পে আর একটি ব্যবস্থা আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান। সার্ জন কেই লিখিয়াছেন, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল। কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তদীয় প্রধান সহকারী এবং অস্থায়ী উত্তরাধিকারী লর্ড মেটকাফ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন (Regulations) তুলিয়া দিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন।

ফলতঃ ভারতবর্ষে ইংরাজী প্রচলিত হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দুই বিষয়েই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার যত্নেই ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জের প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সার চার্লস ট্রিভিলয়ন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতশাসন সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট সমক্ষে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। "To Lord William Bentinck belongs the great praise of having placed our dominion in India on its proper foundation in the recognition of the great principle that India is to be governed for the benifit of the Indians, and that the advantages which we derive from it should only be such as are incidental to and inferential from, that course of proceeding."

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ফ্লোরা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রহস্যোদ্‌ঘাটনে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ষ্টুয়ার্টপত্নীর একমাত্র পুত্র ব্যতীত অপর সন্তান সন্ততি ছিল না। তিনি ফ্লোরাকে নিজ কন্যার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় দ্বিতলের একটা প্রকোষ্ঠে ফ্লোরার শয়নগৃহ ও অপর একটায় তাহার পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট হইল। এক কথায় ফ্লোরা যাহাতে কণামাত্র বিষয়ের জন্যও কষ্ট না পায় তাহার সুচারুরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ফ্লোরা ষ্টুয়ার্টপত্নীকে মাতৃসম্বোধন করিত এবং তৎপুত্র উইলিয়মকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিত। উইলিয়ম পঞ্চবিংশ বর্ষীয় তেজস্বী, বুদ্ধিমান ও উন্নতহৃদয় যুবক। সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের হৃদয়ে যে যে গুণাবলী থাকা উচিত উইলিয়মের হৃদয়ে তাহার কণামাত্রেরও অভাব ছিল না।

ফ্লোরার পাঠগৃহের পরেই উইলিয়মের পাঠাগার, সুতরাং পুনঃ পুনঃ উভয়ের সাক্ষাৎ হইত। ফ্লোরাকে দেখিয়া অবধি উইলিয়মের হৃদয়ে কি একটা অস্পষ্ট রেখা পড়িয়াছিল, সেই রেখা যেন দিন দিন অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট এবং স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উইলিয়ম ফ্লোরার রূপ গুণের এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িল যে, ফ্লোরাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখিলে অস্থির হইয়া উঠিত। কিন্তু ফ্লোরা সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিত বলিয়া তাহাকে কোন দিন কোন কথা বলিত না বা অপরকে নিজ মনোগত ভাব জানিতে দিত না।

ফ্লোরা পাঠচ্ছলে নিজ পাঠাগারে বসিয়া নিয়তই নিজ ভাগ্যবিপর্য্যয় চিন্তা করিত। ষ্টুয়ার্টপত্নী ফ্লোরাকে সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন; এজন্য নানাবিধ উপায়ে তিনি তাহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ফ্লোরা বলিত, "মা! আমি বেশ আছি, কেন আমার জন্য চিন্তা কর মা? আমি সর্ব্বদা পুস্তক পাঠ করিতে বড় ভালবাসি।" সেই দিন হইতে ফ্লোরা নিজ পাঠাগারে বসিয়া পাঠচ্ছলে নানারূপ চিন্তা করিত। ষ্টুয়ার্টপত্নী ভাবিতেন ফ্লোরা সত্য সত্যই পুস্তকপাঠ ভালবাসে, সুতরাং তিনি পূর্ব্ববৎ আর চিন্তান্বিতা হইতেন না বা তাহার কৃত্রিম পুস্তকপাঠে বাধা দিতেন না।

একদিন সন্ধ্যার পর একজন বৃদ্ধা ফেরী-ওয়ালী কতকগুলি দ্রব্য লইয়া উইলিয়মদের বাটী আসিয়া বরাবর ফ্লোরার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই বৃদ্ধা ফ্লোরার রূপজ্যোতিঃ দেখিয়া মস্তক অবনত করিল। ফ্লোরা নিয়তই বিষণ্ণ, সুতরাং এখনও বিষণ্ণ। বৃদ্ধা ফ্লোরার ঈদৃশী অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বড়ই কাতর হইল, বলিল "মা! যখনই আমি এ বাড়ী আসি তখনি তোমায় বিষণ্ণা দেখি, ইহার কারণ কি মা? মা, তোমার ন্যায় আমার একটী কন্যা ছিল তাই কি মা তোমাকে এত ভাল লাগে? মা,মনে হয় তোমার দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারিলে আমি সুখী হই।"

ফ্লোরা নীরব। তাহার নীলেন্দীবর তুল্য লোচনদ্বয় হইতে মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; সে বুঝিল বাস্তবিকই বৃদ্ধা তাহার দুঃখে দুঃখিনী।

ফ্লোরাকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "মা, আমি সমস্ত স্কটলণ্ড ঘুরিয়াছি, কিন্তু তোমার মত বিষণ্ণ কাহাকেও দেখি নাই; তবে একটি মাত্র যুবককে তোমার মত বিষণ্ণ দেখিয়াছি। সেও মা নিয়ত তোমার মত বিষণ্ণ, কাহারও সহিত কথা কহে না।"

ফ্লোরার বুকটা 'ধড়াস্' করিয়া উঠিল। আত্মহারার ন্যায় ফ্লোরা বলিয়া উঠিল "মা, কে সে যুবক, তাহার নাম কি?"

বৃদ্ধা ফ্লোরার কোকিলকাকলিবিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আরও মোহিত হইল। স্নেহগদগদস্বরে বলিল "মা, সে যুবক এই নগরের একটা হোটেলের সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র; সকলেই তাহাকে ক্লোডেন বলিয়া জানে।"

ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ফ্লোরা সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তাহার মুখে জল সেচন করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তখন বৃদ্ধার সানুনয় অনুরোধে ফ্লোরা তাহাকে নিজের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল এবং বলিল "মা, তুমি গোপনে আমার একটা কাজ করিতে পারিবে?"

বৃদ্ধা বলিল "কি কাজ মা?"

ফ্লোরা বলিল "মা, আমি একটা পত্র লিখিয়া রাখিব, তুমি উপর হইতে আসিয়া পত্রটা লইয়া যাইয়া সেই যুবকের নিকট হইতে তাহার উত্তর আনিয়া দিতে পারিবে?"

বৃদ্ধা বলিল "খুব পারিব মা।"

ফ্লোরা তখন ডেস্ক খুলিয়া পত্র লিখিতে বসিল। বৃদ্ধা উপরে চলিয়া গেল।

ফ্লোরার পাঠাগার একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। তাহাতে আট দশটা ভাল মেহগিণি কার্ষ্ঠের আলমারী এবং প্রত্যেক আলমারী বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থকার-গণের মস্তিষ্ক-প্রসূত পুস্তক-রাজিতে পরিপূর্ণ। গৃহের ঠিক মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ মখমলমণ্ডিত টেবিল; তাহার দুইধারে উৎকৃষ্ট বাঁধাই পুস্তক সমূহ স্তূপীকৃত রহিয়াছে। টেবিলের পশ্চাতের ধারের ঠিক মধ্যস্থলে বিশাল একটা স্বচ্ছ দর্পণ; তাহাতে টেবিলের উপরিস্থিত পুস্তকাদি প্রতিফলিত হইয়াছে। সে কি শোভনীয় দৃশ্য! সেই টেবিলের নিকটস্থ একটা সুদৃশ্য চেয়ারে বসিয়া ফ্লোরা পত্র লিখিতে লাগিল।

পাঠক, ফ্লোরা পত্র লিখিতে থাকুক ইত্যবসরে আমরা একবার উইলিয়মের সংবাদ লই। ঐ দেখুন পাঠক, উইলিয়ম কি ভাবিতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া এক একটা সুদীর্ঘ তপ্ত শ্বাসে কক্ষ কম্পিত করিয়া তুলিতেছে! উইলিয়ম ভাবিতেছে, ঐ লাবণ্যময়ী ফ্লোরা কি তাহার হইবে? তাহার ঐ নির্ম্মল লোচন দুটি কি উইলিয়মের প্রতি প্রেম-দৃষ্টিতে তাকাইবে? তাহার মৃণাল-গঞ্জিত কমনীয় বাহুলতা কি উইলিয়ম নিজ বাহুতে ধারণ করিতে পারিবে? তাহার লাবণ্যবিভূষিত দেহখানি কি উইলিয়ম নিজ তাপিত বক্ষে ধারণ করিতে পাইবে? ঊষার আলোকচ্ছটার ন্যায় ঐ প্রেমালোক কি তাহার অন্ধকারময় হৃদয় আলোকিত করিবে, পরক্ষণেই আবার ভাবিল না, না, ঐ পুণ্যহৃদয়া স্বর্গীয়া বালা যদি অন্যের অনুরাগিনী হয় তবে কি আমার এতাদৃশী বাসনা হৃদয়ে পোষণ করা ন্যায়সিদ্ধ? ফ্লোরা, তুমি অন্যের অনুরাগিনী হও, উত্তম; নচেৎ এ অভাগার তাপিত হৃদয় কি তুমি প্রেমবারিবর্ষণে অভিসিক্ত করিবে না? ফ্লোরা, তুমি যদি সত্য সত্যই অন্যের অনুরাগিনী হও, তবে শুধু জানিতে দাও সে ভাগ্যবান —সে পুণ্যবান—কে? আর যদি তুমি সেই পুণ্যবানের জন্যই ওরূপ কাতরচিত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে এই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া সেই পুণ্যবানকে খুঁজিয়া আনিয়া তোমায় দিব। ফ্লোরা, কেবল বল, সে পুণ্যবান কে? ফ্লোরা, ফ্লোরা, তোমাকে ভালবাসিলেও আমি কাপুরুষ নহি যে তোমাদের পবিত্র মিলনের অন্তরায় হইব।"

এদিকে ফ্লোরা বার বার পত্র লেখে, আর ছিঁড়িয়া ফেলে; শেষে এই মাত্র লিখিল:—

"প্রাণের ক্লোডেন,

পত্রবাহিকার মুখে তোমার সংবাদ শুনিয়া ঘোর সংশয়ে হৃদয় আচ্ছন্ন হইল;

অধিক লিখিতে সাহস করি না, যদি তুমি সত্যই আমার চিরারাধ্য ক্লোডেন হও, ত্বরায় ইহার হস্তে উত্তর দিও। পত্রান্তরে সমস্ত জানাইব ও জানিব ইতি।

সংশয়াচ্ছন্না অভাগিনী ফ্লোরা।"

পত্রটা লেখা শেষ হইয়াছে মাত্র, এমন সময় ষ্টুয়ার্ট-পত্নী "ফ্লোরা, ফ্লোরা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ফ্লোরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ব্লটিং কাগজে পত্রটা মুছিয়া ডেস্কের ভিতর রাখিয়া উপরে চলিয়া গেল।

ষ্টুয়ার্ট-পত্নী জিজ্ঞাসিলেন "মা, আজ উপরে আইস নাই কেন? কোন অসুখ বিসুখ করিয়াছিল কি? শরীর ভাল আছে তো?"

ফ্লোরা কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল "মা, আজ একটা ভাল বই পড়িতেছিলাম, তাই আসি নাই।"

ষ্টুয়ার্ট-পত্নী ফ্লোরার চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি সত্য মনে করিয়া সুখী হইলেন। ফেরীওয়ালী দেখিল এ সময়ে ফ্লোরা পত্র দিতে পারিবে না; সুতরাং সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ষ্টুয়ার্ট-পত্নী ও ফ্লোরা নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিলেন।

ফ্লোরা উপরে চলিয়া গেলে উইলিয়ম স্থির করিল সে আজ সমস্ত কথা ফ্লোরাকে বলিবে; সুতরাং সে ধীরে ধীরে ফ্লোরার পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া ফ্লোরার চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিল 'আহা, এই চেয়ারে আমার—না, না, আমার কিসের?—ফ্লোরা বসিয়া থাকে!' কলমাধার হইতে কলমটী লইয়া 'আহা এই কলমটীতে ফ্লোরা লেখে!' সম্মুখস্থ দর্পণের প্রতি তাকাইয়া 'আহা এই দর্পণে ফ্লোরা স্বীয় উজ্জ্বল কান্তি—' উইলিয়ম হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল! সে দেখিতে পাইল দর্পণের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে লেখা রহিয়াছে:—

"প্রাণের ক্লোডেন,

পত্রবাহিকার মুখে তোমার সংবাদ শুনিয়া ঘোর সংশয়ে হৃদয় আচ্ছন্ন হইল; অধিক লিখিতে সাহস করি না, যদি তুমি সত্যই আমার চিরারাধ্য ক্লোডেন হও, ত্বরায় ইহার হস্তে উত্তর দিও। পত্রান্তরে সমস্ত জানাইব ও জানিব ইতি।

সংশয়াচ্ছন্না অভাগিনী ফ্লোরা।"

উইলিয়ম স্তম্ভিত হইয়া গেল। কারণ নির্ণয়ের জন্য তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইল একটা ব্লটিং কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে যাহা অস্পষ্টভাবে লেখা রহিয়াছে তাহাই দর্পণে সুস্পষ্ট ভাবে

প্রতিফলিত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই ব্লটিং কাগজে ফ্লোরা তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার পত্রটা ছাপিয়াছিল। সুতরাং কাগজটা দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় ফ্লোরার পত্রটা যে বেশ সুস্পষ্ট পড়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি ?

উইলিয়ম এতক্ষণে বুঝিতে পারিল ফ্লোরা সত্য সত্যই অন্যের অনুরাগিনী—অন্যের প্রেমাকাঙ্খিনী। উন্নত-হৃদয় উইলিয়ম তন্মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় হইতে ফ্লোরা সংক্রান্ত সমস্ত প্রেম-বাসনা মুছিয়া ফেলিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল, ফ্লোরাকে সুধাইয়া ক্লোডেনের বাসস্থান জ্ঞাত হইয়া তাহাদের মিলন সাধনে প্রাণপণে সহায়তা করিবে।

উইলিয়ম, তুমি ধন্য ! তোমার ন্যায় পরহিতরত উন্নত-হৃদয় যুবকের সর্ব্ব সমাজে প্রয়োজন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশালোকে।

উইলিয়ম স্থির করিল যে প্রকারেই হ'ক আজ ফ্লোরাকে সমস্ত কথা বলিবে। সুতরাং সে ফ্লোরার পাঠাগারেই বসিয়া ফ্লোরাকে কি বলিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, ফ্লোরা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশমাত্র উইলিয়মকে তথায় দেখিয়া ফ্লোরা স্তম্ভিতা হইল। তাহাকে তাদৃশী অবস্থাপন্না দেখিয়া উইলিয়ম স্নেহগদগদস্বরে বলিল "ফ্লোরা, তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছি, মার্জ্জনা করিও।"

ফ্লোরা বলিল "দাদা আবার ভগ্নীর নিকট ক্ষমা চায় কেন জানি না—"

উইলিয়ম বাধা দিয়া বলিল "যাক্ ও কথা, ফ্লোরা আজ আমি তোমায় গোটাকতক কথা বলিব ; বল ফ্লোরা, তুমি তাহাতে রাগ করিবে না বা আমার উপর বীতশ্রদ্ধ হইবে না ?"

ফ্লোরা বলিল "কি কথা উইলিয়ম ? আমি কি তোমার উপর কখন রাগ করিয়া থাকিতে পারি যে তুমি ও কথা বলিতেছ ?"

উইলিয়ম উচ্ছ্বসিত প্রাণে বলিতে লাগিল, "ফ্লোরা, ফ্লোরা, যে দিন হইতে তোমার ঐ পবিত্র দেবী মূর্ত্তি দেখিয়াছি সেইদিন হইতে আমি আত্মহারা হইয়াছি, সেই দিন হইতে ফ্লোরা, তোমার ঐ হেমময়ী মূর্ত্তি আমি অতি যত্নে হৃদয়-মন্দিরে

স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলাম; সাধ ছিল একদিন পবিত্র প্রণয়কুসুমহারে ঐ বরবপু সাজাইব; কিন্তু ফ্লোরা আজ আমার সে যত্ন-বর্দ্ধিত আশালতা হৃদয়-উদ্যান হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে! তাহার জন্য ফ্লোরা, তাহার জন্য আজ এখানে আমি আসি নাই। ফ্লোরা,আমার এতদিন ধারণা ছিল তুমি অন্যের অনুরাগিনী নও, সেই জন্যই ঐ সব কামনা আমি এ যাবৎ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু আজ সহসা রহস্যোদ্‌ঘাটন হইয়াছে—ঘোর সংশয়-মেঘ আমার হৃদয়াকাশ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। ফ্লোরা, আমি কাপুরুষ নহি, তোমাদের পবিত্র প্রেমের অন্তরায় হওয়া তো দূরের কথা, যাহাতে তোমাদের পবিত্র মিলনের সংঘটন হয় তাহার জন্য প্রাণপণে সহায়তা করিব। ফ্লোরা, ভগিনি, আমাকে ক্ষমা করিও ”

উইলিয়ম নীরব হইল। ফ্লোরা এক দৃষ্টিতে, নিস্পন্দশরীরে তাহার মুখপানে চাহিয়া সমস্ত শুনিতেছিল আর ‘বাতাহত কদলী পত্রে’র ন্যায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। উইলিয়ম নীরব হইলে ফ্লোরা বসিয়া পড়িল ও কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ফ্লোরা ভূতলে পড়িয়া গেল। উইলিয়ম চীৎকার করিয়া উঠিল; ষ্টুয়ার্ট-পত্নী পুত্রের চীৎকারে ছুটিয়া আসিলেন। দাসদাসিগণ কেহ জল লইয়া আসিল, কেহ বা ব্যজন করিতে লাগিল। মূর্চ্ছাপনোদনে ফ্লোরা চারুচক্ষু উন্মীলিত করিলে ষ্টুয়ার্ট-পত্নী জিজ্ঞাসিলেন “মা, কি হইয়াছে?” ফ্লোরার বদনমণ্ডল লজ্জায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, সে কিছু বলিল না, কেবল বলিল ‘আমি ভাল আছি, আপনারা আমার নিকট হইতে যান।’ ষ্টুয়ার্ট-পত্নী ভাবিলেন একটু নির্জ্জনে থাকিলেই সারিয়া যাইবে, সুতরাং সকলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং ফ্লোরার একান্ত অনুরোধে তিনিও চলিয়া গেলেন; উইলিয়ম নিজ পাঠাগারে যাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ভাবিতে লাগিল।

ফ্লোরা ভাবিল উইলিয়ম হয়তো ডেস্ক হইতে পত্রটা বাহির করিয়া পড়িয়াছে সুতরাং সে ধীরে ধীরে উইলিয়মের কক্ষে যাইয়া দাঁড়াইল। উইলিয়ম স্বয়ং ফ্লোরাকে নিজ কক্ষে পাইয়া তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে তাহাকে উপবেশন করাইল। ফ্লোরা বলিল “ভাই, উইলিয়ম আমায় ক্ষমা কর।”

“কিসের জন্য ফ্লোরা?”

ফ্লোরা নীরব। উইলিয়ম বলিল “ফ্লোরা, আজ আমি তোমার বিষণ্ণতার অনেকটা কারণ জানিতে পারিয়াছি; এতদিন তোমার আচরণ সমূহ আমার নিকট প্রহেলিকাময় ছিল, কিন্তু আর আজ তাহা নহে। আমি কি করিয়া

জানিতে পারিয়াছি, তাহা জানিতে বোধ হয় তোমার বাসনা হইতেছে। তদুত্তরে এই মাত্র বলি, তুমি নিজের পাঠাগারের দর্পণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিও তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে বল ক্লোডেন কে?"

ফ্লোরা 'আমি আসি' বলিয়া চলিয়া গেল এবং নিজ পাঠাগারে যাইয়া দর্পণের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল, তখনও সেই পত্রটা স্পষ্টরূপে পড়া যাইতেছে। তখন সে বুঝিল যে তাহারই নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে এ সব ব্যাপার ঘটিয়াছে। তখন সে ধীরে ধীরে পুনরায় উইলিয়মের কক্ষে প্রবেশ করিল।

উইলিয়ম বলিল "ফ্লোরা, আমি তো প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমাদের পবিত্র মিলনের জন্য আমি প্রাণপণে সহায়তা করিব, তাহা কি তোমার বিশ্বাস হয় না?"

ফ্লোরা বলিল "উইলিয়ম, তোমাকে যদি এ জগতে বিশ্বাস না করিব তবে কাহাকে বিশ্বাস করিব ভাই?"

উইলিয়ম বলিল "তবে বল ফ্লোরা, বল ক্লোডেন কে? এবং সেই পুণ্যবান আছেন-ই বা কোথায়?"

ফ্লোরা তখন উইলিয়মের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং কিরূপে ক্লোডেনের সংবাদ পাইল, তাহাও বলিল।

উইলিয়ম বলিয়া উঠিল "অহো, বুঝিয়াছি, ক্লোডেন সেই পাষণ্ড নরাধমের হস্তে পড়িয়াছে; যাহা হউক ফ্লোরা 'যেন তেন প্রকারেণ' ক্লোডেনের উদ্ধার সাধন করিবই করিব। তুমি চিন্তা করিও না, অদ্য রাত্রেই আমি ক্লোডেনকে উদ্ধার করিব।"

ফ্লোরা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। উইলিয়ম চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিলনে।

উইলিয়ম সটান মাতৃসন্নিধানে চলিয়া গেল এবং নানা প্রকার সূচনা করিতে করিতে বলিল, "মা, রহস্যময়ী ফ্লোরার নিবিড় রহস্য আজ কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটন করিয়াছি।"

জননী তাড়াতাড়ি বলিলেন "কিরূপে বাবা?"

উইলিয়ম তখন মায়ের নিকট সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বলিল "মা, তুমি ফ্লোরাকে এখন বলিও না যে আমি তোমাকে সমস্ত কথা বলিয়াছি।" জননী

স্বীকৃতা হইলেন। তখন উইলিয়ম বলিল, "মা, আমি আজই ক্লোডেনের উদ্ধার সাধন করিব, কিন্তু মা তাহাতে যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন।"

জননী পুত্রের এইরূপ নিঃস্বার্থ উদার-হৃদয়তা দেখিয়া পুলকিত হইলেন; তিনি পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা, যত টাকার প্রয়োজন এখনি দিব তাহার জন্ত চিন্তা কি বাবা? ফ্লোরা আর তুমি তো ভিন্ন নও বাবা!"

জননীর নিকট হইতে অর্থরাশি লইয়া উইলিয়ম বাটী হইতে বহির্গত হইল। রাত্রি তখন ১২টা; আকাশে খণ্ড-চন্দ্রের পাণ্ডুর-রশ্মি সেই সুপ্তা নগরীকে কি যেন এক মোহাবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। সমগ্র নৈশ প্রকৃতি গাঢ় নিস্তব্ধ; কচিৎ দু'একটা কুকুরের নিদ্রালস শব্দ সেই নৈশ প্রকৃতির মৌন-ব্রত ভঙ্গ করিতেছিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প্রকৃতি আবার ভীষণ নিস্তব্ধতা ধারণ করিতেছিল। মাঝে মাঝে কোনও রাত্রিচর পক্ষীর বিকট চীৎকার নৈশ পথিকের অন্তঃকরণে ভীতির উৎপাদন করিতেছিল। উইলিয়ম ত্বরিত পদে চলিয়াছে; কিছুতেই তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই! কিছুক্ষণ পরে সে একটা বাটীর নিকটস্থ হইয়া ডাকিল "রবার্ট, রবার্ট।"

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জনৈক যুবা বাটীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়াই বলিল "কেন ভাই উইলিয়ম, এত রাত্রে কিসের প্রয়োজন? সব ভাল তো?"

সহৃদয় পাঠক, এই যুবকের নাম রবার্ট। রবার্ট দরিদ্র কিন্তু তাহার হৃদয় বহু সদ্‌গুণের আধার স্বরূপ। ইনি আমাদের উইলিয়মের অন্তরঙ্গ বন্ধু। উইলিয়ম রবার্টকে বুঝাইল যে ঐ নূতন হোটেল হইতে ক্লোডেন নামক জনৈক যুবকের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, এজন্য সে তাহার সহায়তাপ্রার্থী।

উন্নত-প্রাণ রবার্ট বলিল "তা বেশ, চল না, অদ্যই তাহার উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করি, কিন্তু দ্বারবানকে কিছু বেশী করিয়া উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিতে হইবে, টাকা আছে কি?" উইলিয়ম সংক্ষেপে বলিল 'আছে'। চলিতে চলিতে উভয়ে ক্রমে হোটেলের নিকট যাইয়া পৌছিল এবং প্রভূত অর্থের লোভ দেখাইয়া দ্বারবানকে স্ববশে আনিয়া কারাগৃহ স্বরূপ সেই হোটেল-বাটীতে প্রবেশ করিল। ক্রমে ক্লোডেনের কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয়ে শুনিতে পাইল অভাগার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ও অস্ফুট হাহাকারে সে স্থানটা কম্পিত হইতেছে। তখনি তাহারা বুঝিল, এই যুবক নিশ্চয়ই ক্লোডেন।

উইলিয়ম ডাকিল "ক্লোডেন!"

ক্লোডেন চমকিয়া উঠিল। কে তাহাকে এতরাত্রে ডাকিতেছে? একি সেই

যমদূত ? না, না, তাহার কণ্ঠস্বর তো এত স্নেহময় নয়! তবে এ কে ? অভাগাকে স্নেহভরে ডাকিতে যে কেহ নাই! সব যাইয়া ছিল কেবল একজন, হায়, সে কি আর আছে ? ক্লোডেন আর ভাবিতে পারিল না।

উইলিয়ম আবার ডাকিল "ক্লোডেন !"

একি ? এ যে আবার সেই স্নেহময় কণ্ঠস্বর! ক্লোডেন বলিল "কে আপনারা জানি না ; যদি হিতাকাঙ্খী হন, আমায় সামান্য বিষদান করুন, আমি এই জ্বালাজর্জ্জরিত প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া শোকতাপদগ্ধ মর্ত্ত্যভূমি হইতে চির বিদায় গ্রহণ করি। উঃ আর সহ্য হয় না !"

উইলিয়ম স্নেহভরে বলিল "ক্লোডেন, তুমি চঞ্চল হইও না, আমাদের সহিত আইস, তোমার উদ্ধার সাধন করিব।"

ক্লোডেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ তাহাদের অনুসরণ করিল ; কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহারা রাস্তায় যাইয়া পড়িল। উইলিয়ম বাটী হইতে ক্লোডেনের জন্য পোষাক আনিয়াছিল তাহাই পরাইয়া তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেল। রাত্রি তখন ৩টা।

ফ্লোরা তখনও সেইভাবে নিজ পাঠগৃহে বসিয়া ভাবিতেছিল "ক্লোডেন, ক্লোডেন, তোমাকে কি আর পাইব ?" তাহার পর উইলিয়মের কথা ভাবিতে লাগিল ; উইলিয়মের নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া ফ্লোরা মুগ্ধ ও পুলকিত হইল। পরক্ষণেই আবার ভাবিতে লাগিল, "তা ক্লোডেন কি আর কাহারও নাম হইতে পারে না ? আমার ক্লোডেন এখানে আসিবে কি করিয়া ? বৃদ্ধা-কথিত ক্লোডেন হয়তো অন্য কেহ হইবে। তাই যদি হয়, তবে সে দিবারাত্রি বিষণ্ণ কেন ? কেন এ জগতে কি সকলেই সুখী না কি ? সেও বোধ হয় কোন কারণে হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকিবে।" সংশয়াচ্ছন্না ফ্লোরা এইরূপ চিন্তালহরীতে মগ্ন, এমন সময় নীচে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। ফ্লোরা উৎকর্ণ হইয়া বসিল ; অহো এ যে তাহার চিরপরিচিত পদশব্দ বোধ হইতেছে! তবে কি সত্য সত্যই দুঃখিনীর তাপিত হৃদয় আজ শীতল হইবে ? দেখিতে দেখিতে উইলিয়ম ও ক্লোডেন ফ্লোরার কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্লোডেন হঠাৎ ফ্লোরাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ফ্লোরা ও উইলিয়ম ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল।

মূর্চ্ছান্তে ক্লোডেন ধীরে ধীরে চাহিল, আবার চক্ষু মুদিল ; ক্লোডেন নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আবার তাকাইল এবারও যে তাই!

ক্লোডেন ভাবিতে লাগিল "একি! আমি কোন্ স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি? একি সত্য, না স্বপ্ন? এই তো আমার হৃদয়-মন্দিরের সেই আরাধ্যা দেবী—সেই মুখশশী, যাহার চিত্তহারী সুকুমার সৌন্দর্য্য আমার দেহের প্রতি শোণিত-বিন্দুতে—মজ্জার প্রতি রেণুটিতে মিশ্রিত। একি প্রহেলিকা! আমি কি নিদ্রিত,না জাগ্রত?" ক্লোডেন বলিল, "ফ্লোরা,ফ্লোরা, ইহা কি সত্য, না স্বপ্ন?"

"কি সত্য ক্লোডেন?" ফ্লোরা বলিল "কি সত্য ক্লোডেন?"

"এই এত সুখ, ফ্লোরা!" ক্লোডেন নীরব হইল।

উইলিয়ম জননীকে সংবাদ দিতে গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ষ্টুয়ার্ট-পত্নী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

* * * * *

তাহার পর? তাহার পর মহাসমারোহে ষ্টুয়ার্ট-পত্নী ফ্লোরার সহিত ক্লোডেনের বিবাহ দিলেন। ফ্লোরা সেইরূপ তাঁহার কন্যা হইয়া তথায় থাকিল। ক্লোডেনকে ষ্টুয়ার্ট-পত্নী জামাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ফ্লোরা ও ক্লোডেন তাঁহাদের একেবারেই 'আপনার' হইয়া উঠিল। আজ ফ্লোরা ও ক্লোডেনের মত সুখী কে?

সম্পূর্ণ।

খোন্দকার হোসেন রেজা।

নিশীথে।

১

আলোকশূন্য স্তব্ধ রজনী,
নিদ্রাকাতর ধরা;
গগনপূর্ণ জলদ-মালা,
প্রকৃতি সুষমা-হারা।
নাহিক শব্দ, স্তব্ধ সমীর;
ক্ষুব্ধ দামিনী গগনে।
ঝিল্লীর রব থাকিয়া থাকিয়া
উঠিছে কেবল সঘনে।
নিদ্রামগন আমরা তখন,
ক্লান্তি-বিভোর শয়নে;

বুঝিতে পারি না তোমার করুণা—
তত্ত্ব লইছ কেমনে।
আপন সত্ত্বা ভুলিয়া আত্মা
যায় কোথা তাহা জানি না,—
সুপ্তি-মদিরা করে জ্ঞানহারা
আপনার ধারা বুঝি না।
তুর্য্যনিনাদে তখন জলদে
শবদে ভীষণ, শুনি না ;
কিরূপে প্রকাশে তখন প্রকৃতি
শকতি তোমার, দেখি না।
আত্মহারা হই তখন আমরা,—
কোথা ধরা রহে বুঝি না ;
ক্ষিপ্ত জলদ দীপ্ত হইয়া
শক্তি প্রকাশে দেখি না।
ইন্দ্রিয়বৃত্তি হারায়ে শক্তি
পারে না করিতে ধারণা—
কেমনে মন্দ্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে
জলদ-বিজলী-বাজনা।
প্রভাতে যখন আলোক-স্পর্শে
ভুবন হর্ষে জাগিবে,
নিখিল বিশ্বের মর্ম্মে মর্ম্মে
জীবন প্রেরণা ছুটিবে,
তোমারি স্নেহের স্নিগ্ধ পরশ—
অমৃত-ক্ষরা করুণা—
শক্তি সত্ত্বা তোমারি নাথ !
করিবে হে তাহা সাধনা।
নিদ্রাকাতর শকতিবিহীন
জীবগণ যবে জাগিবে,
শক্তি তোমার বুঝিবে তখন,
যুক্তি নাহিক চাহিবে।

২

করম-ক্ষেত্রে তেমনি ব্যস্ত
সতত মানব রহিছে ;
শকতি-গর্ব্বে হইয়া মত্ত
সত্ত্বা তোমার ভুলিছে !
কিন্তু যখন আসিবে ক্লান্তি,
শ্রান্তি চাহিবে লভিতে,
অনন্ত নিদ্রা—সমাধি-শয়নে,
শক্তি রবে না জাগিতে।
ধ্বংসপ্রবণ এ ভবে যখন
নিদ্রা সকলে যাইবে ;
ভুঞ্জিতে স্বীয় করমের ফল
মানবে তখন জাগাবে।
মৃত্যু-ঘুমে ক্লান্ত-শরীর
ভ্রান্ত মানব-দল
হেরিবে তখন শক্তি তোমারি,—
পাইবে না স্বীয় বল।
বাজিবে মর্ম্মে আপন কর্ম্মে
ফল যাহা কিছু আসিবে,
"তোমারি শক্তি, তোমারি সত্ত্বা,"
বলি অনুতাপ করিবে।
চেতনা থাকিতে বুঝিতে তোমায়
দাও হে আমায় শকতি ;—
শক্তি তোমার, করুণা তোমার
বুঝিতে দাও হে ভকতি।
"ঘুমন্ত সময়ে" ঘুম ঘোরে রাখি
শক্তি বুঝিতে দিও না ;
অচেতন কর চেতন থাকিতে,
মোহ-ঘুমে আর রেখ না।

শেখ্ মনসুর আলী।

মৈস্মর-তত্ত্ব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

যাহা হউক, এই শক্তিটা কি? তাহার মীমাংসা এ পর্য্যন্তও হয় নাই। পূর্ব্বতন মেস্‌মেরাইজারেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, শরীর হইতে অলক্ষিতে এক প্রকার 'Nervous Fluid' বা তরল ধাতু-পদার্থ নির্গত হইয়া ক্রিয়াধীন ব্যক্তিকে ঐরূপ তন্দ্রাভিভূত করে। অধুনাতন বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে হেইডেন হেল বলেন "The cause of the phenomena of Hypnotism lies in the inhibition of the activity of the ganglion cells of the cerebral cortex". (Animal Magnetism, Page 46) অর্থাৎ মস্তিষ্কের পূর্ব্বার্দ্ধের স্নায়ু-গ্রন্থির সূক্ষ্ম অংশ সমূহের কার্য্যতৎপরতা নিরাকৃত হইলেই এরূপ অবস্থা হয়। ডাক্তার ব্রেইড্ বলেন "A derangement of the cerebro spinal centres and of circulating and respirating and muscular systems induced by a fixed state, absolute repose of body, fixed attention and suppressed respiration, concurrent with fixity of attention." অর্থাৎ দেহের সম্পূর্ণ স্থৈর্য্য, একাগ্র মন, দমিত শ্বাস প্রশ্বাস ও সুস্থির দৃষ্টিশক্তির সম্মিলনে মাংসপেশী, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ স্নায়ু কেন্দ্রের এক অভিনব অবস্থা-পরিবর্ত্তন হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারীর The British Medical journal এ উক্ত হইয়াছে "* * * General sensibility, sensory and motor sensibility and the Psychichal state were effected by suggestion" সাধারণ সংজ্ঞা, অনুভব-সম্বন্ধীয় এবং সঞ্চালক চেতনাশক্তি ও আধ্যাত্মিক অবস্থা মানসিক 'নির্দ্দেশ' হইতেই উৎপন্ন * * *। এখনকার অধিকাংশ পণ্ডিতেরই মত যে ইহা কোন 'Magnetic fluid', অথবা 'Mystical Universal Fluid' নহে। তবে প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে, ইহাতে ক্রিয়াধীন ব্যক্তির কোনরূপ অনিষ্ট হয় কি না। আমি এ পর্য্যন্ত অসংখ্য লোককে হিপ্‌নটাইজ করিয়াছি কিন্তু একটি বার ব্যতীত কখনও কোন বিপদে পড়ি নাই। ১৯১১ সালের ২৫শে অক্টোবর একজন শূলরোগগ্রস্ত

মুসলমান রোগী আমার নিকট উপস্থিত হয়। আমি মদীয় শিষ্য মাহিগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব সুদক্ষ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন হালদারের সহিত একত্র হইয়া তাহাকে সম্মোহিত করি। ৫।৬ মিনিটের মধ্যেই সে তন্দ্রাভিভূত হয় বটে, কিন্তু যখন তাহার তন্দ্রাপনয়ন করা হইল, তখন সে অত্যন্ত শীত-কাতর হইয়া পড়িল। মানব-শরীরের স্বাভাবিক তাপ ৯৯° ডিগ্রী কিন্তু উক্ত রোগীর শারীরিক তাপ মাত্র ৯০° ডিগ্রী হইয়া পড়িল। উপস্থিত দর্শকদিগের মধ্যে অনেকেই ভীতি-বিহ্বল হইলেন, নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিলেন; কিন্তু আমরা হতাশ না হইয়া সন্দিগ্ধ-চিত্ত জনগণকে স্থানান্তরে যাইতে অনুরোধ করিলাম। কারণ এসব মনোবিজ্ঞানের কার্য্য, সমবেত লোকদিগের অধিকাংশের মনে একটা কু ধারণা হইলে সম্মোহিতের অনিষ্ট হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অতঃপর তাহাকে আবার হিপ্‌নটাইজ করা হয়; আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার সুদীর্ঘ দ্বিবৎসর স্থায়ী তীব্র বেদনা যদিও সেই সময়ে একরূপ নিরাময় হইল, কিন্তু তাহার তাপহীনতা বিদূরিত হইল না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর মানসিক "নির্দ্দেশ" দ্বারা ও "মেসমেরাইজ্‌ড জল" ব্যবহার করিতে দিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করি। দুই দিন সম্মোহিত করায় সে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়াছিল। জেমস্ কোট্‌স তাঁহার 'How to Mesmerise' বা সম্মোহনের উপায় নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাকে হিপ্‌নটাইজ করিতে দেখিয়া জনৈক ভদ্রলোক এক চাকরকে লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। কিছুক্ষণ পর ভৃত্য যথার্থই মোহিত হইলে, তাহার দ্বারা নানারূপ আমোদজনক ক্রিয়াকাণ্ডাদির অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু কিরূপে ঘুম ভাঙ্গাইতে হয় তাহা ভুলিয়া যাওয়ায় বড়ই বিপদে পতিত হন। নানারূপ চেষ্টা করিয়াও যখন তাহাকে জাগ্রত করা গেল না, তখন হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া, এমন কি স্মেলিং• সল্‌ট ব্যবহার করাইয়াও কোনই ফল পাইলেন না। অধিকন্তু ক্রিয়াধীন ব্যক্তি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে ভয় পাইয়া ভদ্রলোকটি কোট্‌স সাহেবের জন্য লোক পাঠাইলেন। সেই লোক অনেক কষ্টে সাহেবকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিল। তিনি আসিয়া ক্রিয়াধীন ব্যক্তির মোহ ভঙ্গ করেন। কিন্তু এরূপ অবস্থা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ হিপ্‌নটাইজার হেইডেন হে বলেন "There is no ground whatever for objection to the Hypnotic experiment—(Animal Magnetism Page 101). অর্থাৎ হিপনটিজ্‌ম বিষয়ক পরীক্ষা সম্বন্ধে আপত্তির কোনই

কারণ নাই। অন্যান্য প্রায় সকলেই এই কথা বলেন। কিন্তু এটা অসম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কৃত বিদ্যা, সুতরাং কখন যে কোন বিপদ মোটেই হইতে পারে না বা হইবে না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কোন কোন ক্রিয়াধীন ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের পরেও তাহার শরীরে যেন কেমন একটা জড়তা উপস্থিত হয়। আমার বিশ্বাস আবার সম্মোহিত করিয়া বা শুধু মানসিক 'নির্দ্দেশ' দ্বারা তাহাকে সুস্থ করা যায়। যাহা হউক 'ছেলে খেলা' ভাবিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে সময়ে হয়ত এমন অসম্ভাবিত বিপদ আসিয়া জুটিবে যে হিপ্‌নটাইজার তখন দিশাহারা হইয়া পড়িবেন। ক্রিয়াধীন ব্যক্তির অবস্থা নানা প্রকার। সেই প্রকার ভেদ শুধু মেসমেরাইজ্‌ড অবস্থাতেই হইয়া থাকে। হিপনটিজম ও মেসমেরিজ্‌ম্ এক নহে। পূর্ব্বে যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহা 'হিপ্‌নটিজম্'এ কখনও হইতে পারে না। মেস্‌মেরিক অবস্থায় ক্রিয়াধীন ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে, স্বাদ পায়, ঘ্রাণ লইতে পারে এবং মেসমেরাইজারের সহিত সমসুখ-দুঃখ-ভোগী হয়, কিন্তু হিপনটাইজ্‌ড অবস্থায় এরূপ হয় না। 'মেস্‌মেরিজ্‌ম্'এ মানসিক বৃত্তিগুলির বিশুদ্ধ, সীমাবিশিষ্ট ও সম্মিলিত কার্য্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'হিপ্‌নটিজম'এ ক্রিয়াধীন ব্যক্তি শুধু পরিচালকের আদেশ অনুসারে স্বপ্নের মত কার্য্য করে। মেসমেরিজ্‌মের নিদ্রা শান্ত, আরামদায়িকা ও আরোগ্য-কারিনী; নাড়ী ধীর গতিবিশিষ্ট, কিন্তু শৃঙ্খলাযুক্ত। আর তন্দ্রাভিভূত হিপ্‌নটিক অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস প্রায়ই বিশৃঙ্খল, অঙ্গাদি আক্ষেপ-যুক্ত, নাড়ী অতিমাত্রায় গতিশীল হয়, গা বমিবমি করে ও স্নায়ু-বিকৃতি অল্লাধিক পরিমাণে উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে কোট্‌সের মত এইরূপ ;—

"The mesmeric and the hypnotic states are often confounded with one another, but of this, rest assured, they are distinct, if allied. In the first the subject has an inward condition—a strong moral and spiritual individuality—a penetration and clearheadedness marked and distinct; the latter is a curative of circumstances, and the circumstances may be good, bad or indifferent." অর্থাৎ মেস্‌মেরিক ও হিপ্‌নটিক্ অবস্থাদ্বয়কে অনেক সময় ভুলবশতঃ এক বলিয়া ধারণা করা হয়, কিন্তু একজাতীয় হইলেও ইহারা বিভিন্ন। প্রথমটীতে ক্রিয়াধীন ব্যক্তির অন্তরের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রখর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষ হয়, এবং বুদ্ধির সূক্ষ্মগামিতা ও মস্তিষ্কের বিশুদ্ধতাও সাতিশয় বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত

হয়। দ্বিতীয় ক্রিয়াটিতে স্বাস্থ্যবিধায়ক অবস্থা উপস্থিত হয়, সেই অবস্থা ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, অথবা উভয়ের প্রভেদশূন্যও হইতে পারে।

'Theory precedes Practice'—কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক চিন্তা মনোমধ্যে ধারণা করিতে না পারিলে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর, এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। চপল ও দুঃশীল লোকের কথায় কখনও বিপথগামী হইবেন না।

কার্য্যপ্রণালী।

প্রথমতঃ পরীক্ষার্থে কয়েকজন লোক সংগ্রহ করুন। তাহাদিগকে নানারূপে আশ্বাস দিবেন যে ইহাতে কোন বিপদ বা ভয়ের কারণ নাই, অধিকন্তু অনেক কুফল নিবারিত হইতে পারে, ইত্যাদি। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, এই সব লোক যত রুগ্ন, বা চিন্তা করিবার শক্তিশূন্য হইবে, তাহারা তত সহজে সম্মোহিত হইবে ; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, সুস্থকায় ও চিন্তাশীল লোকগণই শীঘ্র শীঘ্র সম্মোহিত হয়। প্রত্যেকেই সম্মোহন করিতে পারে এবং সম্মোহিত হইতে পারে. তবে আমি হয়ত যাহাকে পারি না, অপর একজনে তাহাকে নিশ্চয় পারিবে। মানব চরিত্রে যিনি যত অধিক অভিজ্ঞ, তাঁহার কার্য্যসফলতাও তত বেশী হইবে। যাহাকে সম্মোহিত করা যায়, তাহার নাম 'মিডিয়াম' বা 'সাবজেক্ট', যিনি সম্মোহনকারী তাঁহাকে 'অপারেটার' 'মেসমেরাইজার' নামে অভিহিত করা হয়।

সম্মোহন-প্রক্রিয়া।

একজন মিডিয়াম বাছিয়া লউন। যদি উপস্থিত জনসংঘে কেহ সন্দিগ্ধমনা বা আপত্তিকারী থাকেন তবে তাঁহাকে বিনয়ের সহিত সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিবেন। (মোটের উপর প্রথমে গোপনে গোপনে শিক্ষা করাই সঙ্গত)। স্থানটিও এমন হইলে ভাল হয় যেন অধিক গ্রীষ্ম বা শীতযুক্ত না হয়। মনের যেন কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মিডিয়ামকে: একখানা চেয়ারে বসাইয়া তাহার বিপরীত দিকে একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে স্বয়ং উপবেশন করুন--যেন তাহার জানু আপনার জানুর মধ্যে, তাহার পায়ের পাতা আপনার পায়ের পাতার মধ্যে থাকে। তাহাকে তাহার মন হইতে সমস্ত চিন্তা, ভয় প্রভৃতি দূরীভূত করিতে বলিবেন। আরও বলিবেন যদি কোনরূপ ক্রিয়া হইতেছে বলিয়া অনুভব করে, তবে সে

যেন তাহাতে বাধা না দেয়; কোন কারণেই যেন সে বিচলিত না হয়। এই প্রকার বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আপনার অঙ্গুলীর মধ্যে ধারণ করিয়া তাহার চক্ষের উপর আপনার দৃষ্টি স্থাপন করুন, যে পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও আপনার অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে সমান তাপ উৎপন্ন না হইবে সে পর্য্যন্ত এইরূপে চাহিয়া থাকুন। অবশ্য উভয়েই অনন্যমনে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবেন। সমান তাপ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইলে আপনার হস্তদ্বয় পৃথক করিয়া লউন, এবং তাহার মস্তকের কিছু উপরে উঠাইয়া আস্তে আস্তে মুখের উপর দিয়া আনিয়া মিডিয়ামের উভয় স্কন্ধে এক মিনিট কাল স্থাপন করুন। অতঃপর বাহুর উপর দিয়া ঈষৎ স্পর্শ করিতে করিতে মিডিয়ামের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আপনার হস্ত চালনা করুন। আবার হাত উপরে উঠাইয়া মাথার উপর হইতে গাত্র স্পর্শ না করিয়া এইরূপে ক্রমান্বয় ৫।৬ বার হস্ত চালনা করুন। তারপর তাহার মাথায় কিছুক্ষণ হস্ত স্থাপন করিয়া মুখের উপর হইতে চর্ম্মের এক ইঞ্চি কি দুই ইঞ্চি উপর দিয়া পাকস্থলীর গহ্বর পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করুন, সুবিধা হইলে পদদ্বয় পর্য্যন্তও ঐরূপ করিতে পারেন। (ইহার নাম 'পাস' করা।) এইরূপ আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও যদি কোন ফল না দেখেন তবে সে দিনের মত পরিত্যাগ করিবেন। খুব আত্ম-বিশ্বাস রাখিবেন। 'আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিব', ও 'নিশ্চয়ই হিপনটাইজ্‌ড হইবে' এইরূপ বিশ্বাস মনে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবেন। উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন সেই লোককে লইয়া চেষ্টা করিলে সম্ভবতঃ তাহাকে সম্মোহিত করিতে পারিবেন।

তীরে।

গেরুয়া পরা সন্ধ্যা এল
মহাসাগর তীরে,
ব্যাকুল হয়ে একা আমি,
আঁধার আসে ঘিরে;
ঐ প্রতীচি সোণার বরণ,
ঐ মিশে যায় রবিকিরণ,
কে আমারে করবে পার
এ ঘোর তিমিরে।

এমন দিনে তুমি যদি
না হবে কাণ্ডারী,
কেমন ক'রে বল প্রিয়!
বাইতে আমি পারি।
ফুরাল মোর সব সম্বল,
আছে শুধু নয়নজল,
তাই দিয়ে তোমায় মাগি
জীবন মাঝে ফিরে।

শ্রীঅবনীকুমার বসু।

বিবাহ-বিপ্লব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচার-শক্তি।

আমার কথা শেষ হইবামাত্র ভদ্রলোকটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইবে, দেখিতে বেশ সুশ্রী এবং আকৃতি দেখিলে বেশ সবলকায় ও শ্রম-সহিষ্ণু বলিয়া বোধ হয়। মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, লোকটি বহুদর্শী এবং জগতের রঙ্গমঞ্চে নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়াছে।

মিঃ সেন গম্ভীর ভাবে চুরুট টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি চান?

অতি কাতর অথচ ব্যগ্রভাবে ভদ্রলোকটি বলিলেন—মহাশয়ের নাম কি মিঃ সেন? বড় বিপদে পড়িয়াই আপনার সাহায্য ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

নরেশ বলিল—অবশ্য সহজেই তাহা অনুমান করা যায়, তাহা না হইলে আর এত দুর্য্যোগে মহাশয় আমার গৃহে পদার্পণ করিবেন কেন।

আমি তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী এইরূপ বাহ্যিক ভাব দেখাইয়া একখানা সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলাম। কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ভদ্রলোকটি আমার প্রতি অতি কোমল কটাক্ষপাত করিয়া নরেশচন্দ্রকে বলিলেন, "আমার ব্যাপারটা অতিশয় গোপনীয়, যদি কেহ ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে তাহা হইলে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে"।

আগন্তুকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নরেশচন্দ্র একটু হাঁসিয়া বলিল—আপনি ইহার নিকট কোন কথা গোপন করিবেন না, উনি আমার একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। সম্ভবতঃ আপনার কার্য্য উনিই করিবেন। সুতরাং আপনার বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই।

ভদ্রলোকটি সাগ্রহে বলিলেন—আচ্ছা উনি যদি আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হন তাহা হইলে উঁহার নিকট আমি কোনও কথা গোপন করিব না। কিন্তু আমার কার্য্যটি অত্যন্ত গুরুতর, ইহার ফলাফলের উপর আমার সমস্ত মানসম্ভ্রম নির্ভর করিতেছে। আমার কার্য্যটি আপনি স্বয়ং হস্তে না লইলে কোনই ফল হইবে না।

নরেশ একটু হাঁসিয়া বলিল—সেজন্য আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন ? আমরা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিব। ভদ্রলোকটি পূর্ব্ববৎ সোৎসুক ভাবে কহিলেন—আমি আপনার প্রশংসা শুনিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি অর্থের মায়া করি না; আপনি যত অর্থ চান আমি দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি, কিন্তু আমার কার্য্যটি আপনার দ্বারা হওয়া চাই।

নরেশ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বুঝাইয়া দিল যে আমাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনরূপে চিন্তিত হইতে হইবে না, যাহার দ্বারা যে কার্য্যটুকু সম্পাদিত হইলে তাঁহার অধিক ইষ্ট হইবে, আমরা তাহারই আয়োজন করিব।

বুঝিলাম ভদ্রলোকটি এ কথায় তেমন আশ্বস্ত হইলেন না। তিনি যে আমাকে একটা অপদার্থ বুঝিয়া আমার সাহায্য লইতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম না। কিন্তু যাহাতে আমার উপর তাঁহার একটু বিশ্বাস জন্মে তাহার চেষ্টা করিলাম। সুতরাং প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয়ের নাম ?

"শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়"।

আমি বলিলাম—মহাশয়ের জন্মস্থান বাঁকুড়া, নয় ?

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ।

আমি।—বাঁকুড়ায় আজকাল খুব অল্পই থাকা হয়।

সুরেন্দ্র।—হ্যাঁ, দেশ এক রকম ছাড়িয়াছি।

আমি।—মহাশয়কে দেখ্‌ছি খুব রৌদ্রে ঘুরিতে হয়। অবশ্য ইংরাজী পোষাক পরিধান করেন, আর দিনের বেলায় রৌদ্রে ঘুরিবার সময় নীল চসমা ব্যবহার করেন। প্রখর সূর্য্য-কিরণ হইতে চক্ষুকে শীতল রাখিবার এটা বেশ উপায়।

এবার সুরেন্দ্র বাবু একটু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নিজের গুরুতর বিষয়টি ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া আমাকে কৌতূহলাক্রান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়ের নাম ? আমাকে আপনি দেখিলেন কোথায় ? আমি ত মহাশয়কে চিনি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না।

আমি যেন তাঁহার কথায় ভ্রুক্ষেপ করিলাম না এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলাম,—মহাশয় সিগারেট পান করেন, পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছেন।

নরেশ হাঁসিয়া বলিল—দেখিলেন সুরেন্দ্র বাবু! আমার কর্ম্মচারীর কৃতিত্ব

সম্বন্ধে আপনি সন্দেহ করিতেছিলেন, ইনি আপনাকে একবার দেখিবামাত্র আপনার সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিয়া দিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—মহাশয় কি প্রকৃতই আমাকে জানেন না?

আমি হাঁসিয়া বলিলাম—আমি আপনার সম্বন্ধে যে দু' একটি কথা বলিয়াছি তাহার মধ্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক কোন কথাটাই নহে। আপনাকে একটু বিশেষ ভাবে দুই এক মুহূর্ত্ত লক্ষ্য করিলেই সকল লোকেই ঐরূপ কথা বলিতে পারে। অবশ্য মানুষের প্রকৃতি অধ্যয়ন করা আমাদের পেশা বলিয়া আমরা যেরূপ ভাবে মনুষ্যের স্বভাব ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করি, সেরূপ সাধারণ লোকে করে না। আর এইরূপে মানুষ অধ্যয়ন করিলে তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ দুই চারিটি কথা সকলেই বলিতে পারে।

বিস্মিত সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার জন্মস্থান সম্বন্ধে ঠিক ধারণাটা আপনি কি প্রকারে করিলেন?

আমি বলিলাম—বিশাল বাঙ্গালা দেশে সকল অধিবাসীই বাঙ্গালা কথা কহিয়া থাকে তাহা সত্য, কিন্তু প্রত্যেক জেলার উচ্চারণের একটা বিশেষত্ব আছে। কতকগুলা বিশেষ শব্দ ব্যবহারেও একটি প্রাদেশিকতা লক্ষ্য হয়। আমি বাল্যাবধি প্রত্যেক জেলার অধিবাসীর উচ্চারণের বিভিন্নতা অধ্যয়ন করিতাম। সেই বিদ্যার বলে আজ জোর করিয়া মহাশয়কে বলিলাম, যে মহাশয়ের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলায়।

সুরেন্দ্র বাবু আমার কৈফিয়তের পর বিষয়টা অত্যন্ত সাধারণ ভাবিয়া সেই শোকক্লিষ্ট মুখে একটু হাঁসিয়া লইলেন। তাহার পর একবার আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন।

নরেশ বলিল—অবশ্য আপনার উচ্চারণে বাঁকুড়া জেলার টানটা অতি অল্প। সাধারণ লোকের লক্ষ্য না করিবারই কথা। আর আপনার উচ্চারণে বাঁকুড়ার প্রাদেশিক কথার এত অভাব বলিয়াই আমার কর্ম্মচারী সতীশ বাবু বলিয়াছেন যে, মহাশয়ের বহু দিন হইতে জন্মস্থান পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

নরেশচন্দ্রের এইরূপ বিজ্ঞ কথায় আমি তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। সে যে প্রণালীতে আমার কার্য্যকারণের সম্বন্ধ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সকল বিষয় বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা অতীব সুখের বলিয়া বোধ হইল। এ বিষয়ে নরেশের উন্নতির উপর আমাদের ফার্মের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

সুরেন্দ্রবাবুকে বুঝাইবার জন্য বলিলাম—আপনি যে রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়ান তাহার স্বাক্ষর আপনার গায়ের চামড়া। আপনার হাত বা মুখের রং অপেক্ষা আপনার দেহের অপর সকল অবয়বের বর্ণ উজ্জ্বল। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, আপনার হস্ত ও মুখের যেরূপ বর্ণ আপনার শরীরের সাধারণ বর্ণ সেরূপ নহে। আপনার দেহের যে সকল স্থল আবৃত থাকে, সে সকল স্থলে আপনার স্বাভাবিক বর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আপনার মুখ বা হাতের রং বিকৃত করিবার প্রধান কারণ রৌদ্রের তাপ। এই দুই স্থল আবৃত থাকে না বলিয়া এই দুই স্থলে সূর্য্য-কিরণ কার্য্য করিতে পারে। আবার আপনার মুখে অপরাপর স্থল অপেক্ষা আপনার কপালের উপরের অংশটি উজ্জ্বল বর্ণের অর্থাৎ সাধারণতঃ লোকে হ্যাট পরিলে যে অংশটি টুপীতে আবদ্ধ থাকে আপনার সেই অংশের বর্ণ সূর্য্যপক্ক নহে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, আপনি হ্যাট ব্যবহার করেন। মহাশয় যখন পাগল নন, তখন হ্যাটের সহিত নিশ্চয়ই পেন্ট্‌লন ব্যবগার করেন। তাই বলিয়াছিলাম, মহাশয় ইংরাজী পোষাক পরিয়া রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়ান।

আগন্তুক আমাদিগের বিচারশক্তি দেখিয়া মনে মনে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছিলেন বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন—আচ্ছা মহাশয়, এখনত বোধ হচ্চে এ সিদ্ধান্তগুলার বেশ ভিত্তি আছে; কিন্তু নীল চশমা চক্ষে দিই এ কথাটা কেমন করিয়া বলিলেন?

আমি উত্তর করিলাম—এ কথাটাও জ্যোতিষ বিদ্যার বলে বলি নাই। এ সিদ্ধান্তেরও ঐ প্রকারের বেশ সরল ভিত্তি আছে। আপনার নাকের উপরে দাগ দেখিয়া ধরিতে পারা যায় যে আপনি চশমা ব্যবহার করেন। লোকের চোখের পীড়া সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়। অনেকে নিকটের পদার্থ দেখিতে পায় না, আর অনেকে দূরস্থ জিনিষ দেখিতে পায় না। মহাশয় চেয়ারে বসিবার পূর্ব্বে আমাদের ঘরে ঐ দূরের দেওয়ালের ছবিখানির তলায় যাহা লেখা আছে তাহা অন্যমনস্কভাবে পড়িয়া লইলেন। তাহাতে আপনার দৃষ্টিহীনতার কিছু পরিচয় পাইলাম না। একবার অন্যমনস্কভাবে 'বেঙ্গলি' কাগজখানা তুলিয়া তারিখটা দেখিয়া লইলেন, তাহাতেও কোন প্রকার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আপনি রৌদ্রে ঘুরেন, সুতরাং আপনার পক্ষে নীল চশমা ব্যবহার করাই স্বাভাবিক।

আমার কথা শুনিয়া নরেশ ও সুরেন্দ্র বাবু একটু হাঁসিলেন। সুরেন্দ্র

বাবুর আমার উপর একটু বিশ্বাস জন্মিল বলিয়া বোধ হইল। নরেশ বলিল—আপনি সিগারেট্ পান করেন একথাটা প্রত্যেক স্কুলের ছেলেই বলিতে পারিবে। কারণ আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে বেশ দাগ রহিয়াছে। আর মহাশয় পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছেন, একথা বলিবার বিদ্যাটা আপনাকে শিখাইয়া দিয়া নিজেদের অন্ন মারি, এটা বোধ হয় আপনার অভিপ্রেত নয়।

সুরেন্দ্র বাবু আমাদের কথাবার্ত্তায় একটু হাঁসিয়াই আবার পূর্ব্ববৎ গাম্ভীর্য্য আশ্রয় করিলেন। তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তাঁহার সেই বিষাদের কারণটা জাগ্রত হইয়া ভদ্রলোকটিকে আবার পূর্ব্ববৎ আকুল করিল। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন—অবশ্য মহাশয়দের উভয়েরই অত্যন্ত পারদর্শিতা আছে তাহা বুঝিয়াছি। আপনারা উভয়েই আমাকে এই গভীর বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আপনারা আমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কন্যাচুরি।

আমি তাঁহাকে যথাশক্তি সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার মামলাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলাম। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে যে, হৃদয় ভারাক্রান্ত হইলে মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না। কথাটা সত্য, কিন্তু ভারাক্রান্ত হৃদয়ের উৎস একবার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে আরম্ভ করিলে তাহা বেগবতী নদীর মত সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমাদিগের নূতন মক্কেলটির শোককাহিনীও সেইরূপ দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিল। নিষ্প্রয়োজন শাখা পল্লবাদি ছাঁটিয়া ফেলিলে তাঁহার আখ্যায়িকাটী এইরূপ দাঁড়ায়—

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী যশোহর সহরে সুরেন্দ্র বাবু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ারের কার্য্য করিতেন। সহরের বাহিরে একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গলায় তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, একটি কন্যা ও একটি মাত্র পুত্র ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। তাঁহার কন্যাটির বয়স আন্দাজ ত্রয়োদশ বৎসর এবং তাঁহার একমাত্র পুত্রটি দশম বর্ষীয়। পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতে নানাস্থলে কর্ম্ম করিয়া তিনি শেষে বৎসরাবধি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবুর কন্যাটির নাম মুরলা। শুনিলাম, কন্যাটি

দেখিতে বড়ই সুশ্রী। কুলীন সুরেন্দ্র নাথের এই কষিতকাঞ্চনবরণা তনয়ার রূপে আকৃষ্ট হইয়া শাহপুরের জমিদার শীতলপ্রসাদ ঘোষাল তাহাকে পুত্রবধূ করিতে মনস্থ করেন। এরূপ সম্বন্ধ সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বাবধি এ প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও আত্মীয়েরা ঘোষালের গৃহে কন্যা সম্প্রদান করিতে একান্ত অনিচ্ছুক হন। শীতলপ্রসাদও এই সর্ব্বসুলক্ষণ-বিশিষ্ট কন্যাটিকে নিজ পুত্রবধূ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হন। শেষে অর্থের লোভে সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয়েরা ঘোষাল-গৃহে মুরলার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যে দিন চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে আমাদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ আমাদের আফিসে আসিয়া আমাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন, ঠিক সেইদিন হইতে একমাস পরে মুরলার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। নববধূর উপযুক্ত অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ জন্য তিনি চারি সহস্র মুদ্রা অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহের জন্য সকল আয়োজনই হইতেছিল, কিন্তু গতকল্য প্রাতে সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যাটি অপহৃত হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস কোন দুষ্ট লোক তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার জন্য তাঁহার কন্যাটিকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

সুরেন্দ্র বাবুর গল্প শুনিয়া বুঝিলাম যে, স্নেহময়ী কন্যার শোক, শীতলপ্রসাদের অর্থের শোক এবং সামাজিক অবমাননার ভয় প্রভৃতি নানা ভাব একত্রিত হইয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়াছে। তাঁহার আবেগপূর্ণ কাতর কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমাদেরও হৃদয় আর্দ্র হইল। নরেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা এ বিষয়টি আপনি কি পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন নাই?

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—এ সংবাদ পুলিশে প্রদান করিলে আমাকে একেবারে পথে বসিতে হইবে। পুলিশে এ সংবাদ দিলে দেশশুদ্ধ সকলেই একথা জানিতে পারিবে। আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং আমার ভাবী বৈবাহিক শীতলপ্রসাদ বাবু এ খবর জানিতে পারিলে আমার পক্ষে কিরূপ অশুভ হইবে, তাহাত সহজে অনুমান করিতে পারিতেছেন।

আমি বলিলাম—হাঁ। শীতলপ্রসাদ জানিতে পারিলে ব্যাপারটা বড় গুরুতর হইয়া উঠিবে। ভবিষ্যতে যদি বাস্তবিকই কন্যাটি উদ্ধার হয় তাহা হইলে শীতলপ্রসাদ বাবুর পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হওয়া একেবারে অসম্ভব হইবে। আর আমাদের দেশের কুলোকে এরূপ একটা কুৎসা করিবার বিষয় পাইলে সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষে ত দেশে বাস করা দায় হইয়া উঠিবে।

আমার কথায় তাঁহার হৃদয়ের ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন—সতীশ বাবু,আপনি ঠিক কথা বলিয়াছেন। এই কারণেই আমি আমার কন্যার অদৃশ্য হওয়ার কথা এপর্য্যন্ত কাহাকেও বলি নাই। আমার ইচ্ছা গোপনে কন্যার অনুসন্ধান করিয়া যে কোন প্রকারেই হউক, এই এক মাসের ভিতর তাহাকে উদ্ধার করিব। আর নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাকে ঘোষাল-পুত্রের হস্তে দিয়া সকল দিক বজায় রাখিব। আপাততঃ মুরলার অদৃশ্য হইবার কথা, এমন কি শীতলপ্রসাদ বাবুকেও বলিব না।

সুরেন্দ্রনাথের বিবরণ শুনিয়া মনে বড় আতঙ্ক হইল। এই নূতন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পর্য্যন্ত অনেক রহস্যময় কাহিনী শুনিয়াছি। অনেক প্রকারের দায়িত্ব শিরে লইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু এরূপ জটিল গভীর রহস্যময় অথচ এত বড় দায়িত্ব পূর্ণ ব্যাপারে কখন হস্তক্ষেপ করি নাই। এ রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলে চিরদিনের জন্য একটা ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের যথেষ্ট ইষ্ট সাধিত হইবে। কিন্তু যদি এই সামান্য ত্রিশ দিনের মধ্যে এ রহস্যের মীমাংসা করিতে না পারি, যদি সুরেন্দ্র বাবুর কার্য্যটি হস্তে লইয়া শেষে একমাস পরে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিতে হয় যে, তাঁহার কোন উপকারই সাধিতে পারিলাম না, তাহা হইলে আর ক্ষোভের পরিসীমা থাকিবে না। প্রথমে শুনিয়াইত ব্যাপারটা বড় গুরুতর সমস্যা পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। এমন কোন একটা ভিত্তি পাইলাম না, যাহার উপর আমাদিগের থিওরি স্থাপিত করি। অপরাধী ধৃত হইতে যতই বিলম্ব হইবে বিপদ ততই বৃদ্ধি পাইবে। আর একমাস পরে অপহৃত কন্যার সন্ধান করিতে না পারিলে বিপদের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইবে। আর এই একমাসের পরেও কন্যাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে সাফল্যের অর্দ্ধেক আনন্দ বিফল হইবে। সুতরাং সাত পাঁচ ভাবিয়া দুই বন্ধুতে আড়ালে গিয়া পরামর্শ করিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে বলিলাম, —মহাশয় আপনার কেস্ যেরূপ জটিল তাহাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই কঠিন।

আমাদিগের কথা শুনিয়া তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। মর্ম্মস্পর্শী নিরাশার করুণ স্বরে তিনি বলিলেন—আপনারা আমাকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলে আমার একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে। এ কেস্‌টা আপনাদিগের হাতে লইতে হইবেই। যদি আমার ভাগ্যদোষে আপনারা অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলেও আমি আপনাদিগের নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ থাকিব।

তাঁহার এইরূপ কাতর অনুরোধেও আমরা একটু ইতস্ততঃ করিলাম। শেষে নরেশ বলিল—একবার কাজটা হাতে লইয়া দেখিতে ক্ষতি কি? তবে ভদ্রলোককে বলিয়া দেওয়া যাক যে আমাদিগের উপর তিনি যেন সম্পূর্ণ নির্ভর না করেন। আমরাও এবিষয়ে তদন্ত করিব। আর তিনি ইচ্ছা করিলে এ কার্য্যের জন্য সরকারী বা বেসরকারী অপর গোয়েন্দাও নিযুক্ত করিতে পারেন।

এ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া সুরেন্দ্র বাবু কতক আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন এ বিষয়ে তিনি আমাদিগের ব্যতীত অপর কাহারও সাহায্য লইতে পারিবেন না। আপাততঃ আমাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য তিনি দুইশত মুদ্রা প্রদান করিলেন এবং কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে তিনি এক সহস্র মুদ্রা উপহার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

একশত টাকার দুইখানি নোট আমার টেবিলের উপর রাখিয়া ব্রাহ্মণ আমার হাত দুটা জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন—আপনারা ভদ্রলোক, আমার অবস্থাটি বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; এ বিষয় আমি পুলিশের হস্তে দিতে পারিব না বা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না। তাহা না হইলে আপনাদিগকে এত অনুরোধ করিতাম না।

অগত্যা আমরা কন্যাচুরীর মকর্দ্দমা হস্তে লইতে স্বীকৃত হইলাম।

প্রায় রাত্রি ১১টার সময় সুরেন্দ্র বাবু আমাদিগের গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। আমি নরেশকে বলিলাম,—আজকের মত সভাভঙ্গ করিয়া চল খাওয়া দাওয়া করা যাক।

আমাদিগের আফিসের উপরই আমাদিগের বাসা। তখন বৃষ্টিটা ধরিয়াছিল, কিন্তু রাস্তা জনমানবহীন। ভৃত্যকে ডাকিয়া আফিস বন্ধ করিতে অনুমতি করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছি, এমন সময় দরজায় কে আঘাত করিল। ভৃত্য বাহিরে গিয়া সংবাদ আনিল, একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, ইহাপেক্ষা ত পুলিশের কর্ম্ম ছিল ভাল। এই বৃষ্টি বাদলের দিন রাত্রি ১১টার সময় আবার মক্কেল আসে কেন?

নরেশ বলিল—ওহে মক্কেল লক্ষ্মী। বস, বস, কি বলে শুনে যাও। কে বলিতে পারে যে আবার হাজার টাকা পাওয়া যাবে না।

আমি বলিলাম, না। সকল লোককে আমি পরিচয় দিতে চাহি না। তুমি স্বয়ং প্রথমে শুনে পরে আমাকে বোলো। ক্রমশঃ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।
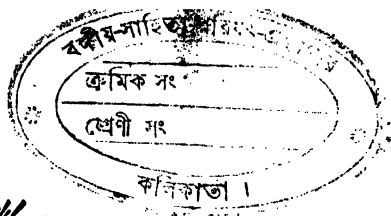
[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩২২। [৭ম সংখ্যা।

কোরান শরীফের নীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সাধারণ-সম্পর্কীয় নীতি।

লোকসাধারণের সহিত ব্যবহার বিষয়ে কোরান শরীফে অনেক হৃদয়গ্রাহী উপদেশ রহিয়াছে। লোকের প্রতি সকল প্রকার সদ্ব্যবহার 'ন্যায়পরায়ণতা ও উপকার' এই দু'য়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। অপরের সত্ব পূর্ণরূপে পরিশোধের নাম ন্যায়পরায়ণতা। নিজের সত্ব পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ছাড়িয়া দেওয়া বা যাহার কোন সত্ব নাই, তাহার কোন সাহায্য করা ইহার নাম উপকার। "নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা ও উপকার সম্বন্ধে আদেশ করেন।" (সুরা নহল ১৩।৯০)। "অন্যায়াচরণে তোমরা কোন দলের শত্রুতার কারণ হইও না ; ন্যায়াচরণ কর, তাহা বৈরাগ্যের নিকটবর্ত্তী এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; নিশ্চয় তোমরা যাহা করিয়া থাক আল্লাহ্ তাহার জ্ঞাতা।" (সুরা মায়দা ২।৮)। "এবং আল্লাহ্ যেমন তোমার প্রতি হিতসাধন করিয়াছেন, তুমি তদ্রূপ হিতসাধন কর।" (সুরা কসস ৮।৭৭)। "এবং হিতানুষ্ঠান কর ; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিতকারীকে ভাল বাসেন।" (সুরা বকর ২৫।১৯৫)।

কোরান শরীফ কঠোর ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেয়। "হে বিশ্বাসিগণ, আল্লার জন্য ন্যায়ানুসারে সাক্ষীরূপে তোমরা প্রস্তুত থাক, যদি তোমাদের নিজের প্রতি অথবা পিতামাতার প্রতি এবং আত্মীয়গণের প্রতিও হয়, এবং যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয়,—(এ দু'য়ের প্রতি আল্লাহ্ অধিক অনুগ্রহকারী); অবশেষে তোমরা বিচার করিতে (স্বীয়) প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না এবং যদি (জিহ্বাকে) বক্র কর, কিংবা (সাক্ষ্যদানে) বিমুখ হও, তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার জ্ঞাতা আছেন।" (সুরা নেসা ২০।৩৫)। "এবং তোমরা সত্যের সহিত অসত্যকে মিশ্রিত ও সত্যকে গোপন করিও না এবং তোমরা ত জ্ঞাত আছ।" (সুরা বকর ৫।৪২)।

কোরান শরীফ অনর্থক সন্দেহ ও নিন্দা নিষেধ করে। "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা বাহুল্য কল্পনা হইতে নিবৃত্ত থাক ; নিশ্চয় কোন কোন কল্পনা পাপ। এবং অনুসন্ধান লইও না ও আপনাদের পরস্পরের দোষ গোপনে আলোচনা করিও না। তোমাদের কোন ব্যক্তি কি আপন মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসে? তাহা হইলে তোমরা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করিতে থাক ; নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনর্ম্মিলনকারী দয়ালু। (সুরা হোযরাত ২।১২)।

কোরানে অপবাদ নিষেধ করে। "যে ব্যক্তি কোন ক্রটি করে, অথবা পাপ করে তৎপর নিরপরাধীর প্রতি অপবাদ দেয়, পরে সে সত্যই অসত্যকে ও স্পষ্ট অপরাধকে বহন করিয়া থাকে।" (সুরা নেসা ১৬।১১২)।

কোরান শরীফে ব্যভিচার, অস্বাভাবিক পাপ ও নরহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পাপচিন্তা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে আদেশ হইয়াছে। "এবং তোমরা পাপের বাহির ও তাহার ভিতরকে পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যাহারা পাপ উপার্জ্জন করে, তাহারা যাহা করিতেছে অবশ্য আমি তদনুরূপ প্রতিফল দান করিব।" (সুরা আন'আম ১৪।১২১)। "এবং তোমাদের অন্তরের বিষয় যদি প্রকাশ কর, কিংবা তাহা গোপন কর, তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ তাহার হিসাব গ্রহণ করিবেন।" (সুরা বকর ৪০।২৮৪)। "কোরান শরীফে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। "যাহাদিগকে শয়তান আক্রমণ করিয়া মতিচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহারা যেরূপ (সমাধি হইতে) উত্থিত হইবে, যাহারা সুদ গ্রহণ করে তাহারাও তদনুরূপ উত্থিত হইবে বই নহে। ইহা এজন্য যে, তাহারা বলিয়াছে যে বানিজ্য কুসীদ গ্রহণ সদৃশ ইহা ব্যতীত নহে ; কিন্তু আল্লাহ্

বাণিজ্যকে বৈধ ও সুদ গ্রহণকে অবৈধ করিয়াছেন।" (সুরা বকর ৩৮।২৭৫)। বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা কোরান নিষেধ করিতেছে। "সেই অসম্পূর্ণ পরিমাণকারিদিগের প্রতি আক্ষেপ। তাহারা যখন লোকের নিকট মাপিয়া লয়, পূর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যখন মাপিয়া দেয় কিংবা ওজন করিয়া দেয়, ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সকল লোক কি মনে করে যে, যেদিন লোক সকল নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের নিকট দণ্ডায়মান থাকিবে, সেই মহাদিনের জন্য সমুত্থাপিত হইবে না?" (সুরা তৎফীফ, ১।১-৪)। ন্যায়াচরণ সম্বন্ধে কোরানের সাধারণ আদেশ এই "তোমরা উৎপীড়ন করিও না এবং উৎপীড়িত হইবে না।" (সুরা বকর ৩০।৭৯)।

ইসলামধর্ম্মকে দানের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কোন ধর্ম্মেই জাকাতের ন্যায় বিধি নাই। জাকাত ও স্বেচ্ছাদান বিষয়ে কোরান শরীফে বহু উক্তি আছে। "যেমন একটি শস্যবীজ সাতটি মঞ্জরী উৎপাদন করে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয়, আল্লার পথে যাহারা স্বীয় সম্পত্তি ব্যয় করে তাহাদের অবস্থা তদ্রূপ।" (সুরা বকর ৩৬।২৬১)। কোরান শরীফের দান স্বাত্তিক দান। তাহাতে পার্থিব কোন লাভাকাঙ্ক্ষা নাই। "এবং তাহারা (সাধু-লোকে) স্বীয় প্রয়োজন সত্ত্বেও দরিদ্রকে ও অনাথকে এবং বন্দীকে ভোজ্য দান করিয়া থাকে। (এবং বলে) 'আল্লার আপন উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার করাইতেছি এতদ্ভিন্ন নহে, তোমাদিগ হইতে কোন বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা ইচ্ছা করি না" (সুরা দহর ১।৮-৯) কোরান শরীফ যে ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা দেয়, তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের। "যে পর্য্যন্ত তোমরা যাহা ভালবাস, তাহা ব্যয় না করিবে, সে পর্য্যন্ত কল্যাণ লাভ করিবে না এবং যাহা ব্যয় করিয়া থাক, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা জ্ঞাত হন।" (সুরা আল-ইমরান ১০।৯২)।

অঙ্গীকারের পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে কোরানে আদেশ আছে। "এবং যখন তোমরা অঙ্গীকার কর, তখন আল্লাহ্ সম্বন্ধীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করিও এবং শপথকে তাহা দৃঢ় করিবার পর ভঙ্গ করিও না। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে আপনাদের সম্বন্ধে প্রতিভূ করিয়াছ। তোমরা যাহা করিতেছ; নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা অবগত হন। এবং সেই (নারীর) সদৃশ হইও না, যে আপনার সূত্রকে তাহা দৃঢ় হওয়ার পর খণ্ড খণ্ড করিয়াছে।" (সুরা নহল ১৩।৯১-৯২)। একটি দান সকলেরই আয়ত্ত কিন্তু কচিৎ তাহা পাওয়া যায়—তাহা মিষ্ট বাক্য। কোরান শরীফে এবিষয়ে আদেশ রহিয়াছে। "এবং লোকদিগকে উত্তম বাক্য বল,

কোমল বাক্য ও ক্ষমা সেই দান অপেক্ষা উত্তম, যাহার উপর ক্লেশ দেওয়া হইয়া থাকে। (সুরা বকর ১৬।২৬৩)।

ইতর জন্তু সম্পর্কীয় নীতি।

ইতর জন্তু সম্বন্ধেও আমাদের কর্ত্তব্য আছে। কতকগুলি জন্তু আমাদের ভক্ষ্য। ভোজনোদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোন জীবকে কষ্ট দেওয়া কোরান নিষেধ করে। "পৃথিবীতে এমন কোন জীব নাই কিংবা পক্ষযোগে উড্ডীয়মান হয় এমন কোন পক্ষী নাই, যে তাহা তোমাদের ন্যায় মণ্ডলী নহে—আল্লার নিকট তাহারা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।" ইতর জীবের প্রতি আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহের উল্লেখ করিয়া মনুষ্যকে তৎপ্রতি দয়াশীল হইতে উপদেশ দিতেছেন,— "তাহারা কি আপনাদের উপর প্রসারিত ও সঙ্কুচিতপক্ষ পক্ষিকুলকে দেখিতেছে না? দয়াময় ভিন্ন তাহাদিগকে (কেহ) ধারণ করে না। নিশ্চয় তিনি সকল পদার্থের প্রতি দৃষ্টিকারী।" (সুরা মুল্‌ক ২।১৯)।

পুনরাবৃত্তি।

এক্ষণে আমি সমস্ত বিষয়টির সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করি। মানুষ স্বেচ্ছায় 'আমানত'—দায়িত্ব—গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্য মানুষ পাপপুণ্যের জন্য দায়ী। মানুষের মনে সুপ্রবৃত্তি দুষ্প্রবৃত্তি উভয়ই আছে। এবং মানুষের পাপপুণ্য আল্লাহ্ দিয়াছেন। দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে মানুষ সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। পুণ্যের জন্য সুপ্রবৃত্তি ও দুষ্প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রয়োজন। দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে উৎকৃষ্টের অনুসরণের নামই পুণ্য। এই অনুসরণ ক্ষমতা মনুষ্যের আছে। ইহাই মনুষ্যের স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক পাপ দ্বারা হিতাহিত জ্ঞান দূষিত হয়। তখন আল্লার প্রেরিত পুরুষগণ লোকদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে পারেন। ধর্ম্মমতের তিন অঙ্গ। ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মকর্ম্ম, নীতি। ধর্ম্ম বিশ্বাসই ধর্ম্মকর্ম্ম ও নীতির মূল। ধর্ম্মকর্ম্মগুলি নীতির সহিত দৃঢ়রূপে জড়িত। ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মকর্ম্ম নীতিকে রক্ষা করিয়া থাকে। উপাসনাদি ধর্ম্মকর্ম্ম গুলির ন্যায় নীতিও অবশ্য পালনীয়। নীতি বিষয়ক কর্ত্তব্য গুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। আত্ম-সম্পর্কীয়, আত্মীয় সম্পর্কীয়, শত্রু-সম্পর্কীয়, সাধারণ লোক সম্পর্কীয় ও ইতর জন্তু সম্পর্কীয়।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পাপপুণ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য পাপের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে? সাধারণ হিন্দু বলিবেন—মস্তক মুণ্ডন করিয়া কিছু অর্থ অভাবপক্ষে কয়েক কাহন কড়ি ব্রাহ্মণকে দান করিলে, কিম্বা যোগ বিশেষে গঙ্গাস্নান করিলে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। খ্রীষ্টান বলিবেন—প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রয়োজন নাই, কেননা প্রভু যিশুখ্রীষ্ট মানুষের পাপের বোঝা আপন ঘাড়ে লইয়া আত্মজীবন দান করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেই পরিত্রাণ। বৌদ্ধ বলিবেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; সকলকেই আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। কোরান খ্রীষ্টিয় মতের বিরুদ্ধে বলেন "এই যে কোন ভারবাহী অন্যের ভার উত্তোলন করে না। এবং এই যে যাহা চেষ্টা করে তদ্ভিন্ন মনুষ্যের জন্য নহে।" (সুরা নযম ৩।৩৮-৩৯)।

বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে কোরান প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করেন এবং ইহাই যথার্থ মত। নিরাশ লোক কি না করিতে পারে? কোরান বলিতেছেন—"তুমি (হে মোহাম্মদ) (আমার পক্ষ হইতে) বল, হে আমার দাসবৃন্দ, যাহারা স্বীয় জীবন সম্বন্ধে অহিতাচরণ করিয়াছ, তোমরা আল্লার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমগ্র পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। এবং তোমার আপন প্রতিপালকের অভিমুখে প্রত্যাগমন কর এবং তোমাদের প্রতি শাস্তি পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুগত হও, তৎপর তোমরা আনুকূল্য পাইবে না।" (সুরা জোমর ৬।৫৩-৫৪)।

কিন্তু হিন্দু মতের ন্যায় কোরানের প্রায়শ্চিত্ত সহজ নহে। কোরানের প্রায়শ্চিত্তের নাম তওবা অর্থাৎ (আল্লার দিকে) প্রত্যাগমন। আল্লাহ্ বলিতেছেন—"হে বিশ্বাসিগণ, আল্লার দিকে তোমরা বিশুদ্ধ প্রত্যাগমনে প্রত্যাগমন কর।" (সুরা তহরীম ২।৮)। বিশুদ্ধ প্রত্যাগমন তাহাকে বলে, যাহাতে আর পূর্ব্বের পাপচিন্তা মনেও উদয় হয় না।

এস ভাই সকল আমরা দয়াময় আল্লাহ্ তা'লা'রদিকে বিশুদ্ধ প্রত্যাবর্ত্তন করি। এবং আমরা প্রার্থনা করি—"হে আমাদের প্রভো! তোমার পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করিও না। আমাদিগকে তোমার নিজের নিকট হইতে অনুগ্রহ দান কর। নিশ্চয় তুমি দাতা।" (সুরা আল্-ইম্‌রান ১।৮)। অপিচ—"হে আমাদের প্রভুঁ আমাদের জ্যোতিঃকে আমাদের জন্য পূর্ণ কর এবং আমাদের অসম্পূর্ণতাকে দূর কর। নিশ্চয় তুমি সর্ব্বশক্তিমান্।" (সুরা তহরীম)।

(সম্পূর্ণ।)

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্

জেব-উন্নেসা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

সর্ব্বদা জ্ঞানচর্চ্চা ও কবিতা রচনায় মত্ত থাকায় জেব-উন্নেসার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা একরূপ দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রথম স্বামী দারা শেকুর পুত্র সোলেমান শেকুকে রাজনৈতিক বিসম্বাদে স্বার্থ-সাধন জন্য অন্যায়রূপে বধ করায় পিতার প্রতি জেব-উন্নেসার একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও অন্তঃকরণে এক প্রবল বৈরাগ্য ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। অতএব সম্রাট আলমগীরের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করেন। আলমগীর কোমলকঠোর অনেকরূপে সাধ্যসাধনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই দয়াবতী মহিলা রোগশোক ও তাপক্লিষ্ট অনাথ ও দরিদ্র নরনারীর সেবা করিতে করিতেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। আমোদপ্রমোদের মধ্যে তিনি কেবল খ্যাতনামা কবিগণকে একত্রিত করিয়া কবিত্বসংগ্রাম দর্শন করিতে অত্যন্ত সুখানুভব করিতেন। বৎসরান্তে একবার "সাহিত্য সম্মিলনী" আহ্বান করিয়া ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলীকে একত্রিত করত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে পরামর্শ ও নানাবিধ প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করাইতেন। ইহাতে পার্শী সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

১০৩৭ হিজরীতে সম্রাট আলমগীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় রাজকীয় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কিছুদিন স্থানান্তরে বাস করিতে উপদেশ দেন। তদনুযায়ী সম্রাট জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লাহোরে গমন করেন এবং তথায় কিছুদিন বিলম্বের সম্ভাবনা দেখিয়া পরিজনবর্গকে লাহোরে আনয়ন করেন। সকলের সঙ্গে সঙ্গে জেব-উন্নেসাও তাঁহার সাধের কবিদল সঙ্গে লইয়া লাহোরে সমুপস্থিত হন। লাহোরে সেই সময়ে আলমগীরের মন্ত্রীপুত্র ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পরমসুন্দর পাঠান যুবক নবাব আলী আকেল খাঁ নাজিম ছিলেন। তিনি দশহাজারী মনসবদারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা তখনকার অতি উচ্চ পদ। অগাধপাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া অল্প বয়সেই আকেল খান সম্রাট সরকারে বড় পদ পাইয়া যশস্বীপুরুষ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আকেল খান অতীব সুন্দর ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তখন দিল্লী

লাহোর ও আগ্রায় তেমনটি আর কেহ ছিলেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে না। তিনি যেমন রূপবান তেমনি গুণবান ছিলেন। কবিত্ব শক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। তাৎকালীন কবিসমাজ আক্কেল খানের কবিতাবলী অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। এই সময় জেব-উন্নেসা অভিনব স্থানে উপনীত হইয়া কবিগণের কাব্যকলার প্রতি অতিরিক্ত যত্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ কবিদের কবিত্ব-যুদ্ধ-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতে লাগিল।

পুষ্পের সম্মান ভ্রমরই অবগত আছে, মণিমাণিক্য ও মুক্তার মর্ম্ম সম্রাট ও জওহরিগণ জানেন; আর কবির কবিত্বের মর্ম্ম কবিই বলিতে পারেন জেব-উন্নেসার রচিত কবিতামালা পাঠ করিয়া এবং তাঁহার গুণ-গরিমা ও অতুল সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া, সেই গুণ-গঙ্গার ভুবনমোহন রূপ স্বচক্ষে দর্শন ও তাঁহার "সাহিত্য সম্মিলনী"তে সভ্যস্বরূপ উপস্থিত হইবার মানসে আক্কেল খান নিতান্ত উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণে আবেদন নিবেদন করিয়াও কিছুতেই সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না। তাঁহার একখানি প্রার্থনা পত্রের পৃষ্ঠে জেব-উন্নেসা স্বহস্তে শুধু এইরূপ একটি কবিতা লিখিয়া ফেরৎ পাঠাইলেন :—

"বুল্‌বুল আজ গুল বোগোজারদ গর দর চমন বিনদ মারা।
বোতপরস্তী কায় কুনদ গর বরহামন্ বিনদ মারা॥
হামচুঁ বু পেন্‌হাঁ শুদম দর বোবৃগে গুল্ মানান্দ গুল্।
হারকে দিদন ময়লে দারদ দর ছখুন বিনদ মারা॥"

অর্থাৎ "ভ্রমর যদি আমাকে উদ্যানে দেখে, তবে পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া (আমার নিকট) আসিবে। আমাকে দেখিলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ কস্মিনকালেও প্রতিমা পূজা করিতে পারিবে না। আমি সুগন্ধের ন্যায় পুষ্পাবরণপত্রের ভিতরে লুক্কায়িত আছি। আমাকে যিনি দেখিতে চাহেন, তিনি যেন আমার রচনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন (তবেই আমাকে দেখা হইবে)।" এইরূপে জেব-উন্নেসার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নবাব আক্কেল খান অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন বটে, কিন্তু কোন উপায়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে অলক্ষ্যে কোন প্রকারে হঠাৎ সন্দর্শন করিবার আশায় তিনি বেগম সাহেবের মহলের চতুর্দ্দিকে বায়ু সেবন উপলক্ষ্যে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা নবাব আক্কেল খান ঐ মনপ্রাণহারিণীর ভুবনমোহন রূপ সন্দর্শনমানসে সুযোগ অন্বেষণার্থ দুর্গের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রাচীরের নিম্নস্থ রাজ-বর্ত্ম দিয়া

যাইতেছিলেন। জেব-উন্নেসা বেগমও সেই সময়েই লোহিতবর্ণের বসন পরিধান করিয়া দুর্গের ছাদে ধীরে ধীরে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। অকস্মাৎ আক্কেল খানের অবাধ্য নয়নদ্বয় সেই প্রাণোন্মাদকারিণী অপরূপ মূর্ত্তির উপর নিপতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জ্ঞানবিহঙ্গম চিত্তছাড়া হইয়া গেল। তিনি ডুবিলেন—মজিলেন—আত্মহারা হইলেন! এক প্রবল শক্তিশালী ও মহাতেজস্কর হুতাশন সহস্র সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া যেন আক্কেল খানের মনঃপ্রাণ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। জ্ঞানী আক্কেল আজ বেআক্কেল অজ্ঞান :—

"কামানে এশ্‌ক হরজা আফগানদ তীর।
ছোপারদারী নাবাশদ কারে তদবীর॥"

অর্থাৎ "প্রেমের ধনুক (হৃদয়ের) সর্ব্বস্থানে তীরবিদ্ধ করিয়াছে। (সেই তীরের গতিরোধ করিবার জন্য) বর্ম্মও নাই, অন্য কোন উপায়ও নাই।"

আক্কেল খানের অবস্থান্তর ঘটিল। সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ, দৃষ্টি ঊর্দ্ধগামী ও বর্ণ লোহিতাভ হইয়া গেল। সঙ্গীয় ভৃত্য অকস্মাৎ প্রভুর এতাদৃশ ভাববিপর্য্যয় দর্শন করিয়া শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আত্মহারা আক্কেল খান উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ঐ দেখ—

"সোর্খ পোশে ব-লবে বাম নজর মীয়ায়েদ।"
অর্থাৎ "ছাদের উপর লোহিত বসন ধারিণীকে দেখা যাইতেছে।"

জেব-উন্নেসা অগাধ কবিত্বশক্তিশালিনী মহিলা। সুতরাং কোকিল যেমন অন্য কোকিলের 'কুহুস্বর' শুনিলে সেও কুহুরব আরম্ভ করে, এক কুক্কুটের প্রভাতিক রব শ্রবণে অন্য কুক্কুটও যেমন সেই শব্দ পুনরাবৃত্তি করে, এক ভ্রমরের মধুর ঝঙ্কারে চকিত হইয়া অন্য ভ্রমরও যেমন গুন্ গুন্ আরম্ভ করে এবং প্রেমভরে সহসা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ জেব-উন্নেসাও অকস্মাৎ পারসী শ্লোকের ঝঙ্কারে চমৎকৃত হইয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক অজ্ঞাতকুলশীল পরম সুন্দর যুবক ঊর্দ্ধনেত্রে অনিমেষে আকুল ভাবে দণ্ডায়মান। তাঁহার সুগঠিত দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, শ্মশ্রুহীন বদনে গুম্ফ-রেখা প্রকাশমান, মস্তক দীর্ঘ কুন্তলদামে পরিশোভিত, অঙ্গে মূল্যবান পোষাক, করকমলে মণি-মুক্তা বিলম্বিত কাঞ্চন যষ্টি। যুবক পরম সুন্দর—যেন সৌন্দর্য্যের নির্ঝর,—বন্যাগমে অতুল রূপরাশি চতুর্দ্দিকে উছলিয়া পড়িতেছে। এরূপ পরম রূপবান যুবককে দর্শন করিয়া জেব-উন্নেসা সত্যই যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি

আগ্রহান্বিত ভাবে আরও অগ্রসর হইয়া সে রূপরাশি অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রাণতোষিণীর আগ্রহদৃষ্টি দেখিয়া আহ্লাদ-ভরে আকেল খান পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন আহা!

"সোর্খ পোশে বল-বে বাম নজর মীয়ায়েদ।"

জেব-উন্নেসার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণ যথেষ্ট ছিল, তিনি এই কবিতার অপরাংশ তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া বলিলেন :—

"না ব-জারী না ব-জোর না ব-জর্ মীয়ায়েদ।"

অর্থাৎ "না আর্ত্তনাদ, না বল, না অর্থ দ্বারা (এই লোহিত পরিচ্ছদ ধারিণী) তোমার হস্তগত হইবে।" এই বলিয়াই জেব-উন্নেসা সেস্থান হইতে ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন। আকেল খান কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় হা করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

প্রেমরূপ অমূল্য রত্নের ব্যবসায়ে মিলনের পূর্ব্বক্ষণ বড় ভয়ানক। তখন মানবের অন্তঃকরণে যে বিশ্বদাহী হুতাশনের লহ লহ শিখা প্রজ্বলিত হয়, তাহা উভয়পক্ষকে দগ্ধীভূত করিয়া বিষম যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। যেমন জেব-উন্নেসাই বলিয়াছেন :—

"এশ্ করা ছেনিশানাস্ত মাতব্বর।
আহে ছর্দ্দ ও রুয়ে জর্দ্দ ও চশ্মে তর॥
গরতোরা পুরশিদ ছে দিগর কোদাম।
কম খোর্দ্দন ও কম গোফ্তন ও খোফ্তন হারাম॥"

অর্থাৎ "প্রেমের সর্ব্ব প্রধান চিহ্ন তিনটি,—হা হুতাস, আরক্ত বদন ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন। আর তিনটি কি, ইহা যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে (তবে বল), পানাহারে অল্পতা, বাক্যের সঙ্কোচ ও নিদ্রাত্যাগ।"

প্রেমের বিষাক্তস্বরে আহত হইয়া নবাব আকেল খান প্রাণে অব্যক্ত মর্ম্মদাহী যাতনা লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু মন উচাটন, দেহ শূন্য, মস্তিষ্ক শূন্য, সমস্ত দুনিয়া শূন্যময়! তিনি কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখনও প্রলাপ বকিতেন! জেব-উন্নেসাই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া গেল। এদিকে জেব-উন্নেসাও নিতান্ত নিরুপদ্রবে ও নিশ্চিন্তভাবে ছিলেন না। কবিত্বশক্তিশালী সুন্দর যুবক নবাবকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার মুখ-নিঃসৃত একটি কবিতার অর্দ্ধাংশ শ্রবণ করিয়াই তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আবার সেই অনিন্দ্যসুন্দর যুবককে দর্শন করিতে ও তাঁহার বাক্যসুধা পানে

পরিতৃপ্ত হইতে তাঁহার অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনিও মণিহারা ফণীর মত সর্ব্বদা বহুমূল্য মণির অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। ধিকি-ধিকি প্রেমবহ্নি তাঁহার হৃদয়কেও দগ্ধ করিতে লাগিল।

স্বীয় পিতার নির্ম্মমতায় পুরুষ জাতির প্রতি জেব-উন্নেসার এক বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। এক্ষণে সেই ঘৃণার বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ না হওয়ার যে অটল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাও যেন টলটলায়মান হইল। জেব-উন্নেসা আত্মহারা হইলেন! প্রেমের এমনি মোহিনী শক্তি যে—যে আকেল খানের শত শত প্রার্থনাপত্র পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, আজ জেব-উন্নেসা সেই আকেল খানের পত্র-প্রাপ্তির জন্য সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকেন এবং পত্র-প্রাপ্তি মাত্রই আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার উত্তর প্রদান করেন! এইরূপে উভয় পক্ষ হইতে কবিত্ব-চাতুর্য্যের সহিত অবিরত লিপিকাদির আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

লাহোরের জলবায়ু জেব-উন্নেসার নিতান্ত মনঃপুত হওয়ায় তিনি ইতি-পূর্ব্বেই তথায় একটি সুরম্য ও সুদৃশ্য উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উদ্যানবাটিকার অর্দ্ধাংশ ও তন্মধ্যস্থ 'বার দোয়ারী' নির্ম্মিত হওয়ার পর, একদা জেব-উন্নেসা পরিদর্শন-মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। গোয়েন্দার সাহায্যে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আকেল খান উদ্যান-দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভাকাঙ্ক্ষায় বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রহরীদিগের প্রতিবন্ধকতায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আত্মহারা প্রেমিকের অসাধ্য কিছুই নাই। উদ্যান-প্রবেশে বিফলমনোরথ হইয়া আকেল খান অবিলম্বে রাজমিস্ত্রির বেশ ধারণ করত ইষ্টক সুরকি বহিবার টুক্‌রি মস্তকে ধারণ করিয়া বিনা বাধায় উদ্যানবাটিকা-মধ্যে প্রবেশলাভ করিলেন। 'বারদোয়ারী'র এক প্রান্তে জেব-উন্নেসা সহচরিগণের সহিত 'দশ পঁচিশ' খেলিতেছিলেন। ধীরে ধীরে রাজমিস্ত্রিবেশধারী আকেল খান এক টুক্‌রি সুরকি লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত সুতরাং কেহ সেদিকে লক্ষ্য করিল না। আকেল খান মস্তকে সুরকি লইয়া জেব-উন্নেসার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে রাজমিস্ত্রি কার্য্য করিতেছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। এবং জেব-উন্নেসার দিকে লক্ষ্য করিয়া যেন অন্যমনস্ক ভাবে সহসা বলিয়া উঠিলেন :—

"মন দর তলবৎ গের্দ্দে জাঁহা মিগর্দ্দম।"

অর্থাৎ—"আমি আপনার জন্য সমগ্র ভুবন পরিভ্রমণ করিতেছি।"

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ রাজমিস্ত্রিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই লও ওস্তাদ সুরকি।"

জেব-উন্নেসা উপরি-উক্ত বাক্যে প্রেমের তীব্র গন্ধ উপলব্ধি করিয়া চকিতনয়নে সেই দিকে ভালরূপে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি তাঁহার মনপ্রাণ-হরণকারী সেই ভুবনমোহন রূপ নয়নপথে পতিত হইল! কিন্তু হায়! একি? তাঁহারই প্রেমের দায়ে—ভালবাসার খাতিরে, আজ প্রধান মন্ত্রীর পুত্র সমগ্র লাহোর সুবার নাজিম নবাব আক্কেল খানের মজুর বেশ! হে প্রেম! তুমিই ধন্য! তুমি না করিতে পার এমন কার্য্যই নাই। হে প্রেম! তুমি মহান ও সর্ব্বশক্তিমান। মহাত্মা জামী সত্যই বলিয়াছেন :—

"দেলে ফারাগ জে দর্দ্দে এশ্ক দেল নিস্ত।
তনে বে দর্দ্দে দেল জোজ আব ও গেল নিস্ত॥"

অর্থাৎ "যে প্রাণে প্রেমের বেদনা নাই, সে প্রাণ প্রাণই নহে এবং যে দেহে অন্তরের যন্ত্রণা নাই, সে দেহ জল ও কর্দ্দম ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

আক্কেল খানের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে জেব-উন্নেসার মনে আরও অধিকতর দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি 'দশ পঁচিশ' খেলিতে খেলিতে আক্কেল খানের কবিতার অপরাংশ এইরূপ পূর্ণ করিলেন :—

"গর বাদ শবি বর সরে জুল্কম নারছি।"

অর্থাৎ "(তুমি কি মলয় মারুত?) যদি মলয় মারুতই হও, তবে যেন আমার মস্তকের চিকুরে উপস্থিত হইও না।"

এদিকে সহচরিগণের দিকেই লক্ষ্য ছিল, সুতরাং কড়িগুলি পূর্ব্বের মত চালিয়া গেলেন। কিন্তু ইহার পর দ্রুতহস্তে খেলা শেষ করিয়া জেব-উন্নেসা 'বার দোয়ারী'র ছাদে পায়চারি করিতে লাগিলেন। আকার ইঙ্গিতে ও শ্লোক-সহায়ে উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু অন্য কেহ তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। জেব-উন্নেসা সত্যই বলিয়াছেন :—

"মিয়ানে আশক ও মাশুক হাম জিস্ত।
কেরামন কাতেবিন রা হাম খবর নিস্ত॥"

অর্থাৎ "প্রেমিক প্রেমিকা এই উভয়ের মধ্যে এমনই নিগূঢ়তত্ত্ব বিদ্যমান

আছে যে (তৎসম্বন্ধে মানবের পাপপুণ্য লেখক চিরসঙ্গী দূত) কেরামন কাতেবিন পর্য্যন্ত সংবাদ রাখেন না।"

কিছুদিন লাহোরে অবস্থান করিয়া সম্রাট আলমগীর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু জেব-উন্নেসা উত্থানবাটিকা নির্ম্মাণ জন্য লাহোরেই রহিয়া গেলেন। ইহাতে উভয়ের পরিচয়-পথে আর কোন বিঘ্ন রহিল না। স্বচ্ছন্দে উভয়ের মধ্যে আলাপ সাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। উভয়েই উভয়কে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। কিন্তু এই শ্রদ্ধাই কালক্রমে অনুরাগে পরিণত হইয়া উভয়ের মিলন-স্পৃহাকে বলবতী করিয়া তুলিল। জেব-উন্নেসার অটল প্রতিজ্ঞা প্রেমের এক অতি ক্ষুদ্র ফুৎকারে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। কবিবর নাসের-আলী ছরহিন্দ কর্ত্তৃক পরিণয়ের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে জেব-উন্নেসাও স্বীকৃত হইলেন।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিধানানুসারে প্রাপ্তবয়স্কা কন্তার বিবাহে মাতাপিতা বা অন্য কাহারও কোন হাত নাই। কন্যার মনঃপূত হইলে নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন আত্মীয় ব্যতীত যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা যাইতে পারে। তাহাতে অন্য কাহারও প্রতিবন্ধকতা করিবার উপায় নাই। বিবাহ কার্য্যে বংশ-ভেদও ধর্ত্তব্য নহে। সৈয়দ বংশের ও সম্রাট-দুহিতার সহিতও শেখ বংশের ভিক্ষুক-তনয়ের বিবাহ হইতে পারে। তাহাতে শাস্ত্রসঙ্গত কোন দোষ হয় না।

জেব-উন্নেসা অদ্বিতীয়া শিক্ষিতা মহিলা। অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তিনি স্বাধীনতার মর্ম্মাবগত হইয়াছিলেন। তাই একদা তদীয় শিক্ষাগুরু মোল্লা সাইদ আশরফ সাহেবকে আহ্বান করিয়া তদীয় বেতনভোগী কবিদলকে উকিল ও সাক্ষী নিযুক্ত করিয়া মোল্লা সাইদ আশরফ সাহেবের পৌরহিত্যে আকেল খানের সহিত পবিত্র উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু সম্রাটের ভয়ে এই কার্য্য অতি সংগোপনে সমাধা হইল। কোনরূপ আমোদ উৎসব হইল না।

ক্রমশঃ।

নুরুলহোসেন কাশিমপুরী।

ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণের একাংশ।

দিল্লীর সম্রাটগণের ইতিহাস।
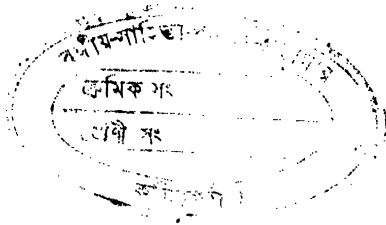
(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

১০। স্থলতান সাহাবুদ্দিন।—আলাউদ্দিনের পর মালেক নায়েব কাফুর আলাউদ্দিনের কনিষ্ঠ পুত্র সাহাবুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। এবং সকলের নিকট হইতে অধীনতা-সূচক কর গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হন। রাজ্যের সমস্ত কাজ কর্ম্ম কাফুরের প্রভুত্বাধীনে পরিচালিত হইতে থাকে। কাফুরের পরামর্শানুসারে সাদি খাঁ ও আবুবকর খাঁর চক্ষু-উৎপাটন করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী করা হয়। খেজের খাঁরও চক্ষু-উৎপাটনের জন্য আদেশ দেওয়া হইল।* কুতব-উদ্দিন বন্দী হইলেন। তাঁহার চক্ষু-উৎপাটনের আদেশ হইল না বটে, কিন্তু হত্যা করণের আদেশ হইল। একদিন আলাউদ্দিনের স্ত্রী নির্দ্দয় নায়েবের হস্তে পড়িয়া পুত্রগুলির শোচনীয় অবস্থার উপর আবার কুতব-উদ্দিনের হত্যা সংবাদ শ্রবণ করিলেন এবং স্বীয় স্বামীর বশির ও মবশর নামক দুইটি বিশ্বাসী গোলামের শরণাগত হইয়া কাতরকণ্ঠে তাহাদিকে হৃদয়ের ব্যথা জানাইলেন। উভয় গোলামের মনেও দারুণ দুঃখ হইল। শেষে উহারা বলিল, ইহার পরিণাম কি হয় পরে জানিতে পারিবেন। এই দুই গোলাম নায়েবের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এবং নায়েবের শরীররক্ষক প্রহরীর কার্য্যও করিত। একদিন রাত্রে উভয়ে মিলিত হইয়া নায়েবকে নিহত করিয়া কুতব-উদ্দিনকে কারাগার হইতে মুক্ত করে।

---

* বাদাউনী লিখিয়াছেন,—মালেক কাফুর—খেজের ও সাদিখাঁর চক্ষু-উৎপাটনার্থে আখ্‌তার উদ্দিন সম্বলকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন।

১১। সুলতান কুতব-উদ্দিন।—কুতব-উদ্দিন কিছুদিন পর্য্যন্ত স্বীয় ভ্রাতা সুলতান সাহাবুদ্দিনের নায়েব থাকিয়া শেষে তাঁহার হস্তাঙ্গুলি কর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ এবং স্বয়ং রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। কিছুদিন পরে তিনি রাজধানী হইতে দৌলতাবাদ গমন করেন। দৌলতাবাদ দিল্লী হইতে ৪০ মঞ্জেল দূরবর্ত্তী। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি ঝাউ ও অন্যান্য বৃক্ষ রহিয়াছে। পথিকগণ এই পথ দিয়া গমন কালে মনে করেন যেন মধ্যে মধ্যে উদ্যান-মধ্য দিয়া যাইতেছেন। পথের প্রত্যেক ক্রোশের মধ্যে তিনটি করিয়া ডাক ষ্টেশন। এই স্থানে 'রানার' উপস্থিত থাকে। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক ষ্টেশনে বাজার রহিয়াছে। এইরূপ ভাবে এই রাজ-বর্ত্ম সমুদ্রের তীরপর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক মঞ্জেলে সম্রাটের থাকিবার স্থান এবং পথিকের জন্য বিস্তৃত ময়দান রহিয়াছে। পথিকদের আহারীয় সামগ্রী সঙ্গে লইবার কোনই আবশ্যক করে না। * যে সময়ে সুলতান কুতব-উদ্দিন পথে ছিলেন, সে সময়ে অন্যান্য আমীরগণ রাজবিদ্রোহীতার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং সম্রাটের ভ্রাতষ্পুত্রকে † (খেজের খাঁর পুত্র) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করেন। এই দশ বৎসরের বালক সম্রাটের সঙ্গেই ছিল। সম্রাট এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া ঐ বালকের উভয় পদ ধারণ করিয়া তাহার মস্তক একটি প্রস্তরের উপর এরূপ জোরে নিক্ষেপ করিলেন যে, তৎক্ষণাৎ সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ মালেক শাহ্ নামক একজন আমীরকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করিলেন এবং আপনার বন্দী ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন।

গোয়ালিয়রের কাজি জয়নুদ্দিন মোবারক আমাকে বলিতেছিলেন—"যে দিবস উক্ত মালেকশাহ্ দুর্গ মধ্যে পৌছিলেন, সে দিবস আমি খেজের খাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ মাত্রই খেজের খাঁর মনে বিশেষরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় এবং তাঁহার বদনমণ্ডল কালিমা ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মালেকশাহ খেজের খাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, খেজের তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এবং তিনি কোন কার্য্য আছে বলিয়া

---

* শেরশাহী সড়ক। এই প্রকারের দুইটি রাজ-বর্ত্ম শেরশাহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

† সুলতান আলাউদ্দিনের পিতৃব্য পুত্র আসাদ-উদ্দিন-বেন বগরসই দেওগড়ের (দৌলতাবাদ) পথে সম্রাটকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সম্রাট হইবার চেষ্টা করেন। বাদাউনী আসাদ-উদ্দিনকে পঞ্চম মালেক নামেও অভিহিত করার বিষয় লিখিয়াছেন।

উত্তর দেন। পুনরায় খেজের জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জীবনের মঙ্গল কি?" তিনি উত্তর দিলেন "হাঁ"। পরে তিনি কোতয়াল, দুর্গস্থ তিনশত প্রহরী এবং আমাকে (কাজীকে) ও অন্যান্য সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইয়া সকলের সমক্ষে সম্রাটের আদেশ-পত্রখানি পাঠ করিলেন। পরে সাহাবুদ্দিনের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাঁহারই বধসাধন করেন। অন্তিম সময়ে তিনি কোন রূপ ভয় বা চিন্তা করেন নাই। পরে সাদি খাঁ ও আবুবকার খাঁকে হত্যা করা হয়। সর্ব্বশেষে খেজের খাঁকে হত্যা-কালে খেজের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন। খেজেরের মাতাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তৎপর খেজেরকে নিহত করিয়া সমস্ত মৃত দেহের কোনরূপ সৎকার্য্য না করিয়া সকলগুলি একটি গর্ত্ত-মধ্যে পুতিয়া রাখা হয়। বহুদিন পরে ঐ গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া যেস্থানে তাঁহাদের বংশাবলীর সমাধি রহিয়াছে তথায় কবরস্থ করা হয়।"

ইহার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত খেজের খাঁর মাতা জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে আমি ৭২৮ হিজরীতে মক্কায় দেখিয়াছিলাম।"

একটি বিস্তৃত ময়দানের চটিতে গোয়ালিয়রের দুর্গ রহিয়াছে। * দুর্গটি দেখিলে বোধ হয় যেন চটিটি গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ

* গোয়ালিয়র দুর্গ—হাণ্টার লিখিয়াছেন যে, গোয়ালিয়রের দুর্গ একটি পৃথক চটির উপর স্থাপিত। উচ্চতা প্রায় ৩৪২ ফিট, দেড় মাইল লম্বা এবং তিন শত গজ প্রশস্ত। দুর্গ দ্বারের সম্মুখে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড হস্তী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই জন্য সাধারণে ইহাকে 'হাতীপুল' বলিয়া থাকে। গোয়ালিয়ের পুরাতন সহর দুর্গের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানে দেখিবার মধ্যে শেখ মোহাম্মদ গওসের সমাধিই প্রধান। মানসিংহ (১৪৮৬ খৃঃ হইতে ১৫১৬ খৃঃ) এখানকার রাজবাড়ী প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। ইহার নিকটে রাজা বিক্রমাজিতের এবং জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের সুন্দর সুন্দর মহল রহিয়াছে। অলকর্ড লিখিয়াছেন গোয়ালিয়র দুর্গ ৭৭৩ খৃঃ অব্দে শূর শের প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ১০২৩ খৃঃ মহম্মদ গজনবীর অধিকারে আসে। ১১৯৬খৃঃ মহম্মদ গোরীর অধিকার-ভুক্ত হয়। ১২১১ খৃঃ দিল্লীর সম্রাটদিগের অধিকার হইতে বাহির হইয়া যায়। এবং ১২৩১ খৃঃ সুলতান আলতমাস পুনরাধিকার করেন। সম্রাট আকবর এইস্থানে বড়লোকদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতেন। কিন্তু বতুতার লেখানুসারে বোধ হয় যে ঐসময়ে আকবরের ন্যায় বড়লোকদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইত। ১৮৫৭ খৃঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকার-ভুক্ত হয়। কিন্তু লর্ড ডফরিণের সময় ঝান্সি সহরের পরিবর্ত্তে ইহা সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হয়। গোয়ালিয়র

করা হইয়াছ। এবং উহার পার্শ্ব-দেশে কোন পর্ব্বতও নাই। দুর্গ-মধ্যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ও প্রায় ২০টি কূপ রহিয়াছে। দুর্গের প্রবেশ-দ্বার এরূপ বৃহৎ যে, হস্তীও স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিতে পারে। দুর্গ-দ্বারে প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তী ও হস্তীচালকের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে প্রকৃত হস্তী বলিয়া ভ্রম হয়। দুর্গ-নিম্নে সহরের বস্তি রহিয়াছে। সহরটি অতি সুন্দর। মসজিদগুলি প্রায় শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত। মসজিদের দরজা ভিন্ন কোন স্থানে কাষ্ঠের নামও নাই। অধিকাংশই হিন্দু অধিবাসী। এই সহরে সর্ব্বদা ছয়শত সৈন্য অবস্থান করে। এখানে সর্ব্বদা ছোট খাটো যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। কারণ এই দুর্গের চতুর্দ্দিকে হিন্দুদিগের রাজ্য রহিয়াছে। কুতবউদ্দিন আপন ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে একজন সামান্য আমীরের হস্তে নিজেও নিহত হইলেন। এই হত্যাকারী সুলতান তোগলক। এইবার আমি বিস্তৃত ভাবে এই ঘটনার

আগ্রা হইতে ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বাবর শাহও "হাতী-পুলের" উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট আকবর আগ্রা-দুর্গ নির্ম্মাণ কালে ঐরূপ দুইটি হস্তী ও হস্তীচালকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া পশ্চিম দরজার নিকট রাখিয়া দেন। শাহজাহান এস্থান হইতে ঐ দুইটিকে লইয়া গিয়া দিল্লীর লাল কেল্লা-মধ্যে রাখেন। সম্রাট আলামগির উহা ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরিত করেন।

ঐ হস্তী-সম্বন্ধে বর্ণীয়ার লিখিয়াছেন যে,—ঐ হস্তী-পৃষ্ঠে যে দুইজন হস্তীচালকের মূর্ত্তি রহিয়াছে ঐ দুইটি জয়মল ও ফতার প্রতিমূর্ত্তি। টড্ ও কানিংহাম ইতিহাসে এই ঘটনা নানারূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ বলেন, সম্রাট আকবর স্বীয় শত্রুদ্বয়কে নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত দর্শনার্থে এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কেহ বলেন অন্য কোন কারণ বশত আকবর এরূপ ভাবে মূর্ত্তিদ্বয় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বর্ণীয়ার ভিন্ন স্বদেশী কি বিদেশী অন্য কোন ইতিহাস-লেখক ঐ মূর্ত্তিদ্বয়কে জয়মল ও ফতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কানিংহাম লিখিয়াছেন, সম্ভবত বর্ণীয়ার দানসমন্দ খাঁর নিকট ঐ কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। বর্ণীয়ার দানসমন্দ খাঁর নিকট ঐ কথা শুনিয়া থাকিলেও আমরা ঐ বিষয়ে তত বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ এ স্থলে আমরা আর একজন ইতিহাসবেত্তার মত বর্ণনা করিতেছি। ইঁহার মত শুনিলে অন্য ইতিহাস-লেখকের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। এই ইতিহাসবেত্তা আর কেহই নহেন—আইন-ই-আকবরী-প্রণেতা আবুলফজল। তিনি আকবরীতে লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, গোয়ালিয়ার দুর্গে হস্তী ও হস্তীচালকের প্রতিমূর্ত্তি ছিল।

বর্ণনা করিতেছি। খোসরু খাঁ সম্রাট কুতব-উদ্দিনের অধিনস্থ একজন আমীর ছিলেন। তিনি যেমন বীর পুরুষ তেমনি দেখিতেও সুপুরুষ ছিলেন। ইনিই চাঁন্দেরী ও মায়াবর প্রদেশ জয় করেন। হিন্দুস্থানের মধ্যে এ স্থানেও অপর্য্যাপ্ত শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। দিল্লী হইতে ছয় মাসের পথ অতিক্রমের পর মায়াবর প্রদেশে পৌঁছান যায়। কুতব ও খোসরু উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। কুতব-উদ্দিনের শিক্ষকের নাম কাজি খাঁ সদর জাঁহান।* ইনিও রাজসভার একজন 'আমীরল ওমরা' ছিলেন। ইঁহারই নিকট সমস্ত রাজবাড়ীর চাবি থাকিত। তিনি সমস্ত রজনী রাজবাড়ীর প্রহরীদের পর্য্যবেক্ষণও করিতেন। ইঁহার অধীনে প্রায় এক সহস্র প্রহরী ছিল। প্রতি রজনীতে সার্দ্ধ দ্বিশত প্রহরী বহির্দ্বার হইতে অন্দরের দ্বার পর্য্যন্ত দুই শ্রেণীতে সজ্জিত হইয়া প্রহরা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। কাহাকেও পুরী প্রবেশ করিতে হইলে ঐ সকল প্রহরীর সম্মুখ দিয়া গমন করিতে হইত। ঐ সকল প্রহরীদিগকে "নওবত ওয়ালা" বলা হয়। ইহাদের উপর আবার প্রধান প্রধান মুন্সি রহিয়াছে। এই সকল মুন্সি প্রহরীদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। রাত্রিকালের প্রহরীদিগের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে দিবসের প্রহরিগণ আসিয়া কার্য্য করিত। উক্ত কাজি খাঁ খোসরু মালেকের † উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকিতেন। খোসরু মালেক প্রথমে হিন্দু ছিলেন। কাজি খাঁ সম্রাটকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেন যে আপনি খোসরু মালেক হইতে সতর্ক থাকিবেন। কিন্তু সম্রাট তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না।

এক দিবস খোসরু খাঁ সম্রাটকে বলেন যে, কয়েকজন হিন্দু মুসলমান হইতে চাহেন। ‡ সে সময়ের প্রথা ছিল, যদি কোন হিন্দু মুসলমান হইতেন, সর্ব্ব প্রথমে সম্রাটকে অভিবাদন করিতে হইত। সম্রাট তাঁহাকে খেলায়াৎ

---

* কাজি খাঁ সদর জাঁহান—মওলানা জিয়াউদ্দিন বেন মওলানা সাহাবউদ্দিনের উপাধি খাওয়াত ছিল। তিনি সম্রাটের শিক্ষক ছিলেন।

† খোসরু খাঁ গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। সেরেস্তা ও বর্ণীয়ার ইঁহাকে নীচ জাতীয় লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খোসরু যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহাকে "পরদার" বলে। বাদাউনী "বরাও" জাতি বলিয়াছেন। ইনি পরে মুসলমান হন। এবং তাঁহার হোসেন নাম রাখা হইয়াছিল।

‡ ইবনে বতুতা ভিন্ন অন্য কেহ ইহার কারণ উল্লেখ করেন নাই। কারণ এই যে সম্রাট খোসরু খাঁকে নায়েব নিযুক্ত করিয়া চাঁন্দেরী ও মায়াবর প্রদেশ অধিকারার্থে প্রেরণ করেন। খোসরুর সঙ্গে সঙ্গে আর যে সকল মাননীয় লোক গিয়াছিলেন, তাঁহারা খোসরুর অধীনে থাকা অপমান বোধ করিতেন। এ বিষয় খোসরু বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত ভয় করিত। সেই জন্য খোসরু সম্রাটকে বলে যে, যদি আদেশ হয় তাহা হইলে আমি

এবং স্বর্ণালঙ্কার পুরস্কার দিতেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে বলিলে খোসরু বলিলেন, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে সেই জন্য দিবসে আসিতে লজ্জাবোধ করেন, কিন্তু রাত্রিকালে আসিতে চাহেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে রজনীযোগে আসিতেই অনুমতি করিলেন। খোসরুমালেক কয়েকজন ক্ষমতাবান হিন্দুকে লইয়া চক্রান্ত করিলেন। তাহার মধ্যে খোসরুর ভ্রাতা খান খানানও ছিলেন। ঐ সময়টা গ্রীষ্মের ছিল। সম্রাট একটি উচ্চ ছাদের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। এবং নিকটে মাত্র কয়েক জন দাস ব্যতীত আর কেহ ছিল না। চক্রান্তকারিগণ যখন চারিটি দ্বার অতিক্রম করিয়া পঞ্চম দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিবে, সেই সময় কাজি খাঁর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া কাজি খাঁর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে বলেন, তোমরা অপেক্ষা কর পূর্ব্বে সম্রাটের অনুমতি আনয়ন আবশ্যক। কিন্তু চক্রান্তকারিগণ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিহত করে। গোলযোগ ও চীৎকার শুনিয়া সম্রাট কারণ জিজ্ঞাসু হইলে খোসরুমালেক বলিলেন, সেই হিন্দু কয়েক জনকে আসিতে দেখিয়া কাজি খাঁ বাধা প্রদান করিতেছিলেন, সেই জন্য গোলযোগ হইতে ছিল। সম্রাটের মনে ভয়সঞ্চার হওয়ায় তিনি অন্দর মহলে গমনের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ ছিল। সম্রাট দ্বারে করাঘাত করিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে খোসরু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। সম্রাট বলবান ছিলেন, তিনি খোসরুকে নিম্নে পাতিত করিয়া তদুপরি উপবেশন করেন। সেই সময়ে খোসরু চীৎকার করিয়া বলেন যে, সম্রাট আমাকে নিম্নে পাতিত করিয়াছেন। এতচ্ছ্রবনে খোসরুর ভ্রাতা ও উক্ত হিন্দু কয়েকজন আসিয়া সম্রাটকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং তাঁহার মস্তক কর্ত্তণ করিয়া চত্বরের উপর নিক্ষেপ করে।

মোহাম্মদ হাফিজল হাসান।

আমার দেশী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে রাখিতে পারি। এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া খোসরু দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্য রাজ সরকারে প্রবেশ করাইয়াছিল। খোসরু পরে সম্রাটকে বলে যে, আমার বন্ধুবর্গ সর্ব্বদা বলেন 'তুমি রাত্রিকালে রাজবাড়ীতে থাক, তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় না।' সম্রাট বলিলেন 'খোসরু তুমি বন্ধুবর্গকে এইস্থানে আনিও।' এই জন্য ফটকের চাবি তাহাকে দেওয়া হয়। খোসরু ঐ পথ দিয়া ঐ সকল লোকদিগকে প্রতিদিন রাজবাড়ীতে আনয়ন করিত।

অনন্তের আহ্বান।

-:*:-

ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল গগন অনন্তে দেহ প্রসারিত করিয়া স্থিরধীর গম্ভীর ভাবে বিরাজমান। সাড়া নাই—শব্দ নাই—চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্র নাই; যেন কি এক গভীর যোগে—গভীর সাধনে সমাসীন। অনন্ত নক্ষত্ররাজি কি এক মহোৎবে—অনন্ত বক্ষেঃ হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের সে মধুর হাসির মধুর প্রতিচ্ছবিতে দিগদিগন্ত নীরব অমিয়প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে—অনন্তের কি এক গভীর রহস্যে চারিদিক ভাবময় হইয়া উঠিয়াছে। আর আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম মানবজাতি নিম্নে—অতি নিম্নে আপন ভাবে বিভোর হইয়া আছি।

চারিদিকে কি এক মহা জাগরণ মহা উন্মাদন; কিন্তু আমরা নীরবে নয়ন মুদিয়া রহিয়াছি। কোটি কোটি গ্রহ প্রচণ্ড তেজে বিশ্ববক্ষেঃ আবর্ত্তন করিতেছে, সংখ্যাতীত ধুমকেতু বিশাল পুচ্ছে দিগন্ত আচ্ছাদিত করিয়া কি জানি কি উদ্দেশ্যে—কোন অলক্ষ্যে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া চলিতেছে! লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড নরনয়ন অলক্ষ্যে জ্বালাময় প্রচণ্ড শিখায় জ্বলিতে জ্বলিতে প্রতিনিয়ত প্রচণ্ড বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। অথচ সর্ব্বত্র শান্তি কোমলতা ও মধুরতার অমিয়প্রবাহ! আমরা সেই মধুরতার মধ্যে—নীরবে ঘুমাইয়া রহিয়াছি।

বালার্কের কণককিরণে প্রতিদিন অখিলজগৎ নবজাগরণে জাগিয়া উঠিতেছে, আমরাও স্বীয় স্বীয় স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছি। আবার নিশা সমাগমে অবশদেহে ধরণীবক্ষেঃ গা ঢালিয়া দিয়া—সুপ্তির বিস্মৃতি-গর্ভে হারাইয়া যাইতেছি। ছায়াবাজীর পুতলের ন্যায় যেন কোন এক অদৃশ্য যাদুকরের অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমরা ঘুরিতেছি—ফিরিতেছি—হাসিতেছি—নাচিতেছি, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন অলক্ষ্যে মিশিয়া যাইতেছি। বৈশাখে গগন অন্ধকার করিয়া বজ্রবর্ষী জীমূতকুল বিদ্যুৎময়ী লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করত যখন মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে থাকে, তখন আমরা ভীত ও সঙ্কুচিত হৃদয়ে আমাদের জীর্ণ পর্ণকুঠিরের নিম্নে মস্তক লুক্কায়িত করি। ভূকম্পনের প্রবল তরঙ্গে যখন জগৎসংসার দুলিতে থাকে, তখন আমরা অসহায় পিপীলিকার ন্যায় চারিদিকে প্রাণ ভয়ে ছুটাছুটি করিতে থাকি। কত সময় অলক্ষ্যে প্রকৃতির

একটি মৃদু নিশ্বাসে—আমরা সকল আশাভরসা মায়ামোহ বিসর্জ্জন দিয়া জগতের সকল সম্বন্ধ চিরতরে ছিন্ন করিয়া অনন্তের আঁধার গর্ভে চিরদিনের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হই!

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র অন্ধকার কোণে আমাদের ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলের মৃৎ গোলকটি অনন্ত সমুদ্র বক্ষঃস্থ—ক্ষুদ্র শৈবালবৎ ডুবু ডুবু ভাবে ভাসিতেছে। আমরা মানবজাতি দৃঢ়রূপে তাহা আকড়িয়া ধরিয়া কোনরূপে স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছি। চারিদিকে প্রবল তরঙ্গমালা উন্মত্ত ভাবে সমুত্থিত—আমরা কোটি কোটি প্রাণী নিমেষে নিমেষে তাহাতে ভাসিয়া যাইতেছি—চিরদিনের জন্য ডুবিয়া যাইতেছি। এই অনন্ত বিশাল মহা সমুদ্রে এই যে এক অভিনয় চলিতেছে আমরা ইহার রহস্যাবধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম।

আমরা প্রতিনিয়ত আপন ভাবে মত্ত—আপন স্বার্থের সঙ্কীর্ণ চক্রে ঘূর্ণায়মান। কিন্তু হায় আমাদের উর্দ্ধে অধেঃ চৌদিকে যে—অনন্ত রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার দিকে আমরা কখনই মনোযোগ দেই না—তাহা ভেদ করিতে কখনই চেষ্টিত হই না। সৃষ্টির আদিম কাল হইতে কোটি কোটি মানব আমাদের ন্যায় হাসিয়া কাঁদিয়া এই ধরিত্রীগর্ভে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের কত আশা—কত কামনা—কত তৃষা এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর স্তরে স্তরে বিলীন রহিয়াছে। আমরাও তাহাদের অনুসরণ করিতে ধাবমান হইয়াছি।

যদি আমরা জগতের এই আবিলতা কাটাইয়া একটু উর্দ্ধে মাথা তুলিতে পারি, তাহা হইলে অনন্তের অনন্তচিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। তখন আমরা আমাদের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে চমকিত হই। যদি আমরা জগতের কোলাহল হইতে একটু সরিয়া-গিয়া দূর অনন্তগগন পানে প্রাণ খুলিয়া চাহিতে পারি—প্রকৃতির বিশাল উন্মুক্ত বক্ষেঃ প্রেমব্যাকুলিত চিত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি, তাহা হইলে আমরা সহজেই এই ক্ষুদ্রতার—সঙ্কীর্ণতার নিগড় বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি। যদি আমরা অনন্তের অনন্ত ভাবের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র ভাব টুকু বিকাইয়া দিয়া—আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র অস্তিত্বের ক্লেদপঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারি—তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত মুক্তি লাভ হয়—তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত জগতে প্রবেশ লাভ করিতে পারি। তখনই আমরা প্রকৃত

মানব নামে সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ বা "আশরাফন্‌ মখলুকাত" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হই।

কূপমণ্ডুক চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া আত্মগরিমায় ফুলিয়া উঠিতে পারে কিন্তু তাহার সে গর্ব্বের কোন স্বার্থকতা নাই! সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ মানব জাতি আপনার ক্ষুদ্র জীবনকাল ও সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার সীমা মধ্যে গর্ব্বে মত্ত হইতে পারে কিন্তু অনন্ত কাল ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তাহার সেই অস্তিত্বগৌরব ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে অধিক নহে। যত দিন আমরা এই সমস্ত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেদ করিয়া আপনাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি অনন্তকালস্থায়ী জীব বলিয়া না বুঝিব, যত দিন আমরা 'আমি' বলিতে রক্তমাংসাদি ভৌতিক সম্বন্ধবিচ্যুত তেজোময় প্রেম ও পবিত্রতাময় আধ্যাত্মিক সত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে না শিখিব, যত দিন আমরা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র বিভূষিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পশ্চাতে ফেলিয়া "তৌহিদের"—একত্বের—দূর অদৃশ্য জ্যোতিৰ্ম্ময় গগনে মুক্তপক্ষে উড্ডীয়মান হইতে না জানিব, ততদিন আমরা প্রকৃত মানবত্বের উচ্চগ্রামে কথনই নীত হইতে পারিব না।

যাঁহারা এই অদৃশ্য মহিমাময় মহানভেঃ প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন—আমাদের প্রত্যক্ষদৃশ্য এই অনন্তগগন তাঁহাদের নয়ন সমক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা ইহার বহু উর্দ্ধে কোথায় কি এক অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, কারাভবন স্বর্ণনির্ম্মিত ও বিবিধ সুখের কারণ হইলেও কদাচ তাহা তাঁহাদের প্রার্থনীয় বা আনন্দপ্রদ হইতে পারে না। যাঁহারা এই ভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিয়াছেন—মুক্ত-প্রাণে ভূতভবিষ্যৎ তুচ্ছ করিয়া—ক্ষুদ্রতা নীচতা হীনতা পদদলিত করিয়া অনন্তবক্ষেঃ মুক্তপক্ষে উড্ডীয়মান হইতে পারিয়াছেন—সৃষ্টির স্বরূপত্ব প্রতি-নিয়ত যাঁহাদের নয়ন সমক্ষে বিভাসিত—ভৌতিকতার কোন শৃঙ্খলে তাঁহারা কথনই আবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত নহেন।

মানব জীবনের লক্ষ্য কি? মুক্তি কি? প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট ইহার অন্য কোন উত্তর নাই। যে দিন আমরা আপন অস্তিত্ব হারাইয়া অনন্তের সহিত মিশিয়া যাইব, সেই দিনই আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে—সেই দিনই আমরা প্রকৃত মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইব।

যিনি এই অনস্তিত্বের মর্ম্ম বুঝেন, এই আত্মবিলোপের গভীরতাও অপার

আনন্দে অনুভব করিতে পারেন, শত স্বর্গসুখ তিনি অবজ্ঞাভরে দূর করিতে প্রস্তুত হন এবং আবেগ ভরে বলিয়া উঠেন—

"হর কসে খাহদ কে মানদ দর জহাঁ বাকিও লেক,
এ মযিনি মা ফানা আন্দর ফানা খাহম ও বস।"

"প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে—জগতে স্থায়ী থাকে—কিন্তু,—হে মষীনদ্দীন আমরা—অনস্তিত্বের মধ্যে অনস্তিত্ব কামনা করি!"

প্রিয় ভ্রাতৃগণ, মানব হইয়া—'আশরাফন মখলুকাত' মানব হইয়া ক্ষুদ্র জড়ত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিও না। যে 'আমানত' ভরে পর্ব্বত কম্পিত হইয়াছিল, তাহা মাথায় লইয়া এখন' জলুমী' ও 'জহুলী'র পরিচয় দিও না—অধঃপাতের অনন্ততলে ডুবিও না। ফেরেশ্‌তার উপরে যাহার গৌরব—আধ্যাত্মিক অনন্ত সাম্রাজ্যের যে সম্রাট—সেই জ্ঞানময় মানব হইয়া নিজের দায়িত্ব বুঝিতে উদাসীন থাকিও না। যে অমৃতের এক বিন্দু লাভের জন্য ফেরেশ্‌তাগণ শুক্তির ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে চাহিয়া থাকেন—তাহার সহস্র সমুদ্র যাহাদের জন্য উৎসর্গ করা গিয়াছে সেই মানব হইয়া—পশুত্বের কারাগারে জড়পূজায় নিরত থাকিও না।

"মালায়েক বহরে এক কাৎরা
বেমন্দা চুঁ সদফ তেশ্না,
হাজারাঁ বহরে বে পায়া
নেসারে থাকে আদম সোদ।"

তোমাদের অপেক্ষায়—তোমাদিগকে শুভ আহ্বানের জন্য ঐ সহস্র মহাজন দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহাদের মিষ্ট আহ্বানে কর্ণপাত কর; সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া বিশাল অনন্ত সাম্রাজ্যের দিকে ধাবমান হও। তোমাদের জন্য স্বর্ণপথ উন্মুক্ত হইবে—আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া অগ্রসর হও, দৈত্যের কলুষকথায় কর্ণপাত করিও না—সাবধান হও—সময় থাকিতে জাগ্রত হও!

"আসাসে আলমে বালা বরায়ে তোস্ত ও তু গাফেল।
তু কদরে খোদ নমিদানি—কে দারি মনসবে ওয়ালা।"

"তোমার জন্য আধ্যাত্মিক জগতের ভিত্তি কিন্তু তুমি উদাসীন—তুমি জান না যে তোমার গৌরব অতি উচ্চ।"

শেখ হবিবর রহমান।

রত্ন-চয়ন।

ধর্ম্ম কি ও তাহার মূল কোথায়?

[কাউণ্ট টলষ্টয়ের ইংরাজী অনুবাদ হইতে।]

১

আমাদের সময়ের লোকে কিছুই বিশ্বাস করে না, তবুও 'হিব্রুগণের নিকট লিখিত পত্র' (ভ্রমবশতঃ সেণ্টপলকে ইহার লেখক বলা হয়) হইতে গৃহীত একটি সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়া লোকে মনে করে তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস আছে। এই সংজ্ঞানুসারে ধর্ম্ম-বিশ্বাস হইতেছে 'অভিলসিত দ্রব্যসমূহের সার পদার্থ', 'অদৃশ্য দ্রব্যসমূহের সাক্ষ্য'।' (হিব্রু। ১১শ। ১) এখানে বোধ হয় বলা আবশ্যক হইবে না যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস কোন পদার্থ বিশেষ হইতে পারে না, যেহেতু ইহা মনের একটি ভাব মাত্র, কোন অবয়ব বিশিষ্ট বাস্তব পদার্থ নহে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম-বিশ্বাস 'অদৃশ্য দ্রব্য সমূহের সাক্ষ্য'ও হইতে পারে না, যেহেতু বক্ষ্যমান পত্র খানিতে 'সাক্ষ্য' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িলে জানা যায় যে, তাহা সহজ-বিশ্বাস-প্রবণতা ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু সহজ-বিশ্বাস-প্রবণতা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস এই দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ধর্ম্ম-বিশ্বাস কোন আশাআকাঙ্ক্ষা নহে, কোন সহজবিশ্বাসপ্রবণতাও নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম-বিশ্বাস মানবাত্মার একটি অবস্থা মাত্র। সমস্ত জগতের সহিত তুলনায় মানুষ এরূপ এক গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত যে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য তাহার পালন না করিলে চলে না—এই বিষয়ের উপলব্ধিই মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস। মানুষ স্বীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্মাচার পালন করিয়া চলে। কিন্তু এই ধর্ম্মাচার পালন মানুষ এই জন্য করে না (যেরূপ রুশীয় ধর্ম্ম-সংহিতায় বলা হয়) যে সে দৃশ্য পদার্থ সমূহকে যে ভাবে বিশ্বাস করে, অদৃশ্য পদার্থ সমূহকেও সেইরূপ বিশ্বাস করে, অথবা এই জন্য নহে যে সে তাহার অভীপ্সিত দ্রব্য পাইবার নিশ্চিত আশা মনের ভিতর পোষণ করিয়া এইরূপ করে। কিন্তু একমাত্র এই জন্য যে সমস্ত জগতের সঙ্গে তুলনায় তাহার নির্দ্দিষ্ট আসন হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র স্বভাবতঃই মানুষ উক্ত আসনের উপযুক্ত কার্য্য

না করিয়া পারে না। কৃষক ভূমি কর্ষণ করে এবং নাবিক সমুদ্র পথে পরিভ্রমণ করে : কিন্তু তাহারা উক্ত সংহিতানুযায়ী অদৃশ্য পদার্থে বিশ্বাস বা কার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্তিতে নিশ্চিত আশা মনে পোষণ করিয়াই যে এরূপ করে তাহা নহে (সেরূপ আশা থাকিতে পারে, কিন্তু এই আশা মাত্রই তাহাদিগকে চালিত করে না); পরন্তু এই জন্য করে যে উক্ত কার্য্যকে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য ব্যবসায় বলিয়া মনে করিয়াছে। সেইরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাসী মনুষ্যও কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান এই জন্য সাধন করে না যে সে অদৃশ্য পদার্থে বিশ্বাস করে, বা তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য পুরস্কারের নিশ্চিত আশা করে; কিন্তু এই জন্য যে জগতে মনুষ্যত্বের উচ্চাসন হৃদয়ঙ্গম হওয়ামাত্র স্বভাবতঃই সেই আসনের উপযুক্ত কার্য্যানুষ্ঠান তাহাকে করিতে হয়। যখন কোন মানুষ সমাজের মধ্যে আপনাকে একজন মজুর, শিল্পী, রাজকর্ম্মচারী বা বণিকের পদে অবস্থিত বলিয়া জানিয়াছে, তখনই কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সে বুঝিতে পারিয়াছে; এবং তখন মজুর, শিল্পী, রাজকর্ম্মচারী বা বণিকরূপে সে স্বভাবতঃই স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করে। ঠিক এই রূপেই মানব-সাধারণও পৃথিবীতে স্ব স্ব আসন সম্বন্ধে যে কোন প্রকারে হউক একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা মনের মধ্যে স্থাপিত করিতে পারিলে স্বভাবতঃই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সেই ধারণা অনুযায়ী কাজ করে (এই ধারণা যে সকল সময়েই অতি স্পষ্ট এরূপ নহে; কখনও কখনও ইহা অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট বোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য জগতে ঈশ্বরের মনোনীত জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আপনাকে বুঝিতে পারিয়াছে, এবং ঈশ্বরের শক্তি-সাহায্য অক্ষুণ্ন রূপে ভোগ করিতে হইলে তাহার জাতিকে যে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া চলিতে হইবে, ইহাও যে জানিতে পারিয়াছে, সে ঈশ্বরাদেশ পালন করিয়া চলিবেই। অপর যে ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন লোকে মানবাত্মার পরিভ্রমণের কল্পনা সাহায্যে স্বকীয় আসন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, এবং স্বীয় কর্ম্মফলের উপরেই ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে এইরূপ যে বুঝিয়াছে, সেও তাহার ধারণা অনুসারেই জগতে কার্য্য করিয়া যাইবে। পরিশেষে অপর তৃতীয় ব্যক্তি যে মানব অর্থে ক্ষণিক অচিরস্থায়ী চেতনা বিশিষ্ট দৈবসংযুক্ত কতকগুলি পরমাণু সমষ্টি বলিয়া বুঝিয়াছে তাহার আচরণও পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির অপেক্ষা বিভিন্ন হইবে।

নবীনওয়াজ খান।

বিবাহ-বিপ্লব।
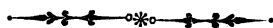
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরেজমিনে তদন্ত।

সুরেন্দ্রবাবুর যশোহরস্থিত বাংলাখানি তেমন বড় না হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাঝে একখানি হলঘর তাহার এক পার্শ্বে একখানি বৈঠক-খানা গৃহ এবং অপর পার্শ্বের গৃহে সুরেন্দ্রবাবু শয়ন করিতেন। সম্মুখে টানা বারান্দায় দুই চারিখানা আরাম-চৌকী পড়িয়াছিল। প্রাচীরে টুপি রাখিবার একটি আল্‌না এবং বাংলার সম্মুখে স্তরে স্তরে ফুল গাছের টব সাজান ছিল। যে গৃহে সুরেন্দ্রবাবু শয়ন করিতেন তাহার পার্শ্ব হইতে খানিকটা জমি ঘিরিয়া বাটীর অন্দর মহলের অঙ্গন করা হইয়াছিল। তাহারই এক প্রান্তে রন্ধন-গৃহ প্রভৃতি কতকগুলা মাটীর কুঠির ছিল। সেই প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে একটি খিড়কি দরজা। খিড়কি হইতে পায়ের দাগের সরু রাস্তা দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে হয়।

যে রাত্রে কন্যা চুরি হয়, সে রাত্রে মুরলা ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভ্যাস মত হলঘরে শুইয়াছিল। বারান্দায় সুরেন্দ্রবাবুর আফিসের একটা চাপরাসী শুইয়া থাকিত। সুরেন্দ্রবাবু স্বয়ং নিজ কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। প্রভাতে শয্যা ছাড়িয়া হলঘরে পুত্রকন্যাকে দেখিতে আসিয়া সুরেন্দ্রবাবু প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন যে মুরলার শয্যাশূন্য। হলঘরের ঈষদুন্মুক্ত দরজা দিয়া গৃহে উষা-লোক প্রবেশ করিতেছিল। পুত্র বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শায়িত। সহদেব চাপরাসী তখনও বারান্দায় শুইয়াছিল। তাঁহার পদশব্দ পাইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসে। কন্যাকে না দেখিতে পাইয়া সুরেন্দ্র বাবু সহদেবকে মুরলার কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে কোন কথা বলিতে পারে নাই।

প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া পশ্চাতের বাগানে মুরলা পুষ্প চয়ন করিতে যাইত। কন্যা ফুল তুলিতে গিয়াছে ভাবিয়া সুরেন্দ্রবাবু তখন আর কোনও অনুসন্ধান না করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন।

পরে তিনি বাহিরে আসিয়াও কন্যার সন্ধান না পাইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন।

স্থানটি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম যে হলঘর হইতে নির্গমনের দুইটি মাত্র পথ। প্রথম পথ সুরেন্দ্রবাবুর শয়ন-কক্ষের ভিতর দিয়া, অপর পথটি বারান্দা দিয়া। যেরূপেই মুরলা অন্তর্ধান হউক তাহাকে বারান্দা দিয়া বাহির হইতে হইয়াছে। বাংলার চতুর্দ্দিক বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলাম। দক্ষিণে ও পশ্চিমে বহুকাল কোনও লোকের বসবাস নাই। পূর্ব্বে ও উত্তরেও ৩০০, ৪০০ ফিটের মধ্যে কোনও গৃহাদি ছিল না। যে বাগানটির উল্লেখ করিয়াছি তাহা সুরেন্দ্রবাবুর বাটীর পশ্চাতে, পশ্চিম দিকে। বাগানটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। বাগানের মধ্যে বেশ একটি সুন্দর স্বচ্ছ-জলপূর্ণ পুষ্করিণী। তাহার চতুর্দ্দিকে পাড়ের উপর নিচু গাছ। সুরেন্দ্রবাবুর বাটীর দিকে কতকগুলা ফুলের গাছ, সেইখানেই প্রাতে মুরলা ফুল তুলিতে যাইত। পুষ্করিণীটি দেখিলে ভয় হয়। তাহার পিতা যখন সে সন্দেহ করেন নাই তখন মুরলা পুকুরে ডুবিয়া গিয়াছে কি না সে কথা উত্থাপন করিয়া আর তাঁহাকে সন্ত্রাসিত করিলাম না। সুরেন্দ্রবাবুর বাটীর পশ্চাতেও একটা ডোবা ছিল। তাহাতে পরিণত বয়স্কা কোনও বালিকার পক্ষে ডুবিয়া যাওয়া অসম্ভব।

সুরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে, অবনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একটি ধনী যুবকই ঐ বাগানের অধিস্বামী।

আমি—অবনীর বয়স কত?

সুরেন্দ্র—২০, ২২ বৎসর হবে। জমিদারের ছেলে, ভোগে থাকে, বেশ সুন্দর লাবণ্যময় চেহারা, দেখিলে প্রায় ২৫ বৎসর বয়স ব'লে বোধ হয়।

আমি—তিনি থাকেন কোথা?

সুরেন্দ্র—সহরে থাকিলে এই উদ্যানবাড়ীতে থাকেন, তাঁহার জমিদারী

[illegible]।

আমি—বিবাহ হইয়াছে?

সুরেন্দ্র—না, বিবাহ হয় নাই। গত বৎসর বি-এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিবাহ করিতে চাহেন না।

আমি—আপনাদের সহিত সদ্ভাব আছে?

সুরেন্দ্র—সদ্ভাব বা অসদ্ভাব কিছুই নাই। তিনিই আমার সহিত পরিচয় করিয়াছিলেন। সাক্ষাত হইলেই বেশ সশ্রদ্ধভাবে নমস্কারাদি করেন।

আমি—আপনার পুত্রের সহিত আলাপ আছে ?

সুরেন্দ্র—তা' বোধ হয় আছে। ভদ্র লোকের খুব মাছ ধরিবার সখ্। আমার ঐ ডোবাটায় বসিয়া প্রায়ই মাছ ধরেন, সে সময় আমার পুত্রকে তাহার পার্শে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

আমি—ডোবায় মাছ ধরেন কেন ? নিজের অত বড় পুকুর রহিয়াছে।

সুরেন্দ্র—খেয়াল। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে আমার পুত্রকে বলিতেন বটে। সে বলিত অবনীবাবু বলেন নিজের পুকুরের মাছ তেমন মিষ্ট নহে।

আমি—স্বভাব চরিত্র কেমন ?

সুরেন্দ্র—আদর্শ। সকল ধনী পুত্রের যদি ওরকম স্বভাব হইত তাহা হইলে বড় সুখের হইত। ঘোড়া চড়িতে, শীকার করিতে এবং খেলিতে বড় পটু।

আমি বলিলাম—"হুঁ"।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—মহাশয় যাহা সন্দেহ করিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। আমার কন্যাটিকে যদি দেখিতেন তো বুঝিতে পারিতেন। সেরূপ লজ্জাশীলা ও মধুর প্রকৃতির বালিকা আজকাল দেখা যায় না। অবনীর সম্মুখে সে বাহির হইত না। আর অবনীও সে প্রকৃতির লোক নন যে একজন গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিবেন।

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম! যে কথার ইঙ্গিতমাত্র পাইয়া তিনি এত উত্তেজিত হইলেন সে কথাটা কত কদর্য্য। তাঁহাকে বুঝাইলাম যে তাঁহার কন্যাকে বা অবনীকে আমি কোনও প্রকার সন্দেহ করি না। অবনীবাবুর নিকট কিরূপ বন্ধুবান্ধব আসে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। জানিলাম অবনীবাবু তখন যশোহরে ছিলেন না। মুরলা অদৃশ্য হইবার দুইদিন পূর্ব্বেই তিনি কাশী চলিয়া গিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রবাবুর পুত্র হরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কিছুই নূতন আলোক পাইতে পারিলাম না। সুরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহার কন্যার কোনও প্রতিমূর্ত্তি আছে কি না।

সুরেন্দ্রবাবু আমার হস্তে একখানি ফটোগ্রাফ দিলেন। ফটো হইতে বুঝিলাম মুরলা সুন্দরী। মুরলার চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত, তাহার মুখের একটা সলজ্জ অথচ বুদ্ধিমত্তার ভাব চিত্রে অবধি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল। তাহার হস্তপদাদি সকলই সুগঠিত ও সুকোমল বলিয়া বোধ হইল। মনে মনে বড় কষ্ট হইল। এমন লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্না কন্যার ভাগ্যে এরূপ বিড়ম্বনা কেন ?

সুরেন্দ্রবাবুর বাসাটি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলাম। ঘরের আসবাব হইতে বুঝিলাম সুরেন্দ্রবাবু একটু সুরাপান করেন। বালিকার ষ্টিলট্রাঙ্কটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার পরিধেয় বস্ত্রালঙ্কারাদি সমস্ত দ্রব্যই ঠিক রহিয়াছে। একটা ভগ্ন কাষ্ঠের বাক্সে কতকগুলা খালি শিশি, কাষ্ঠের কৌটা, পুতুল, ছিন্ন পুস্তক প্রভৃতি ছিল। সে বাক্সটা খুঁজিতে খুঁজিতে একখানা পুস্তকের মধ্যে মোটা চিঠির কাগজে লেখা একখানা পত্র পাইলাম। তখন সুরেন্দ্রবাবু সে স্থলে ছিলেন না। খুঁজিতে খুঁজিতে সেইরূপ পত্র আরও কয়েকখানা পাইলাম। অতি যত্নে সেগুলাকে বুকের পকেটে রাখিয়া বাহিরে সুরেন্দ্রবাবুর নিকট গেলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মুরলা কিরূপ লেখাপড়া জানিত?

সুরেন্দ্র—বেশ সুন্দর লিখিতে পারিত। বাঙ্গালা পুস্তক সমস্তই পড়িতে পারিত। সামান্য ইংরাজীও জানিত।

আমি—তাহার লেখার নমুনা তো বাক্সের মধ্যে পাইলাম না।

সুরেন্দ্র—লেখার নমুনার অভাব কি?

আপনার হিসাবের পুস্তকের পাতা ছিঁড়িয়া সুরেন্দ্রবাবু আমাকে নমুনা দিলেন। আমি লেখার নমুনা ও তাহার চিত্রখানি সযত্নে জামার পকেটে রাখিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—এ চিত্রখানি কত দিনের?

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—এখানি সম্প্রতি তোলা হইয়াছিল। আমার ভাবী বৈবাহিক শীতলপ্রসাদ বাবুর অনুরোধেই এ চিত্রখানি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলাম—আমার এখানকার তদন্ত শেষ হইয়াছে, একবার কেবল আপনার চাপরাসী সহদেবকে গুটিকতক প্রশ্ন করিব।

তিনি বলিলেন—মশায়, ছোটলোক যেন খবরটা না পায় তাহা হইলে বড় বিপদ হইবে।

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম যে এ সংবাদ কেহ জানিবে না। তিনি ভিতরে প্রস্তুত হইতে গেলেন। আমি ইতস্তত দেখিতে দেখিতে তাঁহার টেবিলের উপরস্থিত একখানা পাঁজির ভিতর হইতে এক বিচিত্র অক্ষরে লেখা একখানা কাগজ পাইলাম। সেখানা কোন পত্র হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই কাগজখানা পকেটে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার পর তিনি বাহির হইলে তাঁহার সহিত সহদেব চাপরাসীর বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মক্কেলে সন্দেহ।

আমাদের শয়ন-গৃহে রাত্রে নরেশের সহিত সুরেন্দ্রবাবুর কেস্ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছিলাম। আরাম-চৌকীতে শুইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে মিঃ সেন বলিলেন—যাহাই বল ভাই অবনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গতিকটা বড় ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছেনা। এ কি বাবা! নিজের এত বড় পুকুর রয়েছে দেশে দশ বিশটা বড় বড় দীঘি রয়েছে অথচ ডোবায় ব'সে মাজ ধরে এ ব্যাপারটা তো তেমন সুবিধার নয়। এ বাবা মাছটা অন্য রকমের। শেষে গেঁথে নিয়ে পালিয়েছে।

নরেশের কথার ধরণে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইলাম। অবশ্য আমাকে স্বীকার করিতে হইল যে, সুরেন্দ্রবাবু তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যতই কেন সুখ্যাতি করুন না, মুরলা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রের চাল-চলন গুলা তেমন ভাল বলিয়া বোধ হইল না। অত বড় বড় মাঠ ছাড়িয়া অত সুন্দর সুন্দর রাস্তা ছাড়িয়া যুবক, সুরেন্দ্রবাবুর বাংলার চারিদিকে বা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায় কেন, ডোবার ধারেই বা ছিপ হাতে লইয়া সারাদিন বসিয়া থাকে কেন, আর তার দেশ ছাড়িবার দুই দিন পরেই বা বালিকাটি অদৃশ্য হয় কেন? ঘটনাগুলার মধ্যে বেশ একটা কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। আর তাহার উপর সেই পত্রগুলা বিশেষরূপে অবনীর দোষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। নরেশকে বলিলাম—পত্র সম্বন্ধে তোমার মত কি? পত্রগুলায় কোন পক্ষেরই নাম নাই সুতরাং নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না কে কাহাকে লিখিতেছে। কিন্তু পত্রের ভাষা হইতে এক প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে সেগুলা মুরলার উদ্দেশে লিখিত। যদি হাতের লেখাটা অবনীর হয় তাহা হইলে সন্দেহ তাহার উপর ষোলো আনা হইবারই কথা। কিন্তু অবনীর হাতের লেখা তো আমাদের অজ্ঞাত।

নরেশ বলিল,—অবনীর হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা নিতান্ত অসম্ভব হইবে না। আমার বোধ হয় তাহার হস্তলিখিত কোনও পত্রাদি সংগ্রহ করাই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য।

আমি স্বীকার করিলাম যে অবনীর হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা সম্প্রতি আমার প্রধান কর্ত্তব্য। বড় পুষ্করিণীটার উপর আমার সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু

পুকুরে ডুবিলে এত দিনে নিশ্চয় মুরলার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিত। সুতরাং পর দিন অবনীর হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলাম।

নরেশ বলিল,—ওহে কালকার সেই মাড়োয়ারিটা আজ আবার সকালে আসিয়াছিল। আমায় বলিল,—মহাশয় সকালে তো তদন্ত করিতে বাহির হইলেন না, তবে কেন আমাদের কেসটা লইয়া লাহোর চলুন না।

আমি বলিলাম—তুমি কি বলিলে?

"আমি তাহার নিকট কোনও কথা প্রকাশ করি নাই কেবল বলিলাম অন্য কারণের জন্য কলিকাতায় থাকিতে হইবে, এখন বিদেশ যাইতে পারিব না।"

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল একজন মাড়োয়ারি ও একজন বাঙ্গালী নরেশের সহিত সাক্ষাত করিতে চাহে। মাড়োয়ারিটার উপর আমার প্রথম হইতেই সন্দেহ হইয়াছিল সুতরাং নরেশকে অফিস-গৃহে পাঠাইয়া দিলাম। তাহাকে বলিয়া দিলাম—আমাদের নিজেদের বা সুরেন্দ্রবাবুর কেস সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশ না করিয়া তুমি উহাদের সহিত গল্প করিও আমি লুক্কায়িত ভাবে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিব।

নরেশ আমার কথামত কার্য্য করিল। মাড়োয়ারিটির বয়স আন্দাজ চল্লিশ বৎসর হইবে। মুখে ভদ্রভাবের লেস মাত্র নাই। কেমন একটা স্বার্থলোলুপ অর্থগৃধ্নু পৈশাচিক ভাব তাহার মুখের উপর লেপিত ছিল। বাঙ্গালীটির বয়সও ঐরূপ হইবে। হঠাৎ দেখিলে বেশ শান্ত-ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, মুখের গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের কোন ভাবই বাহিরে প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রকৃত সাধুভাবাপন্ন হইলে এ শ্রেণীর লোক মুহূর্ত্তে লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া মুখের ধীর ভাব অবিচলিত রাখিতে পারে আবার কুস্বভাবাপন্ন হইলে এরূপ লোক অবিকৃত বদনে স্বহস্তে আপনার পিতার গলা কাটিতে পারে। বাহিরের আকৃতি দেখিয়া ইহার মনোভাব অনুমান করা বোধ হয় মহাযোগী মহাদেবেরও অসাধ্য। মাড়োয়ারীটি পরিচয় দিয়াছিল তাহার নাম মেঘরাজ ও তাহার বাঙ্গালী সঙ্গীটির নাম সুবোধবাবু। সুবোধবাবু মেঘরাজের কর্ম্মচারী।

মেঘরাজ বলিল—বাবু, আপনি আমার উদ্ধার করুন। আমাদের মেঘরাজ সুমেরমল নামীয় গদির যথেষ্ট পশার প্রতিপত্তি। একলক্ষ টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে—আর কি দাঁড়াইতে পারি?

নরেশ বলিল—আপনার লাহোরের মুনিব (ম্যানেজার) চুরি করিতেছে একথা আপনাকে কে বলিল?

মেঘরাজ বলিল—চুরি হইতেছে তা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আপনি যদি লাহোরে গিয়া একবার খাতা পত্র দেখেন তো বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কিরূপে চুরি হইতেছে চুরির অংশীদার কে এই সকল বিষয় আপনি সরেজমিনে বসিয়া তদন্ত না করিলে বুঝিতে পারিবেন না।

নরেশ—আমিতো আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলিকাতা ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

এইবার সুবোধ কথা বলিল। সে বলিল—আপনি কি এমন কেস হাতে পাইয়াছেন যে কলিকাতা ছাড়িতে অসম্মত? আপনি অর্থের জন্য ভাবিবেন না আমরা প্রচুর অর্থ দিব।

নরেশ বলিল—আমার মামলা বড় গুরুতর।

সুবোধ বলিল,—আপনার অধিক সময় লাগিবে না। আপনি এক সপ্তাহ বড় বেশী দুই সপ্তাহের মধ্যে আমাদের লাহোরের কাজ শেষ করিয়া আসিতে পারিবেন। আপনার হাতের মামলা কি একটু বিলম্ব হইলে চলিবে না?

নরেশ—না।

সুবোধ—কি কেস? চুরি ডাকাতী না খুন?

নরেশ—চুরি।

মাড়োয়ারী বলিল, কাল যে লোকটা আমি আসিবার পূর্ব্বেই আসিয়াছিল তাহার বুঝি মামলা। একটু আগে আসিলেই আমাদের ভাগ্যটা ফিরিত।

নরেশ হাসিয়া বলিল— আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। যে লোক কাল রাত্রে আসিয়াছিলেন তাঁহার কোনও মামলা নাই। আমার এক বন্ধুর পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবে। উনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তাই একবার সাক্ষাত করিয়া গেলেন। আমার হাতের প্রধান কেসটি জহরত চুরির কেস।

মেঘরাজ সুবোধের মুখের দিকে চাহিল। সুবোধের মুখের ভাবান্তর হইল না।

তাহারা রাম রাম করিয়া পথে বাহির হইলে আমি তাহাদিগের পিছু পিছু চলিতে লাগিলাম। বাটী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে একটা বড় দাড়ি পরিয়া ছদ্মবেশ করিয়া লইয়াছিলাম। লোক দুইটা সোজা হ্যারিসন রোড অবধি হাটিয়া গিয়া একখানি গাড়িতে উঠিয়া বড় বাজারের দিকে চলিল। আমিও একখানা

গাড়িতে উঠিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। তাহারা বড়বাজারের একটি বৃহৎ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি সেই বাটীর নম্বরটা দেখিয়া গৃহে ফিরিলাম।

নরেশ বলিল—কি হে কোথা গিয়েছিলে?

আমি—তোমার মক্কেলদের অনুসরণ করিতে।

নরেশ—কি বুঝিলে?

আমি—তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারি নাই, তাহাদের কথা সত্যও হইতে পারে আবার তাহারা গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরিও করিতে পারে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে আমাদের বড় শক্ত দলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা বোধ হয় বুঝিতেই পারিতেছ।

নরেশের বুদ্ধির প্রশংসা করিলাম, সুরেন্দ্র সম্বন্ধে সে যে কথা বলিয়াছিল তাহা বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা।

পরদিন প্রাতে আমি যশোহরে যাইতে ছিলাম। শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিয়াই দেখি একখানা গাড়ি হইতে সুবোধ অবতরণ করিল। এত শীঘ্র তাহার সাক্ষাৎ পাইবার এরূপ সুযোগ হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। সুবোধ সেকেণ্ড ক্লাস ঘরে গিয়া একখানা টিকিট ক্রয় করিল। সকাল বেলা খুলনার ট্রেণে সে দিন তেমন ভিড় ছিল না। সুবোধ টিকিট ঘর ত্যাগ করিবামাত্রই আমি টিকিট ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয় ঠিক আমার পূর্ব্বের ব্যক্তিটি কোন স্থলের টিকিট কিনিলেন?

টিকিট বাবুটি বলিলেন—যশোহরের।

আমিও একখানি যশোহরের টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বলা বাহুল্য আমি সুবোধের সহিত একই কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালী আরোহীদিগের মধ্যে যেরূপ শীঘ্রই ঘনিষ্ঠতা হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে তত শীঘ্র হয় না। কিন্তু একাধিক বাঙ্গালী একত্রে থাকিলে তাহাদিগের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেই হইবে। আমি দেখিয়াছি বোম্বাই হইতে কলিকাতা অবধি দুইজন অপরিচিত ইংরাজ একত্রে এক গাড়ীতে আসিয়াছে অথচ পরস্পরের সহিত একটিও কথা কহে নাই। কিন্তু কলিকাতা হইতে কোন্নগর অবধি একত্রে গমন করিয়াছে অথচ পরস্পর পরস্পরের সহিত কথা কহে নাই এমন দুইজন বাঙ্গালী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সুতরাং চিরন্তন প্রথা অনুসারে দমদমা পৌছিয়াই সুবোধের হস্তস্থিত খবরের

কাগজের একখণ্ড পড়িতে চাহিলাম। সুবোধও একটু হাসিয়া সমস্ত কাগজ খানি আমার হস্তে দিল।

আমি বলিলাম—না, না, সে কি কথা আপনিও পড়ুন।

সুবোধ বলিল—পাঠের উপযুক্ত বিষয় কিছু নাই। আমাদের খবরের কাগজগুলা বড় এক ঘেঁয়ে।

আমি ঠকিলাম। কাগজখানা মুখের নিকট ধরিয়া দমদমা ক্যাণ্টনমেণ্ট অবধি গেলাম। দমদমা ছাড়িয়া বলিলাম—হ্যাঁ কিছু নাই। সিগারেট্ খাইবেন?

আমার সিগারেট কেস হইতে সুবোধ একটি সিগারেট তুলিয়া লইল আমি বলিলাম—এ লাইনের গাড়ি বড় আস্তে যায়। আপনি কত দূর যাবেন?

সুবোধ বলিল, সে যশোহর অবধি যাইবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আমি কত দূর যাইব; অগত্যা আমাকে বলিতে হইল যশোহর যাইব।

তিনি বলিলেন—আপনি কি যশোহরে থাকেন;

আমি—না তবে যাওয়া আসা আছে।

তিনি বলিলেন—তেজপাল মতিচাঁদের গদি জানেন?

আমাকে অগত্যা বলিতে হইল যে আমি সে গদি চিনি না।

তিনি বলিলেন—তাঁহাদের গদির একটা হুণ্ডি লইয়া আমাদের সহিত গোল হইয়াছে। কাজেই একবার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি।

আমি বলিলাম—মহাশয় কি ব্যবসাদার?

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ আমি মেঘরাজ স্থমেরমলের ম্যানেজার।

ক্রমশঃ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

রত্ন-চয়ন।

পুণ্য কথা।

(হজ্‌রত মোহম্মদের জীবনের ঘটনাবলী।)

(২৬)

শোক দুঃখ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় ফুলের মত কোমল ছিল। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম অতি শৈশবে ইহলীলা সাঙ্গ করেন।

জনকজননীর বুকভরা স্নেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। যখন তাঁহাকে কবরে শায়িত করিতে ছিলেন, তখন হজরতের চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করিতে ছিল। তিনি বলিলেন "নয়ন অশ্রু পূর্ণ—হৃদয় শোক পূর্ণ, তবুও আমি আমার প্রতিপালকের যাহা অভিপ্রেত তাহাই করিতেছি। হে ইব্রাহিম সত্যই তোমার জন্য শোক পাইয়াছি।"

(২৭)

জয়নবের কন্যা—হজরতের এক দৌহিত্রী মুমূর্ষ দশাপন্ন। হজরত তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। সেই সময় হজরতের করুণ নয়ন জলে ভরিয়া আসিল, সা'দ নিবেদন করিল "হে আল্লার রসুল এ কি?" তিনি বলিলেন, "ইহা কারুণ্য যাহা আল্লা আপনার সেবকগণের হৃদয়ে প্রদান করিয়াছেন। যাঁহাদের হৃদয় সদয় আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর সদয়।"

(২৮)

মহদ্ব্যক্তি কালপ্রসূত নহেন। তাঁহারা কালাতীত। হজরতের পুত্র ইব্রাহিমের যে দিন মৃত্যু হয়, সে দিন গ্রহণ হইল। লোকে বলিল, ইব্রাহিমের মরণে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছে। হজরত বলিলেন, "কাহারও মরণ বাঁচনের সহিত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের কি সম্পর্ক?"

(২৯)

এক ব্যক্তি হজরত মোহম্মদের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রতাপ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ভয় কি? আমি বাদশাহ নহি। আমি কোরেশ বংশের এমন এক দুঃখিনী স্ত্রীর সন্তান, যিনি শুষ্ক মাংস খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন।"

(৩০)

হজরত প্রায়ই খর্জুর পাতার চেটায়ের উপর শুইতেন। একদিন তাঁহার শরীরে চেটায়ের দাগ দেখিয়া এবনে মস্উদ বলিলেন, "হে আল্লার প্রেরিত, আপনি আজ্ঞা করিলে বিছানা বিছাইয়া দিতাম কিংবা অন্য কিছু করিতাম।" হজরত বলিলেন, "সংসারের সহিত আমার কি? আমি এবং সংসার—যেমন কোন অশ্বারোহী কোন বৃক্ষতলে ছায়ায় দাঁড়াইল, পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল—এ বৈ নহে।"

(৩১)

মহাত্মা আবু হোরায়রা একদল লোকের নিকট যাইতে ছিলেন। তাহাদের

সম্মুখে ভর্জ্জিত ছাগমাংস রক্ষিত ছিল। তাহারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। তিনি আহার করিতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, "নবী—তাঁহার উপর আল্লার আশীর্ব্বাদ ও শান্তি হউক—পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু উদর পূর্ণ করিয়া যবের রুটি খাইতে পান নাই।" ভোজন-বিলাসী মুসলমান একবার চিন্তা কর!

(৩২)

মহাত্মা আবুতল্‌হা আনসারী হজরতের নিকট আসিয়া ক্ষুধা সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন এবং বস্ত্র অপসারিত করিয়া উদরের উপর একটি পাথর বাঁধা দেখাইলেন। তখন হজরত আপন পেট খুলিয়া দুইটি পাথর দেখাইলেন।

(৩৩)

ওস্‌মান বিন মত'উন নামক শিষ্য দেহত্যাগ করিলে হজরত তাঁহার উপর চুম্বন করিলেন। তাহা দেখিয়া এক স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল 'উহার পরলোকে মঙ্গল হইবে।' হজরত বলিলেন, "আল্লাই জানেন আমি জানি না—যদিও আমি আল্লার প্রেরিত—আমার কি হইবে জানি না তোমাদের বা কি হইবে।"

(৩৪)

হজরত শিষ্যগণের সহিত মদিনার মস্‌জিদে বসিয়া আছেন, এমন সময় মুস্'আব বিন্ ওমায়র সেখানে আসিলেন। তাঁহার শরীরে শতছিন্ন চাদর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। হজরত তাঁহাকে দেখিয়া, পূর্ব্বে মুস'আব কি সম্পদে ছিলেন আর আজ কি দুরবস্থায় পড়িয়াছেন মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে বলিলেন, "তখন কেমন হইবে, যখন তোমরা সকালে এক বস্ত্র এবং সন্ধ্যায় আর এক বস্ত্র পরিধান করিবে, যখন তোমাদের সম্মুখে এক থালা রাখা হইবে এবং আর এক থালা উঠান হইবে এবং কাবাগৃহের ন্যায় তোমাদের ঘরে ঝালর ও পর্দ্দা ঝুলিবে।" লোকেরা বলিল, "হে আল্লার রসুল, সে দিন আমরা আজিকার হইতে ভাল হইব, উপাসনার জন্য অবসর পাইব এবং কষ্ট হইতে বাঁচিয়া যাইব।" হজরত বলিলেন, "না, আজ তোমার সেই দিন হইতে ভাল।"

(৩৫)

হজরত স্বীয় দৌহিত্র হাসনকে চুম্বন করিতেছিলেন। তখন তথায় আক্‌রা বিন্ হাবেস উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাহাদের কাহাকেও চুম্বন করি নাই।' হজরত আক্‌রার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "যে দয়া করে না—সে দয়া পায় না।"

(৩৬)

এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়। সে বাতাসকে শাপ দিতে লাগিল। তখন হজরত বলিলেন "উহাকে শাপ দিও না; কেননা উহা আজ্ঞাধীন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি এমন কাহাকেও শাপ দেয় যে তাহার উপযুক্ত নয়, তাহার উপর তাহার শাপ উল্‌টিয়া আসে।"

(৩৭)

দুই ব্যক্তি আসিয়া জোহর ও আসরের নমাজ পড়িল এবং তাহারা রোজাও রাখিয়াছিল। যখন হজরত আপন নমাজ শেষ করিলেন, তখন তিনি তাহা-দিগকে বলিলেন "তোমরা আপন ওজু ও নমাজ ফিরিয়া কর। অদ্য রোজাপূর্ণ কর, কল্য ভাঙ্গিয়া ফেলিও।" তাহারা বলিল,—কেন—হে আল্লার রসুল? তিনি বলিলেন, "তোমরা পর নিন্দা করিয়াছ।"

(৩৮)

কেহ আসিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে আল্লার রসুল, কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত?" তিনি বলিলেন, "তোমার মা।" সে বলিল তাহার পর কে, তিনি বলিলেন "তোমার মা।" সে বলিল তাহার পর কে, তিনি বলিলেন "তোমার মা" সে বলিল তাহার পর কে, তিনি বলিলেন "তোমার বাপ"।

(৩৯)

হজরত ওজু করিলেন। তাঁহার ওজুর অবশিষ্ট জল লইয়া শিষ্যগণ মুখে মাখিতে লাগিলেন। হজরত বলিলেন, "ইহা কিসের জন্য? তাঁহারা বলিলেন, "আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের ভালবাসার জন্য।" তখন হজরত বলিলেন, যে ইচ্ছাকরে যে আল্লাকে ও তাঁহার রসুলকে ভালবাসে কিংবা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল তাহাকে ভালবাসে, সে যেন যখন কথা বলে—সত্য বলে, যখন কেহ তাহার কাছে কিছু গচ্ছিত রাখে, যেন ফিরাইয়া দেয় এবং যে তাহার প্রতিবেশী তাহার উপকার করে।

(৪০)

এক বিবাহে হজরত উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকারা বরপাত্রদের পূজ্যপুরুষগণের গৌরবকাহিনী গাহিতে ছিল। তাহারা গাহিল, "আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন, যিনি কল্যকার কথা আজ বলিয়া দেন।" হজরত বলিলেন, "এমন বলিও না, যাহা তোমরা বলিতে ছিলে তাহাই বলিতে থাক।"

শহীদ।

কবিতা-গুচ্ছ।

সাদি।

পারস্য-কাননে তুমি যে গীত গাহিলে,
হে 'বুল-বুল'! সুরে তার জগৎ মাতিল;
সঙ্গীত-ঝঙ্কার কভু প্রেমের হিল্লোলে,
কভু বা ধরমে মর্ম্মে বাজিতে লাগিল।
যে বাঁশরী করে ধরি মধুর নিক্কণে
করুণ সঙ্গীতরসে ভাসালে ধরায়,
সাধের সে প্রকৃতির বাঁশরী এক্ষণে
আর কি পাইব পুনঃ জীবন বেলায়?
কবিতা-কুসুমোদ্যানে তুমি মধুকর,
মধুচক্র নানা ছাঁদে করিলে রচনা;
সে মধুর স্নিগ্ধরস কত তৃপ্তিকর,
বারেক করিলে পান কেহ ভুলিবে না।
পারস্যের যে কাননে গাহিলে বসিয়া,
কুসুম বল্লরী তা'র হের দিন দিন—
তোমার অভাবে আজি গিয়াছে শুকিয়া;
হেরিলে বদন কা'র না হয় মলিন?
হে পারস্য-কাননের গায়ক প্রধান!
হে ধরম্ম-ভুবনের প্রেমিক অতুল!
তোমার সদৃশ কেহ আর কি এখন
আসিবে জগতে?—অহো কি ধারণা ভুল!

সেখ্ মনস্থর আলি।

তৃষিতা।

তোমারি নীল গগনে বসিয়া
হাসিছ বিজলী হাসি,
রবির কিরণে, জোছনার ধারে,
সবাতে রয়েছ মিশি।
মেদুর মলয় তোমারি পরশ
দিয়ে যায় প্রাণ মাঝে,
প্রতিদিন তুমি দেখা দিয়ে যাও
নবীন মোহন সাজে।
অণু পরমাণু সবারি মাঝারে
রয়েছ গো অতি গোপনে,
মোর তৃষিত পরাণ, অন্ধ নয়ন,
দেখেনি কখন জীবনে।
মোর ক্ষুদ্র হৃদয়ে—গোপনে আগারে,
সেথায় তোমার জ্যোতি,
অজ্ঞাতে মোর, দিবস যামিনী
বিতরে উজ্জল ভাতি।
আমি কেন গো তোমারে পারিনা ডাকিতে
আকুল আবেগ ভরে,
আমি কেন গো পারিনা তুচ্ছ জীবন
সঁপিতে তোমারি তরে।
মহান উচ্চে উঠিবার তরে
দাও গো শকতি হৃদয়ে,
পবিত্র কর অন্তর মম
পাপের পঙ্কে মুছায়ে।
মোর, তাপিত হৃদয় মাগিছে স্মরণ
তোমার শীতল চরণে,
কর, সার্থক তব তাপহারী নাম
তৃষিতার তৃষা হরণে।

শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবী।

ঈশাসন

স্বর্গে সিংহাসন রয়েছে বিভুর
সকলের মুখে শুনিতে পাই
তবে কি মরতে নাহি সিংহাসন
বসিবার তাঁর নাহিক ঠাঁই ?

রয়েছে নিশ্চয়, এই মর্ত্তধামে
পূত সিংহাসন রয়েছে তাঁর,
জ্ঞান আঁখি তব কর উন্মীলন
পাইবে দেখিতে আসন তাঁর।

বিশ্বকর্ত্তা বটে বিশ্বেশ্বর সত্য
বিরাট বিস্তৃত আসন নয়,
সমস্যার কথা, কিন্তু সত্য অতি
ক্ষুদ্র সিংহাসনে আসীন রয়।

অই যে দেখিছ প্রফুল্ল কুসুম
নয়ন রঞ্জন মানস লোভা,
সুবাস বিতরি মোহিছে জগত
প্রকটিছে কিবা ত্রিদিব শোভা !

স্নিগ্ধমনোহর স্বরগের কণা
নিষ্কলঙ্ক ফুল সামান্য অতি,
পবিত্রতা মাখা—অই ক্ষুদ্র ফুলে
বিরাজ করেন অখিল পতি।

সুকুমার শিশু, সদানন্দ চিত
অমিয় ঝরিছে হাসিতে যার,
দিব্য জ্যোতি ভরা, কান্তি মনোহর
আধ ভাষে ক্ষরে অমৃত ধার।

পবিত্র সরল হৃদয় উহার
শুদ্ধ নিরমল নাহি তুলনা,
কলুষ বিহীন আনন্দের খনি
মরতে যেন রে স্বরগ কণা।

অই ক্ষুদ্র হৃদে, অই পূতাসনে
সানন্দে বসেন ধরণীশ্বর,
মানস নয়নে নেহার বারেক
কি শোভে বিরাট ক্ষুদ্রের' পর !

পুনঃ দেখ চেয়ে ভক্ত একজন
আরাধিছে ঈশে পরাণ ভরি,
ত্যজেছে সংসার, ভুলেছে সকলি
মায়া মোহ পাশ ছেদন করি।

অন্তর উহার বিশুদ্ধ বিমল,
পাপকালিমার নাহিক চিন,
উদার সরল ভক্তি বিমণ্ডিত
বিশ্বপ্রেমে ভরা কামনা হীন।

ক্ষুদ্র ভক্ত হৃদে ভকত বৎসল
অধিষ্ঠান কভু করেন সুখে,
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বিরাট ভবেশ,
বিরাজেন হের ভকতি চখে।

মানবের গড়া বিশাল মন্দিরে
লীলাময় বিভু আসীন ন'ন,
স্বকর রচিত পূত ক্ষুদ্রাসনে
দেখরে সতত বিরাজ রন।

ও, আলি

পূর্ণ-কাম।

কি বলে আনন্দ তোমা করিব জ্ঞাপন
অয়ি লক্ষ্মী, অয়ি দেবী আনন্দরূপিণী,
জন্ম-জন্মান্তের মোর জীবন-সঙ্গিনী,—
কল্যাণী প্রেয়সী মোর? উষায় যখন
তুমি এলে পুষ্পময়ী উষারাণী বেশে,
অফুরন্ত প্রেমে তব মোর মর্ম্ম-দেশে
নব প্রাণ সঞ্চারিয়া, বুঝিনু তখন
আমারি আমারি তুমি! হইল সফল
জীবন-তপস্যা মোর, চরণ-কমল
পূজিনু সমর্পি মোর সমগ্র জীবন!
আশ্বাস লভিনু চির, সে যে মহাদান,
প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! আশা ভরে
আজি হতে চেয়ে রব কবে চিরতরে
পার্থিব-বিচ্ছেদ-নিশা হবে অবসান!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ইস্লাম কাহিনী।—শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ৫৬, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য এক টাকা। রামপ্রাণ বাবুর 'মোগলবংশ' পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলাম। আজ তাঁহার 'ইস্লাম-কাহিনী' পড়িয়া ঋণী হইলাম। তিনি যেরূপ সমবেদনার সহিত মোস্লেম ইতিহাসের আলোচনা করেন এরূপ যে আর কেহই করেন না, ইহা আমরা দ্বিধাশূন্য ভাবে বলিতে পারি। তিনি সমালোচ্য গ্রন্থখানি 'বঙ্গীয় মোস্লেম ভ্রাতৃবৃন্দকে সদ্ভাবের নিদর্শন স্বরূপ উপহার প্রদান' করিয়া তাঁহাদিগকে, চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আজ এই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ—বিপ্লবের যুগে মুসলমানের প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধার ভাব —সহানুভূতির ভাব, শিক্ষিত মুসলমানের হৃদয়কে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি ভক্তিমান করিবে। যাঁহারা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পবিত্র জীবন-কাহিনী, খোলাফায়ে রাশেদিনগণের শাসননীতি এবং সারাসানিক্ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ হৃদয়স্পর্শী এবং সমবেদনা পূর্ণ ভাষায় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রামপ্রাণ বাবুর 'ইস্লাম

কাহিনী' পাঠ করুন। কি কারণে একদিন মুসলমান জাতি বিদ্যায় বৈভবে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল এবং কি কারণেই বা তাহাদের পতন হইয়াছে, পাঠকগণ এই গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাইবেন। অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে অতি দক্ষতার সহিতই তিনি এক বিপুল ইতিহাসের বর্ণিত বিষয় গুছাইয়া, মনোজ্ঞ করিয়া বলিতে পারিয়াছেন।

পাঠান রাজবৃত্ত।—শ্রীযুক্ত রামপ্রণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। রামপ্রাণ বাবু এই গ্রন্থে সুলতান মাহ্‌মুদ হইতে আরম্ভ করিয়া বাবর কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ বিজয় পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার একটা সংযত ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাসের উপযোগী ভাষায়ই তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে যখন জেতৃ ভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জ্ঞানবলকে উপেক্ষা করিয়া বাহুবলেরই সাধনা করিয়াছিলেন। এবং সে সাধনায় যে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা জ্ঞানবলকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহারা জ্ঞানের দিক দিয়া ভারতবর্ষে এত অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। যে জ্ঞান-পিপাসা সারাসানদিগকে জগতে অক্ষয়কীর্ত্তিস্থাপনে সক্ষম করিয়াছিল, ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়ে সম্ভবতঃ মুসলমান-গণ তাহা পশ্চাতে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিলেন, অথবা বর্ণসঙ্কটের ফলে সারাসানদিগের সে পিপাসা তাঁহারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন না। তাহা হইলেও, আজ মুসলমানদিগের মধ্যে জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত হইতেছে দেখিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। কি 'মোগলবংশ' কি 'পাঠান রাজবৃত্ত' কি 'ইস্‌লাম কাহিনী' যাহাই পাঠ করি, তাহাতেই মুসলমানের পতনের মূল কারণ একটি মাত্র দেখিতে পাই, তাহা গৃহ-কলহ। আজও সেই গৃহকলহই মুসলমানের উন্নতির পরিপন্থি। ইহা বিধাতার অভিশাপ কিনা জানি না! সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে রামপ্রাণ বাবুকে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে অনেক অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা করিতে হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি মুসলমানের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হন নাই, এবং কোন স্থানেই তাঁহার ভাষা বা ভাব বিদ্বেষদুষ্ট নহে। রামপ্রাণ বাবুর ইহা বিশেষত্ব, এবং এই জন্যই মুসলমানগণ রামপ্রাণ বাবুকে ভালবাসিয়া থাকেন। রামপ্রাণ বাবু কোন কোন মুসলমান নাম ঠিক করিয়া লিখিতে পারেন নাই, আশাকরি পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি তাহা শুদ্ধভাবে লিখিবেন। মুসলমানগণ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১২।১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[নব পর্য্যায়]

২য় বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩২২। [৮ম সংখ্যা।

বঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গ সাহিত্য-চর্চ্চা।

বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি সর্ব্বপ্রধান জাতি। এই দুই জাতির একত্র সমবায়ে বিশাল বাঙ্গালী জাতি গঠিত। উভয় জাতির মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্য অভিন্ন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর সহোদরের ন্যায় একই দেশে বাস করেন এবং একই রূপ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি একই সূত্রে গ্রথিত। তাই এই দুই জাতির একতা ও উন্নতির উপর সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির সর্ব্বপ্রধান সহায়। এজন্য মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনে আমাদের সর্ব্বাগ্রে অবহিত ও চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। হিন্দুগণ অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সাধনার সহিত সাহিত্য-চর্চ্চায় নিরত হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সমাজেরও প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া লইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ বঙ্গীয় মুসলমানেরা অদ্যাপি মাতৃভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। তাঁহাদের এরূপ উদাসীনতার ফল কিরূপ বিষময় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা ভাবিলে এই সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে একান্ত নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে।

বঙ্গ সাহিত্যের ভিতর দিয়া হিন্দুগণ আপনাদের সমাজ-শরীরে যে জীবনী শক্তি ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রভাবে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে

চৈতন্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু সমাজে এই যে নবজীবনের অরুণ-রেখা দেখা দিয়াছে, তাহার মূলে বঙ্গ সাহিত্যেরই অন্তর্নিহিত শক্তি কার্য্যকরী রহিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলি লোক মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার না করিয়া আরব্য-পারস্য-উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার একতমকে জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন। তাঁহাদের এরূপ কার্য্য যে পাগলের প্রলাপোক্তির ন্যায় নিতান্ত অসার, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। একটা জীবন্ত মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ না করিয়া আরব্য পারস্যের মত মৃতভাষাকে বা উর্দ্দুর মত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটা ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ ও প্রচলন করিবার চেষ্টা শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র! এতদ্বিষয়ে এখানে অনর্থক বাগ্বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে আমরা ইচ্ছা করি না। আমরা জানি, বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন বাঙ্গালী মুসলমানদের অন্য মাতৃভাষা নাই। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার এই অভাবনীয় উন্নতি ও প্রসার, তাহা একমাত্র হিন্দু সাধনারই অমৃতময় ফল। কিন্তু তাহা হইলেও বঙ্গভাষার এই উন্নতি যে নিতান্তই ঐকদেশিক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যম ব্যতীত বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব। বর্ত্তমান বঙ্গভাষা প্রায় সর্ব্বাংশে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহা বাঞ্ছনীয় না হইলেও একান্ত স্বাভাবিক। হিন্দুরাই অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে ইহাকে এমন উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদেরই প্রতিভা বলে বাঙ্গালা ভাষা আজ পৃথিবীর একতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত হইতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গভাষার হিন্দুভাবাপন্নতার জন্য হিন্দুগণকে কিছুতেই দোষী করা যায় না,—মুসলমানের নিশ্চেষ্টতাই তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। প্রাচীনকালে মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষাকে নিজের ভাষা মনে করিয়া উহার উন্নতি বিধানে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা যদি অভগ্ন প্রবাহে চলিয়া আসিত, আজ বাঙ্গালা ভাষা হইতে নিশ্চয়ই এমন হিন্দু হিন্দু গন্ধ অনুভূত হইত না। মুসলমানেরা যদি তাঁহাদের মহাযশাঃ পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে মহার্হ রত্ন সকল বাঙ্গালা ভাষায় উপহার দিতে কুণ্ঠিত না হইতেন, আজ বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদেরও নিজস্ব ভাষা হইয়া দাঁড়াইত এবং উহাকে তাঁহারা হিন্দুর ভাষা বলিয়া পরিহার করিবার কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না। মুসলমানেরা সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে এখনও সে অভাব সহজেই পূরণ হইতে পারে। তাহাতে শুধু বঙ্গভাষা শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্না হইবে এমন নহে, তাঁহাদেরও প্রভূত কল্যাণ

সাধিত হইবে। ইহাতে হিন্দু সমাজের সহিত ভাব-বিনিময় হইয়া হিন্দুমুসলমান পরস্পর আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। হিন্দুর সহিত মিলন ভিন্ন মুসলমানদের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। একই দেশে বাস করিয়া দুইটি সহোদর সমাজ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হউক, ইহা কদাপি জগৎপিতার অভিপ্রেত নহে। এরূপ বিরোধ-ভাব যেমন বিসদৃশ, তেমন প্রভূত অমঙ্গলের হেতুভূতও বটে। হিন্দুসমাজ মুসলমানের গুণ গৌরব প্রভৃতি বিষয়ে অদ্যাপি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনভিজ্ঞ বলিয়াই তাঁহারা মুসলমানদের সম্বন্ধে নানা বিসদৃশী ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সে অজ্ঞতা ও ধারণা যাহাতে দূরীভূত হয়, তাহার চেষ্টা করা মুসলমানদেরই কর্ত্তব্য। হিন্দুর সাধনায় হিন্দু সাহিত্য, এবং মুসলমানের চেষ্টায় মুসলমান সাহিত্য—এই দুই শাখার সম্মিলনে বঙ্গসাহিত্য এক বিরাট কলেবর ধারণ করিবে ও বিপুল শক্তিশালিনী হইবে। হিন্দু সাহিত্য, হইতে হিন্দুগণকে এবং মুসলমান সাহিত্য হইতে মুসলমানগণকে চিনিবার সুবিধা হইলে উভয় সমাজের মধ্যগত বর্ত্তমান বিপুল ব্যবধান আপনা আপনি সঙ্কীর্ণ ও তিরোহিত হইয়া যাইবে, তাহাতে পরস্পরের মধ্যে চিরস্থায়ী সম্প্রীতি ও একতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। বাঙ্গালীর জাতীয়তা গঠনে ইহা অপেক্ষা সহজ পন্থা আর হইতে পারে না।

মুসলমানের উদাসীনতার ফলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য একবারে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, আগেই বলিয়াছি। তাহার ফলে আরও একটা কুফল ফলিয়াছে। মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন, হিন্দুগণ বঙ্গসাহিত্যকে মুসলমান বিদ্বেষ ও গ্লানিতে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন সুতরাং ঐরূপ সাহিত্য তাঁহাদের পঠনীয় নহে। বাস্তবিক ঐরূপ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ও গ্লানি আছে সত্য কিন্তু সেজন্য প্রধানতঃ মুসলমানেরাই দোষী। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুগণের অজ্ঞতা একান্ত স্বাভাবিক। সে অজ্ঞতা দূর করিবার পক্ষে মুসলমান সমাজ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই হয় নাই। মুসলমানদের ইতিহাস ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহা হিন্দুগণের অনধিগম্য। দুরভিসন্ধি প্রণোদিত বৈদেশিকগণের বিদ্বিষ্ট লেখনীর অনুসরণ করিতে গিয়াই অধিকাংশ স্থলে হিন্দুগণকে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ভাব উদ্গীরণ করিতে হইয়াছে। যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও ইতিহাসাদি বঙ্গভাষায় বঙ্গভারতীর কণ্ঠে পরাইয়া দিতেন, তবে হিন্দু লেখনীর গতি নিশ্চয়ই বিভিন্ন মুখিনী হইত, একথা আমরা

অসঙ্কোচে বলিতে পারি। মুসলমানগণ বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চায় নিরত থাকিলে বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে কখনই এরূপ অনুযোগের অবসর ঘটিত না, তাহাতে হিন্দু-লেখকগণও এরূপ অসংযতভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনে সাহসী হইতেন না।

একথা সর্ব্ববাদি সম্মত যে, মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। ইহা বুঝিতে পারিয়াই হিন্দুগণ সাহিত্যালোচনার ভিতর দিয়া জাতীয় উন্নতির সৌধ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলমানেরা এই সহজ সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আজও যে তিমিরে সেই তিমিরে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না, মাতৃভাষার অনুশীলনে উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আপনার মস্তকে আপনি কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় জীবনতরীর দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া থাকে। মাতৃস্তন হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শিশুর দেহ যেমন পুষ্টিলাভ করে, মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্য হইতে রস গ্রহণ করিয়া তেমন সমাজ দেহও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। জাতীয় সাহিত্যই সমাজকে উচ্চ আদর্শের দিকে লইয়া যায়। জাতীয় সাহিত্যের প্রতি নিস্পৃহতা বশতঃ সাহিত্য হইতে রস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ক্রমশঃ নিস্তেজ ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে তাহা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পাইবেন। অধুনা মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ইংরেজীতে শিক্ষিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চউপাধি লইয়া বাহির হইতেছেন বটে, কিন্তু স্বীয় সমাজের অন্ধকার কক্ষে আলোক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি তন্মধ্যে অত্যল্প লোকের হৃদয়েই সঞ্জাত হইতে দেখা যায়। ইংরেজী বিদ্যা গলাধঃকরণ করিয়া তাঁহাদের অনেকে ইংরেজ সাজিয়া যান; আবার কেহ কেহ বা বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী হওয়াকে যেন অপমানসূচক মনে করিয়াই উর্দ্দু বোলচাল অভ্যাস করিয়া বসেন। ইহার ফলে তাঁহারা স্বীয় সমাজের ক্রোড়চ্যুত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে তাঁহারাও সমাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হন। শুধু দুই চারি জন শিক্ষিত লোক লইয়া কিছু সমাজ বা জাতি হয় না। চন্দ্রসূর্য্যের আলোক যদি জগদ্ব্যাপী না হইত, তবে তাহাদের এত মাহাত্ম্য হইত কি না সন্দেহের বিষয়। উচ্চ গুণের অধিকারী হইয়াও যদি সমাজের অন্ধকাররাশি দূরীকরণে সহায় হইতে না পারিলাম, তবে আমাদের অত গুণজ্ঞানের কোন সার্থকতা থাকে না।

আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অত্যল্প লোকেরই সমাজের হিতাহিতের প্রতি প্রকৃত সুদৃষ্টি থাকে। ইহার প্রধান কারণ, ইংরেজীতে তাঁহারা সেরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন না। অবশ্য হাল ফেসানের নানা সমিতিতে অনেক উচ্চশিক্ষিতের সমাজহিতৈষিতা ফুটিয়া উঠে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সমাজহিতৈষিতা নহে,—আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনের একটা ফন্দি মাত্র। হাজার শ্রেষ্ঠ হউক, ইংরেজী একটা বিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাষা। তৎসাহায্যে আর যাহাই করা যাউক না কেন, সমাজের স্তরে স্তরে—অণুতে পরমাণুতে প্রবাহ ও অনুভূতি সৃষ্টি কদাপি সম্ভবপর নহে। আমাদের উচ্চ শিক্ষিতেরা মাতৃভাষার প্রতি দণ্ডরস্তার ব্যবস্থা করিয়া শুধু সমাজকে প্রবঞ্চিত করিতেছেন এমন নয়, আপনারাও প্রবঞ্চিত হইতেছেন। তাঁহাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, তাঁহাদিগকেই আলোক-বর্ত্তিকা করিয়া,—তাঁহাদিগকেই ধ্রুবতারা জ্ঞানে তাঁহাদের দুর্গত সমাজ ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পাড়ি যোগাইতে ধাবিত হইতেছে! তাঁহারা যদি আপনাদের আলোক দিয়া—হাতে ধরিয়া সমাজকে সুপথে পরিচালিত না করেন, তবে এ সমাজের বাঁচিবার আশা কোথায়?

জাতীয় সাহিত্যের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইয়া কর্ণধারবিহীন তরীর ন্যায় বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ উচ্চ আদর্শ-হারা হইয়া পড়িয়াছেন। এ সমাজে কোন উচ্চ জাতীয় আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। সমাজকে জাতীয় সাহিত্য হইতেই জাতীয় আদর্শ খুঁজিয়া লইতে হয়। সত্য বটে বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানদের উপযোগী জাতীয় আদর্শ মিলে না। ইহার জন্য বঙ্গসাহিত্য দোষী নয়,—মুসলমানের আলস্য ও অবহেলাই তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। বঙ্গীয় মুসলমানদের উপযোগী জাতীয় সাহিত্য গঠনের কাজ মুসলমানদেরই করা উচিত। সেজন্য অন্য জাতির বা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। এ কাজ অতীব গুরুতর বটে কিন্তু অসাধ্য নহে। সমাজে সুনিয়ন্ত্রিত সাহিত্যচর্চ্চা প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে সহজেই এ কার্য্য সুসাধ্য হয়। দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় মুসলমানেরা সে পথে না গিয়া তজ্জন্য অনর্থক রাজসরকারের সহায়তা-প্রার্থী হইতেছেন। বাঙ্গালা ভাষা যখন আমাদের মাতৃভাষা, তাহাতে অনুরাগ সঞ্চার করাটা বড় কঠিন কার্য্য নহে। আমাদের শিক্ষিত লোকেরা মাতৃভাষানুরাগী হইয়া মাতৃভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলে অচিরকাল মধ্যে দেশে সাহিত্যানুরাগ পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। তদ্দ্বারা বঙ্গ ভাষা অসাধারণ সমৃদ্ধিশালিনী হইবে, সমাজ অশেষ প্রকারে উপকৃত হইবে এবং জাতীয় শরীরে নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে। তদন্যথা এ সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত।

ধরাপৃষ্ঠে একদিন মুসলমানেরা বড় হইয়াছিল। কিসের সাহায্যে? ইতিহাস অমনি বলিয়া দিবে,—জাতীয় ভাষার সাহায্যে। আরবীয়েরা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া আপনাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন।

তাই তাঁহারা বড় হইতে পারিয়াছিলেন। সেই আরবীয়দের অযোগ্য বংশধর আমরা কিনা আজ মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্য অবহেলা করিয়া বড় হইব! কি দুরাশা! মধ্যাহ্ণ স্বপ্ন বরং সফল হইতে পারে, এ দুরাশার সফলতা আদৌ অসম্ভব। হে বঙ্গীয় মুসলমান! এখনও সময় আছে, এখনও সংশোধনের উপায় আছে, এখনও মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলনে তৎপর হও! সাহিত্য-চর্চ্চা হইতে তুমি অচিরে নবজীবন প্রাপ্ত হইবে,--পূর্ব্বাকাশে উষার তরুণ-কিরণের সহিত তোমার জাতীয় আকাশে নূতন আশার আলোক ফুটিয়া উঠিবে। সে আলোকে তুমি নিজে আলোকিত হইবে এবং জগৎকেও উদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইবে। অতএব আশু আলস্য ত্যাগ করিয়া উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!

আবদুল করিম।

ধর্ম্মজীবনের আদর্শ।*

মানব-শক্তি যতই উন্নত—মানব বুদ্ধি যতই প্রখর হউক না কেন, উহা কখনই পূর্ণ উন্নতি এবং পূর্ণ প্রাখর্য্য লাভ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই উহা পার্থিব, পারে না বলিয়াই উহা চিরদিন অসম্পূর্ণ! পরন্তু, মানবীয় শক্তির এই অপ্রতুলতা.মানব বুদ্ধির এই অপূর্ণতা,—মানব প্রকৃতির দোষ বলিয়া আমরা কুত্রাপিও স্বীকার করিতে পারি না। অথবা আমাদের বাহ্য সমালোচনার অগভীর দৃষ্টির নিকট উহা দোষাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর মজ্জাভেদী সূক্ষ্ম বিচারে উহা কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না। কেন না, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে একথা স্পষ্টতঃই পরিদৃষ্ট হয় যে, মানবিক শক্তিবুদ্ধির ঐ অপূর্ণতার অন্তরালেই তাহার মহত্ত্ব এবং উৎকর্ষ লাভের অদম্য আকুল স্পৃহা লুক্কায়িত রহিয়াছে। অপূর্ণতা আছে বলিয়াই, পূর্ণতা লাভ মানবভাগ্যে সম্ভবপর না হইলেও, পূর্ণতার দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইবার নিমিত্ত একটা উদ্দীপ্ত আগ্রহ—একটা জ্বলন্ত চেষ্টা তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বীজ যেমন স্বভাবতঃ (Essentially) অতি উত্তম হইলেও উপযুক্ত ভূমি, পরিমিত সার, উত্তাপ এবং তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে অঙ্কুরিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং পরিশেষে ফলফুলে সুশোভিত হইয়া ধরিত্রীর উপকার সাধন করিতে পারে না,—মানব-হৃদয়-নিহিত উৎকর্ষ-লাভের সেই অপরিণত (Unrealised) বাসনাও তদ্রূপ অনুকূল অবস্থায় সাহায্য না পাইলে বিকশিত এবং তদনন্তর চরম সাফল্যলাভে সমর্থ হয় না। পক্ষান্তরে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একবার আপতিত

---

* কলিকাতা University Institute হইতে ১৯১০ সালের Majumadar memorial prize প্রাপ্ত।

হইলে ঐ সুকুমার বাসনা অকালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; এবং ঐ ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে নানাবিধ দুষ্ট প্রবৃত্তি সমুদ্গত হইয়া পাপের পঙ্কিল পথ আরও আবর্জ্জনাময় করিয়া তোলে।

একটু স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই সসাগরা ভূমণ্ডলে কেহই কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত থাকিতে চাহে না—কেহই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে অভিলাষ করে না। এ পৃথিবীতে যেন সকলেই অগ্রবর্ত্তী হইতে চাহে,—সকলেই যেন দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর সভার বিষ্ণুচক্রের ন্যায় উৰ্দ্ধে অবস্থিত কোন এক মহৎ উদ্দেশ্যের পানে আকুল নয়নে পথ বাহিয়া ছুটিয়াছে! সকলেই যেন চাহিতেছে শুধু ঐ এক উন্নতি! সকলেই যেন ভাবিতেছে শুধু ঐ এক উৎকর্ষ (Progress and betterment of the existing condition)!

কলকলনাদিনী কেদারবাহিনী তরঙ্গিনী যেন গিরিগহ্বর হইতে সমুদ্গতা হইয়া নানা দেশবিদেশের উপর দিয়া আপনার অপ্রতিহত প্রবল প্রবাহ বিস্তার করত পরিশেষে সাধনার ধন—আশার নিকেতন—জলধির বিশাল বক্ষেঃ আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু বিলীন করিয়া দিতে সতত অভিলাষিণী,—মানবের মনস্বীতা, অনুধাবনা ও যত্নচেষ্টার পরিচায়ক জাগতিক যাবতীয় দর্শন-বিজ্ঞান সাহিত্য-ইতিহাস ন্যায়-নীতি প্রভৃতিও সেইরূপ মানবের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদির অশেষবিধ সাহায্য এবং সৌকর্য্য সম্পাদন করত এক যোগে—একলক্ষ্যে—সেই এক অচিন্ত্য অজ্ঞেয় শান্তিপূর্ণ অনন্ততার (Eternity) মধ্যে আপনাদের নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ত বিলাইয়া দিতে সমুৎসুক! এই অনন্ততার মাঝখানেই বিপুল বিশ্বের সমগ্র জনপ্রাণীর—সমস্ত নরনারীর চরম লক্ষ্য—সর্ব্বশেষ আরাধনার সামগ্রী—নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই স্থানেই এস্লামের মূল কারণ! এই স্থানেই হিন্দুত্বের সার তত্ত্ব! এই স্থানেই বাইবেল (The Bible) কথিত মহা বৈরাগ্যের সমাধি!

মানবের অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে—নিম্নস্তর হইতে উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিবার এই যে একটা স্বভাবগত প্রবল স্পৃহা, ইহাই তাহাকে তাহার সর্ব্ববিধ দৈনন্দিন কার্য্যে প্ররোচিত—প্রবুদ্ধ করিয়া দিতেছে। ইহার প্রভাবেই সমগ্র এসলাম-জগতের সর্ব্বময় অধীশ্বর ধর্ম্মগতপ্রাণ মহামতি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিষয়-বাসনা—সম্ভোগলালসা দূরে রাখিয়া স্বশ্রমোপার্জ্জিত যৎসামান্যে নিঃসহায় নিঃস্ব দরিদ্রের ন্যায় আপনার মহজ্জীবনের পরিসমাপ্তি করিতে পারিয়াছিলেন।

ইহারই প্রভাবে রাজকুমার শাক্যসিংহ কপিলাবস্তুর মণি-মাণিক্য-সমলঙ্কৃত রাজসিংহাসন পশ্চাতে রাখিয়া প্রলোভন পরিপূর্ণ যৌবনমধ্যাহ্নে বৈরাগ্য ব্রতে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহারই প্রভাবে রাজশক্তির দারুণ অত্যাচার-নিপীড়িত ঐশ্বর্য্য মদমত্ত নৃশংস ধনী সম্প্রদায়ের (Aristocratic class) দুর্ব্বিষহ নির্য্যাতনগ্রস্ত—অস্থিমজ্জাবশিষ্ট নিঃসহায় ফরাসী জনসাধারণ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রলয়ের ভয়প্রদ গভীর হুঙ্কারে সমগ্র ইউরোপ ভূমি প্রকম্পিত করিতে পারিয়াছিল! ইহারই প্রভাবে, ক্ষণস্থায়ী হইলেও, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিজয়-বিষাণ প্রতি ফরাসীর প্রাণে প্রাণে সঘনে বাজিয়া উঠিয়াছিল! ইহারই প্রভাবে এই বিনশ্বর অবনীতলে কত কি মহাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়!

মানুষ আপনার বর্ত্তমান (Present) অবস্থা হইতে যে অবস্থায় উপনীত হইবার নিমিত্ত অভিলাষ করে, সেই অবস্থায়ই তাহার পক্ষে তাহার আদর্শ (Ideal), ঐ যে দশমবর্ষীয় তরলমতি কোমলবালক আপনার গুরুমহাশয়ের লিখনভঙ্গী, পঠনপদ্ধতি এবং রীতিনীতি সন্দর্শনে মনে মনে তাঁহার অশেষবিধ প্রশংসাবাদে নিয়োজিত আছে, ভাবিতেছে যদি একটিবার জীবনে গুরুমহাশয়ের মত অমন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিপতি হইতে পারিতাম! যদি একটিবার অমনি করিয়া সমাস সন্ধিতে সুললিত পদবিন্যাস করিতে শিখিতাম! যদি উহার মত সরল রেখায় মুক্তার মত লিখিতে পারিতাম! উহার অপরিস্ফুট সরল আকাঙ্ক্ষার পক্ষে গুরুমহাশয়ের তথাকথিত পাণ্ডিত্য লাভই একমাত্র আদর্শ। ঐ যে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ উদীয়মান তরুণযুবক কৌতূহলপরাক্রান্ত হৃদয়ে স্বীয় সুহৃদজনকে লিখিয়া পাঠাইতেছে, "সখে! আশীর্ব্বাদ করিও, যেন বিধাতার অনুগ্রহে এইরূপে Graduate এর খাতায় নাম লিখাইতে পারি"—উহার মুখ্য আদর্শ (Immediate ideal) হইতেছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের জমকাল একটি উপাধি ধারণ। ঐ যে জ্ঞানবিজ্ঞানের মহাচার্য্য প্রবীণ দার্শনিক সকল শাস্ত্রে সর্ব্ববিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াও কি জানি কিসের জন্য নিরন্তর লালায়িত—তৃষিত রহিতেছেন,—তাঁহার জীবনের আদর্শ হইতেছে—সেই "কি জানি কি ধন" প্রাপ্তি।

এই প্রকারে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ প্রত্যেক মনুষ্যেরই একটি না একটি আদর্শ বা ঈপ্সার বিষয় আছে এবং এই আদর্শ, জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যে এবং সংশ্রবান্বিত বিষয়াদির (Environment) বৈষম্যে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যতই পরিমার্জ্জিত

হইতে আরম্ভ করে—তাহার বিষয়রুচি যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট বস্তুর রসাস্বাদ গ্রহণে লালায়িত হইতে থাকে, মানুষের আদর্শও ততই চরমের দিকে (The remote highest ideal) পৌঁছিতে প্রয়াস পায়। এই পরিমার্জ্জিত আদর্শ-নীতির অনুবর্ত্তনের ফল স্বরূপেই "সার টমাস মুরে"র "ইয়োটেপিয়া" (Sir Thomas More's Utopia) "হ্যারিংটনে"র "ওসিয়ানা" (Harrington's Oceana) "প্লেটো"র "রিপাবলিক্" (The Republic of Plato) এর সৃষ্টি। ইহারই ফলে আর্য্যঋষিবৃন্দের গভীর গবেষণার অক্ষয়কীর্ত্তি ষড়দর্শনের (Six schools of the Hindu Philosophy) আবির্ভাব। ইহারই ফলে খৃষ্টানের বাইবেল (The Bible)।

অপিচ, মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে যে আদর্শ শুধু পার্থিব বিষয়াদিতেই নিবদ্ধ থাকে, যে আদর্শ শুধু সাংসারিকতার ভিতরেই প্রমত্ত থাকে, যে আদর্শ সংসার-শান্তির বহির্ভাগে কোন উচ্চ—কোন মহৎ—কোন চিরন্তন বস্তুর দিকে আমাদিগকে সঙ্কেত করিয়া দেয় না,—সে আদর্শ ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসার-জীবনের (Earthly life) গৌরব উপার্জ্জনের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও পারমার্থিক বিশেষত্বের হিসাবে, অতি নগণ্য—অতি তুচ্ছ। যে আদর্শ মানবের অধর্ম্ম, অবিশ্বাস, কুরীতি এবং কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তাহার জ্ঞানের উজ্জ্বল চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়,—যে আদর্শ মানব-হৃদয়ের সংকীর্ণতা, আবিলতা এবং ক্ষুদ্রতার লৌহশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে প্রশস্ত, উদার এবং সরল করিয়া তোলে,—যে আদর্শ আপাতমধুর পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের—যশোকীর্ত্তির—অপর পারে আমাদিগকে কোন নিত্যসত্য অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যসমন্বিত দিব্য মহিমামণ্ডিত অপূর্ব্ব মনোহর রাজ্যের দিকে সজোরে ইঙ্গিত করিয়া দেয়,—যে আদর্শ অপূর্ণকে পূর্ণের দিকে, অনিত্যকে নিত্যের দিকে, সান্তকে অনন্তের দিকে, আকুল আবেগে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়,—লীলাময় জগতের বিচিত্র (Diverse) আদর্শের মধ্যস্থলে সেই আদর্শই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই আদর্শই ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃত আদর্শ! সেই আদর্শই মহজ্জীবনের সাধনার সামগ্রী! এই আদর্শ-বর্ত্মে মোহমুগ্ধ—বিস্মৃত মানব জাতিকে পরি-চালিত করিবার জন্যই যুগে যুগে বিশ্বমঞ্চে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন পবিত্রতা এবং সাম্যের বিমল ছবি—ঐস্লামিক "পয়গম্বর" (Prophets) অথবা হিন্দুর "অবতারের" (Incarnation of God) আবির্ভাব। ঐ আদর্শের পুণ্যগাথাই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পবিত্র কণ্ঠে জীমূত মন্দ্রে বিঘোষিত হইয়া

ছিল। ঐ আদর্শের পূত কাহিনীতেই নারদের সুমধুর বীণা সামরবের ললিত মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়াছিল! ঐ আদর্শমন্দিরে উপনীত হইবার নিমিত্তই জগতে আজ আমরা বিবিধ পথকল্প বিবিধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অবলোকন করিতেছি।

মার্ত্তণ্ডের উজ্জ্বল ভাতি, সুধাকরের নির্ম্মল জ্যোতি, নীলিম শূন্যের অনন্ততা, সমীরণের শীতলতা যেমন সকলেরই একাধারে উপভোগ্য—উপরোক্ত ঐ উচ্চ আদর্শও তেমনি, জাতি-ধর্ম্ম বর্ণ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেরই আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত। উহাতে কাহারও বাধা নাই, আপত্তি নাই, 'দু'হাত তোলা' দোহাই নাই। মানুষ যতদিন ঐ আদর্শকে আপনার মানস-মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, ততদিন সে,—তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য কিম্বা অতুলনীয় গৌরবকীর্ত্তি বর্ত্তমানেও (inspite of) স্বীয় অনুসৃত ধর্ম্মের দাস (A slave to his professed creed); ততদিন সে ব্যক্তিগত সমাজ, অথবা সাম্প্রদায়িক দুর্ভেদ্য প্রাকারপ্রকোষ্ঠে নির্দ্দয়রূপে আবদ্ধ। কিন্তু, যেই মাত্র সে ঐ সমস্ত আদর্শের শীর্ষস্থানীয় আদর্শমন্দিরের যথার্থ উপাসকরূপে আপনাকে জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল,—যেইমাত্র সে, ঐ আদর্শকে স্বকীয় জীবনের ধ্রুব তারকারূপে পরিগ্রহণ করিল,—তখনি তাহার আসন,—ব্যক্তিগত ধর্ম্মের এবং সামাজিক নিয়মনীতির বহির্ভাগে—বহু উর্দ্ধে এক অতি অনির্ব্বচনীয় সাম্য ও উদার ধর্ম্মরাজ্যে সংস্থাপিত হইল। তখন সে পৃথক ভাবে মুসলমানের নহে, খৃষ্টানের নহে, হিন্দুর নহে, বৌদ্ধের নহে,—তখন সে সর্ব্ব-ধর্ম্মের সংমিশ্রণজাত পরম উদার বিশ্বধর্ম্মের সভ্যরূপে পরিগণিত। তখন সে, একযোগে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলেরই দাবী করিবার সাধারণ সম্পত্তি! তখন সে স্বদেশভক্ত না হইয়া বিশ্বপ্রেমিক—Patriot না হইয়া Philanthropist রূপে জগতের সম্মুখে বিরাজিত। এই সত্যের অনুবর্ত্তনেই আমরা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যীশুখৃষ্ট, শ্রীগৌরাঙ্গ অথবা বুদ্ধকে যথাক্রমে সুধু মুসলমানের, খৃষ্টানের এবং হিন্দুর না বলিয়া বিপুল বিশ্বের পরিত্রাতা—সমগ্র মানব জাতির পরিপূজ্যরূপে গ্রহণ করিব।

যদিও শ্রেষ্ঠতম মানববুদ্ধি এবং মানবিক জ্ঞান এই আদর্শকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, এবং ইহার প্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিধ ধর্ম্ম-পন্থার নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন;—যদিও স্থূল-দৃষ্টিতে এক ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না, এক মতের সহিত অন্য মতের মিল দেখা যায় না,—তথাপিও প্রকৃত প্রস্তাবে মূলতঃ (at the bottom) সকল বিধান এবং ধর্ম্মের

গতি একদিকেই— উদ্দেশ্য একই। সকলেরই অভ্যন্তরে ঐ একই আদর্শের পুণ্যপীযূষ নিহিত রহিয়াছে। ইস্‌লামের "শান্তি" (The absolute peace of Islamism) হিন্দুর "মুক্তি" (Salvation) বৌদ্ধের "নির্ব্বাণ" (Extinction of all desires and passions) খৃষ্টধর্ম্মের "সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব" (Universal brotherhood)—ইহারা সকলেই,—সাগর সঙ্গমাভিলাষিণী বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় একলক্ষ্যে, একাগ্রচিত্তে একই গন্তব্যের দিকে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। বাহ্য প্রস্তাবে আমি মুসলমান, তুমি খৃষ্টান এবং সে হিন্দু হইলেও বাস্তবিক পক্ষে আমরা সকলেই—সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের স্নেহপ্রতিপালিত সন্তান—সকলেই তাঁহার স্নেহের ধারা—সকলেই পারমার্থিক সম্বন্ধ-সূত্রে (Spiritual relationship) দৃঢ়রূপে গ্রথিত। আমাদের সকলেরই সমষ্টিভূত ক্ষুদ্রজীবন তাঁহারই মহিমান্বিত অনন্ত ও অসীমের (Infinititude) অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারই পূত সিংহাসন-অধিরোহণী-নিম্নে সমগ্র মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ—উচ্চতম মঙ্গল বিরাজ করিতেছে। তাঁহারই মধ্যে মানবের যথার্থ শান্তি, প্রকৃত মুক্তি, নির্ব্বাণ-নিবৃত্তি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। মানব-সভ্যতার পুণ্য-নিকেতন প্রাচীন গ্রীসের মনীষীসন্তান মহাত্মা প্লেটো (Plato) সত্যই বলিয়াছেন—"The science of God is the noblest of all sciences; if you cannot attain that the all other sciences of Music, Rhetoric, Medicine etc. will be of no avail to you."

ধর্ম্মের পথ অতি প্রলোভনময়। ধর্ম্মজীবনের আদর্শ লাভ (Realisation of the ideal of religious life) অতি দুরূহ। সে পথে চলিতে হইলে—সে আদর্শে উপনীত হইতে হইলে মানুষের অপরিমিত সাধনা ও অপরিসীম হৃদয় বলের আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে—ভগবানের করুণা লাভ করিতে হইলে—মানুষকে অপ্রতিহত তেজস্বিতা সহকারে আপনার আভ্যন্তরীণ রিপু ও কুপ্রবৃত্তির সহিত ভীষণ আহবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সত্যকে আশ্রয় করিয়া পাপ ও অধর্ম্মকে হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে—সমূলে বিধ্বংস করিতে হইবে। জগতের প্রত্যেক প্রাণীর সহিত পবিত্র প্রেমের সুদৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে—মহৎ ক্ষুদ্র সকলকে ভাল বাসিতে হইবে। ইংরাজ কবি "কোলেরীজ" (Coleridge) তাই গাহিয়াছেন,—

"He prayeth well who loveth well
Both man and bird and beast,"

"He prayeth best who loveth best
All things both great and small."

ফলতঃ যেদিন মানব, স্বকীয় জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য—যাবতীয় কার্য্যের শীর্ষভাগে সেই বেদবর্ণিত—কোরান উল্লিখিত পরমপুরুষের প্রশান্ত বিরাট আলেখ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে,—যেদিন সে পবিত্র মনে বিশুদ্ধ প্রাণে, ভক্তিগদগদকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া গাহিতে পারিবে,—

"প্রভো! নির্ম্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম-মুছায়ে"—

সেদিন সে তাহার কোটি প্রমত্ত বাসনাকে সংযত করিয়া—একত্র করিয়া ভগবানের রাতুল চরণোদ্দেশে লইয়া যাইতে পারিবে,—সেদিন জগতে স্বর্গের সুবর্ণরাজ্য সংস্থাপিত হইবে! পবিত্র পরব্রহ্মের পুণ্যালোকে বিপুল ধরণী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে! মঙ্গলশঙ্খের মধুর রবে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিবে।

নূরর রহমান খান ইউসফজী।

বিশ্বাসের মূল্য।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বাগ্‌দাদ নগরের রাজপথ।
সময়—প্রাতঃকাল।

খলিফা হারুনুর্-রশীদ আজ প্রমোদোদ্যানে যাইতেছেন। সঙ্গে মহিষী জোবেদা খাতুন। উভয় পার্শ্বে উলঙ্গকৃপাণপানি খোজাগণ। রাজপথের দুই ধারে, রাজপ্রাসাদ হইতে উপবন পর্য্যন্ত, বসোরার সপুষ্প গোলাপ তরু সারি সারি সুসজ্জিত। গোলাপ-বর্ণ মখমলে সমস্ত পথ মণ্ডিত। দক্ষিণ বামে গৃহ প্রাচীর সমূহ গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত।

অগ্রে আরব্য ঘোটক পৃষ্ঠে খলিফা, পশ্চাৎ মহিষী। রাজাজ্ঞায় পথ জন-প্রাণী শূন্য। কোথা হইতে পাগল বহ্‌লুল আসিল! বহ্‌লুল ধীরে ধীরে খলিফার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কেহ বলে বহ্‌লুল পাগল। কেহ বলে মস্তান ফকীর। বিশেষতঃ রাজ-অন্তঃপুরে তাহার অব্যাহত গতি। কেহ বাধা দিল না। প্রধান শরীররক্ষক একবার খলিফার মুখের দিকে তাকাইলেন। খলিফা বলিলেন 'আসিতে দেও।'

বহ্‌লুল অগ্রসর হইয়া বলিল, "ওগো! বেহেস্ত * কিনিবে?"

"কত দাম?"

"লাখ টাকা।"

"কই তোমার বেহেস্ত?"

বহ্‌লূল কম্বলের ভিতর হইতে হিজিবিজি কাটা একখানি মলিন কাগজ বাহির করিল।

খলিফা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন "যাও পাগল! এ তোমার পাগ্‌লামি করিবার সময় নয়!"

বহ্‌লূল সরিয়া গেল। কাগজখানি লইয়া মহিষীর কাছে ধরিল। মহিষী দ্বিরুক্তি না করিয়া গলা হইতে হীরক হার খুলিয়া বহ্‌লূলের হাতে দিলেন।

বহলূল চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাগ্‌দাদের আদালত গৃহ।

সময়—সেই দিন মধ্যাহ্ন।

বাগ্‌দাদের আদালতে আর কখন বুঝি এত লোক জমে নাই। সকলেই প্রায় কাঙ্গাল গরীব। তাহারা এখানে কেন? এতক্ষণ ভিক্ষা করিলে তাহাদের দু' পয়সা রোজগার হইত। কি জন্য সকলে সজল নেত্রে বসিয়া আছে? আজি আলি হাসন সওদাগরের বিচারের রায় প্রকাশিত হইবে। এমন দিন ছিল, যখন প্রত্যেক বেলায় হাজার পাত আলি হাসনের বাড়ী পড়িত। দানের জন্য আজি আলি হাসন ঋণী। ঋণও ত কম নয় লাখ টাকা।

সহরে এমন আমির ওমরা, এমন গরীব দুঃখী ছিল না, যে একবার আলি হাসনের গৃহে পোলাও কোর্ম্মার আস্বাদ গ্রহণ করে নাই। আলি হাসনের

* পারসী শব্দ—স্বর্গ।

ধনী বন্ধুগণ আজ কোথায়? অমন একটা অপব্যয়ী দেনদার দেউলিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখাটা লজ্জার কথা! তাই তাহারা কেহ আসে নাই। আসিয়াছে কেবল কতকগুলি লোক—যাহাদের হৃদয় ব্যতীত আর কোন ধন নাই। তাহারা কি দিবে? ছ' ফোঁটা চোখের জল বই ত নয়! দুনিয়ায় তাহার কিম্মত কি?

কাজিয়ুল্ কোজ্জাত * রায় প্রকাশ করিলেন। দেনার দায়ে আলি হাসনের কারাদণ্ড। গরীব-দুঃখী হাহাকার করিয়া উঠিল।

জনতা মধ্য হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই আল্লার! দণ্ড মাফ—আমি টাকা দিব।" সকলের নজর সেই দিকে গেল। এ যে বহ্‌লুল পাগল! আলি হাসন খালাস।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাগ্‌দাদের রাজান্তঃপুরের একটি প্রকোষ্ঠ।

সময়—সেই দিন রাত্রি।

রাজপুরী কোলাহল শূন্য। শয়ন প্রকোষ্ঠে খলিফা ও মহিষী। অন্য কেহ নাই। স্বর্ণ নির্ম্মিত শামা'দানে একটি কর্পূরের বাতি স্থির আলোক দিতেছে।

খলিফা বলিতেছেন "মহিষি! তোমার মত নির্ব্বোধ ত দেখি নাই। কি বলিয়া তুমি লাখ টাকার হীরার হার দিয়া একটা পচা কাগজ কিনিলে?"

মহিষী।—জাঁহাপানা, আমি কাগজ কিনি নাই। স্বর্গ কিনিয়াছি।

খলিফা।—বহ্‌লুল একটা পাগল; আর তুমি তারও বাড়া।

মহিষী।—হ'তে পারে। আমি কিন্তু বহ্‌লুলকে সত্যবাদী জানি।

খলিফা।—সে একটা মস্ত জুয়াচোর।

মহিষী।—সে যাই হ'ক, আমি কিন্তু সরল বিশ্বাসে তাহাকে হার দিয়াছি। আল্লা আমার দিল † (অন্তঃকরণ) দেখিবেন।

খলিফা।—তোমাদের মেয়ে লোকের বুদ্ধিই এই প্রকার। আমি আর তোমার সহিত বৃথা বাক্যব্যয় করিতে চাহি না।

কথোপকথন থামিল।

* আরবী—প্রধান বিচারপতি।

† পারসী—হৃদয়।

রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। রাজ্ঞী জোবেদা খাতুন আর নাই। খলিফাও কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করে কে? মৃত দেহ সমাধিস্থ হইল। খলিফা বলিলেন, "কবর খোঁড়। আমি একবার রাণীর মুখখানি দেখিয়া লই।" খলিফার আদেশ। কবর খোঁড়া হইল।

খলিফা কবরে নামিলেন। কিন্তু শব ত নাই। কবরে বড় এক সুরঙ্গ। তিনি সুরঙ্গ পথে চলিলেন।

কোথায় সুরঙ্গ! এ যে প্রশস্ত মাঠ! সেখানে অগণ্য ফুলের গাছ। পাখীর মধুর কাকলীতে ঘাসগুলি পর্য্যন্ত যেন আনন্দ হিল্লোলে নাচিতেছে। তাহার উপর আবার মৃদু সমীরণ। এমন ফুলগাছ এমন পাখী, এমন সমীরণ তিনি ত কখন দেখেন নাই, শুনেন নাই, অনুভব করেন নাই। কিন্তু তাঁহার চিত্তে আনন্দ কোথা? জোবেদা যে নাই!

ক্রমে একটি হর্ম্ম্য। পৃথিবীর রাজা তিনি, তবুও সেই হর্ম্ম্যের শোভা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঐ যে জোবেদা! ঐ যে প্রাণের জোবেদা! বাতায়ন তলে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন।

খলিফা আনন্দে দৌড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলেন। দরোয়ান বাধা দিল। খলিফার রাগ হইল! কিন্তু তিনি এখানে কে? অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আমার সমস্ত রাজত্ব তোমাকে দিব, আমার রাণীর নিকট আমাকে যাইতে দেও।" নিষ্ঠুর সে। তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। খলিফা কাঁদিয়া বলিলেন, "রাণী! তুমি আমায় ভিতরে লইয়া যাও।"

উত্তর হইল, "জাঁহাপানা! এ সেই আমার স্বর্গ, যাহা আমি হারের বদলে কিনিয়াছি। এখানে অন্যের আসিবার অধিকার নাই।"

খলিফা কাতর ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পার্শ্বে রাণী নিদ্রা যাইতেছেন। উপাধান অশ্রুতে ভিজিয়া গিয়াছে। খলিফা বলিয়া উঠিলেন "লা হাওলা অলা কুআ'তা ইল্লা বিল্লাহ্।" *

তখন ভোর হইয়াছে। সিংহ দরজায় নহবৎ বাজিতেছে। চারিদিকে সুস্বর

* আরবী।—"ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও কোন শক্তি নাই।" মুসলমানগণ দুঃস্বপ্ন দেখিলে কিংবা কোন অমঙ্গল ব্যাপার উপস্থিত হইলে ইহা বলিয়া থাকেন। মৃত্যুসংবাদ শুনিলেও ইহা উক্ত হইয়া থাকে।

পাখী গান করিতেছে। বাতি নিবিয়া গিয়াছে কিন্তু তখনও একটা সুগন্ধ রহিয়াছে।

খলিফা ডাকিলেন—"মসরুর !"

"জাঁহাপানা ! গোলাম হাজির !"

"যাও। বহলূলকে রাজসভায় লইয়া আইস।"

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—খলিফার দরবার।

সময়—পরদিন প্রাতঃকাল।

খলিফা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। চারিদিকে উজির নাজির উপবিষ্ট। এমন সময় বহ্‌লূল আসিয়া উপস্থিত।

খলিফা বলিলেন "এস, বহ্‌লূল এস। এস, এখানে বস।"

বহলূল।—কি গো ! কি জন্য ডেকেছ। গর্দ্দান-টর্দ্দান নেবে না কি ? তোমাদের ত ঐ কাজ। হি-হি-হি।

খলিফা।—না বহ্‌লূল ! তুমি স্বর্গ বিক্রয় করিবে ?

বহ্‌লূল।—না, গো না ! তোমার রাজত্ব দিলেও না।

খলিফা।—তবে কিসে পাওয়া যায় ?

বহ্‌লূল।—সরল বিশ্বাসে। যাই আমি।

(প্রস্থান)

মিলনের অন্তরায়।

(গল্প)

১

বাল্য-প্রণয় জমাট বাঁধিয়া যখন যৌবনের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হইল, তখনও যতীন্‌কে আমি অভেদাত্মা মনে করিতাম, সেও করিত। তাহার কোন কার্য্যে আমি তাহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। আমি মুসলমান, সে হিন্দু—কিন্তু আমরা অন্তরের অফুরন্ত প্রণয় ও ভালবাসার মধ্যে জাতিভেদের কথাটাকে

কখনও মনে স্থান দেই নাই, দিবার অবসরও পাই নাই। তথাপি আমরা নিজ নিজ সমাজের গণ্ডি হইতে এক তিলও স্খলিত হই নাই। আমাদের ইহাই বিশেষত্ব ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত মুসলমানের ভারতবিজয়ের ইতিহাসই হিন্দুকে মুসলমান হইতে পৃথক করিয়াছে। উভয়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষী রেষারেষী জীবন্ত করিয়া দিয়াছে। হিন্দু ইতিহাস পড়িয়া দেখেন, মুসলমান হিন্দুর হাত হইতেই ভারতবর্ষের শাসন ভার কাড়িয়া লইয়াছিলেন, মুসলমান তাহা না করিলে হয়ত হিন্দুর ভারতবর্ষ হিন্দুরই থাকিত। তারপর শেষ যখন হিন্দুর এক শাখা মারাঠিরা প্রবল হইয়া উঠিল, পাঠান আহাম্মদশাহ্ আব্দালী পাণীপথের তৃতীয় যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুর সে শেষ আশা নির্ম্মূল করিয়া দিলেন। ভারতবর্ষ হিন্দুর শাসনেও রহিল না, মুসলমানের শাসনেও রহিল না। আর এক বিজয়ী, উন্নত, সুসভ্য, সমদর্শী জাতির হাতে পড়িল,—সে জাতি ইংরাজ। বিধাতার এই বিধান, নতুবা ভারতের উদ্ধার ছিল না। ইংরাজের হাতে পড়িয়া ভারত সুশিক্ষার পথ পাইল, নূতন জীবনের সাড়া পাইল। কিন্তু সাত শত বৎসরের একত্র বাসও হিন্দু-মুসলমানকে এক করিতে পারিল না।

স্কুল কলেজে পড়িবার সময় যতীন্ আর আমি এই সব বিষয়ের আলোচনা করিতাম। অপরিণত বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি লইয়া আমরা ইহার কোন মীমাংসা করিতে পারিতাম না। সে আওরঙ্গজেবকে দোষ দিত,—যত নষ্টের গোড়া আওরঙ্গজেব। আমি শেরশাহ্ ও আকবরের নাম সগর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম। আওরঙ্গজেবের একটি ত্রুটির জন্য আমি তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিলাম। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, বোধ করি নিজকেও না। ইহা ভিন্ন আওরঙ্গজেবের অন্য ত্রুটি ছিল না। তিনি বীর, ধার্ম্মিক, সংযমী এবং ন্যায়দর্শী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের তুলনা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

মোগল বা হিন্দুরাজা কেহই Democrat ছিলেন না। Democracyর অভাবেই হিন্দু-মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে। আর এই Democracyর ভাব ইংরাজে অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই ইংরাজের রাজ্য টিকিয়া গিয়াছে এবং বহুদিন টিকিবে। কেবল অতীতই যে হিন্দু-মুসলমানের অপ্রীতির কারণ, ইতিহাসের আলোচনা করিয়াও এ ভাব মনে স্থান দিতে পারিতাম না। সাতশত বৎসরের পুরানো ক্ষত কি এখনও শুষ্ক হয় নাই? সামান্য একটি ঘটনায় এই অপ্রীতির কারণ ধরা পড়িয়াছিল, আজ সেই কথাই বলিব।

২

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে রাশি রাশি পাঠ্য পুস্তক প্রাণপণে দিবা রাত্র ধরিয়া মুখস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াও যখন বি-এ পরীক্ষায় ফেল্ হইলাম, তখন অভিভাবকদের অর্থ আর জলে ফেলা অন্যায় ভাবিয়া চাকরীর ওমেদওয়ার হইলাম।

বাবা কোনও এক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার ছিলেন। তিনি অনেক সাহেবসুবো পার করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজনকে ধরিয়া রেভেনিউ বোর্ডে তিনি আমাকে একটি কাজ জুটাইয়া দিলেন; বেতন ৪০৲ টাকা।

যতীন্ বি-এ পাশ করিল। সে এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার হইল। নিরিবিলি থাকিয়া সাহিত্য-সাধনা করাই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। এখন হইতে সে সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিল।

এতদিন সামান্য অদর্শনেই উভয়ের মন অস্থির হইত, এখন হইতে চির অদর্শনের জন্যই প্রস্তুত হইতে হইল। কিন্তু আমাদের অন্তররাজ্যে আমরা উভয়ে উভয়কে নিত্যসঙ্গী রাখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। সে প্রতিজ্ঞা কি ভাঙ্গিয়াছি? আমি হাফেজ্, সে যতীন্, আমরা কেহই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী নই, অতীত ও বর্ত্তমানই ইহার সাক্ষী।

৩

এখন আমরা উভয়েই বিবাহিত। যতীন্ লিখিয়াছে তাহার দাম্পত্যজীবন প্রীতিপুষ্পে অভিনন্দিত হওয়ারই উপযুক্ত। তাহার স্ত্রী স্নেহবালা নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সতী-সাবিত্রীর দেশে যাঁহার জন্ম, তাঁহার ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, না হওয়াই বিচিত্র। অন্ততঃ আমার এইরূপ বিশ্বাস।

আমার দাম্পত্য-জীবনও আশাতিরিক্ত সুখেরই হইয়াছে। সলজ্জ, পর-দুঃখকাতরা, ধর্ম্মশীলা, প্রেমময়ী, আয়েষা আমাকে যতখানি অনাবিল আনন্দ দিতেছে, আমার ভাগ্যে যে ততখানি থাকিতে পারে, ইহা আমি কল্পনাই করিতে পারি না। আয়েষার তুলনা হয় না।

নারীজাতির প্রতি আমার যে একটা স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল, আয়েষার ব্যবহারে আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। নারী এখন আমার নিকট কেবল মাত্র নারী নহে, সে দেবী। সংসারে যদি কোথাও অকৃত্রিম দেবত্ব থাকে, তবে সে নারীর হৃদয়ে।

আয়েষা অনেক স্থানে হিন্দুনারীর নিকট অবহেলা পাইয়া বড় ক্ষুব্ধ হইত। আমি উহা দু' একজনের কুটিলতা বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে উপদেশ

দিতাম। উহা দু' একজনেরই কার্য্য, সমষ্টির নহে, তাহার মনে সর্ব্বদা এই বিশ্বাসই জন্মাইতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তবু যেন তাহার মনে অবিশ্বাসের কণিকা রহিয়া যাইত, মন কোন রূপেই পরিষ্কার হইত না। আমি তাহাকে বলিতাম, যতীনের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তোমার সব ভ্রম টুটিয়া যাইবে। তাহার উদারতা কখনও মুসলমানকে ঘৃণা করিতে বলিবে না। কিন্তু দেবতাকে কল্পিত স্বর্ণসিংহাসন ত্যাগ করিয়া যে দিন ভূমিতে নামিতে দেখিলাম, সে দিন আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আয়েষা সে দিন সঙ্গে থাকিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতাম। নারীর নিকট লজ্জা পাওয়া বড়ই নিদারুণ।

৪

বঙ্গ-বিভাগের ফলে দিন কতক ঢাকায় পূর্ব্ব-বঙ্গের হেড্ কোয়াটার ছিল, এই সত্য কথা এখন অতীত ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের সেই ক্ষণিক রাজধানীতে আমাদিগকে কতক দিন থাকিতে হইয়াছিল। যতীনও গ্রাম ছাড়িয়া তখন সহরে আসিয়াছে। সে সহরেরই কোন স্কুলের হেড্মাষ্টার। দেবতাও তাহার সঙ্গে।

একদিন আফিস হইতে ফিরিতেছি, রাস্তায় দেখি যতীন্ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত আমাদেরই একজন পুরাতন সহপাঠী ভূপেন্দ্র আলাপ করিতেছে। ভূপেন্দ্র, লেখা পড়ায় যে কখনও ভাল ছিল তাহা নহে, কিন্তু লক্ষ্মী আজ তাঁহার স্বর্ণঝাঁপির মুখ তাহার নিকট খুলিয়া ধরিয়াছে, সে দু' হাতে যত ইচ্ছা নিতেছে। সে আজ একটি সুবৃহৎ তূলার কারবারের সাহেব মালিকের বড়বাবু। অন্যান্য বড়বাবুদের মত উদরের অত্যধিক স্ফীতির জন্য তাহার আকৃতি ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে। হয়ত আর কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ যখন তাহাকে দেখিব, তখন তাহাকে প্রকৃত বড়বাবুরই মত দেখিব।

যতীন্ বলিল ভূপেন আজ তার অতিথি। আমাকেও তাহার বাসায় যাইতে হইবে, উদ্দেশ্য কিছু জলযোগ। আমি চির দিনই খাবারের লোভী, অতএব এই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

দেবতাকে আর কখনও দেখি নাই, সেই দিনই প্রথম দেখার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহার সহজ, সরল, আড়ম্বরহীন ভাবে সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

কিন্তু দেবতাই আমাকে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় কোথায় তাহা বুঝিতে অবসর দিয়াছিলেন। আজ তাঁহাকে তজ্জন্য প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা

জানাইতেছি। সেই দিনই আমি মুসলমান হাফেজ বুঝিতে পারিলাম, আমি কি, আমার স্থান কোথায় ?

যথা সময়ে উভয়ের জন্য জলযোগ আসিল। আমি মুসলমান, আমার জন্য এনামেলের অপরিস্কার চা দানিতে, আর বড়বাবুর জন্য সুমার্জ্জিত থালায়। আমার আসন বাহিরে, একখানা জীর্ণ, ময়লা, অব্যবহার্য্য পিড়িতে, তাঁহার আসন ধবল প্রকোষ্ঠে, গালিচায়। আমার চোক্ ফাটিয়া জল বাহির হওয়ার উপক্রম হইল। তখন আয়েষার কথা মনে হইল। আমি পুরুষ, আমি যে পার্থক্য দেখিয়া ব্যথিত, ক্ষুব্ধ হই, সে নারী, সে যে তাহাতে অধিক ব্যথিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি ? আর আমার চিরজীবন-বন্দিতা দেবতার মধ্যেই যদি এইরূপ বিভিন্নতার ভাব থাকিতে পারে, তবে সাধারণের পক্ষে যে সেই বিভিন্নতার পরিণাম কত বেশী, সেই দিনই প্রথম তাহা বুঝিতে পারিলাম।

একবার মনে হইল, না, খাইবনা, চলিয়া যাই। কিন্তু চিরজীবনের বন্ধুত্বকে পায়ে দলিতে মন চাহিল না। তাই শেষ পর্য্যন্ত সমাধা করিয়া অসুস্থতার ভান করিয়া বাহিরে ছুটিয়া পড়িলাম। মুক্ত বায়ুতে আসিয়া আমি প্রাণ পাইলাম। কেবল এইখানে হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য নাই, অপ্রীতি নাই, থাকিতে পারে না, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম।

কয়দিন পর্য্যন্ত মনটা বড়ই খারাপ লাগিল। সে যে কি যাতনা তাহা বলিতে পারি না। যতীন্, আমার শৈশবের, যৌবনের অকৃত্রিম সুহৃদ, তার হাতেই যদি আমার এই পরাজয়, তবে অন্যের নিকট আর কি অধিক আশা করিতে পারি ?

সময়ের ব্যবধানে অশান্তি যখন একটু কমিয়া আসিল, মনটা যখন একটু ধৈর্য্য ধরিবার অবসর পাইল, তখন একবার বিষয়টার সমস্ত দিক বিশেষ করিয়া আলোচনা করিবার অবসর পাইলাম। সেই সময় বুঝিতে পারিলাম, আমার পক্ষে রাগ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমি মুসলমান, সে হিন্দু। আমাদের ধর্ম্ম পৃথক, সমাজ পৃথক, সামাজিক ও পারিবারিক আচার ব্যবহারও পৃথক। তাহাদের সমাজের বিধানে আমার স্পর্শ তাহাদের নিকট অপবিত্র। তাহারা সমাজেরই জীব, অতএব তাহাদের বাটীতে জলযোগই করি, আর ভাতই খাই, উভয় দিক দিয়াই আমি অপবিত্রতার দিক্‌টা ভারাক্রান্ত করি। এই যে সামাজিকতার ব্যবধান, ইহাই হিন্দু-মুসলমানকে দূরে দূরে রাখিয়াছে।

অবজ্ঞার ভাব এই ব্যবধানকে আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু মুসলমানের প্রতি হিন্দুর যে অবজ্ঞা তাহা আমরাই সৃষ্টি করিয়াছি। আমরা যদি খাবারের লোভটা সংবরণ করিয়া আত্মমর্য্যাদার দিক্‌টাকে উন্নত রাখিতে পারি, তবে আমরাও অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাই, হিন্দুগণও অসম-সামাজিকতার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন দিন দিন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহা সুযোগ পাইয়া আবার জোড়া লাগিতে পারে।

হিন্দু তাহার হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া, মুসলমান তাহার মুসলমানত্ব বজায় রাখিয়া যদি মিলিতে পারে, তবেই মিলন সম্ভব, নতুবা নহে। মিলনের একমাত্র অন্তরায় এই অবজ্ঞার ভাব। ইহা কি এক দিন দূর হইবে না?

আমরা বিদ্যায়, বিভবে, সাহিত্যে, দর্শনে, বড় হইতে পারিলে কখনই অবজ্ঞাত থাকিব না, থাকিতে পারি না। আজ মুসলমান সেই নবজীবনের পথিক, খোদা মুসলমানকে এ জীবনে জয়যুক্ত করুন, মুসলমান ভারতবর্ষের সন্তান বলিয়া সর্ব্বত্র গৌরবের অধিকারী হউক।

যতীনের বাড়ীতে সেই দিন যে ব্যথা পাইয়াছিলাম, তাহা আজ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছি। হৃদয়ে এখন একটুও ময়লা নাই, তাহা পূর্ব্বেরই মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। যতীনের স্ত্রী যে আমাকে মিলনের অন্তরায় কোথায় তাহা বুঝিবার অবসর দিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহাকে শত ধন্যবাদ। বলিতে ভুলিয়াছি, আমাদের বাল্য-প্রণয় এখনও অটুট আছে, কেবল দেবতা স্বর্গ হইতে মর্ত্তে নামিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ।

প্রেমিকের পণ।

(শেখ সা'আদীর গোলেস্তান হইতে সঙ্কলিত।)

হান যদি তীক্ষ্ণ অসি মস্তকে আমার
তবু প্রিয় ছাড়িব না অঞ্চল তোমার।
তোমার নিকট ছাড়া কোথাও যে আর
নাহি আছে স্থান মোর মাথা রাখিবার।
পলা'বার যদি কভু হয় প্রয়োজন,
পলাইব প্রিয় আমি তোমারি সদন।

মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ

শাপমুক্ত।

(১)

অভিশপ্ত—অভিশপ্ত—কত দিন অভিশপ্ত আছি
আজ তাহা মনে নাহি হয়,
কত দিন—কত মাস—কত বর্ষ—কত যুগ আসি'
একে একে হ'য়ে গেছে লয়!
কাদামাখা—ছিন্ন বেশ—
কারেও দেয়নি ক্লেশ
সবাই করিয়া গেছে নিঠুর পাষাণ সম হায়
নিরমম ক্রূর আচরণ,
তখনো সহিয়াছিনু সে বেদনা—তব মুখ চেয়ে
হে দয়াল! হে বিশ্বশরণ!

(২)

আজি তাহা মুছে ফেল—দূর কর ক্লান্তি ক্লেদ ভার
শুভক্ষণে হে প্রিয়দর্শন,
স্থির সৌদামিনী সম আলোকে ভরিয়া দেহ মোর
মুগ্ধ দু'টি তৃষিত নয়ন!
মিশে যাক পাপ তাপ
সীমাহীন অভিশাপ
নূতন ভুবনে মোরে কৃপা করি কর উপনীত
চড়াইয়ে প্রীতিপুষ্প-রথ,
আর কতদিন প্রভু—একাকী চলিব অন্ধকারে
অশ্রুময় দীর্ঘ রাজপথ?

শেখ ফজলল করিম।

আমাদের কথা।

যে করুণাময়ের মঙ্গলেচ্ছায় বিগত ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে "কোহিনূরে"র দীপ্তি ফুটিয়া উঠে—তাঁহারি ইচ্ছালীলায় মুসলমান সাহিত্যপত্রের চিরন্তন ভাগ্যফলে সার্দ্ধ এক বৎসরের মধ্যে "কোহিনূরে"র তিরোভাব।

বাঙ্গালী মুসলমান পাঠক সাহিত্যিকের যথেষ্ট সহানুভূতির অভাব স্বত্বেও অর্থাভাবজনিত নানা অসুবিধা মাথায় করিয়া একমাত্র সেবা ও কল্যাণের প্রেরণায় আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে নবপর্য্যায়ে আমরা অব্যাহত ভাবে "কোহিনূর" পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলাম। জাতীয় সাহিত্যচর্চ্চার বিকাশে এবং এক-দল শক্তিশালী নবীন মুসলমান সাহিত্যিকের সৃষ্টি ও সমবায় সাধনে নবপর্য্যায়ের "কোহিনূর" স্বীয় স্বার্থকতাগৌরবে হিন্দু-মুসলমান সুধী ও সাহিত্যিক সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে দেড় বৎসরের মধ্যেও মুসলমান পাঠক-সমাজ আমাদের এই সাহিত্য-সাধনার উপযোগীতা ও আবশ্যকতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া "কোহিনূরে"র জীবন রক্ষার জন্য মুক্তপ্রাণে অগ্রসর হইলেন না। আমাদের আকুল আহ্বানে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক আমাদের সামর্থ্য সামান্য, আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ রোগ-শঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়া খোদাতালা আমাদের সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়া লইলেন। গ্রাহক ও পাঠকের অনুগ্রহ নাই—প্রবীন লেখক সাহিত্যিকের আগ্রহ নাই—কর্ম্মসাধনায় সহযোগীর সাহায্য নাই—ধনবান সাহিত্য-রসিক মহাজনের পৃষ্টপোষণ নাই—এরূপ অবস্থায় আর কি হইবে? ১৩১৯ সালের ৭ম ও ৮ম সংখ্যাদ্বয় মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে উদ্ধার লাভের পুর্ব্বেই শত সাধের নবপর্য্যায়ের—"কোহিনূর" অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমরা গ্রাহকবর্গের সুতীব্র ঘৃণা ও বিরাগের বিষয়ীভূত হইলাম। "কোহিনূর"কে জাতীয় জীবন-সাধনার অঙ্গ মনে করিয়া কেহই ইহার উদ্ধার সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ইহার পর দীর্ঘ এক বৎসর ঘুরিয়া গেল সমাজে আর

সাহিত্য-পত্রের উদ্ভব হইল না। ইহা মুসলমানের দারুণ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

সাহিত্য-চর্চ্চা ব্যতীত জাতীয় মনীষা জাগ্রত হয় না। উন্নত চিন্তা জাতীয় মনঃপ্রাণকে নিনাদিত ও উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে পারে না। সাহিত্য জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান।

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে একখানিও মাসিক পত্র নাই; তন্নিমিত্ত সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি কল্পে মাসিকপত্রের প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া "কোহিনূর" আবার প্রকাশিত হইল। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যদি এইবার আমাদের সহায় হন—"কোহিনূরে"র জীবন রক্ষার্থ স্বদেশ ও স্বজাতি-হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার পৃষ্টপোষক হন—তাহা হইলে ভরসা হয় "কোহিনূর" আর বন্ধ হইবে না। "কোহিনূরে"র পরিচালক বিশেষ সম্পদশালী ব্যক্তি নহেন। ভরসা করি সকলে এ বিষয় মনে করিয়া যাহাতে সমাজে একখানি মাসিক পত্র স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

আমরা "কোহিনূর" পরিচালনায় কোনরূপ কৃতীত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারি নাই। আমাদের উদ্যম পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইয়াছে। তত্রাচ সমাজের অভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা পুনর্ব্বার এই বিড়ম্বনাপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম।

আমরা অকৃতী—অকিঞ্চন এবং দুর্ব্বল। মঙ্গলনিদান করুণাময় আমাদিগকে নববলে বলীয়ান করিয়া মঙ্গল—শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন। আমাদের ভবিষ্যৎ সাধনার পথ সম্পূর্ণরূপে কণ্টক বিমুক্ত হউক। সুধীসজ্জনগণ আমাদের সহায় হউন। আমরা সকলের প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] পৌষ, ১৩২২। [৯ম সংখ্যা।

অপরাজিতা।

যত দুঃখ দিবে দেব! যত বার বার
কঠিন নির্ম্মম করে করিবে আঘাত,
তত আরো বেশী করে হে হৃদয়-নাথ!
জড়ায়ে ধরিব তোমা অন্তরে আমার!

একে একে নিভাইয়ে প্রদীপ আশার
যত আন অন্ধকার সারা বক্ষ ভরি'
তত আরো প্রেমময়! প্রাণ-পণ করি
রাতুল চরণে লব শরণ তোমার!

নিবিড় তিমির আর বেদনা গভীর
পূজার মন্দির তব রচিবে জীবনে,
অটল বিশ্বাসে রহি' সমুন্নত শির
অর্চ্চিব তোমারে সদা একাকী নির্জ্জনে!

বিশ্বরাজ পিতা তুমি করুণা-আধার,—
বিজয়ী পূজারি সুত আমি যে তোমার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

হজ্‌রত বহ্‌মান শহিদ।

(প্রসিদ্ধ পিরস্থান।)

সুয়াতা বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের পারাজ ষ্টেসন হইতে ইহা তিন মাইল উত্তরে এবং মানকর ষ্টেসন হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। সুয়াতার উত্তর দিকের প্রান্তরে অনেক প্রসিদ্ধ পিরের সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান আছে। মুসলমানগণ এই সমাধিস্থানকে 'বহ্‌মান শহিদের আস্তানা' এবং হিন্দুগণ 'বম্মানের থান' বলিয়া থাকেন। এই পিরস্থানই সুয়াতা গ্রামকে ঐতিহাসিকের লুব্ধদৃষ্টির বিষয়ীভূত করিয়াছে।

বহ্‌মান শহিদের আস্তানার চারিদিক্ ইষ্টকপ্রাচীর বেষ্টিত। কেবল উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে দুইটি প্রবেশদ্বার আছে। দক্ষিণদিকের দ্বারটিই প্রশস্ত এবং সদর দ্বাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমাধি গৃহটি বৃহদায়তন; কিন্তু উহা পূর্ব্বে এক গুম্বজের মসজিদাকৃতি ছিল; সম্ভবতঃ গুম্বজটি পড়িয়া যাওয়ায় এখন উহা খ'ড়ো ঘরে পরিণত হইয়াছে। সমাধি গৃহের চারিদিকে অনতিপ্রশস্ত পাকা প্রাঙ্গণ, গৃহপ্রবেশের জন্য দক্ষিণদিকে একটি মাত্র দ্বার; দ্বারের সম্মুখেই (গৃহের ভিতরে) উক্ত পিরসাহেব মরহুমের পবিত্র "রওজা শরীফ" *। সমাধি-ভবনের বাহিরে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে এক সুবৃহৎ "দামামা" স্থাপিত আছে; পুরুষপরম্পরাগত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে এই মকুবেরা শরীফের † খাদেমগণ ‡ দ্বারা প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উহা ধ্বনিত হইয়া থাকে। দেড় মাইল দূর হইতেও সে ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

সমাধি-ভবনের প্রাচীরের বাহিরে চারিদিকেই ময়দান। উত্তরদিকের ময়দানের লাগ উত্তরে জঙ্গল,—উহার নাম "বম্মানের রাখা জঙ্গল"। ময়দানে অসংখ্য নূতন ও পুরাতন সমাধি। সমাধিমন্দিরের পূর্ব্বদিকে এক প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। উহা "পিরপুকুর" বা "বম্মানপুকুর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে, সামান্য দূরে "ফকিরপাড়া" নামে অনেক কালের পুরাতন একটি পল্লী আছে; এখনও তথায় কতিপয় ফকিরের

---

* পবিত্র সমাধি। † পবিত্র সমাধি। ‡ পরিচারকগণ।

বাসস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা "বহ্মানের ফকির" বলিয়া আপনাদের গৌরব ও বংশ-মর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই সমাধি-ভবনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য "বহ্মানপুর" নামক একটি নজুরাত বা পিরোত্তর নিষ্কর মহাল আছে, তাহা হইতে বার্ষিক ২২৩৷৹ টাকা আমদানি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অনেক গ্রামে উক্ত "হজরত বহ্মান শহিদের" নজুরাত বা পিরোত্তর সম্পত্তি আছে। কিন্তু বর্ত্তমান মতওল্লি-দিগের শৈথিল্যে ও অযত্নে সেই সকল সম্পত্তির আয় পরের ভোগে লাগিতেছে, এই পিরস্থানের কোন কাজেই আসিতেছে না। বহ্‌মান শরীফের সমাধি-ভবন "দরগাহ্‌" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য উহার মতওল্লি ও খাদেমগণের বাসস্থানকে অদ্যাপি লোকে "দরগাপাড়া" বলিয়া থাকে। উহার অন্য নাম "জোত মস্‌উদ" এবং উহা বর্দ্ধমান কালেক্টরীর ৯৯৭ নং তৌজিভুক্ত আয়মা।

এই মকবেরা শরীফ জেয়ারত * করিবার জন্য প্রত্যহই দু-একজন লোকের এবং প্রতি রবিবারে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। হিন্দু-মুসলমান অনেক নরনারী, রোগ-উপশম ও সন্তানলাভ কামনায় ভক্তিসহকারে এই রওজাশরীফে গমন ও বহ্মান পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর ১লা মাঘ ও তাহার পূর্ব্ব দুই দিন এই স্থানে অসংখ্য নরনারীর জনতা হয় এবং তাহাদের অবগাহনে বহ্মান পুষ্করিণীর জল কর্দ্দমময় হইয়া যায়। উক্ত দুই দিবস দিবারাত্রি অবিচ্ছেদে এই স্নান ব্যাপার চলিয়া থাকে। তদুপলক্ষে ঐ স্থানে ঐ তিন দিবস এক বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা এতদঞ্চলে "বহ্মানের মেলা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উক্ত মেলা উপলক্ষে ঐ তিন দিন মহতী জনতার সমাবেশ হয় এবং নিকট ও বহু দূরদূরান্তর হইতেও নানা-শ্রেণীর বহুতর দোকানদার নানাজাতীয় দ্রব্যসম্ভার সহ সমাগত হয় এবং বিক্রয়াধিক্য নিবন্ধন প্রচুর লাভবান্‌ হইয়া থাকে।

বহ্‌মান শরীফের প্রকৃত নাম সৈয়দ মহমুদ বহমানী। তিনি বাহমন-রাজ-বংশধর ছিলেন, নাম হইতেই তাহা সূচিত হইতেছে। ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহার স্বর্গলাভ ঘটিয়াছিল। এই সাধু পুরুষের নাম, বর্ত্তমান মতওল্লিদিগের রক্ষিত পুরাতন কাগজপত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

* কোন বয়োধিক বা গুরুস্থানীয় লোকের সাক্ষাৎ অথবা কোন সমাধিমন্দির দর্শন করিতে যাওয়াকে মুসলমানদিগের সম্মানসূচক কথায় জেয়ারত করিতে যাওয়া বলা হয়।

বহ্‌রান শহিদের সমাধির পূর্ব্বদিকে এক মাইলের মধ্যে ভাক্ষী নামে একটি গ্রাম আছে। কথিত আছে যে, ঐ গ্রাম পূর্ব্বে ভল্লুপদ নামক হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল এবং রাজার নাম অনুসারে রাজধানীর নাম ভাক্ষী হইয়াছিল। উক্ত রাজবংশের শিবাক্ষা নাম্নী এক কুলদেবতার মন্দির "হজরত বহ্‌রান শহিদের" আস্তানার পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে অবস্থিত "সেঁহালা" নামক পুষ্করিণী-তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে ঐ রাজধানী অমরাবতী নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রথমা পত্নী রাণী "অমরার" নামে ঐ অমরাবতী নগরীর নামকরণ হইয়াছিল। অমরাবতী নগরী ভাক্ষীর পশ্চিমে চারি মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম অমরার গড়। ভাক্ষী ও অমরার গড়ে রাজধানী থাকার অনেক প্রাচীন চিহ্ন ও নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

রাজধানী অমরাবতী নগরীতে স্থানান্তরিত হইলেও শিবাক্ষাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ভাক্ষী গ্রামে সেঁহালা পুষ্করিণীর তীরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত দেবীমূর্ত্তির ভোগ-পূজা জন্য নিত্য নরবলী হইত।

মহাত্মা সৈয়দ মহমুদ বংশগৌরবে যেমন সম্মানিত ছিলেন, তেমনি ধর্ম্ম-পরায়ণ, বিদ্বান এবং তপোনিরত সাধুপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কোন মুসলমান বাদশাহ কর্ত্তৃক উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং শিবাক্ষাদেবীর সম্মুখে নরবলী প্রদানরূপ মহাপাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তদুপলক্ষে তাঁহার সহিত তাৎকালীন হিন্দুরাজের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। সৈয়দ মহমুদের পরিচালিত সেনাপতি ও সৈন্যবৃন্দের প্রবল পরাক্রমে হিন্দু সৈন্যগণ পলায়নপর হইয়া শিবাক্ষামন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমানেরা সেখানেও তাহাদের উপর আক্রমণ করিলে, সেই মন্দিরের মধ্যেই উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং সেই সংঘর্ষে ও হুলস্থূলে শিবাক্ষাদেবীর প্রতিমূর্ত্তির নাসিকা ভাঙ্গিয়া যায়। মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে হিন্দু সৈন্যগণ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঐ বিকৃত শিবাক্ষামূর্ত্তি সহ পলায়ন করিয়া অমরাবতী নগরীতে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। শিবাক্ষাদেবীর নাসিকাভঙ্গ ব্যাপারে হিন্দুরাজ বিশেষ মর্ম্মাহত ও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্করভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ধর্ম্মযুদ্ধের নামে অসংখ্য হিন্দু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চারিদিক্ হইতে পঙ্গপালের ন্যায় অমরাবতী নগরীতে সমবেত হইতে আরম্ভ করে।

অমরাবতী তখন অতি সুরক্ষিত নগরী। তাহার উত্তরে নিবিড় জঙ্গল, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে সুদৃঢ় দুর্গ। দক্ষিণদিকে সারি সারি সাতটি গড়খাই *—সে গড়খাইগুলির উপরে সুবিন্যস্ত সৈন্যশ্রেণী। সুতরাং কোন দিক্ হইতেই শত্রুসৈন্যের নগরাক্রমণ সহজসাধ্য ছিল না এবং ঐ সুরক্ষিত নগরীতে অবস্থিত থাকিয়া শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থকরণ পক্ষেও হিন্দুগণের বিশেষ সুবিধা ছিল। এইরূপভাবে সুরক্ষিত ও বলদৃপ্ত হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে।

সাধুপুরুষ মহাত্মা মহমুদের শিবাক্ষাদেবীর বা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কোন রোষ বা আক্রোশ ছিল না এবং তিনি শিবাক্ষাদেবীর বা হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন করিতেও কৃতসঙ্কল্প ছিলেন না,—তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নরবলী নিবারণ। কেবল এই সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই তিনি এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সংখ্যাধিক্য হেতু হিন্দুগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং তাপসকুল-গৌরব মহামনা মহমুদ নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। † কিন্তু তিনি অসত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষা কল্পে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামের শেষে গৌরবসূচক 'শহীদ' ‡ শব্দ যোগ করা হয়।

এইরূপ ভাবে যাঁহারা সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের 'পুণ্যকাহিনী' অনেক মোস্‌লেম-বিদ্বেষী ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিকের হস্তে পড়িয়া হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অন্যায় অত্যাচারের আদর্শরূপে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহারা প্রকৃত ইতিহাসকে গোপন করিয়া দেশের যে কি অপকার

---

* ঐ গড়খাত বা গড়খাইগুলি সম্ভবতঃ রাণী অমরার সময়ে খনিত হইয়াছিল; বোধ হয় সেই কারণেই এখন উক্ত অমরাবতী রাজধানী "অমরার গড়" গ্রাম আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। উক্ত গড়খাইগুলির অনেকাংশ এখন আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে। একটি মাত্র খাত এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া রাণী অমরার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

† এই যুদ্ধের পরে উক্ত হিন্দুরাজ্য মুসলমান করকবলিত হয়। অমরার গড় গ্রামে এখনও ঐ রাজবংশধরগণ অবস্থিতি করিতেছেন। রাজা ভদ্রপদ কুলীন সদ্‌গোপ ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি ছিল "রায়"—এজন্য ঐ রাজবংশধরগণ আজিও "রায়" উপাধিতে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। শিবাক্ষাদেবী আজিও উক্ত রায়বংশীয়গণের কুলদেবতারূপে অমরার গড় গ্রামে প্রতিষ্ঠিতা; উক্ত দেবীর দৈনিক ও নিত্যনৈমিত্তিক ভোগপূজার জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি আছে।

‡ ধর্ম্মার্থে নিহত।

করিতেছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। গুয়াতা ও অমরাবতী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের হিন্দুগণ এই আস্তানা সম্বন্ধে বলেন যে, বস্মান সাহেব হিন্দুর ধর্ম্মযুদ্ধে হিন্দুরাজের নিকট পরাভূত ও নিহত হইলেও হিন্দুরাজ দয়া করিয়া তাঁহার সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ ও সমাধির ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য পিরোত্তর সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান। কিন্তু এই প্রবাদের সমর্থনযোগ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উক্ত সমাধিভবনের প্রবেশ দ্বারের উপরে যে প্রস্তরফলক আছে, উহাতে তোগরা অক্ষরে অনেকগুলি শব্দ খোদিত দেখা যায়। ঘরের দেওয়ালে চুণ ফিরাইবার সময় সেই খোদিত অক্ষরগুলির উপরে চুণের ছড়া পড়িয়া এখন অক্ষরগুলি একরূপ ঢাকিয়া গিয়াছে। এবং প্রস্তর ফলকটি অনেক উচ্চে সন্নিবেশিত থাকায় আমরা নিম্ন হইতে অক্ষরগুলি পড়িতে পারি নাই। তৎপর সমাধি-নিরত মহাত্মার প্রতি পাছে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়, এই আশঙ্কায় আমরা সিঁড়ি সহযোগে উপরে উঠিয়া উহা পড়িবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করি নাই। তবে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া "আলাউদ্দীন" এই নামটি বহুকষ্টে অবগত হইতে পারিয়াছি। উক্ত নাম দৃষ্টে এই সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণ সময় জানিবার জন্য আমাদের ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হওয়ায়, আমরা মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত একটি প্রস্তরফলক বাহিরে আনাইয়াছিলাম। উহাতে তোগরা অক্ষরে কোরান শরীফের—"কোলেল্লা হোম্মা" সম্পূর্ণ আয়েত ও তাহার পরবর্ত্তী "তুলেজল লায়লা" সম্পূর্ণ আয়েত খোদিত আছে দেখিতে পাই। * উক্ত বচনের নিম্নে "সৈয়দুস্ সাদাত

---

* কোরান শরীফের সুরা "আল এমরানের" মধ্যে ঐ দুইটি আয়েত আছে। ঐ আয়েত দুইটির অর্থ এইরূপ ;—"বল, হে ঈশ্বর! তুমিই রাজ্যেশ্বর ; তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহারই হস্তে রাজ্যভার প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইবার তোমার ইচ্ছা হয়, তাহারই নিকট হইতে কাড়িয়া লও! তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে গৌরবান্বিত কর এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে লাঞ্ছিত কর! তুমি সর্ব্বমঙ্গলময়—তুমি সর্ব্বশক্তিমান! তুমি দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন সংঘটিত করিয়া থাক! তুমি নির্জ্জীব পদার্থ হইতে সজীব প্রাণীর সৃষ্টি কর এবং সজীব প্রাণীকে নির্জ্জীবে পরিণত কর ও যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য প্রদান কর।"

কোরান শরীফের এই দুই আয়েত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, উক্ত সমাধিভবন নির্ম্মাণের সময় হোসেন শাহ্ কর্ত্তৃক হিন্দুরাজ পরাস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য হোসেন শাহ্র হস্তগত হইয়াছিল। এজন্য হোসেন শাহ্ ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ কোরান শরীফের ঐ দুই আয়েত উক্ত প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন।

আবুল মজঃফর আলাউদ্দীন হোসেন" এই নাম ও সন ৯১৬ হিজরী এবং তৎপরে আরও কয়েকটি শব্দ খোদিত আছে। পরবর্ত্তী শব্দগুলির অক্ষর কতক কতক বিকৃত হইয়া যাওয়ায় তাহা স্পষ্ট পড়িতে পারা যায় নাই। সেগুলি স্পষ্টভাবে পড়িতে না পারিলেও, উক্ত সমাধিভবন ও সমাধিস্থ মহাত্মা যে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেনের সমসাময়িক, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা গিয়াছে।

এই আলাউদ্দীন চিতোরের পদ্মিনী উপাখ্যানের আলাউদ্দীন নহেন। ঐতিহাসিক প্রমাণে এই আলাউদ্দীন প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশধর ছিলেন এবং ইঁহার পুর্ব্বপুরুষগণ মক্কার "শরীফ" ছিলেন। ইঁহার প্রাথমিক নাম সৈয়দ হোসেন। ইনি গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া হিজরী দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে "সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ শরীফ মক্কী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই মহামান্য শরীফ রেয়াজ-উস্‌-সালাতিন গ্রন্থে "সোলতান" আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। ইনি নিজে উচ্চবংশ সম্ভুত ছিলেন বলিয়া উচ্চবংশীয় মহাত্মাগণের বিশেষ সম্মান করিতেন এবং আপন রাজ্য মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্তকুলজাত সৈয়দ, মোগল ও আফগানকে * উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। (History of Bengal by Charles Stewart, Section IV.) এমত অবস্থায় আমাদের উল্লিখিত সৈয়দ মহমুদ বহ্‌মানীকে উক্ত সোলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সম্মানিত প্রতিনিধি বলিলে ইতিহাসের বাহিরে যাইবার কোন আশঙ্কা নাই বলিয়াই বিবেচনা করি।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌ অনেক ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্য করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক জেলায় মস্‌জিদ ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন এবং ধার্ম্মিকমণ্ডলীর বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সাধুপুরুষের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণাদি দ্বারাও বহু সুকীর্ত্তি ও সদনুষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার "গৌড়ের ইতিহাসে"ও সে বিষয়ের অনেক প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপরোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সমাধিস্থানে সংরক্ষিত প্রস্তরফলকের লিপি

* শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন "তিনি (হোসেন শাহ্‌) সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও হিন্দুদিগের মধ্যে সদ্বংশজাতদিগকে উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।" (গৌড়ের ইতিহাস।)

প্রমাণ একত্র করিলে এই সমাধিমন্দির হিজরী দশম শতাব্দীতে সৈয়দ আলা-উদ্দীন হোসেন শাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তিনিই উক্ত সমাধিভবনের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য উপরি কথিত সম্পত্তি সকল নজুরাত করিয়া যাওয়া সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়।

মহাত্মা সৈয়দ মহমুদ বহমানী চারি শত বৎসরের অধিককাল লোকনয়নের অন্তরাল হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার পুণ্যময় নাম আজিও সহস্রকণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে। হিন্দুমুসলমান অসংখ্য নরনারী তাঁহার সমাধিভবনের দ্বারদেশে ভক্তি সহকারে লুণ্ঠিত হইয়া এবং "পিরপুকুরে" অবগাহন করিয়া কৃতার্থম্মণ্য ও সফলমনোরথ হইতেছেন। সাধুতাপসদিগের মহিমার এমনই প্রভাব! তাঁহাদের দেহ ধরণীর ধূলিরাশিতে মিশিয়া গেলেও, লোকে তাঁহাদের নিকট ফলাকাঙ্ক্ষা করে এবং অনেক স্থলে সফলকামও হইয়া থাকে। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে মহাত্মার বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাঁহার জীবনের এমন কোন মাহাত্ম্য ছিল, যাহার ফলে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নরনারীবৃন্দ তাঁহার সমাধি-মন্দিরে আগমন করিয়া নিজ নিজ জীবন ধন্য করিতেছে।

আবদুল লতিফ্।

মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস।

[আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত যে সকল ইতিবৃত্তগুলি আধুনিক প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিতদিগের হস্তগত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে সে গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে ৪০ খানির বর্ণনা ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের "নবনূর" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।]

তারিখ-ই হক্কি (৪১)

দিল্লীর দাসবংশীয় প্রথম ভূপতি হইতে আকবর শাহের রাজত্ব কালের ৪২ বৎসরের (ইং ১৫৯৬-৭ অবধি) ইতিহাস তারিখ-ই হক্কিতে পাওয়া যায়। লেখক তাঁহার ইতিহাসের জন্য তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন। মোহাম্মদ ঘোরী হইতে নাশিরুদ্দিন মামুদের ইতিহাস তিনি "তাব্‌কাতে নাশিরী" হইতে সংকলন করেন। ইহা ব্যতীত "তারিখ-ই ফিরোজসাহী" এবং "তারিখ-ই বাহাদুরী"র নিকটে তিনি ঋণী।

বাহাদুর লোদীর পর হইতে তাবৎ ইতিবৃত্ত তিনি লোকপরম্পরায় যেমন

শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে দিল্লীর ইতিহাস বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে ইতিবৃত্তকার বাঙ্গালা, জৌনপুর, মাণ্ডু, দাক্ষিণাত্য, মুলতান, সিন্ধু এবং কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সকল বর্ণনাই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া এ গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ কোনও উপকার হয় না। গ্রন্থকার মহাগ্রন্থ কোরানের শ্লোক দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

লেখক শেখ আব্দুল হক তাইমুরের এক অনুচরের বংশধর। তাহা হইলেও তিনি দিল্লীবাসী ছিলেন। বাল্যাবধিই আব্দুল হক বিদ্যানুরাগ দেখাইয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর বয়ক্রম কালে আব্দুল হক সমগ্র কোরান শরীফ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এই সময় তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কেবল পুস্তক লইয়া সময়াতিবাহিত করিতেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে ক্রীড়াদি করিবার জন্য অনেক সময় অনুরোধ করিতেন; কিন্তু আব্দুল হক ক্রীড়াস্থল অপেক্ষা পাঠাগারকেই অধিক ভাল বাসিতেন। প্রত্যহ চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তিনি বিদ্যালয়ে গমন করিতেন।

তীর্থ ভ্রমণ মানসে আরবে গমন করিয়া তিনি মক্কা ও মদিনায় কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এই সময় তথাকার বিদ্বজ্জনের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া আব্দুল হক যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করেন। দিল্লীতে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার দেহ সেই স্থলেই সমাহিত করা হয়। তাঁহার বিদ্যানুরাগ, ধর্ম্মপ্রাণতা ও চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য আব্দুল হক পীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখনও শত শত নরনারী তাঁহার সমাধিস্থলে সাধনা করিয়া থাকেন।

ভ্রমণ, সমালোচনা, ইতিহাস এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "মদিনা শকিনা" (Madina Sakina) "মদারিজুন নবুয়াৎ" (Madarijun Nabuyat) "জজবুল কলুব" (Jazbul Kulub) এবং "আখবারুল আখিয়ার" সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ।

তারিখ-উস্-সিন্ধ্ (৪২)
বা
তারিখ-ই মাসুমী।

প্রথম আরববিজয়ের সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সিন্ধুদেশের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য সিন্ধুদেশ সম্বন্ধীয় যত ইতিহাস আছে তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ।

গ্রন্থখানি চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আরবদিগের দ্বারা সিন্ধু-বিজয় হইতে রাজা দাহীরের মৃত্যু অবধি বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে দিল্লী সাম্রাজ্যের আধিপত্য সময়ের সিন্ধুর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উপসংহারে 'সুমরা' (Sumra) এবং 'সম্ম' (Sammma) রাজবংশের ইতিহাস যোজিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আরঘুনিয়া বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এই গ্রন্থে প্রসিদ্ধ সাধু, হাকিম, সৈয়দ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। মুলতানের রাজাদিগের ইতিহাসও এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পরিশেষে আগ্রা হইতে পলায়ন করিবার পর সিন্ধুদেশে এবং মরুভূমিতে সুলতান হুমায়ুঁর কার্য্যাবলীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

চতুর্থ ভাগে সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক সিন্ধুদেশ জয়ের তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

ইং ১৬০০ খৃঃ অব্দে তারিখ-ই মাসুমী লিখিত হইয়াছিল। লেখকের গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য বড় মহৎ ও হৃদয়স্পর্শী। তাঁহার পুত্র মীর বুজরুগ যাহাতে "এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রাচীন কালের বিখ্যাত লোকদিগের জীবন চরিত জানিতে পারে, যাহাতে সে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে শিক্ষা করে, যাহাতে কোন্ বিষয়টি উপকারী এবং কোন্ বিষয়টি অপকারী তাহা বুঝিতে পারে এবং যাহাতে সে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রচলিত পথে ভ্রমণ করিতে পারে" সেই উদ্দেশ্যে ইতিবৃত্তকার মোহাম্মদ মাসুম এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

মাসুম সিন্ধুর ভক্কর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিত্বে তাঁহার বেশী প্রতিভা ছিল। তিনি আপনাকে "নামী" বলিয়া অভিহিত করিতেন।

সিরহিন্দীর আকবর নামা (৪৩)

পূর্ব্বোল্লিখিত আবুল ফজলের আকবর নামা ব্যতীত পারস্য সাহিত্যে অপর একখানি আকবর নামা আছে। ইহার রচয়িতা শেখ ইল্লাহদাদ ফৈজী সিরহিন্দী। তিনি সিরহিন্দ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরহিন্দীর পিতা মোল্লা আলি সের একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

সিরহিন্দীর আকবর নামায় নূতনত্ব কিছু নাই। তিনি তবকাতে আকবরী ও আবুল ফজলের আকবর নামা হইতে আপনার ইতিবৃত্তখানি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ইং ১৬০২ খৃঃ অব্দ অবধি ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

ওয়াকিয়াৎ (৪৪)

এখানি প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস নামের যোগ্য নহে। আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ সুপণ্ডিত ফৈজী সম্রাটকে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন, এ গ্রন্থখানিতে সেই-গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র। ইহা হইতে বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক সমাচার পাওয়া যায় না। তবে পত্রাবলী সুপ্রসিদ্ধ শেখ ফৈজী লিখিত বলিয়া লেপ্টেনাণ্ট প্রিচার্ড সাহেব সে গুলিকে ইংরাজীতে অনুদিত করিয়াছিলেন।

তকৃমিলা-ই-আকবর নামা (৪৫)

ইহা সুবিখ্যাত আকবর নামার পরিশিষ্ট মাত্র। আকবর শাহের রাজত্ব কালের শেষ চারি বৎসরের ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আপনিই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—"মহামহিমান্বিত সম্রাট এইরূপ প্রশংসনীয় আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, আকবর নামা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং আবুল ফজল আর ইহজগতে নাই" বলিয়া তিনি এই সুউচ্চ বর্ণনা সমাপ্ত করিবার সুখানুভব করিতে পান নাই; সুতরাং যে চারি বৎসরের ইতিহাস বর্ণিত হয় নাই তাহা এই দীন ব্যক্তি সঙ্কলন করিবে।"

তকমিলার লেখক ইনায়েতুল্লা। লেপ্টেনাণ্ট চামার্স (Chalmers) ইহার অনুবাদক এবং এলফিনষ্টোন প্রভৃতি ইহার প্রমাণ সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন।

মন্তাখাবুত তওয়ারিখ্। (৪৬)

(Muntakhabut Tawarikh)

বা

তারিখে বাদাউনী।

সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যকালে রচিত মন্তাখাবুত তওয়ারিখ বা তারিখে বাদাউনী নামক ইতিবৃত্তখানি তবকাতে আকবরী এমন কি আকবর নামার সমান বিখ্যাত ও মূল্যবান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ এলফিন্‌ষ্টোন প্রমুখাত ইংরাজ ইতিবৃত্তকারগণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাদাউনী প্রণীত এই গ্রন্থখানিকে আবুল ফজলের সুবিখ্যাত আকবর নামা হইতেও উচ্চস্থান প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন আকবর নামা সম্রাটের পরম সুহৃদ আবুল ফজল বিরচিত সুতরাং তাহা ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত। বাদাউনীর ইতিহাসে তাদৃশ চাটুবাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় আবুল ফজল প্রভুভক্তি দেখাইতে গিয়া

সম্রাট চরিত্রকে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। আবদুল কাদের বাদাউনীর স্বাধীন চিত্রে সম্রাটের ওজস্বিতার অধিক বিকাশ হইয়াছে।

আকবর নামার তুলনায় তারিখে বাদাউনীর মূল্য যেরূপই হউক, বাদাউনী প্রণীত গ্রন্থখানি যে এতাবৎ কাল ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সকলের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা নিঃসন্দেহ। অবশ্য সম্রাট আকবরের উপর গ্রন্থকারের অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ ছিল তাহা পরে বলিব। কিন্তু এই অসন্তোষের ফলে যে বাদাউনী তাঁহার ইতিহাসে সম্রাটের চরিত্র একটু কঠোরতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এবং সম্রাটের চরিত্র এইরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এই পুস্তকখানি তাঁহার প্রভুর সাম্রাজ্যকালে প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যকালে তাঁহার পুত্রগণ ইতিহাসখানি প্রকাশিত করেন। সমসাময়িক সাহিত্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যকালের দশ বৎসর কাল (১০২৫ হিঃ অব্দ) অবধি এ ইতিহাসখানি অজ্ঞাত ছিল।

দিল্লীর প্রথম মুসলমান ভূপতির রাজত্বকাল হইতে ইং ১৫৯৫-৬ খৃষ্টাব্দ অবধি সময়ের ইতিহাস এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে লেখক স্বয়ং বলিয়াছেন—"শৈশবাবধি আমি ইতিহাস ভালবাসি। এমন সময় কাটাই নাই যখন আমি কোনও ইতিহাস লিখি নাই বা পড়ি নাই। আমি ভবিষ্যতে মুসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতে আধুনিক সময় অবধি দিল্লীর ভূপতিদিগের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিবার সংকল্প মনে মনে সর্ব্বদাই করিতাম।" লেখকের আর্থিক অবস্থা তত সুবিধাজনক ছিল না, কাজেই তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইয়াছিল। কেবল যাহা সত্য তাহা লিপিবদ্ধ করা তাঁহার উদ্দেশ্য, একথাও তিনি গ্রন্থারম্ভে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেবল দিল্লীসিংহাসনের ইতিহাস লিখিয়াই বাদাউনী সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কাশ্মীর, গুজরাট, বাঙ্গালা এবং সিন্ধুপ্রদেশেরও পূর্ব্বাপর ইতিহাস তিনি এ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করেন। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার সে আশা পূর্ণ করেন নাই।

তারিখে বাদাউনীতে নিম্নলিখিত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—

(১) গজনীর ভূপতিদিগের শাসনকালের ইতিহাস।

(২) দিল্লীর ভূপতিদিগের শাসনকালের ইতিহাস।

(৩) সম্রাট বাবর হইতে সম্রাট আকবরের সময়াবধি ইতিহাস।

(৪) সম্রাট আকবরের শাসনকালের ইতিহাস।

(৫) ৩৮ জন শেখ এবং পুণ্যাত্মার ইতিহাস।

(৬) ৬৯ জন বিদ্বজ্জনের জীবনী।

(৭) ১৫৩ জন কবির বর্ণনা।

(৮) উপসংহার।

মোটের উপর মূল গ্রন্থখানি ৫৬২ ফোলিও পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যে কেবল সম্রাট আকবরের শাসনকালের ইতিহাসই সম্পূর্ণ গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। আইনে আকবরী ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়া আধুনিক ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠকের সুবিধা হইয়াছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাদাউনীর ইতিহাসখানি কেহ ভাষান্তরিত করেন নাই। ইলিয়ট সাহেব তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ইহার সামান্য অংশ অনূদিত করিয়াছেন মাত্র এবং এলফিন-ষ্টোন সাহেব স্থানে স্থানে প্রমাণের জন্য ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইলিয়ট সাহেব বলেন—এ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ ভাবে অনূদিত করিবার পক্ষে কতকগুলি অন্তরায় আছে। ইহাতে অনেকস্থলে এমন পারস্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে তাহা সহজে বোধগম্য নহে। ইহা ব্যতীত সমসাময়িক ইতিহাস উত্তমরূপে না জানিলেও বাদাউনীর ইতিহাস সহজে আয়ত্ত করা যায় না। পুস্তকের মধ্যে নানাস্থলে ধর্ম্মতর্ক, জীবনচরিত, স্বপ্নাবৃত্তি প্রভৃতি সন্নিবেশিত করিয়া লেখক অনুবাদকের কার্য্য অধিকতর দুরূহ করিয়াছেন।

লেখক আব্দুল কাদের ৯৪৭ হিঃ অব্দে বাদাউন * সহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্যই তিনি বাদাউনী বলিয়া খ্যাত। বাল্যাবধি বিদ্যানুরাগ বশতঃই তিনি কলাবিদ্যা, ইতিহাস এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এবং তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর জন্যই তিনি রাজ-ইমাম নিযুক্ত হয়েন। যৌবনেই তিনি সম্রাট আকবরের সহিত পরিচিত হয়েন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তিনি সুপণ্ডিত শেখ মোবারক এবং তদীয় ভুবনবিখ্যাত পুত্রদ্বয় ফৈজি ও আবুল ফজলের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। বাদাউনী ও শেখ-পুত্রগণ পরস্পর পরস্পরের মেধা বুঝিতে পারিলেন। এই বিদ্বজ্জন মণ্ডলীতে

* বাদাউন শহরটি উত্তর ভারতের ঠিক কোন্ স্থলে তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। বাদাউনশহর অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একথা লেখক বলিয়াছেন।

বাস করিতে করিতে আবদুল কাদের যথেষ্ট আত্মোন্নতিসাধন করিলেন। আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ হইল এবং সকল বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব বিকসিত হইতে লাগিল।

সম্রাট আকবরের বিশ্বজনীন সাহিত্য ও ধর্ম্মানুরাগের ফলে তাঁহার সাম্রাজ্য-কালে অনেকগুলি সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ফৈজি, নকীব খাঁ, মোল্লা শাহ মহম্মদ, মোল্লা শবরী, হাজী ইব্রাহিম প্রভৃতি মুসলমান মনীষিগণ সংস্কৃত সাহিত্য-বিজ্ঞান-পুরাণাদির অক্ষয়কাননে মধু আহরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত ইতিবৃত্তকার আবদুল কাদের বাদাউনী যোগদান করিলেন। কেবল তিনি যোগদান করিলেন না, ইহাদিগের মধ্যে সংস্কৃত জ্ঞানের জন্য বেশ উচ্চ আসন পরিগ্রহ করিলেন। তিনি রামায়ণ ও সিংহাসন বত্রিশ অনূদিত করিলেন এবং মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে দুই পর্ব্ব ভাষান্তরিত করিলেন। কাশ্মীরের একখানি ইতি-হাসের অনুবাদ পারস্য ভাষায় তাঁহার সাহায্যে প্রকাশিত হইল। তাঁহার কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্রাট তাঁহাকে অথর্ব্ববেদ পারস্য ভাষায় অনূদিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া তিনি সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। ইহা ব্যতীত মূল আরবী হইতেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনূদিত করেন। বলা বাহুল্য, এ সকল কার্য্যে তিনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ফৈজির নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ফৈজি ও তদীয় ভ্রাতা আবুল ফজলের নিকট হইতে এতাদৃশ সাহায্য পাইলেও এবং ফৈজির দেবোপম চরিত্র ৪০ বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিলেও তাঁহাদিগের প্রতি বাদাউনীর আদৌ আন্তরিক অনুরাগ ছিল না। শেখ ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং বাদাউনীর ধর্ম্মমতের পার্থক্যই তাহার কারণ। বাদাউনী অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার চক্ষে সম্রাটের ও তাঁহার এই দুই অনুগ্রহ-জীবির বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবটা আদৌ ভাল লাগিত না। আকবর যে হিন্দু, জৈন, পার্শী, ইসাই প্রভৃতি নানা মতাবলম্বী লোক লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন তাহা ইস্লাম-প্রাণ আবদুল কাদেরের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইত। আবুল ফজল সম্বন্ধে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—"রাজার কার্য্যে অপ্রতিহত আনুরক্তি দ্বারা, তাঁহার কালোচিত পরিবর্ত্তনশীল স্বভাবের জন্য, তাঁহার ধূর্ত্ততার জন্য, রাজার মেজাজ ও মনোভাব অধ্যয়নের দ্বারা এবং অসীম চাটুকারিতার দ্বারা আবুল ফজল জাঁহাপনার হৃদয়াধিকার করিয়াছিলেন।" অপর একস্থলে আবুল

ফজল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"যদি তর্কের খাতিরে কেহ কোনও ধার্ম্মিক লোকের মত উদ্ধৃত করিত, তাহা হইলে তিনি (আবুল ফজল) বলিতেন, যে মতটি উদ্ধৃত করা হইল তাহা অমুক মুদি, অমুক মুচি, অমুক চর্ম্মকারের ; কারণ তিনি তাবৎ মহম্মদীয় শেখ এবং পণ্ডিতের মতামত অগ্রাহ্য করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।" ফৈজি সম্বন্ধে লেখকের ক্রোধ আরও অধিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এবং তাঁহার সম্বন্ধে লেখক যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। ফৈজির মেধার সুখ্যাতি করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"তিনি ভণ্ডামি, দ্বেষ, কাপট্য, উচ্চাভিলাষ, ঔদ্ধত্য এবং আত্ম-স্তুরিতাপূর্ণ ছিলেন। তাঁহার (ইস্‌লামের প্রতি) বৈরীভাব এবং স্বৈরিতা বশতঃ তিনি পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী খলিফা এবং তাঁহাদের শিষ্যদিগকে, হজরতের পূর্ব্ব-পুরুষ ও বংশধরগণকে, জ্ঞানী ও মহানুভবদিগকে, ধার্ম্মিক এবং দেবচরিত্র-দিগকে, এক কথায় সাধারণতঃ সকল মুসলমানকে নিন্দা করিতেন এবং সাধারণ ও গুপ্তভাবে (মুসলমান) ধর্ম্মমতকে পরিহাস করিতেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে মুসলমান ধর্ম্মের উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেন।" অবশ্য ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় যে ফৈজি বাদাউনীর সমান গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। তাহা বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বাদাউনী আগ্রহাতিশয্যনিবন্ধন যাহা বলিয়াছেন তাহা ততদূর সম্ভবপর নহে। তাহার পর তিনি ফৈজি সম্বন্ধে যে সকল গল্প বলিয়াছেন, তদনুরূপ আচরণ ফৈজির মত সুপণ্ডিতের পক্ষে কেন, কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর নহে। ফৈজি নাকি পবিত্র কোরানের একখানি টীকা অতি অপবিত্র ভাবে লিখিয়াছিলেন এবং তাহা নাকি কুক্কুর দ্বারা পদদলিত করাইয়া-ছিলেন। এই কারণে সম্রাট যখন ফৈজির মৃত্যুশয্যায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন নাকি ফৈজি কুক্কুরের ন্যায় রব করিতেছিলেন। আমাদের পক্ষে এতদিন পরে এ গল্পের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও, একথা বলিতে পারা যায় যে, ফৈজী বাদাউনীর মত নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন না বলিয়া, ক্রোধ বশতঃ ধর্ম্মপ্রাণ বাদাউনী তাঁহার সমসাময়িক লেখক সম্বন্ধীয় অধর্ম্মের গল্পগুলা অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফৈজির প্রভু কোনও ধর্ম্মকে বিদ্বেষচক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং কৃতবিদ্য ফৈজি যে আপনার পিতা-পিতামহের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ নারকী আচরণ অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে কলুষিত করিবেন এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন করিলেও অপর পক্ষে উক্তরূপ কারণ বশতঃ বাদাউনীর

হিন্দুজাতির প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। হিন্দুদিগের বর্ণনায়, তিনি প্রায়ই তাহাদিগকে কাফের, নারকী প্রভৃতি বলিয়াছেন। সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রয়াগ দুর্গ নির্ম্মাণকল্পে লেখক লিখিয়াছেন—"কাফেরগণ ইহাকে (প্রয়াগকে) তীর্থস্থান মনে করে। * * * কেহ করাতের নিম্নে তাহাদের মস্তিষ্কহীন শির রক্ষা করে, কেহ তাহাদের প্রতারণাময় জিহ্বাকে দ্বিখণ্ডিত করে, আর কেহ কেহ একটা উচ্চ বৃক্ষ * হইতে আপনাকে একটা গভীর নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নরক প্রবেশ করে।" হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের উৎকর্ষতা কিন্তু তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। আকবরের ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে তিনি বলেন—"শ্রমন (সন্ন্যাসী) ও ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত গুপ্ত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন। তাহারা নীতিসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এবং পদার্থ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অপর সমুদায় বিদ্বজ্জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভবিষ্যতের জ্ঞান সম্বন্ধে এবং পরমার্থিক শক্তি ও পার্থিব উৎকর্ষতায় তাহারা অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। কাজেই তাহারা আপনাদিগের মতের সত্য প্রমাণের জন্য এবং অপর ধর্ম্মের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য, ন্যায় ও সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ আনয়ন করিয়া এরূপ দৃঢ়তার সহিত আপনাদিগের মত সপ্রমাণ করিত এবং যে সকল বিষয় বিচার করিবার প্রয়োজন তাহা এরূপ দক্ষতার সহিত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিত যে, কোনও লোক সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জাঁহাপনার হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত করিয়া দিতে পারিত না।"

বাদাউনী প্রণীত মূল ফারসী ইতিহাস ভারতবর্ষে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। আমরা আশা করি পারস্যভাষাভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি ইহা আমূল অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বন্ধুর প্রতি।

(১)

বন্ধু আমার!

চিঠি লিখ্‌তে বলেছিলে,—লিখিনি তাই রাগ করেছ,—

হায়রে আমার সাধের অভিমান,

এমন করে' একটু' কথায় রাগ্‌লে কি ভাই রাজ্য চলে?

—দুঃখে আমার ফাটছে পোড়া প্রাণ!

---

* ইহা প্রসিদ্ধ অক্ষয় বট। দুর্গ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইহা বাহিরে ছিল এবং সঙ্গমও তখন অক্ষয় বট অবধি ছিল। এখন অক্ষয় বট দুর্গের মধ্যে অবস্থিত।

(২)

দোয়াত-কলম বন্ধ করে' আমি যে গো ঘরের কোণে
চুপ্‌টি করে' আছি নিরিবিলি,
চাই না তোমার কেতাব লেখা—ভাবের বাগান তৈরি করা
—সমালোচক কীটের কিলি বিলি!

(৩)

শুভ্র তরল চাঁদের আলো,—সোনামাখা সূর্য্যকিরণ
কত মধুর,—কেমন্ শোভাময়,
তা' না দেখে' খাতার পিঠে কলম ঘসে যে অভাগা,
তার কি কভু দুনিয়া দেখা হয়?

(৪)

প্রাণটা যখন ব্যথার চোটে বাহির পানে উধাও ছুটে
সুখের আশায় ব্যস্তবাগীশ হয়ে,
তখন একটু' হাল্কা হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে দেই গো তারে
ঘুমায় আবার আপন মনে শুয়ে!

(৫)

তুমি বল্‌ছ "কাব্য লেখ"—দূর্ হোক ছাই কাব্য লেখা
মিথ্যা সেটা বহুরূপীর বেশ,
যে গান বেরয় হৃদয় হ'তে সেই তো সখা আসল জিনীস
নাইকো তাতে একটু' ভাণের লেশ!

(৬)

সে গান ছেড়ে কোথায় যাব?—শান্তি আমার মনের মাঝে
তোমরা কেন শান্তিভঙ্গ কর?
নেহাৎ যদি নাছোড়বান্দা হয়ে থাক তোমরা তবে
এই চিঠিটাই "কাব্য" ভেবে পড়!

(৭)

জলের তলে চাঁদের ছবি—কত আলো, কত শোভা
গাছে গাছে ফুলের বাহার রেখে'
ঢাক বাজিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে নাম কিন্‌তে বেড়ায় যা'রা
মূর্খ তারা কিসের কাব্য লেখে?

(৮)

মিথ্যা বড়াই করে তা'রা—কথার মালা গাঁথে শুধু
ভাবের সঙ্গে জন্মে হয় না দেখা,
যাত্রাদলের জাল রাজা কি হ'তে পারে আসল রাজা?
—এগুলি ঠিক তেম্নি নকল লেখা!

(৯)

হাস্নাহেনার মধুর সুবাস মাথার ভিতর সত্যি যেন
পরীর দেশের কি কাহিনী আনে,
কি যে নেশা, কি যে আশা—কিছুই তো না বুঝে হৃদয়,
তবু যেন মগ্ন আপন ধ্যানে!

(১০)

সাম্নে এমন মজার জিনীস—এমন্ বাতাস, এমন আলো,
উদার আকাশ তারার চোকাচোকি,
এ ছেড়ে কি কাঁটাবনে "কাব্যকুসুম" চয়ন করে'
জীবনটারে নেহাৎ দিব ফাঁকি?

(১১)

ময়ূর ডাকে কেকা রবে, কোকিল করে কুহুধ্বনি,
ভ্রমর খোঁজে ফুলের কলি বনে,
আমি আমার আকুল স্বরে আপনি গেয়ে আপনি শুনি,
—সে গান শুনে শুধু একটি জনে!

শেখ ফজলল করিম।

উপাসনা।

কালের কোন্ দূর দুরান্তে মানবচিত্তে উপাসনার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, কবে কোন্ কান্তার-প্রান্তরে গিরি-গহ্বরে মানব প্রথম বিশ্বপাতার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণতি করিয়াছে, মানুষের ইতিহাস তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেনা। কিন্তু স্রষ্টার নিকটে মানবের আত্মনিবেদন মনুষ্য-সৃষ্টির মতই পুরাতন,

মানুষের দৈহিক ক্ষুধার ন্যায়ই চিরন্তন। আদি মানুষ যখন নয়ন মেলিয়া বিচিত্র ধরাধাম দেখিয়াছে, তখন তাহার মন স্বতঃই অপরূপ বিস্ময় ও পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে,—কি সুন্দর এ পৃথিবী! গাছে গাছে, লতায় পাতায় ভরা, ফুলে ফলে শোভিতা, আলোজলে সঞ্জীবিত,—কি অপূর্ব্ব! কি বিচিত্র! সুনীল সাগরের অপার উন্মাদ তরঙ্গ-লীলা, আর তাহার মধ্য হইতে তরুণ-অরুণের সুরক্তিম হাস্য বিভাস—কি বিরাট! কি মনোহর! উপরের ঐ অসীম আকাশ,—ঐ বিশালনীলিমালীলা, কোটী কোটী তারকার মেলা, সূর্য্যচন্দ্রের খেলা, আলোকের ঝলক, কিরণের ক্রীড়া,—কি অপরূপ! কি অসীম! কি সুন্দর! মনুষ্য এই সমস্ত দেখিয়াছে, আর তাহার মন বিস্ময়পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক অজ্ঞাত অনুভূত বিরাট শক্তির সত্ত্বায় তাহার অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনের পর রাত্রি আসে, ব্যোম—ভুবন ঘিরিয়া আঁধার নামে, আকাশ ভাঙ্গিয়া মেদিনী মথিয়া দিগন্ত ছিঁড়িয়া ঝঞ্ঝা ছুটে, বজ্রগর্জ্জনে প্রাণ কাঁপে, বিদ্যুৎ ঝলকে নয়ন ঝলসে, কে করে—কে ঘটায়? মানুষ সভয়বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে; আর অজ্ঞাত জগৎকারণের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া লুটাইয়া বলিয়াছে, কে তুমি ধাতা—ভয়াল বিশাল বিরাট মহান? তোমাকে প্রণাম করি, তোমাকে জানিনা কিন্তু তুমিই ঘটাও, বাঁচাও! বজ্র-বিদ্যুৎ তোমারি লীলা—জ্যোৎস্না সমীরে তোমারি খেলা—ফলে জলে তোমারি করুণা—তুমিই পরমচরম, তোমাকে প্রণাম।

কারলাইলের মতে এই ভাবে মানুষের মনে উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকাশমান বিশ্বসৃষ্টির অপার রহস্য ও অপরিসীম শক্তি-লীলা দর্শনে মানুষের মনে যে বিপুল বিস্ময় জাগিয়াছে, সেই অগাধ অপ্রমেয় বিস্ময়ের প্রকাশই উপাসনা। এই বিস্ময়ই মানুষের মনকে স্তম্ভিত করিয়া অপরিসীম শক্তিশালী স্রষ্টার সম্মুখে মানুষের মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে।

আদি মানুষের সরল চিত্তে বিস্ময় এই প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বমানবের মন ও মস্তক শুধু বিস্ময়েই স্রষ্টার উদ্দেশে নত হয় নাই, বিস্ময় অপেক্ষা ভক্তিতেও মানুষের প্রাণ আকুল হইয়া স্রষ্টার উদ্দেশে ছুটে নাই, ফলশস্যরৌদ্রজলে বিশ্বপাতার জীবনপোষণ অপার করুণা দেখিয়া মানুষের অন্তর স্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে সিক্ত হইয়াছে; জন্মিবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে ক্ষীরধারার সঞ্চার দেখিয়া—পীড়ার পূর্ব্বে বনে বনে

লতায় পাতায় জীবন-সঞ্জীবন ওষধির সমাবেশ দেখিয়া—মানুষের মন বিশ্বপাতার প্রতি অসীম প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে; অরুণের স্বর্ণ-কিরণে, চন্দ্রমার স্নিগ্ধ-হাস্যে, পুষ্পের মনোমোহন মাধুরীতে, তরুপল্লবের শ্যামশোভায়, মানুষের মন স্রষ্টার প্রতি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু উপাসনার মূল কারণ ইহার কোনটাই নহে।

মুসলমান শাস্ত্রমতে পৃথিবীতে মনুষ্যসৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, দুঃখের দাবদাহের মধ্যে উপাসনার উদ্ভব। আদি পুরুষ হজরত আদম ভূতলে মাথা লুটাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লার বন্দনা করিতেছেন; হৃদয়-ভাঙ্গিয়া আল্লার নিকটে বিনয় নিবেদন করিতেছেন। অনুশোচনার সংক্ষোভে তাঁহার দীর্ঘদেহ কম্পিত হইতেছে; পৃথিবীর তরুপল্লবের শ্যাম-শোভা প্রকৃতির উদার নগ্নমূর্ত্তি, সূর্য্যচন্দ্রের পূর্ণ দীপ্তি কিছুই তাঁহার নয়নে ঠেকিতেছেনা। তাঁহার অন্তর আকুল হইয়া ইহার ঊর্দ্ধে ও অতীতে স্রষ্টার সমীপে লুণ্ঠিত হইতেছে।

আদি মানবের এই যে বেদনা ও প্রার্থনা, ইহা অসীম সুখসুষমাময় স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া নহে। সকল সুখের উৎস—সকল সুষমার আলয়—আল্লার নিকট হইতে বিদূরিত হইয়া,জীবনের মূল হইতে স্খলিত হইয়া, জীবনের উৎস—পরমচরম প্রভু রুষ্ট হইয়াছেন,—দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন—এই দুঃখে! পুনরায় তাঁহার দয়া ও সান্নিধ্য লাভ করিবার নিমিত্ত,—সেই মূলের রসে জীবন সরস করিবার জন্য—আদমচিত্তের এই সংক্ষোভ! এই বেদনা! অশ্রুজলে তিতিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া এই প্রার্থনা। স্বর্গচ্যুতির দুঃখ ইহার নিকট পৌছিতে পারে না।

স্বর্গচ্যুত আদমের বেদনা ও প্রার্থনার মধ্যে উপাসনার মূল কারণের সূক্ষ্ম ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা বিস্ময় হইতে গভীর, ভক্তি হইতে নিগূঢ়, কৃতজ্ঞতা হইতে মধুর—তাহা মানবাত্মার ধর্ম্ম। আত্মার তাহা ক্ষুধা। নদীর সিন্ধু-গমনের মত,রবি-করে নলিনী-স্ফুটনের মত, জলদোদয়ে চাতকের আনন্দের মত, প্রদীপ পাশে পতঙ্গের সমাগমের মত, তাহা সত্য—সুন্দর ও স্বাভাবিক। অদ্ভুত অহেতুক আকর্ষণে পতঙ্গ যেমন আলোকের দিকে ছুটিয়া যায়, মানবাত্মাও তেমনি আকুল আবেগে স্রষ্টার পানে ছুটিয়া যায়; বিক্ষিপ্ত হইয়াও পুনরায় মূলের সহিত মিলিত হইতে চায়। উপাসনা ইহারই প্রকাশ। উপাসনার মধ্যে মানবাত্মা আপনাকে স্রষ্টার চরণতলে লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহারি মধ্যে হারাইয়া যাইতে চায়, —বিলুপ্ত বিস্মৃত হইতে চায়।

উপাসনার এই স্বরূপ হজরত ইব্রাহিমের ধর্ম্মজীবনে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। বালক পয়গম্বর উপাস্যের সন্ধানে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার দেলদরিয়ায় তুফান উঠিয়াছে, অন্তর আরাধনার আবেগে অশান্ত হইয়াছে। চিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, সে কৈ? সে প্রভু কৈ? সে আরাধনার ধন কৈ? লতায় পাতায় তাঁহার লেখা দেখা যায়, ফলে জলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তাঁহার দয়া হিল্লোলিত হয়, স্নিগ্ধ সমীরণে তাঁহার স্মৃতি ভাসিয়া আসে, ফুলে ফুলে তাঁহার গন্ধ পাওয়া যায়, সে কৈ? সে পাতা কৈ? সে প্রভু কৈ? সে পরমচরম জীবনস্মরণ দয়িত কৈ? তাঁহার পৌত্তলিক আত্মীয় স্বজন প্রতিমা দেখাইল, প্রতিমার সম্মুখে মস্তক নত করিতে বলিল। কিন্তু এ যে মাটির পুতুল,—হাতে গড়া, খেলার জিনীস; ডাকিলে সাড়া দেয় না, কুড়ুল দিয়া ভাঙ্গা যায়, ভাঙ্গিয়া গড়া যায়; এত সে নয়! সে কি ঐ তারা? ঐ হীরার ফুল, সোনার বাতি—ঐ মনোহর তারকাই কি সেই? না—না জ্বলিয়া নিবিয়া যায়, ফুটিয়া ডুবিয়া সরিয়া যায়, ও সে নয়। সে অত ছোট নয়। সে কি তবে ঐ?—ঐ সুধার আধার, শোভার রাশি, ঐ মধুর-মোহন গগন-শোভন চন্দ্রই কি সেই? সেই শোভাময় আনন্দময়ের কি ঐ রূপ? না-না, উহারও ক্ষয় আছে, বিলয় আছে। সূর্য্যোদয়ে উহাও মলিন হইয়া যায়। সে কি তবে ঐ সূর্য্য?—ঐ হাস্যময় জীবনময় বিরাট বিশাল সূর্য্য,—ঐ কি প্রভু? উহার উদয়ে অন্ধকার পলাইয়া যায়, আলোকে জীবন ছুটে, জীবজগৎ জাগিয়া বাঁচিয়া ফুটিয়া উঠে; ভীষণ উহার তেজ, দুর্ব্বার উহার প্রতাপ,—ঐ কি সেই বিরাট অধীশ্বর? না-না উহারও বিলয় আছে; অন্ধকার উহার চেয়েও বলবান। যাহার ক্ষয় আছে, বিলয় আছে, দুর্ব্বল ও অধীন যে, সে কখনও আমার প্রভু নহে। সে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র নহে। উহারা স্থায়ী নহে, স্বাধীন নহে। উহারা কাহার কাহিনী ঘোষণা করে? কাহার কাজ করে? সে তবে কে? এই দৃশ্যমান বিশ্বের তবে কর্ত্তা কে? কাহার সকাশে মাথা লুটাইব?

পয়গম্বরের চিত্তে প্রেরণা জাগিল, স্রষ্টার সন্ধানে উপাস্যের অন্বেষণে তাঁহার আত্মা জড়াতীত চৈতন্য-লোকে—তরুলতা-সূর্য্য-চন্দ্র-বায়ু-ব্যোম অতিক্রম করিয়া তাঁহার মন অনন্তের মধ্যে প্রয়াণ করিল। তিনি বুঝিলেন বিশ্বের যিনি স্বামী, মস্তকের যিনি প্রভু, মনের যিনি দয়িত, তিনি আল্লাহ্‌তালা—সকলের প্রধান, মহান, দয়াবান, ভয়াল ও সুন্দর। তিনি অরূপ, অপরূপ; সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, বিশাল হইতে বিশাল। চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না, হস্ত তাঁহাকে গড়িতে

পারে না, দেহ তাঁহাকে ধরিতে পারে না, কল্পনা তাঁহাকে আঁকিতে পারে না,— ধ্যানের ধন, প্রাণের প্রিয়; শ্রেষ্ঠ। তিনিই উপাস্য, আমি তাঁহাকে চাই— তাঁহারই আরাধনা করি।

সেই যে অরূপ অপরূপ আল্লার ধ্যানে তাঁহার মন মজিয়া গেল, তাহা আর টলিল না। যে আরাধনায় তিনি মগ্ন হইলেন অগ্নির দাহন তাঁহার নিকট ক্রিয়া করিতে পারিল না।

এই অরূপ অব্যয় চিন্ময় উপাস্যের আকুল অন্বেষণ ও তাহারি মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন, ইহাই আরধনার স্বরূপ। ইহাই মানবাত্মার ধর্ম্ম। স্রষ্টার সন্নিহিত হইতে না পারিলে, চিত্ত ও জীবনে তাঁহাকে অনুভব করিতে না পারিলে, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় জরজর হইয়া তাঁহার সম্মুখে লুণ্ঠিত হইতে না পারিলে, তাঁহার সহিত মিলনানুভূতির পুলকাবেশে তাঁহারি মধ্যে ডুবিয়া মিশিয়া মুছিয়া যাইতে না পারিলে, কিছুতেই মানবাত্মার শান্তি নাই। মানবাত্মার ইহাই চরম পরিণতি, সুস্থ আত্মার ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা।

জীবনে মরণে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল স্থানে সকল অবস্থায় মানুষের মন এমন কিছু অবলম্বন চাহে, যাহা দেহাতীত ও মায়াতীত—অনন্ত শক্তিময়, অনন্ত জ্ঞানময়, অসীম করুণাময়—সংসারের সুখ ও দুঃখ, ঘাতপ্রতিঘাত ও উত্থানপতনে বিচিত্র সংঘর্ষময় জীবনে যাহাকে আশ্রয় করিলে অন্তিমে সান্ত্বনা মিলে; সকল আশাআকাঙ্ক্ষা দগ্ধ হইলে চিত্ত যেখানে স্থির হইতে পারে; মানসে যাহাকে ধারণা করা যায়, কামনা যাহাকে নিবেদন করা যায়, নিবেদনে আনন্দ পাওয়া যায়, জীবন সংগ্রামে ছিন্নকাণ্ড অবসন্নমন যাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাঁফ ছাড়িতে পারে।

সকল উপায় অবলম্বন শূন্য হইলে দুঃখের মধ্যে আত্মা তাহাকে ঘিরিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া ফিরে। সুখের বিলাসলীলার মধ্যে এমন সকল মুহূর্ত্ত আসে, যখন স্বর্ণরৌপ্য তুচ্ছ হইয়া পড়ে, মণিকাঞ্চনে মন মজে না, রমণী-রূপে মাধুর্য্য থাকে না, সুকোমল শয্যায় হাস্যতরঙ্গের মধ্যে মন সহসা কাহার জন্য অশান্ত হইয়া উঠে, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কিসের অভাবে হৃদয় হু হু করিয়া উঠে। বলিতে ইচ্ছা হয়—"আমার মন যে টানে, কিসের টানে, কেউ তা জানে না!"

হজরত মুসার সময় এক মূর্খ মেষপালকের মনে মানবাত্মার এই ক্ষুধা, মূলের সহিত মিলনের এই তৃষ্ণা অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। হজরত মুসা এক পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে যাইতে এই মেষপালককে দেখিতে পাইয়া-

ছিলেন। দীন-হীন মেষপালকের মনোবীণায় তখন অপূর্ব্ব ছন্দে প্রেমবন্দনার ঝঙ্কার উঠিতেছিল,—"হে প্রিয়! তুমি কোথায়? তোমাকে পাইলে মাথার কেশ দিয়া তোমার চরণ মুছাইয়া দিতাম, পাখা দিয়া তোমাকে বাতাস করিতাম, কাল গা'য়ের দুধ দোহাইয়া তোমাকে খাওয়াইতাম, তুমি ঘুমাইলে তোমার পাশে জাগিয়া থাকিতাম, তুমি হাঁটিলে তোমার পদতলে হৃদয় পাতিয়া দিতাম, প্রভু তোমার প্রীতির জন্য আমার সর্ব্বস্ব লুটাইয়া দিতাম, প্রিয়তম তুমি কোথায়?" সরল নির্ম্মল কৃষাণপ্রাণের এই অনাহুত নিবেদন মূলের প্রতি—মানবচিত্তের স্বাভাবিক আসক্তির অতি সুন্দর অতি মধুর মোহময় অভিব্যক্তি। এই আসক্তি মানুষের জীবনে সান্ধ্য সমীরণের মত ভাসিয়া আসে, গভীর রাত্রে দূরাগত বীণাধ্বনির মত প্রাণের মধ্যে বাজিয়া উঠে এবং চিত্ত একেবারে উদাস করিয়া ফেলে। দিনের মধ্যে জীবনের কাজ করিতে করিতে মানুষ সহসা চমকিয়া উঠে—কি এক অহেতুক আকর্ষণে আকুল হইয়া পড়ে। পরমচরম প্রভুর সহিত যোগ স্থাপন করিবার জন্য, মূলের সহিত মিলনের নিগূঢ় রস পান করিবার নিমিত্ত ক্ষুধিত মর্ম্ম আর্ত্তনাদ করিতে থাকে,—

"বেশনও আজনায় চুঁ হেকায়ত মিকুনাদ,
আজ দরদে জুদাইহা শেকায়েত মিকুনদ
আজ নায়েস্তাঁ তামারা বুরিদা আন্দ,
আজ নফিরম মরদ্ ও জন্ নালিদা আন্দ"

শুন শুন বাঁশীর কাহিনী শুন,—বিরহ বেদনায় সে বিলাপ করিতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—মূলস্থান হইতে যখন আমাকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তখন হইতে আমার আর্ত্তনাদে নরনারী ক্রন্দন করিতেছে—বাঁশী কি গান গায়? বিরহ বেদনায় বিলাপ করে। সুরে সুরে তাহার মূলছিন্ন প্রাণ গুমরিয়া গুমরিয়া বেদনা জানায়। মূল হইতে তাহাকে ভিন্ন করা হইয়াছে বলিয়া দাগে দাগে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার প্রাণের বিরহ বেদনা আকুল হইয়া বাহির হইতেছে। সে সুর বড় করুণ, বড় মধুর, বড় মর্ম্মস্পর্শী। গভীর নিশীথে তাহাতেই বাঁশীর রাগিণী শুনিয়া মানবমন করুণ-বেদনায় ভরিয়া উঠে। ব্যথা শুনিয়াই ব্যথা মনে পড়ে, অশ্রু দেখিয়াই চক্ষু ভরিয়া জল আসে।

বাঁশীর যে কথা আত্মারও সেই কথা। বাঁশীই আত্মা। কবি বাঁশীর বিলাপ দিয়া মানবাত্মার ক্ষুধা চমৎকার করিয়া বুঝাইয়াছেন। আত্মার মধ্যে বিচ্ছেদের

ব্যথা লুক্কায়িত আছে, নিদারুণ শোকের ছিদ্র আছে। তাই থাকিয়া থাকিয়া কিসের অভাবে শিহরিয়া উঠে, কিসের তৃষ্ণায় আকুল হয়। আত্মা বিলাপ করিয়া বলে,—

কোন্ দেশে সে বিহরে,
কতদূরে কার ঘরে,
বাসনা পূজিতে তারে নয়নের জলে।

চাই তাহাকে চাই,—কোথায় সে? আমার প্রভু আমার উৎস, আমার চরম সে কে? সে কোথায়? তাহাকে ধরিতেই হইবে, পাইতেই হইবে, নহিলে কিছুতেই হাহাকারের নিবৃত্তি হইবে না। নহিলে সকলি বৃথা, সকলি অসার; এ জীবন শূন্য, এ অন্ধকার পারাবারে আমি একা—নিতান্ত একা।

এই যে মূল হইতে বিচ্ছেদবোধের বেদনা, নিঃসঙ্গতার নিগূঢ় অনুভূতি এবং মূলের সহিত মিলনতৃষ্ণা ইহাই আরাধনার মূল কারণ। দৈহিক উপাসনা ইহারই ফল ও পরিণাম। স্রষ্টার সন্নিহিত হইতে, মূলের সহিত মিলনের নিগূঢ় অনুভূতির রসে মজিয়া যাইতে যাইতে মানুষ উপাসনা করে; স্বীয় সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বাঙ্গ দিয়া মূলের সহিত মিশিয়া যাইতে চায়। আত্মা যখন স্রষ্টার উদ্দেশ্যে আকুল হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন বিচ্ছেদব্যথা প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ অবনত ও লুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাহাই মানবাত্মার আর্ত্তনাদ, বংশীর ক্রন্দন, বুলবুলের বিলাপ। মন যখন বিস্ময় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে, তখন মানুষ পরমপাতার সম্মুখে অবনত হইয়া গদ্‌গদ্ করিয়া প্রাণের নিবেদন ব্যক্ত করিতে চায়; মূলের সহিত মিলনানুভূতির বিমলানন্দে আত্মা যখন হর্ষে সরস হইয়া উঠে, তখন দেহ ও মস্তক পরমচরম প্রভুর পানে নত হইয়া লুটাইয়া লুটাইয়া তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইতে চায়, স্বীয় সর্ব্বস্ব তাঁহাকে নিবেদন করিতে চায়। মানুষ যতক্ষণ ইহা না করে ততক্ষণ কিছুতেই তাহার প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না, হাহাকারের নিবৃত্তি হয় না। নিঃসঙ্গতার ব্যথায়, মিলনের তৃষ্ণায় মানুষ স্রষ্টার সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া লুটাইয়া পড়ে, লুটিয়া লুটিয়া মিলনের আনন্দ পায়, আনন্দে পড়িয়া পড়িয়া লুটাইতে থাকে। ব্যথা তৃষ্ণা ভয় ভক্তি বিস্ময় ও আনন্দ যখন ভিতরে তীক্ষ্ণ তীব্র ও উদ্বেল হইয়া উঠে, বাহির তখন তাহার আবেগে কম্পিত হয়, মানুষের সর্ব্বাঙ্গে তাহার ক্রিয়া ফুটিয়া উঠে। ফল যখন ভিতরে রসে গন্ধে পূর্ণ হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পাকিয়া উঠে, বিনা বাতাসে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। তাম্রতারের অভ্যন্তরে যখন তাড়িত প্রবাহ

ছুটে তখন সমস্ত তার থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। মানুষও অমনি করিয়া আত্মার চিরন্তন তৃষ্ণায় স্রষ্টার সম্মুখে লুণ্ঠিত হয়, পরম পাতার আরাধনা করে। এই তৃষ্ণারই তাড়নায় ফিজদ্বীপের রাক্ষস-মানুষ তরবারীর পূজা করে,আফ্রিকার উলঙ্গ নিগ্রো পাথরে মাথা ঠেকায়।

মানুষ কোন দিন উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে নাই, থাকিতে পারে না। উপাস্যের সন্ধানে ও নির্ব্বাচনে ভুল হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার আভ্যন্তরীণ তৃষ্ণায় মানুষ চিরদিন মহত্তর শক্তির সম্মুখে দেহ ও মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া আসিতেছে। মানুষ আপনাকে নিবেদন করিতে চায়, মূলের মনোময় আকর্ষণে প্রভুর সমীপে সর্ব্বস্ব সহ লুটাইতে চায়, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়। জরজর কলেবরে তাঁহার সমীপে লুণ্ঠিত হইতে না পারিলে, তাঁহার সহিত মিলনানুভূতির অমৃতরসে মজিয়া যাইতে না পারিলে, কিছুতেই মানবাত্মা শান্তি পায় না; ইহাই উপাসনার সার ও ইহাই উপাসনার সাধনা।

মোহাম্মদ এয়াকুবআলী চৌধুরী।

পারস্যকবি রুদাকি।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে যখন বাগ্দাদের আব্বাসী খলিফাগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল এবং যখন খলিফাগণের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে লাগিল, তখন পারস্যে এক নবজীবন দেখা দিয়াছিল। প্রায় দুই শত বৎসর আরবদিগের অধীনে থাকিয়া ইরাণীগণ জেন্দের * অগ্নিপূজা পরিত্যাগ করিয়া ইস্লামের একেশ্বরবাদিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। পহলবি অক্ষরের পরিবর্ত্তে তখন আরবী অক্ষরের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। আরবের রীতি-নীতি ইরাণী রীতি-নীতির স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু পারস্য সকল ভুলিয়াও স্বীয় জাতিত্ব ভুলিতে পারে নাই, আরবদিগের অপ্রতিহত তেজের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু যখন কালের কুটীল চক্রে বিশ্ব-বিজয়ী আরবদিগের পতন আরম্ভ হইল, তখন পারস্যবাসিগণ পুনরায় জাতিত্ব লাভের চেষ্টা

* জেন্দাভেস্তা।

করিতে লাগিল। এই চেষ্টার ফলেই তাহিরী ও সুফারী বংশদ্বয় দুইটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের ধ্বংসের পর স্বাধীন সামানী বংশ বোখারায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইরাণীদিগের পূর্ব্বগৌরব পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিল। সামানীগণ যখন সমুদয় পারস্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন পারস্য একটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্যরূপে পরিগণিত হইল।

সামানী রাজগণ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং পারস্য ভাষার উন্নতি-কল্পে অত্যন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা নছর-বিন্-আহমুদের সময়ই রুদাকি রাজকবি হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লা জাফর অল রুদাকি। তিনি ৮৮০ খৃঃ অব্দে সমরকন্দের অন্তর্গত রুদ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আওফি লিখিয়াছেন যে তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। রুদাকি তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি বলে অষ্টম বৎসর বয়সেই সমগ্র কোরান শরীফ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং তিনি বাল্যকালেই কবিতা রচনায় ও গীতবাদ্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ক্রমশঃ তিনি সামানীরাজ নছর-বিন-আহম্মদের নিকট পরিচিত হন ও তাঁহারই আদেশে কালিলা ও দামনা কাব্য রচনা করেন। এইরূপে রাজার অনুগ্রহভাজন হইয়া রাজসভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। আওফি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জাঁকজমক রাজাদেরই ন্যায় ছিল। দুই শত দাস সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত এবং এক শত উষ্ট্র তাঁহার আসবাবাদি বহন করিয়া লইয়া যাইত।

কোন এক বিশেষ ঘটনায় রুদাকির নাম আরও খ্যাতাপন্ন হইয়াছিল। দৌলতশাহ লিখিয়াছেন যে "হামগুল্লা মস্‌তফি লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত আছে, এক সময় নছর-বিন্-আহম্মদ হিরাতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথাকার মলয় বায়ু, ফল ফুলের প্রচুরতা ও স্বর্গোপম দৃশ্য দেখিয়া তিনি এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, স্বীয় রাজধানী বোখারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নাম মাত্রও করিতেন না। এইরূপে চারি বৎসর গত হইলে তাঁহার পারিষদগণ বহুকাল বিদেশে অবস্থান হেতু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনাতেও রাজার মত ফিরাইতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা রুদাকির শরণাপন্ন হইলেন। একদা দরবারে বসিয়া রাজা নিজেই বোখারার কথা উত্থাপন করিলেন। রুদাকি স্বীয় কার্য্যসাধনের উপযুক্ত সময় ভাবিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি রাগ রাগিণী সহ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন——

"এয়াদে জুয়ে মুলিয়ান্ আয়েদ্ হমি,
এয়াদে এয়ারে মেহেরবান্ আয়েদ্ হমি।
রেগে আমু ও দরশ্‌তি হায়ে আঁ ;
জেরে পায়েম্ পুর্নিয়ান্ আয়েদ হমি।
আবে জইহুন্ বা হমাহ্ পেহ্‌নাওরি ;
খেনক্ মারা তা মিয়ান্ আয়েদ হমি।
আয় বখারা শাদ্ বাশ্ ও শাদ্ জি ;
শাহ্ সুয়েৎ মেহ্‌মান আয়েদ্ হমি।
শাহ্ মাহ্ আস্ত ও বখারা আসমান্ ;
মাহ্ সুয়ে আসমান্ আয়েদ্ হমি।
শাহ্ সরব্ আস্‌ৎ ও বখারা বোস্তাঁন্।
সরব্ সুয়ে বোসতাঁন্ আয়েদ্ হমি।"

অর্থ—"যখনই মুলিয়ানের নদীর কথা স্মরণ-পথে উদয় হয়, প্রিয় বন্ধুগণের কথা অমনি মনে পড়িয়া যায়।

আমু নদীর বালুকাময় তট যদিও দুর্গম কিন্তু চলিবার সময় রেশমের ন্যায় বোধ করি। জইহুন নদী (Oxus) যদিও অত্যন্ত গভীর (কিন্তু আমাদের প্রত্যাগমনে) আহ্লাদিত হইয়া আমাদের কোমর পর্য্যন্ত লাফাইয়া উঠিবে। হে বোখারা তুমি আনন্দিত ও দীর্ঘজীবী হও, কেন না রাজা তোমার নিকট হইতেছেন। রাজা চন্দ্রের ন্যায় ও বোখারা আকাশের ন্যায়, চন্দ্র আকাশ আলোকিত করিতে চলিয়াছেন। রাজা সর্‌ব বৃক্ষের ন্যায় এবং বোখারা বাগানের ন্যায় ; সরব্ বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চলিয়াছেন।"

নিজামি-এ-আরুদি লিখিতেছেন যে, রুদাকিকে আর গাহিতে হইল না। রাজা অস্থির হইয়া সিংহাসন হইতে নাবিয়া পড়িলেন, সম্মুখে শান্তিরক্ষকের একটি অশ্ব চরিতেছিল, আর বিলম্ব সহ্য হইল না, পাদুকা না পরিয়াই সেই অশ্বারোহণে বোখারাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রায় ছয় মাইল গমন করিয়া বুরুণা নামক গ্রামে অনুচরের নিকট হইতে পাদুকা লইয়া পরিধান করেন। এইরূপে একবারও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ না হইয়া বোখারা গিয়া পৌঁছান। পারিষদগণ এই কৃতকার্য্যের জন্য রুদাকিকে দশ সহস্র দিনার পুরস্কার দিয়াছিলেন।

শেষ অবস্থায় রুদাকি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কারণ বশতঃ রাজার বিরাগভাজন

হওয়ায় দরিদ্রাবস্থায় কাল কাটাইতেন। যদিও সামানী রাজত্বের সময় অনেক গুলি খ্যাতাপন্ন কবিগণের নাম পাওয়া যায় যথা—আবু আবদুল্লা ফারলাবি, সদিদ বল্‌খি, আবুল আব্বাস বোখারি, দকিফি, আবুল হাসান কিসাই, কিন্তু রুদাকি এই সকল কবি নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। মারুফ বলখি লিখিয়াছেন যে, তিনি কবিগণের রাজা ছিলেন। গজনবির সুলতান মহমুদের রাজকবি আন্‌সারি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি কিছুতেই রুদাকির সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ৯৪১ খৃষ্টাব্দে এই মহাকবি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

জামি তাঁহার বাহারাস্তানে লিখিয়াছেন, রুদাকি ১০ লক্ষ ৩০ হাজার পদ কবিতা রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ তাহার অতি সামান্য অংশ ভিন্ন, প্রায় সমুদয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মানীর হাটীন্‌জেন্‌ ইউনি-ভারসিটীর প্রফেসার ডাক্তার এথি বহু পুরাতন পারস্য পুস্তকাদি হইতে রুদাকির কবিতাবলীর ৪৮৪টি পদ উদ্ধার করিয়াছেন এবং তিনি আরও উদ্ধার করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করেন। আশাকরি আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যে কেহ ডাক্তার এথিকে এই কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

কবিগুরু চসার (Chaucer) যেমন ইংরাজ কবিগণের মধ্যে আদি ও আদর্শ স্থানীয়, পারস্যসাহিত্যে রুদাকির স্থানও তদ্রূপ। রুদাকি হইতেই পারস্য-সাহিত্য নবজীবন লাভ করিয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর পারস্যে আরবী ভাবের স্রোত বহিয়া আসিতেছিল। রুদাকিই সেই বিদেশীয় ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেন এবং তৎপরে পারস্য ভাবের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। তাই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ফেরদৌসিতে সেই জাতীয় ভাবের পূর্ণতা দেখিতে পাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন আধুনিক বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, পারস্যভাষা সম্বন্ধে রুদাকিও তদ্রূপ। তিনি গ্রাম্য ফারসীকে ফেরদৌসির শাহনামার ফারসীতে উন্নত করিয়াছেন। ফেরদৌসি যখন লিখিতে বসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে ভাষার একটা মাপকাটী ঠিক করিয়া লইতে হয় নাই—পুরাতন পহ্‌লবি ভাষা হইতে আধুনিক পারস্যভাষাকে বাছিয়া লইতে হয় নাই—কিন্তু রুদাকিকে এই সকল ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তাই রুদাকির স্থান এত উচ্চ—তাই আজ পর্য্যন্ত পারস্যের সকল কবি রুদাকিকে 'ওস্তাদ' (শিক্ষক) বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন।

মোহাম্মদ খলিলোল্লাহ্‌।

রত্ন-চয়ন।

ধর্ম্ম কি ও তাহার মূল কোথায় ?

(কাউন্ট টলষ্টয়ের ইংরাজি অনুবাদ হইতে।)

অতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানবগণের কার্য্যকলাপে একটা বিশেষ বৈষম্য লক্ষিত হইবে এইজন্য যে তাহারা স্ব স্ব অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়াছে—অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অন্যের অপেক্ষা ভিন্ন। 'ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রায় একই জিনীস। শুধু এইটুকু পার্থক্য যে ধর্ম্ম অর্থে আমরা বহিস্থ কোন কার্য্য সম্পাদন বুঝি, আর ধর্ম্ম-বিশ্বাস দ্বারা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে ভাব উত্থিত হইলে ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহাই বুঝি। ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনন্ত বিশ্বের সহিত মানবের গূঢ় সম্বন্ধের উপলব্ধি, এবং এই সম্বন্ধের উপলব্ধি হইতেই মানবের যাবতীয় কার্য্যের প্রণোদন আইসে। তাহা হইলেই প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস বিবেক-বিরুদ্ধ অথবা বর্ত্তমানকালীন জ্ঞানের বহির্ভূত হইতে পারে না। এমন কি ইহা অস্বাভাবিক অথবা অসম্ভব কিছুও হইতে পারে না, যদিও সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, একজন খ্রীষ্টান ধর্ম্মগুরু এক সময়ে গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন 'আমি অসম্ভব বলিয়াই এ সমুদয়কে ভক্তিভরে বিশ্বাস করি' (Credo quia absurdum)। এরূপ হওয়া দূরে থাকুক, প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসের জিনীসগুলি, সমস্তগুলি প্রমাণ সাধ্য না হইলেও, যুক্তি বিরুদ্ধ অথবা মানবজ্ঞানের বহির্ভূত নহে। বরঞ্চ জীবনের অনেক জিনীস যাহা স্বভাবতঃই বিবেকবিরুদ্ধ বা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হয় একমাত্র ধর্ম্মবিশ্বাসের সাহায্যেই সে গুলির সহজ অর্থবোধ সম্ভব।

কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। প্রাচীন যুগের ইহুদি এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অবিনশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান মহাপ্রভুতে বিশ্বাস করিত,—যিনি বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং যিনি তাঁহার বিধানপালনকারী লোকদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইহুদির এই বিশ্বাস তাহার বিবেক বা অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ ছিল না ; বরং এই বিশ্বাস তাহার জীবনের অনেক দুর্ব্বোধ্য জিনীস সহজবোধ্য করিতেছিল।

এইরূপে হিন্দু বিশ্বাস করে যে মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে বিভিন্ন জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং জীবনে সদসৎ কার্য্যসাধন অনুসারে উহার উন্নত অথবা অবনত দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে। সেও তাহার এই ধর্ম্মবিশ্বাস সাহায্যে জীবনের অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অর্থোপলব্ধি করিয়াছে।

ঐ একই রূপে যে ব্যক্তি মানবজীবনকে এক বিষম দুঃখভোগ বলিয়া বুঝিয়াছে এবং যে সমুদয় বাসনা বিনাশ করিয়া একমাত্র শান্তিলাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করিয়াছে, সেও কোন অন্যায় বা অযৌক্তিক জিনীসে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না। বরং এই বিশ্বাস দ্বারাই সে জীবনের অনেক আপাতদৃষ্ট অন্যায় ও অযৌক্তিক জিনীসের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেছে।

ঠিক এইরূপে প্রকৃত খ্রীষ্টান বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর সমস্ত মানুষের পিতা এবং এই বিশ্বাস হইতেই সে উপলব্ধি করে যে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সুখলাভ মনুষ্যের এই ঈশ্বর-পুত্রত্ব ও মানবসমুদয়ের ভ্রাতৃত্ব বোধ হইতেই লভ্য।

উপরোক্ত ধর্ম্মবিশ্বাস কয়েকটিকে অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা না যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া উহারা যুক্তি-বহির্ভূত নহে, বরং জীবনের অনেক ঘটনা যাহা সমস্ত বুদ্ধিবিবেচনা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, উহাদের দ্বারাই তাহাদের যুক্তিসম্মত অর্থবোধ হয়। এতদ্ব্যতীত এই সমস্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস শুধু মানসিক ভাবমাত্রেই পর্য্যবসিত না হইয়া মানুষের নিকট হইতে এই বিশ্বাসানুযায়ী প্রত্যক্ষ আচরণ পর্য্যন্ত দাবী করে। তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে যে ধর্ম্মশিক্ষা কতকগুলি অযৌক্তিক ও অর্থশূন্য কথার মধ্যে নিবদ্ধ, যাহার কোনই প্রয়োজন নাই বরং যাহা মানুষের জীবন সম্বন্ধীয় অনেক সত্য ধারণাকে আরও ঘোরাল করিয়া দেয়, তাহা কিছুতেই ধর্ম্মবিশ্বাস নামে উক্ত হইতে পারে না; তাহা ধর্ম্মবিশ্বাসের ব্যভিচার, তাহা হইতে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসের আসল লক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, তাহা মানুষের নিকট হইতে বিধানানুযায়ী আর কোন আচরণ দাবী করিতে পারে না, তাহা মানুষের হাতের ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত হইয়াছে। সত্য ধর্ম্মবিশ্বাস ও অধঃপতিত ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে অধঃপতিত ধর্ম্মবিশ্বাসে মানুষ উৎসর্গ ও প্রার্থনা আদি সম্পাদন করতঃ এইরূপ আশা করে যে, ঈশ্বর তাহার ইচ্ছাসমূহ পূর্ণ করিবেন এবং তাহার কাজ করিবেন; আর সত্য ধর্ম্মবিশ্বাসে মানুষ উপলব্ধি করে যে, তাহাকেই ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে হইবে এবং তাহাকেই ঈশ্বরের কাজ করিতে হইবে।

এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবই আমাদের সময়ের মনুষ্যগণের মধ্যে লক্ষিত হইতেছে। তাহারা বুঝিতেই পারে না, ইহা আবার কি প্রকারের জিনীস। ধর্ম্ম-বিশ্বাস অর্থে তাহারা বুঝে যে ওষ্ঠদ্বারা কতকগুলি বচনের অনায়াস আবৃত্তি অথবা ইচ্ছানুযায়ী ফলপ্রাপ্তির জন্য কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠান। যাজকীয় খৃষ্টান ধর্ম্ম এইরূপ অনেক বাহ্যিক অনুষ্ঠান শিক্ষা দিয়াছে।

৮

বর্ত্তমান জগতের লোক কোন ধর্ম্মবিশ্বাসই আর মানে না। সমাজের এক দল লোক যাহারা সংখ্যায় অল্প এবং যাহারা শিক্ষিত ও ধনশালী তাহারা ধর্ম্মের মায়াপাশ হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে। তাহারা এখন আর কিছুতেই বিশ্বাস করে না; এবং সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতিই ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাত করে। অথবা মনে করে যে সাধারণ মানুষকে অধীনতা নিগড়ে বাঁধিবার ইহাও এক মহা কৌশল। অন্যদিকে সমাজের অপর দল অসংখ্য নির্ধন অশিক্ষিত সাধারণজন-সমুদয়—যে সম্প্রদায়ের দুই একজন ভেদে অধিকাংশের মধ্যে এখনও সত্য-বাদিতা ও সরলতা দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা এখনও ধর্ম্মের সম্মোহন-বাগুরাজালে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মগুরুগণের প্রদত্ত সমস্ত শিক্ষাকেই ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অবলম্বন করিতেছে;—যদিও উক্ত শিক্ষা ধর্ম্মবিশ্বাস নামে অভিহিত হইতেই পারে না, কারণ উহা সমুদয় বিশ্বের সহিত মানুষের সম্বন্ধের ধারণাকে উজ্জ্বল করা দূরে থাকুক আরও কুহেলিকাময় করিতেছে।

এই ত অবস্থা! একদিকে অবিশ্বাসী কপট অত্যল্প সংখ্যক লোক, অন্যদিকে ধর্ম্মের মায়াপাশ-বদ্ধ বিশাল জন-সমাজ। ইহাই আমাদের তথাকথিত খৃষ্টান-জগতের মানবসমুদয়ের জীবন ব্যাপারের মূলসূত্র। কি ভীষণ জীবন ব্যাপার! সমাজের ঊর্দ্ধতন অত্যল্প সংখ্যক লোকের হাতে সম্মোহনজালের সমুদয় উপকরণ ও অধস্তন বিশাল জনসমাজ সেই সম্মোহননিগড়ে দৃঢ় আবদ্ধ। যে দিক হইতেই দৃষ্টিপাত কর, শাসক-সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুরতা ও অধর্ম্মের দিক হইতেই হউক—অথবা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমকারী বিশাল জনসমাজের নির্য্যাতন ও মোহাবদ্ধতার দিক হইতেই হউক, এই জীবনগতি কি ভয়ঙ্কর!! জগতে ধর্ম্মের অধঃপতনের কোন সময়েই সমুদয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, মানবসাধারণের সমতার মহাবাণী এরূপভাবে উপেক্ষিত ও বিস্মৃতির অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, যেমন আমাদের যুগে হইতেছে।

আমাদের এই যুগে মানুষের প্রতি মানুষের ভীষণ নিষ্ঠুর ব্যবহারের আর এক প্রধান কারণ আছে। শুধু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ তিরোভাবই ইহার কারণ নহে। এই কারণ বর্ত্তমান জীবনের বহুমুখীন জটিল বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যই মানুষকে তাহার কর্ম্মের ফলাফল পরিচিন্তনের প্রতি অন্ধ করিয়া রাখে। আটিলা, চেঙ্গিজ খাঁ ও তাহাদের অনুচরগণ জগতে অনেক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিকটও সমুখোসমুখি মানুষকে স্বহস্তে বধ করিবার উপায়

অতৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইত; বিশেষ এইরূপ বধক্রিয়ার ফলাফল—নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণের কাতরবিলাপ ও সম্মুখীন নরদেহের শবদৃশ্য আরও অতৃপ্তিকর হইত। এই ফলাফল চিন্তা হয়ত তাহাদের বধক্রিয়ায় নিষ্ঠুরতার মাত্রা কিছু লাঘব করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু আজকাল আমরা মানুষকে এরূপ জটিল রহস্যপূর্ণ হস্তান্তর প্রথায় বিনাশ করি এবং আমাদের সাধিত হত্যাক্রিয়ার ফলাফল এরূপ কৌশলে দূরে নীত ও চক্ষুর অন্তরাল হয় যে, আমাদের নিষ্ঠুরতার মাত্রা হ্রাস করিবার চিন্তা কখনও আমাদের মনে উদয় হয় না। এইজন্যই এক শ্রেণীর মানুষের উপর আর এক শ্রেণীর মানুষের অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহার ফলে এই অত্যাচারের আয়তন এখন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এরূপ আর পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

আমার ত মনে হয় যদি বর্ত্তমানকালে কেহ নরশোণিতের একটি পুষ্করিণী দিতে মানস করে,—যেখানে শিক্ষিত ডাক্তারগণের পরামর্শ মত রুগ্ন ধনিগণ স্নান করিতে পারে,—তবে সে মানসও সে অবাধে পূর্ণ করিতে পারে। এই কার্য্য সংসাধনের জন্য রোমসম্রাট নীরোর ন্যায় কোন ভীষণ পাষণ্ডের প্রয়োজন নাই, একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হইলেই চলিবে। তবে তাহাকে এইটুকু সতর্ক হইতে হইবে যে, সে যেন প্রচলিত আইনের গণ্ডী অতিক্রম না করে, অর্থাৎ নর-শোণিত-পাত জন্য সে কোনরূপ ভীষণতার অনুষ্ঠান না করে। কিন্তু মানুষকে এমন অবস্থায় পড়িতে হয়, যখন সে বাধ্য হইয়া নিজেই নিজের রক্ত প্রদান করে; এবং সে কয়েকজন পুরোহিত ও বৈজ্ঞানিককে হাত করে। পুরোহিত এইজন্য যে সে দশজনের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া এই কার্য্যকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, আর বৈজ্ঞানিক এইজন্য যে এই কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে। যে পুরোহিত-সম্প্রদায় আজকাল কামান, যুদ্ধপোত, বন্দীশালা ও ফাঁসিকাষ্ঠকেও পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং যে বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় আজকাল যুদ্ধ ও বেশ্যালয় প্রভৃতিরও প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহাদের নিকট এইরূপ আশা করা কিছুই অসম্ভব নহে।

নবীনওয়াজ খান।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] মাঘ, ১৩২২। [১০ম সংখ্যা।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য।

মাতৃ ভাষা।

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানহীন মৌলবী সাহেবগণের বিদ্যা ও বঙ্গদেশে উর্দ্দু পত্রিকার বিফলতা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। বাঙ্গালী মুসলমানকে বাঙ্গালা ছাড়িয়া উর্দ্দু পড়িতে বলাও যা, আর তাহাদিগকে প্রতি বেলা ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী খাইতে বলাও তাই। যিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন তিনি বোধ হয় নদীর স্রোতও পাহাড়ের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন।

বাঙ্গালার অধিকাংশ মুসলমান কুটীরবাসী কৃষক। তাহারা উর্দ্দুতে কথা কহিবে ও কাজকর্ম্ম চালাইবে? বাঙ্গালী শিশু মাতৃদুগ্ধের সহিত উর্দ্দু বুলি গলাধঃকরণ করিবে? এইরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টার সফলতায় জাতীয় শক্তি ব্যয় করা নিদারুণ মূর্খতা মাত্র।

সুখের বিষয় এই অদ্ভুত চেষ্টার গতি থামিয়া গিয়াছে এবং তাহার শিকড় শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে। ভাল হউক বা মন্দ হউক, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা মানিয়া লইয়াই

জাতীয়তা পুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জাতীয়তার অনুরোধও উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গালায় আর বলবতী করিতে পারিতেছে না। কেন না আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সমস্ত বাঙ্গালী মুসলমানগণ লীগ্ কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতেছেন তাঁহারা ইংরাজীর সহায়তায় বেশ কাজ চালাইয়া লইতে পারিতেছেন। যাঁহারা উর্দ্দু জানেন না তাঁহাদের পক্ষেও ভাবের আদান প্রদানে ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজী ভালরূপ বলিতে না পারিলেও উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রাজুয়েটগণও উর্দ্দু বুঝিতে অক্ষম নহেন। তাঁহারা উর্দ্দুর আলোচনা না করিলেও জাতীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত রাজনীতি ঘটিত ব্যাপারের আলোচনা উর্দ্দুতে হইলেও বুঝিতে পারেন। জাতীয় ব্যাপারের আলোচনা এখন একরূপ ইংরাজী ভাষাতেই নির্ব্বাহিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী মৌলবী একথাও তুলিয়াছেন যে, সভা সমিতিতে যেমন ইংরাজীর সহিত উর্দ্দুতেও বক্তৃতা করা চলে, তেমন বাঙ্গালাতেও ভাব প্রকাশ করিবার প্রথা চালান হউক।

বাঙ্গালার কোটী কোটী কৃষক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ধার ধারে না। যাঁহারা মুসলমানের জাতীয় স্বার্থ লইয়া চিন্তা ও আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই ইংরাজীতে কাজ চালাইতে সক্ষম আছেন ও ভবিষ্যতেও হইবেন; তাঁহাদিগকে উর্দ্দুর জন্য ভাবিতে হইবে না। সুতরাং জন সাধারণকে উর্দ্দুশিক্ষা হইতে নিস্কৃতি দিলে নিশ্চয়ই জাতীয়তা-বৃদ্ধির অনিষ্ট হইবে না।

সাহিত্যের ভাষা।

বিরুদ্ধ চেষ্টা যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালাভাষা মুসলমান সমাজে আপন বলে পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে। মুসলমানেরা রীতিমত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। কে কোথায় কি করিতেছেন বা বলিতেছেন তাহার অপেক্ষায় সাহিত্যসেবিগণ বসিয়া থাকিতেছেন না। বাঙ্গালা মুসলমানের মাতৃভাষা কি না, বা বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানদিগের সাহিত্য চর্চ্চা করা উচিত কি না, ইহা আলোচনা করিবার সময় এখন আর নাই; এখন ইহাই ঠিক করিতে হইবে যে বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যের ভাষা কিরূপ আকারের হইবে বা তাহাদিগের সাহিত্য-চর্চ্চা কোন্ পথে পরিচালিত করিলে জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হইবে।

আমাদের সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে এই একটা কথা উঠিয়াছে যে, আমরা বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিব না; কারণ তাহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে আমরা গৃহে ও সমাজে, কথাবার্ত্তা কাজকারবারে যে সমস্ত আরবী ও পার্শী শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সেগুলি আমরা সাহিত্যে অবাধে চালাইতে চাই। কারণ ঐ সমস্ত শব্দ আমাদের বালকেরা ও আমরা অতি সহজে বুঝিতে পারি।

এই প্রশ্নের মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন। যুক্তিবলে যে ইহা কেহ সম্পন্ন করিতে পারিবেন তাহাও নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা অন্য একটি বৃহত্তর প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে এবং তাহা লইয়া হিন্দু সাহিত্যিক মণ্ডলে বহুদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে।

এই প্রশ্ন সাহিত্যে ব্যবহারের জন্য সাধুভাষা ও চলিত ভাষা লইয়া বিবাদ। একদল সাহিত্যিকের মতে সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখিতে হইবে; কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত ও দেশ-প্রচলিত সামান্য গ্রাম্য শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না; যিনি ব্যবহার করিবেন তাঁহাকে শাসন করা যাইবে। কারণ চলিত ভাষা বঙ্গদেশে নানা প্রকারের; উহা চালাইলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নানা রূপ ধারণ করিবে এবং ভাষাও নিতান্ত হীন ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিবে। সাহিত্যের ভাষা আদর্শ সুন্দর, সতেজ ও শিক্ষনীয় রাখা চাই। এই যুক্তি প্রবল হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

অন্য দল চলিত ভাষার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ এই দলের গুরু। ইঁহারা বলেন চলিত কথা আমরা আমাদের সাহিত্যে বেশী করিয়া ব্যবহার করিব, কারণ তাহাই খাঁটি বাঙ্গালা এবং তাহাতেই ভাল করিয়া ভাব ফুটে, লোকেও সহজে বুঝিতে পারে। লোকে পড়িবে বলিয়াই ত লেখা! যেমন করিয়া বলিলে আমাদের মনের কথাটি বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, কলম আপনা আপনি চলে, শব্দের জন্য ভাবিতে হয় না, আমরা তেমন করিয়াই বলিব। শুধু তাহাই নয়, যে কথা আমরা যেমন করিয়া উচ্চারণ করি, সাহিত্যও তেমন করিয়াই লিখিব। ফলে এই শ্রেণীর লেখকগণের দ্বারা বহু গ্রাম্য ইতর জনোচিত শব্দ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এমন কোন চলিত শব্দ নাই যাহা ইঁহারা ব্যবহার করেন না। ইঁহারা 'রন্ধন গৃহ' ত দূরের কথা 'পাকশালা' 'রান্নাঘর' পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া 'হেঁসেলে' ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের কাছে 'নবীন' ত একরকম তীরস্থ, 'নূতন' পর্য্যন্ত 'নতুন' হইয়া দেখা দিয়াছে। 'পুচ্ছ' উহ্য হইয়াছে, এবং 'লেজের' মধ্য দিয়া তাহার কেবল 'ন্যাজা'টুকু দেখা যাইতেছে। ওদিকে 'মুড়ো' মহাশয় 'প্রান্তের' উপর দৃঢ়ভাবে আসন গাড়িয়া বসিয়াছেন।

এখন মুসলমানেরা যদি ইঁহাদের দেখাদেখি আপনাদের নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দগুলি সাহিত্যে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই শ্রেণীর লেখকদিগের তাহাতে বাধা দিবার অণুমাত্র উপায় ও অধিকার নাই। তাঁহারা যদি ব্যবহারের দোহাই দিয়া ঐ সমস্ত নিতান্ত জঘন্য শব্দ সাহিত্যে চালাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা 'জল' না লিখিয়া 'পানি' লিখিলে বা 'নিমন্ত্রণের' পরিবর্ত্তে 'দাওৎ' করিলে, 'বে আক্কেলির দরুণ' কোন কাজে 'লোকসান' হইলে 'অনুতাপ' না করিয়া যদি 'আব্‌সোস্' করি এবং কোন বিষয় হইতে ফল প্রাপ্তির আশা না করিয়া 'ফায়দা' উঠাইবার জন্য 'কোশেশ' করি, তাহা হইলে এই সমস্ত কথ্য ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী হিন্দু লেখকগণের আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে?

তাঁহারা যে একেবারে "লাচার" হইয়া পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ আমরা ত আমাদের ঘরে বাহিরে আচারে অনুষ্ঠানে মজলিষে ও দরবারে এই সমস্ত শব্দই দিনরাত ব্যবহার করিয়া থাকি।

কিন্তু সাধুভাষা ও চলিত ভাষার এই বিবাদের নিষ্পত্তি হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, "আমরা যাহা বলি তাহাই লিখিব" এই মতের পক্ষপাতী লেখকগণ এখনও হিন্দু সাহিত্যিক মণ্ডলে একরূপ উপহাসের পাত্র হইয়া আছেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বঙ্গভাষার সমুদয় শক্তিশালী সাহিত্যিকগণ বিশুদ্ধ রচনারীতিতে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। 'প্রবাসী'র কোন কোন প্রবন্ধ ব্যতীত বঙ্গের অধিকাংশ মাসিক ও সমুদয় সাপ্তাহিক পত্র বিশুদ্ধ সাধুভাষায় লিখিত হয়। সুতরাং জোর করিয়া বা যুক্তি দ্বারা প্রচলিত ও অপ্রচলিত অজস্র আরবী পার্শী শব্দ সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহার করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গভাষা হইতে পৃথক আর একটি নূতন বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিতে যাওয়া সমীচীন কি না তৎসম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ বিদ্যমান। এইরূপ চেষ্টায় আমরা যে বর্ত্তমান সমৃদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের আনন্দ ও সৌন্দর্য্য হইতে অনেকাংশে বঞ্চিত হইব তাহাই নহে, সে চেষ্টায় আমাদের বহুশক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইবে। এবং আমরা আরম্ভেই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব। পরন্তু যুক্তির বলে ঐ সমস্ত শব্দ চালাইলেই যে সাহিত্যযোগ্য ভাষার সৃষ্টি হইবে এরূপ মনে করাও ভুল। তজ্জন্য ক্ষণ-জন্মা লেখকের উন্মাদিনী প্রতিভার সোণার কাঠির স্পর্শের অপেক্ষা করিতে হইবে। শব্দ লিখিলেই হইবে না; সুন্দর 'করিয়া লেখা চাই। সে শব্দ এরূপ বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহাতে এরূপ টান

থাকা চাই যে শুনামাত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয় এবং মোহমুগ্ধ মন অজ্ঞাতসারে সে শব্দকে নিঃশেষে গ্রহণ করে, মন যেন অপরিচিত কোন কিছুর আভাষ পাইয়া কিছুমাত্র সন্দিগ্ধ হইবার অবকাশ না পায়। আজ যে বঙ্গ সাহিত্যে কয়েকখানি মাসিক পত্রে ও পুস্তকে দেশ-প্রচলিত খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ অজস্র পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ইন্দ্রজালই তাহার কারণ, তাঁহার প্রতিভার ইন্দ্রজাল না থাকিলে ঐ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিতে কখনই কেহ সাহস করিত না। তিনি যাহা লেখেন তাহাই মিষ্ট শুনায়,—তজ্জন্যই দেশজ শব্দ সাহিত্যে চলিয়া যাইতেছে।

আমরা মুসলমান ঐক্যের উপাসক। সকল কাজেই ঐক্যসমন্বয়ের আমরা পক্ষপাতী। বিভিন্ন জেলার দেশ-প্রচলিত কথ্যশব্দপ্রচলনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নানামূর্ত্তি গ্রহণ করুক ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। বঙ্গভাষা একে নিতান্ত কোমল প্রকৃতির ; তাহার উপরে নিতান্ত মৃদু খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের একাধিপত্য ঘটিলে বঙ্গভাষা একরূপ অবলার ভাষা হইয়া পড়িবে। মুসলমানের নিকট এরূপ নীতি মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তবে এক বিষয়ে আমাদের ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার। ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই আসল কথা। বাঙ্গালা ভাষার যে সমস্ত শব্দ আমাদের ধর্ম্মমতে বিরুদ্ধ ভাব সম্পন্ন তাহা আমরা কখনও ব্যবহার করিব না ; পক্ষান্তরে যে সমস্ত শব্দ আমাদের জাতীয় ভাব প্রকাশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে আমরা তৎপরিবর্ত্তে আরবী বা পারসী শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করিব। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যাউক।

বাঙ্গালায় "হস্তমুখ প্রক্ষালন" বলিলে যাহা বুঝায় মুসলমানের "ওজু" তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। হিন্দুর উপাসনার আসন ও মুসলমানের "মোছল্লা" বা "জায়নমাজ" বিভিন্ন পদার্থ। হিন্দুর "উপাসনা" ও "উপবাস" মুসলমানের "নমাজ" ও "রোজার" ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ। মুসলমানের 'কেবলা' 'নিয়ত' ও 'ইমানের' প্রতিশব্দ বঙ্গভাষায় অজ্ঞাত। "বেহেস্ত ও দোজখের" পরিবর্ত্তে "স্বর্গ ও নরক", "হালাল ও হারামের" পরিবর্ত্তে "বৈধ ও অবৈধ" "গোছল ও খানার" পরিবর্ত্তে "স্নান ও আহার" অবশ্যই চলিতে পারে।

কিন্তু "জবের" পরিবর্ত্তে "বলি", "বন্দেগী" বা "এবাদতের" পরিবর্ত্তে "পূজা", "সালামের" পরিবর্ত্তে "প্রণাম" কিছুতেই চলিতে পারে না। স্বর্গের "অপ্সরা"

দেবতা ও মুনিগণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু বেহেস্তী "হুর" কখনও কোন পুরুষের কাম দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় নাই। হিন্দুর "ঈশ্বর" বহু দেবত্ব ভাবের উত্তেজক, কিন্তু মুসলমানের "আল্লা" একমাত্র আল্লা। মুসলমান কখনও এই প্রকারের শব্দ পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত বাঙ্গলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে পারে না।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত কতকগুলি শব্দ আমাদিগকে সতর্কতার সহিত পরিহার করিতে হইবে। "এজন্মে", "মানবলীলা সংবরণ", "বাগ্‌দেবী", "সহিষ্ণুতার অবতার", "যমদূতের মত" এবং "শ্রীযুক্ত" প্রভৃতি শব্দ হিন্দুয়ানীর দ্যোতক ও সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ। ঐ সকল শব্দ আমরা কখনই ব্যবহার করিতে পারি না। পক্ষান্তরে আমাদের 'তৌহীদ' 'মসজিদ' 'আজান' 'রমজান' 'কেয়ামত' 'হাসর' আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবে, কারণ সমস্ত শব্দের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় নাই। নূতন শব্দ নির্ম্মাণ করিলেও "কেয়ামত" অর্থে "মহাপ্রলয়" বরং চলিতে পারে কিন্তু "হাসর" অর্থে "বিচার দিবস" বা "পুনরুত্থান দিবস" কখনই আমাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মগত ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। ধর্ম্মরক্ষার্থে যুদ্ধ ও তজ্জন্য প্রাণত্যাগ করিবার বিধান অন্য কোন ধর্ম্মে বিদ্যমান নাই, সুতরাং 'গাজি' ও 'সহিদের' জন্য 'ধর্ম্ম যোদ্ধা' ও 'ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি' প্রভৃতি ব্যবহার করিলে কেবল বল প্রকাশ করা হইবে মাত্র।

জগতের সমস্ত ভাষায় এমন কতকগুলি নিজস্ব শব্দ প্রচলিত আছে, যাহাকে ইংরাজিতে ম্যাজিক ওয়ার্ড বলে। ঐ সমস্ত শব্দের সহিত ঐ সমস্ত জাতির জীবন সাধনার সম্বন্ধ আছে; এবং মুহূর্ত্তে জাতির যুগযুগান্তের কত কাহিনী মনে পড়িয়া যায়। যেমন জর্ম্মাণীর "Father land" এবং আমেরিকানের "Congress". বাঙ্গলায় যদি বলি "তিনি মানবদেহ ত্যাগ করিয়াছেন" তাহা হইলে মনে পড়ে, তিনি বহু প্রকারের জীবদেহ ধারণ করিয়াছেন বা করিবেন। ইহা জন্মান্তরবাদে গভীর বিশ্বাসের কথা। তদ্রূপ মুসলমানের "জেহাদ"। ইহাকে "ধর্ম্মযুদ্ধে" পরিণত করিলে কখনই "জেহাদের" উন্মাদনা আসিবে না।

ফলতঃ আমরা বাঙ্গলা ভাষাকে মুসলমানী ভাষায় পরিণত না করিয়া মুসলমানের ভাবে পরিপূর্ণ করিব। দেহের দিকে না তাকাইয়া প্রাণের দিকে চাহিব। যে সমস্ত আরবী পার্শী শব্দের বিশুদ্ধ বাঙ্গলা প্রতিশব্দ আছে তাহা ব্যবহার করিয়া অনর্থক ভাষাকে জটিল করতঃ কৃত্রিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিব না। পক্ষান্তরে যে সমস্ত শব্দ আমাদের বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাবের পরিচয় দেয়,—যাহা আমাদের হৃদয়কে বহুদূরে সঞ্চালিত করে,—যাহা আমাদের বালকগণের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মগত বিশিষ্টতার প্রতি চৈতন্য উৎপাদন করে,—তাহা আমরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভাষার অঙ্গে গাঁথিয়া দিব।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী।

মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস।

ওয়াকায়া-ই-আসাদ বেগ
বা
হালাতী আসাদ বেগ। (৪৭)

এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকর্ত্তা আসাদ বেগের জীবনের স্মরণযোগ্য কার্য্যাবলীর বৃত্তান্ত। আসাদ বেগ কজবীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সপ্তদশ বৎসর সেখ আবুল ফজলের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার পর তিনি সম্রাট আকবরের কার্য্যেও কিছুদিন অতিবাহিত করেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক সমাচার পাওয়া যায়। পণ্ডিত আবুল ফজলের হত্যার বিষয় অনুসন্ধান করিবার ভার আসাদ বেগের হস্তে ন্যস্ত হয়। সুতরাং তাঁহার লিখিত আবুল ফজলের হত্যাকাহিনী যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমরা তাঁহার "ওয়াকায়া"য় আবুল ফজলের হত্যাবিষয়ক যে গল্প পাঠ করি তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তিনি বিজাপুরে দৌত্যকার্য্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজাপুরের বর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী। ফলতঃ গ্রন্থকার যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আপন গ্রন্থমধ্যে তাহাই সন্নিবেশিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাহিনী বেশ চিত্তাকর্ষক।

আবুল ফজলের হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আসাদ বেগ তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন। ফজল তাঁহাকে সিরোক্ত নামক স্থানে রাখিয়া স্বয়ং কালাবাঘের দিকে গমন করেন। আবুল ফজলের হত্যা সংবাদ পাইবামাত্র লেখক কালাবাঘের দিকে অগ্রসর হয়েন। তিনি নিহত আবুল ফজলের সম্পত্তিগুলি হত্যাকারীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। আবুল ফজলের সহিত সম্পত্তিও প্রায় চারি পাঁচ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের ছিল। আসাদ বেগ নিরাপদে সেগুলিকে লইয়া আগ্রায় পঁহুছিলেন।

আপনার বন্ধু সেখ সাহেবের হত্যা সংবাদে সম্রাট আকবর অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। আসাদ বেগকে আগ্রায় পঁহুছিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারই অমনোযোগিতার ফলে যে এরূপ কার্য্য

সম্ভবপর হইয়াছে, বাদসাহ সেইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, সম্রাট আজ্ঞা দিলেন—"আসাদকে আমার স্নানাগারে লইয়া আইস, আমি তাহাকে স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিব।" কিন্তু কম্পিত কলেবর আসাদ বেগ যখন আকবরের নিকট সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন, তখন ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা বুঝিলেন যে আসাদ বেগ নির্দ্দোষ। আকবর তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ দান করিলেন এবং পরে তাঁহাকে আপনার শরীররক্ষক সেনার নায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন। আসাদ বেগ এই সময় একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আবুল ফজলের হত্যা ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট আছে, তাহা তদন্ত করিবার জন্য সম্রাট আসাদকে প্রেরণ করিলেন। এই তদারকের সময় কতিপয় ব্যক্তি আসাদকে অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিতে চাহে। আসাদ সে লোভ সংবরণ করিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধন করতঃ ফিরিয়া আসিয়া আবার রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে তোষা-খানার ধনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় সাহজাদা দানিয়েলের সহিত বিজাপুর রাজকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। রাজকুমারীকে বিজাপুর হইতে আনিয়া আহমেদ নগরে সম্রাট-তনয়ের নিকট পঁহুছাইয়া দিবার ভার আসাদের উপর পড়িল। সদলবলে আসাদ বিজাপুর রাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে মাত্র একদিন বিজাপুরে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া বিজাপুরের রাজা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি আসাদকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া আপনার সমৃদ্ধিশালী রাজধানীতে এক দিনের অধিক রাখিতে না পারিয়া শেষে তাঁহাকে দুই লক্ষ পাগোদা (pagoda) মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইলেন। আসাদ সে উৎকোচের এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করিলেন না। কিন্তু তিনি সম্রাটের নিমিত্ত উপঢৌকনের জন্য ভূপতির সহিত যথেষ্ট দরদস্তর করিতে ছাড়িলেন না। সম্রাটের জন্য একটি বহুমূল্য হস্তী এবং মণিরত্নাদি লইয়া রাজকুমারী সমভিব্যাহারে আসাদ বেগ বিজাপুর নগর ত্যাগ করিলেন।

আসাদ বেগের সহিত বিজাপুরাধিপতি বিশুদ্ধ পারস্যভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন নাই। তিনি আপন মাতৃভাষা মারাঠীতেই সম্রাট-দূতের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। বিজাপুরের সমৃদ্ধি দেখিয়া আসাদ বেগ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন, বিজাপুর নগরের বাজার সম্বন্ধে তিনি বলেন—"মোটের উপর সমস্ত বাজারটি

মদ্য এবং সৌন্দর্য্য, নর্ত্তকী, সুগন্ধী দ্রব্য, নানা প্রকারের রত্নাদি, অট্টালিকা এবং সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। এক রাজপথে সহস্র লোক সমবেত হইয়া মদ্যপান করিতেছে, কত নর্ত্তকী, কত প্রেমিক এবং আমোদপ্রিয় লোক একত্র মিলিত হইয়াছে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কলহ করিতেছে না ;—কেহ কাহারও সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছে না। আর এইরূপ অবস্থাই চিরন্তন। বোধ হয় এই বিশাল জগতের অপর কোনও স্থলই ভ্রমণকারীর চক্ষে এরূপ বিস্ময়ের চিত্র উপহার দিতে পারিবে না!" বিজাপুরে রত্নখচিত নানাপ্রকার ছুরি, তরবারি, বর্ষা এবং অলঙ্কারাদি পাওয়া যাইত। বিজাপুরে তখন তামাক সেবন প্রচলিত ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি সম্রাটের জন্য রত্নখচিত আলবোলা ও তামাক আনিয়া জাঁহাপনাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন *।

বিজাপুরের রাজকুমারী সাহজাদা দানিয়েলের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং রাজনন্দিনী ভীমানদীর তীরে সন্ধ্যার অন্ধকারের সুযোগে সদলবলে পলায়ন করিলেন। পরদিন আবার তাঁহাকে তাঁহার পিতার কর্ম্মচারীবৃন্দ সম্রাট-দূতের শিবিরে পঁহুছাইয়া দিলেন। সম্রাট পুত্র ভাবী বধূ লইয়া আসাদকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার দানে পরিতুষ্ট করিলেন।

এই দৌত্যের পর সম্রাট আসাদকে আরও বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরও আসাদকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে 'পেশরান খাঁ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সাহজাহানের শাসনকালের প্রারম্ভেই ইহলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

---

* সেই অবধি উত্তর ভারতে তামাক প্রচলিত হয়। এ সম্বন্ধে 'অর্চ্চনা' ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

গৃহহীনের গৃহলাভ।

(১)

আমি পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। পিতৃদেব জীবনে আর একবার বিবাহ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার শেষ পক্ষের সন্তান।

আমার জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে বুঝিলাম, কোনও ঘটনা বশতঃ সমাজের লোক হইতে আমরা পৃথক্। আমাদের কোথাও নিমন্ত্রণ হইত না ;—কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের কেহ ডাকিত না। পিতার জমিদারীতে কর্ম্ম-চারীর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ বড় আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত না। ক্বচিৎ বিদেশীয় অতিথি এক আধটি আসিয়া দুই একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইত।

সংসারের এইরূপ বিরূপ অবস্থা হইলেও আমার জননী দেবীর স্নিগ্ধ স্নেহপূর্ণ হাসিটুকু চারিদিকে একটা শান্তি ও পুণ্যের রাজ্য সৃষ্টি করিত। মা যেন মূর্ত্তিমতী করুণা ছিলেন। যাহারা অসাক্ষাতে নিন্দা করে বলিয়া জানিতেন, তাহাদের প্রতিও তাঁহার করুণার অভাব দেখি নাই। তাঁহার সে দেবীমূর্ত্তিতে কেহ কোনদিন ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন দেখে নাই।

(২)

বড় হইলাম। গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পাশ হইয়া মেদিনীপুরে পড়িতে গেলাম। মেদিনীপুর হইতে এফ্-এ পাশ হইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়িতে গেলাম। এইবার মায়ের অভাব খুব অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম হোষ্টেলের ঘরে খিল দিয়া কাঁদিতাম। তার পর মনটা শান্ত হইত। অন্য কোন ছাত্রের সহিত মিশিতাম না। আপনার পড়াশুনা লইয়া থাকিতাম, আর প্রত্যহ রাত্রে মাকে একখানি পত্র লিখিতাম। সেই নীরব নিশীথে মনে হইত, যেন স্নেহময়ী মা আমার নিমেষের মধ্যে সেই অর্গলবদ্ধ গৃহে আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন ও তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদে আমাকে অভিষিক্ত করিতেছেন !

যোগ্যতার সহিত বি-এ পাশ হইলাম। তখন আইন অধ্যয়নের জন্য সকলে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পিতারও ইচ্ছা তাই। আমার ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। সেইজন্য এম্-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে বিবাহের জন্য কয়েকবার অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু শৈশবাবধি লোকসমাজ হইতে বিচ্ছিন্নাবস্থায় বাস করিয়া এবং মায়ের সমগ্র ভালবাসার একমাত্র অধিকারী বলিয়া আমি বিবাহের আবশ্যকতা তত অনুভব করিতাম না। বরং ইংরাজীকাব্য সমূহে প্রণয়মূলক উচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখিয়া কবি-কল্পনাসম্ভূত অসম্ভব প্রেমাভিনয়ের প্রতি মনে মনে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতাম।

আমি এম্-এ পড়িতে আরম্ভ করিলে জননীদেবী কলিকাতায় আমার নিকট আসিলেন। পিতা দেশেই রহিলেন। দেশের একটি বর্ষীয়সী বিধবা মায়ের সঙ্গে আসিলেন।

(৩)

পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে আমরা বাসা করিলাম, তাহার পশ্চিমদিকের বাড়ীখানিতে একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির বাস। বাড়ীখানি পুরাতন হইলেও বেশ বড়। ঘরের দেওয়ালগুলি এক সময়ে চিত্রিত ছিল। এক্ষণে তাহার সে উজ্জ্বলতা নাই,—স্থানে স্থানে বালি ঝরিয়া পড়িয়াছে। আমাদের ঝি মা আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদের বাড়ীর কথা সাগ্রহে মাকে শুনাইত। আমার পড়িবার ঘরটি দোতালার উপর রাস্তার ধারে ছিল। প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই বাড়ীর নিম্নস্থ বৈঠকখানায় সঙ্গীত বাদ্যনাদি হইত। সেজন্য সময়ে সময়ে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাতও হইত।

একদিন সন্ধ্যায় ছাদের রেইলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া টেনিসনের In Memorium পড়িতেছিলাম। যখন অন্ধকার হইয়া আসিল,—নগরের ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, তখন বই বন্ধ করিয়া আকাশের দিকে চাহিলাম। একে একে তারাগুলি আকাশে দেখা দিতে লাগিল। নির্জ্জনে সেখানে দাঁড়াইয়া কেবল—

"So many worlds, so much to do,
So little done, such things to be!"

(*In Memorium.*)

এই দুই পংক্তি কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মা ডাকিলেন, "হেমন্ত!"

"মা আসি" বলিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। মা সন্ধ্যাস্নান করিয়া আমার জন্য কিছু খাবার লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি খাইতে বসিলে উমা আসিয়া বলিল,—"মা, বলোনা।" আমি বলিলাম, "কি মা ?" বিষয়টা উমা নিজে বলিবার জন্য খুব উৎসুক হইয়াছিল, কিন্তু মায়ের ইঙ্গিতে সে অনেক কষ্টে জিহ্বাকে সংযত করিল। মা তাহাকে স্থানান্তরে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। আমি বলিলাম,—"কি মা ?"

মা বলিলেন,—"বাবা, সাম্‌নের বাড়ীর ব্রাহ্মণদের একটি বড় মেয়ে আছে; তা ক'দিন থেকে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আনাগোনা কর্‌ছে,—তুই কি বলিস্‌ ? একদিন দুপুরবেলা তুই কালেজে গেলে ওরা মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছিল। মেয়েটি বড় শান্ত ধীর,—আর রূপও ফেটে পড়্‌ছে। মেয়ের বাপ মেয়েকে ইংরিজী পড়িয়েছে; গান বাজনা, সেলাই করতে শিখিয়েছে। আমার ত খুব পছন্দ হয়েছে।"

আমি বলিলাম,—"মা, আমাকে আর যা বল, ও কথা ব'লো না। জানই ত আমার ও সব ভাল লাগে না। ঐ জন্যে আমি ঘর ছেড়ে বাইরে যাইনে।" মা চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে মায়ের মুখ ম্লান দেখিলাম।

নভেম্বরের শেষে আমার পরীক্ষা হইয়া গেল। কালীঘাট, তারকেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে যাইবার জন্য মা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; সুতরাং ডিসেম্বর মাসটা কলিকাতায় থাকা স্থির করিলাম।

(৪)

পরীক্ষার পর একদিন দুপুরবেলা পূর্ব্বোক্ত বাড়ীর মেয়েরা আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। আমি যতটা সম্ভব, আপনাকে ঢাকিয়া চলিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু উমার সহায়তায় তাহারা আমার আবরণ অনেকটা খুলিয়া ফেলিল। মেয়েদের বারম্বার যাতায়াতে আমি এক প্রকার কৌতূহল-মিশ্রিত বিরক্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় চারিটার সময় তাহারা সকলে চলিয়া গেল। আমিও সেদিন একটু চঞ্চল মন লইয়া বাসা হইতে বাহির হইলাম। সার্কুলার রোড দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যখন চৈতন্যোদয় হইল, তখন দেখি, ইটালি গোরস্থানের নিকট আসিয়া পড়িয়াছি! তখন দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

বাড়ীর গলিতে ঢুকিয়াই পায়ে ইটের ঠোকর খাইলাম। একতলায় অন্য দিন আলো থাকে, আজ একেবারে অন্ধকার দেখিয়া একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। উমার উপর পূর্ব্বেই বিরক্তির কারণ হইয়াছিল ; তাই একটু রুক্ষস্বরে ডাকিলাম "ঝি! তোমাদের কি আক্কেল নেই ? —" আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই উমা ক্ষিপ্রগতিতে আলো লইয়া আসিল। তাহার চক্ষে জল দেখিয়া আমি আরও বিরক্তির সহিত কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে সে বলিল, "দাদাবাবু, মায়ের বড় জ্বর হয়েছে,—চেতনা নাই !"

"চেতনা নাই !" আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে নৃত্য করিয়া উঠিল ! সম্মুখে যেন কে ঝনাৎ করিয়া একটা বৃহৎ অট্টালিকার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল !

(৫)

ঘরে গিয়া দেখি মেজেয় একটা বিছানায় মা আলুলায়িত কেশে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন ! একি হইল ? দুই ঘণ্টার মধ্যে একি পরিবর্ত্তন ?

জীবনে কখনও বিপদের মুখ দেখি নাই। বিশেষতঃ এইরূপ আকস্মিক বিপদে অনেক কুটিল সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে। উমা বলিল, "দাদাবাবু, দেখ্‌ছ কি ? ডাক্তারের কাছে যাওনা। তুমি যে মেয়েমানুষের বাড়া হ'লে !"

কম্পিতপদে অন্ধকারের মধ্যে নীচে নামিয়া আসিলাম। সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দমবন্ধ হইয়া আসিতেছিল ! চারিদিকে বিভীষিকার চিত্র, দেখিতে লাগিলাম ! পথে বাহির হইয়া গ্যাসের আলোক আমার চক্ষে অত্যন্ত তীব্র বোধ হইতে লাগিল। কোথায় যাইব, কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। হ্যারিসন রোডে পড়িয়া উন্মনস্ক ভাবে চলিয়াছি, এমন সময় চক্ষে পড়িল Dr. D. N. Sandal. খোঁজ লইয়া জানিলাম,—ডাক্তার ডাকে গিয়াছেন, শীঘ্র ফিরিবেন। ফুটপাথের উপর পায়চারি করিতে লাগিলাম, আর গাড়ী আসে কি না তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একজন বাইসিইক্‌ল হইতে অবতরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you in search of me ?" আমি থতমত খাইয়া বলিলাম,—"Yes, if you are Dr. Sandal."

দু'জনে বাসায় পৌঁছিলাম। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "This seems to me an attack of the Pneumonic Plague. However, you need not be too much troubled about her. I shall send competent medical students to attend her during the night."

ভগবান! একি করিলে? আমি যে মা বই আর কাহাকেও জানি না!

(৬)

রাত্রি ১১টার সময় দুইজন ছাত্র আসিলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহাকে লইবেন, মানুষের সাধ্য কি তাঁহাকে রাখে? মা রাত্রে কেবল অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া দুই তিন বার বলিয়াছিলেন, "বাবা, বৌ"?

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যার সময় আমার মায়ের সব ফুরাইল। যে মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিলে কোন দিন নিরুত্তর থাকিতে দেখি নাই, সেই মা আজ সহস্র আহ্বানে, অজস্র রোদনেও বিচলিত হইলেন না!

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দেবীস্বরূপা জননীর দেহ যখন চিতানলে বিসর্জ্জন দিলাম, তখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। তারপর মোহ গেল,—কঠোর সত্যকে গ্রহণ করিতে হইল।

রাত্রি দুইটার পর শ্মশান হইতে বাহির হইলাম। সমস্ত প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জগৎ একটা মহাশূন্য বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। আজ আমার জগতে মাথা রাখিবার স্থান চলিয়া গেছে।

সেই দিনই কলিকাতা ছাড়িলাম। গয়াতে যথাসময়ে শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করিয়া পরিবারস্থ বিধবাটিকে ও উমাকে কাশীতে রাখিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেলাম।

(৭)

লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এটোয়া, আগ্রা, দিল্লী বেড়াইয়া এলাহাবাদে আসিয়া কিছুদিন থাকিব স্থির করিলাম।

মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের পর বাড়ীর প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। পিতৃদেবকে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিলাম; আর ভ্রমণকালে যখন যেখানে পৌঁছিতাম, সেখান হইতে এক একখানা চিঠি লিখিতাম। তাহার ফলে পিতৃদেবের আশঙ্কা ও উদ্বেগ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইত।

এলাহাবাদে কয়েকদিন পাণ্ডাদের আশ্রয়ে কাটিল। তার পর একটি বাঙ্গালী ডাক্তারের সহিত পরিচয় হইল। তাঁহার আগ্রহে আমি পাণ্ডাদের আশ্রয় ছাড়িলাম। ডাক্তারবাবুর বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর হইবে। বহুদিন হইতে এলাহাবাদে বাস করিতেছেন,—নাম নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আসিলাম বটে,—কিন্তু নিজের নাম ব্যতীত আর সকল পরিচয় গোপন করিলাম। তাঁহার স্ত্রী, একটি মেয়ে ও একটি ছেলে

ব্যতীত সংসারে আর কেহ নাই। মেয়েটির নাম সুরমা। সে কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। সুদূর প্রবাসে সুরমার সলাজ সুন্দর মুখখানি আমার নিকট অত্যন্ত মনোরম বোধ হইত। ছেলেটি সুরমার ছোট। তাহার নাম সুরেশ।

ডাক্তারবাবু একটু বয়স্ক লোক হইলেও তাঁহার মতগুলি বেশ উদার ছিল। সুরমাকে তিনি বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম চারুবাবুর সহিত হৃদ্যতা থাকায় বাঙ্গালীরা অনেকে তাঁহাকেও "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিত।

এখানে অবস্থান কালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস হইয়াছি দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল। এলাহাবাদেই একটি বিদ্যালয়ে কার্য্য গ্রহণ করিলাম।

ডাক্তারবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর ভাবে বোধ হইতে লাগিল, সুরমাকে আমি বিবাহ করি এই তাঁহাদের ইচ্ছা। সুরমা রূপে গুণে কোন অংশেই আমার পক্ষে অযোগ্যা পাত্রী হইত না; কিন্তু মাতৃশোকে তখনও আমার হৃদয় এতদূর অবসন্ন যে বিবাহের প্রস্তাব আমার নিকট উপহাস বোধ হইত।

অবশেষে একদিন চারুবাবু আমার নিকট ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমি তাঁহার প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া বলিলাম,—"দেখুন, যদি আমি বিবাহ করি, তবে মায়ের মনোনীতা কন্যাকেই বিবাহ করিব।"

সুরমা যে এ বিষয়ের কিছু জানিতে পারিয়াছে, তাহার পরিচয় শীঘ্রই পাইলাম। তাহাকে আর যখন তখন দেখিতে পাইতাম না। হঠাৎ দেখা হইলে সরিয়া যাইত।

কয়েকদিন মনের মধ্যে বড় একটা অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। এলাহাবাদ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। হায়, হায়! আমার জীবনের শান্তি চিরদিনের মত চলিয়া গেল!

সন্ধ্যায় Pioneer (পাইওনিয়ার এলাহাবাদের সংবাদ পত্র) হাতে করিয়া বসিয়াছিলাম। সেটা উপলক্ষ্য মাত্র। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কোথায় বলিতে পারিতাম কি না সন্দেহ! এমন সময় দুইখানি চিঠি পাইলাম! নিবিষ্ট চিত্তে পড়িব, আমার মস্তিষ্কের এমন শক্তি ছিল না,—প্রথম দুই ছত্র পড়িয়াই "বাবাগো! তুমি কোথায় গেলে গো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলাম।

* * * * *

যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখি ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, সুরমা, সুরেশ সকলে আমাকে ঘিরিয়া কাঁদিতেছেন। ইহাও জীবনের একটা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে সুরমা আমার নিকট হইতে শত হস্ত দূরে থাকে, সেই সুরমা আমার মাথা কোলে লইয়া কাঁদিতেছে!

* * * * *

আমার একটি বৈমাত্রেয় বালবিধবা ভগ্নী ছিলেন। বিমাতার মৃত্যুর পর পিতৃদেব ভগ্নীর বিবাহ দিয়া পুনরায় বিবাহ করেন। এই ভগ্নী সুরমার জননী ও ডাক্তারবাবুর পত্নী। বিবাহের পর অনেক ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহারা এলাহাবাদে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। পিতৃদেব বিধবা বিবাহ দেওয়ায় সকলের সহিত সম্বন্ধচ্যুত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। সেইজন্য কন্যার বিবাহের পর হইতে কোনও দিন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারেন নাই, এবং শেষকালে কেহ কাহারও সংবাদও পাইতেন না। আজ পিতার স্বর্গারোহণে আমরা দুইজনে পিতৃহীন ও পরস্পরের শোকের সমভাগী। পূর্ব্বের যত কিছু সঙ্কোচ ছিল, আজ তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে।—সুরমার মা আমার দিদি,—আমি সুরমার মামা!

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা।

নদী যখন তর্‌তরিয়ে সাগর পানে ছোটে,
ফুলের কলি বিশ্বপূজায় আপ্‌না হ'তে ফোটে,
অলির গানে উষার আকাশ রোমাঞ্চিত হয়,
দখিণ পবন নেশার মত মাথার উপর বয়,
তখন আমার মনে মনে কেবা যেন বলে—
"তোর মনটি জাগ্‌বে কবে এম্নি কুতূহলে?"

শেখ ফজলল করিম।

অপ্রকৃত নবী।*

প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ একেশ্বরবাদ ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচার পূর্ব্বক খ্যাতি লাভ করিলে, অনেকের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জনসাধারণের নিকটে সম্মান প্রাপ্তির আশায় আপনাদিগকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জন-সমাজে প্রচার করিতেও ত্রুটি করে নাই।

এই সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ ভণ্ড নবী নামে পরিচিত। এমন কি ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় দল বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ও ক্ষমতাশালী করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। সাধারণের অবগতির জন্য কয়েকজন প্রধান ভণ্ড নবীর বৃত্তান্ত নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল।

আরব দেশের অন্তর্গত ইমান প্রদেশে হোনেফা নামে এক শ্রেণীর আরবগণ বাস করিত। ঐ শ্রেণীর মধ্যে মোস্‌লেমা নামে সুচতুর ও ক্ষমতাশালী একজন প্রধান লোক ছিল। সে হিজরীর নবম বর্ষে হজরত মোহাম্মদের নিকটে উপস্থিত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। পরে, সে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, হজরত মোহাম্মদের সৎনাম ও ক্ষমতার অংশভাগী হইবে। এই দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সে সাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছিল যে, হজরত মোহাম্মদের সহকারী নবীরূপে সে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছে। এইরূপে সে বহুসংখ্যক লোকের চিত্তাকর্ষণ করতঃ হজরত মোহাম্মদের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

ক্রমে তাহার দল পুষ্ট হইলে, সে আপনাকে হজরত মোহাম্মদের তুল্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহাকে এক পত্র পাঠাইয়াছিল ;—

"চলিত পত্র ঈশ্বর প্রেরিত নবী মোস্‌লেমার নিকট হইতে, ঈশ্বর প্রেরিত নবী মোহাম্মদের নিকটে।"

পত্রের মর্ম্ম :—

"এক্ষণে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ আমার এবং অপরার্দ্ধ আপনার হউক।"

তদুত্তরে হজরত মোহাম্মদ লিখিয়াছিলেন ;—

* ইস্‌লাম ইতিবৃত্তের হস্তলিপি হইতে।—লেখক।

"চলিত পত্র ঈশ্বর প্রেরিত নবী মোহাম্মদের নিকট হইতে, মিথ্যাবাদী ভণ্ড মোস্‌লেমার নিকটে।"

পত্রের মর্ম্ম :—

"পৃথিবী ঈশ্বরের। তিনি, তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে দিয়া থাকেন। এবং যাঁহারা ঈশ্বরকে ভয় ও ভক্তি করেন, তাঁহারাই সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

উক্ত মোস্‌লেমা ক্রমশঃ বিলক্ষণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পরে মহাত্মা মোহাম্মদের তিরোভাব হইলে, হিজরীর একাদশ অব্দে খলিফা আবু বকর উক্ত মোস্‌লেমার দমনার্থ সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা খালেদ্‌-ইব্‌ন্‌-আল্‌-ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওয়ালিদ্‌ মোস্‌লেমার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া তাহার দশ সহস্র অনুচরকে নিহত করিয়াছিলেন। এবং সেই যুদ্ধেই ওয়াদা নামক একজন নিগ্রো ক্রীতদাসের হস্তে মোস্‌লেমা নিহত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে, সেজাজ নাম্নী এক রমণী স্বীয় নবীত্ব প্রাপ্তির কথা সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিল। এই রমণী ভণ্ড নবী মোস্‌লেমাকে বিবাহ করতঃ মাত্র তিন দিবস তাহার নিকট অবস্থান করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তৎপরে তাহার আর কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অন্‌স্‌ ও মজ্‌জ্‌ শ্রেণীর নেতা অন্‌স্‌ বংশীয় অহিলা নামক এক ব্যক্তি হিজরীর একাদশ বর্ষে অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের তিরোভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে আপনাকে একজন নবী বলিয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তিকে লোকে 'জিন্‌ হেমার' অর্থাৎ রাসভপতি নামে অভিহিত করিত। কারণ সে সর্ব্বদাই ব্যক্ত করিত যে, রাসভপতি জিন্‌ প্রায়শঃই তাহার নিকট আসিয়া থাকে। সে আরও প্রকাশ করিত যে, সোহেক্‌ ও সেরেইক্‌ নামক দুইটি ফেরেস্তার যোগে সে ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হইত। তাহার সুন্দর বক্তৃতাশক্তি ছিল এবং সে ক্ষিপ্রহস্তে মনোমুগ্ধকর ঐন্দ্র-জালিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে পারিত। এই কারণে, সে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে স্বীয় দলভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া সে নজ্‌রান্‌ ও তায়েফ বিভাগে আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিল।

ইমানের শাসনকর্ত্তা বধানের মৃত্যু হইলে উক্ত অহিলা ইমান প্রদেশ আক্রমণ করতঃ বধানের পুত্র শহর্‌কে নিহত করিয়া উক্ত রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। পরে ফিরোজ্‌ নামধারী এক ব্যক্তি নিশাযোগে তাহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে নিহত করিয়াছিল।

মহাত্মা মোহাম্মদের তিরোভাবের অল্পদিন পরেই, তোলেহা নামক এক ব্যক্তি নবী হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পরে সে বিফল মনোরথ হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

আব্বাস বংশীয় তৃতীয় খলিফা মেহেদির খেলাফতী কালে, অর্থাৎ হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, খোরাসান বিভাগের মেরুনগর নিবাসী হাশেম্-ইবনে-হাকেম্ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত নবী বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। আরবীয় ঐতিহাসিকগণ কেহ তাহাকে মোকান্না, কেহ বা বোরকাই নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "বোরকা" শব্দের অর্থ পর্দ্দা বা আবরণ। যেহেতু উক্ত ব্যক্তি প্রতিনিয়তই বস্ত্রদ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিত। কেহ কেহ বলেন যে, তাহার মুখের গঠন নিতান্ত কুদৃশ্য ছিল বলিয়াই, সে ঐরূপ করিত। কিন্তু তাহার অনুচরগণ বলিত, "তাঁহার মুখমণ্ডলে এরূপ অত্যুজ্জ্বল স্বর্গীয় জ্যোতি ছিল যে, তাহা মানব-নয়ন সহ্য করিতে সমর্থ হইত না; তজ্জন্যই তিনি নিয়ত মুখাবৃত করিয়া থাকিতেন।" এই ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ায় সিদ্ধহস্ত ছিল। সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে বহুবিধ মনোহারিণী ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দেখাইয়া আপনার দলভুক্ত করিয়াছিল। পারস্য ভাষায় তাহাকে "সাজেন্দে মাহ" অর্থাৎ চন্দ্রনির্ম্মাতা নামে অভিহিত করা হইত। কারণ, সে সময় সময় নিশাযোগে একটি কূপ হইতে জনগণকে চন্দ্রের উদয় দেখাইত।

এইরূপে ভণ্ড নবী হাশেম প্রবল হইয়া উঠিলে, খলিফা আল্-মাহ্‌দি তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। খলিফা-সেনার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া সে ব্যক্তি সপরিবারে একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এবং দেশস্থ জনসাধারণ যাহাতে তাহাকে সাহায্য করে তৎপক্ষে বিলক্ষণ চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু কোনরূপ সাহায্য না পাওয়ায় এবং আশ্রিত দুর্গ খেলাফতীয় সেনাগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অবরুদ্ধ হওয়ায়, একদিন মদিরার সহিত সুতীব্র বিষ মিশ্রিত করিয়া পরিবারবর্গকে ও অপরাপর অনুচরদিগকে তাহা পান করাইয়া তাহাদিগকে নিহত করতঃ তাহাদিগের দেহ অগ্নিকুণ্ডে ভস্মসাৎ করিয়াছিল। পরে, দেহক্ষয়কারী একরূপ তীব্রবারি প্রস্তুত করতঃ তাহা একটি প্রকাণ্ড জলাধারে ঢালিয়া স্বয়ং তাহাতে নিমগ্ন হইয়াছিল। খেলাফতীয় সৈন্যগণ দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তকের কেশমাত্র পাইয়াছিল। শরীরের অপর সমস্ত অংশই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হাশেমের একজন উপপত্নী তাহার অসদুদ্দেশ্যের বিষয় পূর্ব্ব হইতে জানিতে

পারিয়া গুপ্তভাবে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহারই প্রমুখাৎ এই লোমহর্ষণ ঘটনার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গিয়াছিল। হিজরীর ১৬২ কিম্বা ১৬৩ অব্দে মোকান্না হাশেম এইরূপে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

বাবেক্ নামে আর এক ভণ্ড ব্যক্তি হিজরীর ২০১ অব্দে আবির্ভূত হইয়া নানা কৌশলে আপনার দল পুষ্ট করিয়াছিল। এবং অল্পদিনের মধ্যে দশ বার সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এইরূপে পৃষ্ঠপোষিত হইয়া বাবেক্ নানাস্থান আক্রমণ পূর্ব্বক আপন আয়ত্বাধীনে আনিয়াছিল। এবং তদানীন্তন আব্বাসীয় খলিফা আব্দুল্লা-অল-মমিনের সৈন্যগণকে পুনঃ পুনঃ রণস্থলে পরাজিত করিয়া ক্রমশঃই আপনার প্রসার বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মমিনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী খলিফা মুতাস্‌সিম্ বিল্লা বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সংগৃহীত সৈন্যগণকে সেনাপতি আফ্‌সিদের নেতৃত্বে বাবেকের দমনার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাবেক্ আফ্‌সিদের প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পরে সে সপরিবারে তথা হইতে অতি গোপনে নির্গত হইয়া ছদ্মবেশে গ্রীকাধিকারে পলায়ন করিয়াছিল।

সাহল নামক একজন আর্ম্মানীয় বাবেক্‌কে জানিত; সে কৌশলে তাহাকে সপরিবারে সেনাপতি আফ্‌সিদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। বাবেক্ অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিল, তজ্জন্য উক্ত সেনাপতি তাহাকে সপরিবারে লাঞ্ছিত করিয়া খলিফা মুতাস্‌সিম বিল্লার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। খলিফা তাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। সে প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর যাবৎ আপনার প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছিল।

হিজরীর ২৩৫ অব্দে মাস্থদ-ইবন্-ফেরাজ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে হজরত মূসার অবতার বলিয়া প্রচার করায়, তৎকালিক খলিফা মুতাওয়াক্কিল কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে, কর্ম্মৎ নামক এক ব্যক্তি খোরাসান বিভাগ হইতে আসিয়া, কুফার সন্নিকটে অবস্থান করিয়াছিল। তথায় অবস্থান-কালে, উক্ত ব্যক্তি স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা এবং কঠোর ধর্ম্মনিয়ম প্রতি-পালনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি প্রতিদিন পঞ্চাশৎ বার ঈশ্বরের আরাধনা করিত এবং মহাত্মা মোহাম্মদের বংশীয় কোন এক ইমামের প্রতি সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান ছিল। জনসাধারণে তাহার চরিত্রের পবিত্রতা

দেখিয়া ক্রমশঃ তাহার শিষ্য হইতেছিল। শিষ্যগণ প্রতিনিয়তই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, সাধারণ ব্যবসাকার্য্য ও কৃষিকার্য্য প্রভৃতির অবনতি হইতেছিল।

স্থানীয় শাসনকর্ত্তা দেশের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একদিন উক্ত কর্ম্মৎকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং তাহার যাহাতে মৃত্যু হয়, তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলে, কর্ম্মতের পরিবারস্থ একটি বালিকা দাসী তাহা অবগত হইয়া, অতি গোপনে এরূপ কৌশলে তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছিল যে, সে রহস্য তৎকালে কেহই জানিতে পারে নাই।

পরদিন প্রাতে উক্ত শাসনকর্ত্তা কারাগারে গিয়া দেখেন যে, বন্দী পলায়ন করিয়াছে। এইরূপ আশ্চর্য্য পলায়নের সুযোগ সূত্রে, কর্ম্মতের শিষ্যগণ তাহার উপরে নানা প্রকার দৈবীশক্তির আরোপ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিল, "ঈশ্বর তাঁহাকে কারাগার হইতে স্বর্গে উঠাইয়া লইয়াছেন"। সে কুফা হইতে পলায়ন করিয়া, নানা স্থান ভ্রমণ করতঃ অবশেষে সামপ্রদেশে অবস্থান করিয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে তাহার সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই কর্ম্মৎ হইতেই প্রবল কর্ম্মতীয় (The Karamita) সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল।

কর্ম্মতীয়গণ মহম্মদীয় ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। খলিফা মুক্তাদিরের খেলাফৎকালে তাহারা নিরতিশয় প্রবল হইয়া, আরব দেশে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিয়াছিল। এমন কি খলিফাদিগকেও এক সময়ে ইহাদের ভয়ে ভীত হইয়া ইহাদিগকে কর দিতে হইয়াছিল। ইহারা প্রবল পরাক্রমে মক্কা নগর অধিকার করিয়া পবিত্র কা-বা মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাপসংহারিণী চুম্বন-শিলা (হাজরল-আস্‌ওয়াদ) উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

উক্ত কর্ম্মতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, মোতান্নবী উপাধিধারী আবু তৈয়ব্ নামে একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিল। তৎকালে আবু তেমাস্ ব্যতীত তাহার তুল্য কবি, আর কেহ ছিল না। তৈয়ব্ স্বীয় কবিত্ব বলে প্রাণপণে নবীত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিল; এবং তাহার চেষ্টা কিয়দংশে ফলবতীও হইয়াছিল।

কেলাব্ প্রভৃতি অনেকগুলি সম্প্রদায়, তাহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন স্থানীয় শাসনকর্ত্তা লুলু ভাবিবিপদের আশঙ্কায় তাহার দলকে প্রবল হইতে দেন নাই। তিনি তৈয়বকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে, সে নবীত্বের দাবি পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তৈরব্ স্বীয় কবিত্ব শক্তির প্রভাবে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। সে পারস্য-সুলতান অসদুদ্দৌলার সভায় উপস্থিত হইয়া, সুললিত কবিতা-কৌশলে সভাস্থ যাবতীয় লোককে বিমোহিত করিয়াছিল। সুলতান তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিক দিয়াছিলেন। উক্ত অর্থ লইয়া স্বদেশ-প্রত্যাগমন কালে, হিজরীর ৩৫৪ অব্দে, পথিমধ্যে আরবীয় দস্যুগণ কর্ত্তৃক সে নিহত হইয়াছিল।

হিজরীর ৬০৮ অব্দে, নাতোলিয়া বিভাগের অমসীয়া নগরস্থ তুর্কজাতীয় এক ব্যক্তি, আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত নবী বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। ইসাহাক্ নামে তাহার একজন শিষ্য ছিল। আপনাকে 'বাবা' নামে আখ্যাত করিয়া, সে ইসাহাক্‌কে তুর্কশ্রেণীর মধ্যে প্রেরণ করতঃ স্বীয় দল প্রবল করিয়াছিল।

ক্রমে ষষ্ঠ সহস্র অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য, তাহার দলভুক্ত হইয়াছিল। সে এই প্রবল সেনাদল লইয়া আপনার প্রাধান্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে শ্রেণী, "লাইলাহা এল্লেল্লা বাবা রসুলোল্লা" বলিয়া স্বীকার না করিত, সে তাহাদিগেরই সহিত দলবলে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত।

এইরূপে তাহারা দেশ মধ্যে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করায়, মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টীয় সৈন্যগণ একযোগে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে এককালে ধ্বংস করিয়াছিল। এইরূপে সময়ে সময়ে অনেকগুলি অপকৃত নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ভণ্ডগণ আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু মিথ্যার বুনিয়াদে সত্যের কেল্লা নির্ম্মাণ করিতে গিয়া, সমস্তই পণ্ড হইয়াছে।

হজরত মোহাম্মদ এক সময়ে তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, ক্রমে ক্রমে ন্যূনকল্পে ত্রিশ জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হইবে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

খনা।

খনা ও লীলাবতী বিদুষী ভারত রমণী। সুদূর অতীত কালে এই দুই মনস্বিনী নারী ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের জ্ঞানের প্রদীপ্ত প্রভায় ভারতবর্ষ উজ্জ্বল রহিয়াছে।

খনার জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং লীলাবতীর গণিত শাস্ত্রে অগাধ পারদর্শিতা ছিল। অনেক মহাত্মার ধারণা যে, আমাদের দেশে নারীজাতি উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত ছিল। খনা এবং লীলাবতীর জীবন তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাদৃশ প্রদীপ্ত প্রতিভাশালিনী নারীদ্বয়ের জীবন-কথা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আমাদের মন স্বভাবতঃই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জীবন চরিত অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এই ঘোর অন্ধকার দূর করিবার কোন উপায় নাই। ইহাঁদের সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল কিম্বদন্তীর অনেকগুলিই বিশ্বাসযোগ্য নহে। আজ আমরা পাঠক পাঠিকা-দিগকে খনার জীবন-কথা উপহার দিতেছি।

খনা চিরখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজসভার অন্যতম রত্ন মিহিরের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই শৈশব এবং বাল্যকাল এক সঙ্গে অনার্য্য জাতির আশ্রয়ে অতিবাহিত হইয়াছিল; তাঁহারা একসঙ্গে অনার্য্যদের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন।

আর্য্যা খনা কোন্ সূত্রে শৈশবকালে পিতামাতার স্নেহ-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনার্য্যালয়ে নীত হইয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু মিহির সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, তদীয় পিতা মহামহোপাধ্যায় জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ বরাহ, পুত্রের জন্মমাত্র তাহার আয়ুষ্কাল নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন এবং গণনার ভুল বশতঃ একশত বৎসর স্থানে দশ বৎসর মাত্র আয়ুঃ অবধারণ করেন। এজন্য বরাহ সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন এবং মাত্র দশ বৎসরের জন্য স্নেহপাশে বদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক হন। অতঃপর তিনি পুত্রকে মৃৎপাত্রে সংস্থাপন করিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেন। একজন অনার্য্য রমণী দৈবাৎ শিশুকে দেখিতে পায়; শিশুর সুন্দর মুখ তাহার হৃদয় স্নেহসিক্ত করিয়া তুলে; রমণী তাহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করে।

ভারত-রত্ন মিহির কিরূপে অনার্য্যগৃহে নীত হইয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইল। এই অনার্য্যাবাসে খনার সঙ্গে তাঁহার শৈশব ও বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহাদের বাল-সুলভ সখ্য ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়। তাদৃশ অভিনব ভাবের আবির্ভাবে তাঁহাদের হৃদয় পুলকাবিষ্ট হইয়া উঠে; তাঁহারা পরিণয় সূত্রে সম্মিলিত হন।

নবীন দম্পতি বয়োবৃদ্ধি সহকারে আপনাদিগকে আর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং গণনা দ্বারা আপনাদের পিতৃমাতৃ কুলের পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা পাঠ সমাপ্ত করিয়া জন্মভূমি দর্শন ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গলাভ জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অশেষ সুখস্মৃতি জড়িত আশ্রয়স্থল এবং স্নেহশীল প্রতিপালকদিগকে পরিত্যাগ করিতে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে জন্মভূমি দর্শন ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গলাভ আকাঙ্ক্ষাই জয়লাভ করিল। তাঁহারা অনার্য্যদের নিকট হইতে বাষ্পাকুল-লোচনে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনার্য্যগণ তাঁহাদের অদর্শনের কল্পনায় ক্লিষ্ট হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। মিহির ও খনা তাহাদিগকে প্রীতিপূর্ণ সান্ত্বনা বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তাহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের হৃদয়ানন্দ মিহির ও খনার মঙ্গল কামনা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

মিহির ও খনা আগত হইলে বরাহ, পুত্র এবং পুত্রবধূর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং তাঁহাদিগকে আদরে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য মিহিরের অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন। রাজাদেশে মিহির সভারত্নরূপে আসন পরিগ্রহ করিলেন। বরাহ নিজে সভারত্ন ছিলেন; তদুপরি পুত্রের রাজ-প্রসাদ লাভ সাতিশয় আনন্দের কারণ হইল। খনা রাজ-সভার ভূষণ স্বরূপ শ্বশুর ও স্বামীর আশ্রয়ে বাস করিয়া পরম সুখে দিন অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানালোচনার সহায় স্বরূপিণী হইলেন। শ্বশুর ও স্বামীর সঙ্গে জ্ঞানালোচনার সূত্র অবলম্বন করিয়া খনার সুখরাশিতে কীট প্রবেশ করিল। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে শ্বশুর ও স্বামী অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিনী ছিলেন। খনা সময় সময় শ্বশুরের গণনা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বরাহের হৃদয়ে ঈর্ষার সঞ্চার হইল।

এই সময় একদা বরাহ আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা নির্দ্ধারণ জন্য রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বরাহ নিজে এই গণনা করিতে অসমর্থ হইয়া পুত্রবধূ খনাকে উহার ভার অর্পণ করিলেন। খনা শ্বশুরের আদেশানুসারে গণনা পূর্ব্বক আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা অবধারণ করিয়া দিলেন। বরাহ যথাসময়ে রাজসভায় গমন করিয়া মহারাজাকে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা পরিজ্ঞাত করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাদৃশ অদ্ভুত গণনাশক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তৎকালে খনার বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। তিনি খনাকেই গণনা-

কারিণী বলিয়া অনুমান করিলেন এবং অনুসন্ধান দ্বারা স্বীয় অনুমান যথার্থ বলিয়া জানিতে পারিলেন। গুণমুগ্ধ বিক্রমাদিত্য মনস্বিনী খনার দর্শনলাভ জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। এবং কৌতূহলের আতিশয্য বশতঃ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই আদেশ প্রতিপালন করিলে কুলমর্য্যাদানাশ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া বরাহ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পুত্রবধূর অসাধারণ গুণগ্রাম তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছিল। এক্ষণে কুলমর্য্যাদানাশ ভয় তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। বরাহ খনার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া শান্তিলাভের সংকল্প করিলেন এবং পুত্র মিহিরকে তদনুরূপ আদেশ দিলেন।

পিতার তাদৃশ অমানুষিক আদেশ শ্রবণে মিহিরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পদতলে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। বরাহের সংকল্প ও আদেশের বিষয় খনার কর্ণগোচর হইলে তাঁহার জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইল; তিনি জীবন ভার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ জীবন পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দের ন্যায় অস্থির, পূজ্যপাদ শ্বশুরের হৃদয় শান্ত করিবার জন্য এই নশ্বর দেহ পাত করিতে পারিলে তাহা পরম ফলোপধায়ক হইবে। অতএব সত্বরে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন কর"। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মিহির উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; তিনি খনার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া চিরদিনের জন্য স্বীয় নাম কলঙ্কিত করিলেন।

খনার তিরোভাবের পর কত কাল,—কত যুগ,—অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; অদ্যাপি লোকে তাঁহার বচন আবৃত্তি করিয়া থাকে। এই সকল বচন অভিজ্ঞতা লব্ধ ও জ্ঞানগর্ভ। তৎসমুদয় পাঠে আমরা বর্ষা ও কৃষি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারি। কিম্বদন্তী বিদুষী খনাকে এই সকল বচনের রচয়িত্রীরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু উজ্জয়িনীবাসিনী বিদুষীর বচন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রথিত দেখিয়া আমাদের মনে সহজেই দ্বিধা উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ এই সকল বচন উজ্জয়িনীর ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। তারপর বাঙ্গালী জাতি তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছে। খনার বচনের কতক-গুলি হিন্দি মিশ্রিত, এজন্য যে প্রক্রিয়ায় খনার বচন রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অনুমিত হইতে পারে। খনার বচন সাহিত্যের হিসাবে সৌষ্ঠবশালী না হইলেও আলোচনার যোগ্য; এবং তাদৃশ আলোচনা গৃহস্থ ও কৃষক কুলের হিতজনক।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম কি ?

পূর্ব্বে এমন এক শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব ছিল এবং এখনও আছে, এই নিখিল বিশ্বের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল যাঁহাদের নয়নপথে পতিত হয় না। যে বিস্ময়কর রঙ্গমঞ্চ সারা দিনযামিনী অশেষবিধ অভিনয়ে পূর্ণ, তাঁহাদের বিবেচনায় তাহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠ। তাঁহারা মনে করেন—বস্তু এবং বীর্য্য (Matter and energy) কখনও সৃষ্ট হয় নাই এবং কখনও নিঃশেষিত হইবে না। এবং এই বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই ইহাতে স্বয়ং নির্ম্মিত হইয়াছে। এমন কি তাঁহাদের ইহাও বিশ্বাস যে, প্রাণ এবং অহংজ্ঞান বাস্তব। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ জড়বাদী বিজ্ঞান ও সাহিত্যে অশেষজ্ঞান সম্পন্ন। তিনি নাকি অন্য এক অভিনব মতের প্রচারক। একত্ববাদ (Monism) বস্তু এবং বীর্য্যের দ্বৈতভাব (Duality) স্বীকার করে না, এক বস্তুকেই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষক এবং পরিপালক মনে করে। ইহাতে বস্তুকে অনন্ত এবং অসীম বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা তন্মত-বাদিগণের ঈশ্বরকে সচেতন কিম্বা জ্ঞানময় বলিয়া স্বীকার করে না, অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের ঈশ্বরকে আপনাদের অপেক্ষা অপকৃষ্ট মনে করেন। তাঁহারা বলেন—আমরা জানি পৃথিবীস্থ সেন্দ্রিয় প্রাণিগণ মেদিনীর নিরিন্দ্রিয় আকৃতির ন্যায় "নিরবচ্ছিন্ন লৌহ বিধি অনুসারে" স্বয়ং ক্রমাগত ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এইটুকু বুঝেন না যে, ঐ "লৌহ বিধির" অস্তিত্বই একজন সচেতন জ্ঞানময় বিধি-প্রণেতার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয়। বস্তুতঃ এই বিশাল অত্যাশ্চর্য্য সৌরজগৎ যদৃচ্ছাক্রমে ক্রমবিকাশ লাভে সমর্থ হয় নাই এবং এই সূক্ষ্ম ও গণিতসম্মত মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহ এক জ্ঞানময় 'মানসের' আবশ্যক হইয়াছে। ফলতঃ মধুমক্ষিকার অত্যাশ্চর্য্য স্বভাবের এই ক্রমবিকাশের এবং তদপেক্ষা আশ্চর্য্য মানুষের এই বিচারশক্তির নিশ্চয়ই অলৌকিক জ্ঞান সম্পন্ন একজন স্রষ্টা আছেন। কথিত আছে যে, অশেষবিধ প্রাণী এবং উদ্ভিদ—যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে বাস করিয়া আসিতেছে—এক বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা মাত্র। এবং ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, মানব মেরুদণ্ডী জীবগণের অভিনব, অত্যুন্নত এবং

সম্পূর্ণ সংস্করণ মাত্র। ইহাও ঘোষণা করা হইয়া থাকে যে, পৃথিবী বহুকাল যাবৎ 'প্রটিষ্টা' (Protista) বা এক প্রকার একগহ্বর আদিম জীবের বাসস্থান ছিল। তৎপরে পিতৃপিতামহাদির শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ইহাদের 'সিনোবিয়া' (Cœnobia) বা সামাজিক সঙ্ঘ হইতে নিম্নতম 'বাইষ্টোন' (Bistone) বহুগহ্বর উদ্ভিদ এবং প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে এবং সেই প্রাচীনতম 'বহুগহ্বর' হইতে ক্রমশঃ অভিনব মানব—আমরা অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে, কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিতে পারেন কি যে, যে প্রণালীতে আকৃতিপ্রদ গহ্বর হইতে মানবের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা একজন বিচক্ষণ জৈবিক-শারীর-পদার্থতত্ত্বজ্ঞের কার্য্য নহে? আদিম জীবগুলিকে এই অসংখ্য যুগের মধ্য দিয়া অত্যুন্নত মানবরূপে বিকসিত হইবার শক্তি প্রদান করিতেই অতিপ্রাকৃত কৌশল এবং জ্ঞানবত্তার প্রয়োজন। ফলতঃ সৃষ্টিবাদ অপেক্ষা ক্রমবিকাশবাদে সমধিক কৌশলের আবশ্যক আছে। বিজ্ঞানে যাঁহার কিছুমাত্র অধিকার আছে, তিনি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, পৃথিবীর যাবতীয় পরমাণু নিয়মের অধীন এবং প্রত্যেক ক্রমোন্নয়নের একটা নির্দ্দিষ্ট গতি—একটা নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা আছে। নভোমণ্ডলস্থ বহু সহস্র গ্রহের অন্যতম সূর্য্য কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আদিম কম্পমান জলদখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। আমরা ইহাও শুনিতে পাই যে, সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ সেই বিচ্ছিন্ন এবং ঘূর্ণায়মান সূর্য্য হইতে কেন্দ্রবিসর্পী হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যদি কম্পমান আদিম মেঘখণ্ড নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নির্দ্দিষ্ট আকৃতি এবং গুরুত্ব নিক্ষেপ না করিত, তাহা হইলে সূর্য্যের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না; এবং যদি সূর্য্য কেন্দ্রবিসর্পী শক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি এবং দূরত্ববিশিষ্ট বস্তু ত্যাগ না করিত, তাহা হইলে সৌরজগৎ নিরস্তিত্ব হইত; আর আমাদের পৃথিবীর ত কোন সন্ধানই মিলিত না। নির্দ্দিষ্ট নিয়মের এবং গতির সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের এক জগৎ (System) এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এক গূঢ়ার্থপ্রকাশক সূক্ষ্ম নিয়মের অধীন। এই নিয়মগুলি একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করে, এবং সেই স্রষ্টা সৃষ্ট বস্তুর নিমিত্ত কি কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাপন করে। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্ধারিত নিয়মের বশীভূত হওয়াই প্রকৃতির ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য। সূর্য্য এবং পৃথিবী, মানব এবং পশু, সকলেরই সেই এক কর্ত্তব্য—সকলেরই

সেই কর্ত্তব্য পালন করিবার এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (Instinct)। সূর্য্য স্বীয় গতি পরিবর্ত্তন করে না—পৃথিবীও তাহা করে না। যদি করিত, তবে উহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইত। বিশ্বে যাহা কিছু আল্লাহ্‌তাআলার নির্দ্ধারিত নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহাই শাস্তি প্রাপ্ত হয়। আজ্ঞানুবর্ত্তিতার পরিমাণ অবশ্য ব্যক্তিগত সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু প্রত্যেক পরমাণু সেই নিয়মে—সেই ধর্ম্মে প্রবুদ্ধ। সেই ধর্ম্ম অনুসরণ করাই ইহাদের স্বভাব। ইহারা যে কেবল ধর্ম্মের মৌলিক নীতি (Fundamental principle) অর্থাৎ স্রষ্টার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আত্মসমর্পণ করে তাহা নহে, উপরন্তু ধর্ম্মের আনুমানিক সত্য অর্থাৎ সৃষ্ট জীবকে প্রেম করিয়া চরিতার্থ হয়।

যাবতীয় অণুই স্রষ্টার অধীন এবং প্রত্যেক অণুরই অন্য আর এক অণুর সহিত একটা সম্বন্ধ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে "রাসায়নিক সম্বন্ধ" নামে অভিহিত করেন। ক্রমবিকাশে মানুষ 'আত্মা' এবং 'ইচ্ছাশক্তি' প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মানুষকে এমন শক্তি দেওয়া হইয়াছে, যাহা দ্বারা সে অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারে—বিশ্বে যাবতীয় পদার্থ কি নিয়মের অনুসরণ করে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যে নিয়ম তাহার দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যদি সে তাহার ব্যতিক্রম করে, তবে শাস্তি হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। তাহার ধর্ম্ম, অণু-পরমাণু, সূর্য্য অথবা তাহার অস্তিত্ব যাহার উপরে—সেই পৃথিবীর ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন নহে। সমগ্র প্রকৃতির কর্ত্তব্য এক—ধর্ম্ম এক এবং তাহা এই :—

স্রষ্টায় আত্মসমর্পণ এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবে প্রেম—অথবা এক কথায় ইস্‌লাম। *

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি।

* This is a translation of an article which appeared in the "Islamic Review and Muslim India" under the head : "What is the Religion of Nature ?"—*Translator.*

দুইটি সাধুজীবনের চিত্র।

ইতিহাস জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন, বিপদ ও সম্পদের কথা প্রকাশ করে; জীবন-চরিত ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ইতিহাস। যে সকল জীবন বিবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, মহৎ লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছে, বুদ্ধিবলে সমরক্ষেত্রে বা রাজ্য-পরিচালনে সমর্থ হইয়াছে, সে সকল জীবনের বিবরণ চিরদিনই নরনারীর চিত্ত আকর্ষণ করিবে। আর এক শ্রেণীর জীবন আছে, যে জীবন, মানব-চিত্তকে এক ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের দিকে ধাবিত করে, অন্তরের প্রবৃত্তিদিগের সংগ্রামে কিরূপে জয়লাভ করিতে হয়—সকলে বিরুদ্ধাচারণ করিলে, কিরূপে অন্তর মধ্যে পরমেশ্বরের শান্তিপ্রদ ভাব রক্ষা করিয়া, তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতে হয়, তাহা আমাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকে। এইরূপ জীবন চিরদিনই মানব ইতিবৃত্তে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

সাধুদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে, জীবনে কি মহৎ কল্যাণই সাধিত হয়! জীবনচরিত পাঠ করিলে, পঠিত জীবনের অনেক ছায়া আসিয়া, আমাদের জীবনের উপর প্রতিফলিত হয়। কাহারও বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসপূর্ণ জীবনের উত্তাপ আমাদের জীবনকে গরম করিয়া তুলে, কাহারও বা ভক্তিপূর্ণ জীবনের স্নিগ্ধতা আমাদের সংসার-তাপিত জীবনের উপর যেন শীতল বারি সিঞ্চন করিয়া থাকে।

একই শক্তি যেমন এই ধরাকে, কখন রুদ্রমূর্ত্তিতে, কখন বা স্নিগ্ধ কোমলতায় পূর্ণ করিয়া মানব-মনে বিচিত্র-ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে, ঐ ঐশীশক্তিই আবার তদ্রূপ ব্যক্তিবিশেষের জীবনে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়। মানব ইতিবৃত্ত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। খৃষ্টীয় ইতিবৃত্ত পাঠকেরা জানেন, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা লুথারের পথাবলম্বী প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাহাকেও সিংহ মুখে নিক্ষেপ করিতেন; কাহাকেও বিষাক্ত সর্প পূর্ণ পিপার মধ্যে পুরিয়া, উহার মুখ বন্ধ করিয়া সাগর-তরঙ্গে ভাসাইয়া দিতেন; কাহাকেও সজোরে লৌহশলাকার উপর বসাইয়া, উহার অগ্রভাগ দ্বারা, তাহার মস্তক ভেদ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং কাহাকেও হুতাশনের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন। এ সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার পাঠ করিলে, অত্যাচরিত ব্যক্তিদিগের চরিত, আমাদের সম্মুখে বিশ্বাসেরই জয় ঘোষণা করিয়া থাকে।

নেপোলিয়নের বীরত্ব কাহিনী ও কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায়, খৃষ্টীয় জগতের কোন কোন ধর্ম্মবীরের জীবন-কাহিনী তদ্রূপ বিস্ময়কর ও প্রীতিপ্রদ। রিডলি ও লাটিমারের বিষয় পাঠ করিলে, কাহার হৃদয় না, বিশ্বাসের দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়রসে পূর্ণ হইয়া উঠে?

ইংলণ্ডের রিডলি ও লাটিমারের আত্মোৎসর্গ এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। উভয়েই প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য উভয়কেই ক্যাথলিক চর্চ্চের বিধানানুসারে প্রাণদণ্ডের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হয়। উভয়ের উপর

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা যখন প্রদত্ত হইল, তখন এই বিশ্বাসীদিগকে বধ্যভূমিতে উপস্থিত করা হইল। এক ব্যক্তি উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে কাষ্ঠের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। বন্ধনকারী যখন রিডলিকে বন্ধন করে, তখন শক্ত করিয়া বন্ধন করিতে সমর্থ হইতেছে না দেখিয়া, রিডলি স্বয়ং তাহার হস্ত হইতে শৃঙ্খলটি লইয়া দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এইরূপ করিয়া শক্ত করিয়া বাঁধ'। উভয়েই এইরূপে বন্দী হইলে, উভয়ের পদতলের নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল। চারিদিক শোকার্ত্ত দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। হুতাশন এই মহাত্মাদিগের পদদ্বয় স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, লাটিমার যে জীবন্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা ইংলণ্ডের ও খৃষ্টীয় ইতিবৃত্তে চিরদিনই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত থাকিবে। লাটিমার রিডলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "Be of good comfort, brother Ridley, and play the man; we shall this day, light such a candle by God's grace in England, as I trust shall never be put out." "ভাই রিডলি প্রকৃত মানবের ন্যায় কার্য্য কর, এবং হৃদয়ে আনন্দ লাভ কর; আমরা আজ ইংলণ্ডে যে আলো প্রজ্বলিত করিব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ আলো পরমেশ্বরের কৃপায় আর কখন নির্ব্বাপিত হইবে না।"

যখন দাউ দাউ করিয়া দুইদিকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন দুইদিক হইতেই আবার দুইটি ধ্বনি উত্থিত হইল। রিডলি বলিয়া উঠিলেন, "Lord unto thy hands, I commend my spirit: Lord receive my spirit." "ভগবান! তোমারই হাতে আমি আজ আমার আত্মা সমর্পণ করিলাম। তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।" লাটিমার অন্যদিক হইতে বলিয়া উঠিলেন, "Oh Father of Heaven, receive my soul." "হে পরমেশ! তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ করতঃ স্বর্গীয় বলে বলীয়ান কর।"

উভয়কেই প্রোথিত কাষ্ঠের সঙ্গে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল; এবং অগ্নিশিখা যাহাতে ধীরে ধীরে তাঁহাদের পাদদেশ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেজন্য তাঁহাদিগের চরণের নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল।

সৌভাগ্যক্রমে প্রচুর কাষ্ঠখণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া, লাটিমারকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। কিন্তু রিডলির দুইখানি পা দগ্ধ হইলে, কাষ্ঠাভাবে অগ্নির প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িল। জীবিত মানুষের ও অর্দ্ধদগ্ধ শরীরের কথা স্মরণ করিলে, কাহার শরীর না শিহরিয়া উঠে? এই কল্পনাতীত যন্ত্রণার মধ্যে রিডলি অচঞ্চল অবস্থায় বলিলেন, "খৃষ্টের নামে বলিতেছি, আগুন ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দাও, দেখ, আমার সার্ট এখনও দগ্ধ হয় নাই!" তখন কাষ্ঠের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হইল, হুতাশন আপন পরাক্রম বিস্তার করিয়া, তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্ম করিয়া নিরস্ত হইল।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

কবিতা-গুচ্ছ।

হিন্দু-মুসলমান।

কহিলা দেশ-মাতৃকা—"শুন বৎসগণ
যুগল সন্তান তোরা—হিন্দু-মুসলমান,
এক বৃন্তে দুটি ফল—অথবা যেমন
জীবদেহে দুটি নেত্র—উভয়ে সমান।
এক ভাষা ভাষী দোঁহে, এক স্থানে বাস
একই নদীর জলে মিটাও পিপাসা,
এক পথে চলা ফিরা, এক ভুঁয়ে চাস,
পরস্পর প্রতি তাই সাজে ভালবাসা।
ভুলে যাও বৎসগণ অতীত কাহিনী
বাদ বিসংবাদ বহু হইয়াছে দোঁহে,
চেয়ে দেখ মোর প্রতি চির অভাগিনী
জননী তোদের আজি জীর্ণাশোকমোহে।
দুই ভাই এক হয়ে হও আগুয়ান,
ঘুচাও মায়ের দৈন্য—হিন্দু-মুসলমান।"

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

হেমন্তে।

১

প্রকৃতি, সজনী, আজ   করে এলি একি সাজ
প্রভাত কালে,
ও চারু আননখানি   কেমনে ঢাকিলি রাণী,
কুয়াসা জালে!
কোন্ রসরাজে আজি নিরখিয়া
মরমে মরমে সরমে মরিয়া
খুলিলি দ্বার,—
কিছুই ত নাহি বুঝি   আকুলি কেবলি খুঁজি
পরশ তাঁর।

২

শ্যামল তৃণের দলে   মুকুতা কি আজি ঝলে—
অথবা ছলে
পুলক-নয়ন-জল   ঢালিলি ও পদতল
ধোয়াবি বলে!
আতসী গেঁদায় গোলাপ বেলায়
যে মালা গাঁথিলি, কাহার গলায়
দোলাবি বালা,—
বুল্‌বুল টিয়ায় সখী,   তোর ঘরে পেল একি
অতিথশালা!

৩

সুরসাল তুঁতফলে   করিবি কি কুতুহলে
কাহারে সেবা,—
নিবিড় প্রণয় সম   সেই পূজা নিরুপম
নিবেন একা!
শীতল সমীর রহিয়া রহিয়া
কার কথা যেন আনিছে বহিয়া,
শিহরে বুক,—
যাচি সখী, করযোড়ে   আজিকে দেখানা মোরে
সে হাসি মুখ!

৪

বড় আশা জাগে প্রাণে   যাহারে হেরিনু ধ্যানে
বাসিনু ভালো,
সে যেন গোপনে আজ   আসিছে অবনী মাঝ
জ্বালিতে আলো।
তোর সনে তার, কি-যেন-কি খেলা
হবেরে সজনী এ প্রভাত বেলা
মধুরতর,—
সে খেলায় তিলতরে   নেনা মোরে সাথী করে
নহি ত 'পর'!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কামনা।

জীবনে আমার যাহা ছিল সব
দিয়াছি তোমারে নাথ,
আমার মাঝারে রহিয়াছ তুমি
করিয়াছ মোরে সাথ!
জীবনে-মরণে ভুলিব না কভু,
তোমারে ছাড়িয়া কি লইব প্রভু!
তোমার চরণ করিয়া স্মরণ
রহিব দিবস রাত!
জীবনে আমার কতই আনন্দ
করেছ নিয়ত দান,
তুমিই গো পিতা তুমিই গো মাতা
তুমিই সবার প্রাণ!
তুমি দয়াময় মঙ্গল-আলয়
সকলি তো জান তুমি;
তোমার চরণে এক মন প্রাণে
দিবানিশি যেন নমি!

শ্রীননীবালা দেবী।

আশা।

কে রে তুই ব'লে দিলি কানে কানে মম,
'এখন সময় আছে ফের পায় ফের'?
কুহকিনি! কে রে তুই নাহি দিস্ ধরা—
ফিরাইলি কেন তুই জীবন দুঃখের?

সংসার-তরঙ্গ-বেগ না পারি সহিতে,
ডুবিতে ছিলাম আমি নিরাশা-সাগরে,—
ছাড়িয়াছি প্রিয় যত মুগ্ধ বাসনায়
আহত অকর্ম্ম এবে কর্ম্মের সমরে।

তুই ফিরাইলি মোর অবশ জীবন
—জ্বালিলি উত্তম-শিখা হৃদয়ে আবার,
মায়াবিনি! এলি বুঝি আর এক তিল
হতাশ জীবনে কর আশার সঞ্চার।

শ্রীকুসুমেশ্বর বোস।

শোভার শেষ।

ধরণীর কোন্ এক কোণে
অজানিত নিভৃত প্রদেশে,
ফুটেছিল একটি কুসুম,
শোভাময়ী নিশীথিনী শেষে।
প্রভাতের মলয় পবন,
ল'য়ে যত সুবাস হরিয়া,
নিরজন শান্তিময় দেশে,
মৃদু মৃদু যাইত বহিয়া।
প্রভাতের সুনীল আকাশে,
ধীরে ধীরে কনক-বরণ,
আলোকিত করিয়া ধরণী,
প্রকাশিত তরুণ তপন।
সহসা কাঁপায়ে তরুশাখা,
ভীম বেগে ঝটিকা বহিল,
জীবনের প্রভাত সময়ে,
ফুলদল ঝরিয়া পড়িল।
এ ধরায় না ফুটিয়া যদি,
মন্দাকিনী-পূত উপকূলে—
ফুটিতে গো কুসুম কলিকা,
উঠিতে গো দেবতার গলে।
শান্তিময় সেই সুখ স্থানে
মনোহর হাসিটি হাসিয়া,
চারিধারে সুবাস বিলায়ে
চিরকাল থাকিতে ফুটিয়া।
কিন্তু তোর ভাগ্য-দোষে বালা,
এসেছিলি ধরার মাঝারে,
পড়িলি গো ঝরিয়া ভূমিতে
বিকশিয়া ক্ষণেকের তরে।
যাও তবে যাও গো কুসুম
স্বরগের পারিজাত বনে,
আর কভু ভুলিয়াও যেন
এস'না গো একাল-কাননে!

শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী।

[নব পর্য্যায় ।]

২য় বর্ষ ।] ফাল্গুন, ১৩২২ । [১১শ সংখ্যা ।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ।

১

সাহিত্য-চর্চ্চার অবস্থা ।

এখন এই কথা যে, আমাদের মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা নানা দিক দিয়া উত্তম-রূপে জমিয়া উঠিতেছে না কেন ? মুসলমানগণ বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া চলিয়াছেন একথা যেমন সত্য, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চায় জোর বাঁধিতেছে না। হিন্দু সমাজে যে শুধু রাশি রাশি মাসিক পত্র চলিতেছে, এমন নয়, প্রতিদিন যে কত নূতন লেখকের সৃষ্টি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই ; বঙ্গসাহিত্য যে নিত্য কত নূতন ভাব-সম্পদে ও রস-সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চার প্রতি সেরূপ আগ্রহ ও উদ্যম দেখা যাইতেছে না কেন ? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই বহু মুসলমান গ্রন্থকার অনেক ভাল ভাল পুস্তক লিখিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। ধরিয়া লওয়া যাউক ইহা সত্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা পুস্তক প্রকাশ করিতে না পারেন, প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেও অক্ষম কেন ? এই প্রশ্নের একটা উত্তর করা হয় যে, আমাদের জাতীয় কোন সাহিত্য পত্র নাই, হিন্দু মাসিক পত্রে প্রবন্ধ পাঠাইলে তাহা সম্পাদক হিংসা বা তাচ্ছিল্য বশতঃ প্রকাশ করেন না। ইহা কতদূর সত্য তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ। যদি মাননীয় 'প্রবাসী' সম্পাদক

মহাশয় এই সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশে হিন্দু সম্পাদকগণ কার্পণ্য প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু কোন মৌলিক ও সাহিত্য-রস-সম্পন্ন প্রবন্ধ কোন সম্পাদক প্রকাশ করেন নাই, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

আসল কথা এই যে, মুসলমান লেখক-সাহিত্যিকগণ স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ও রস-সৌন্দর্য্য-ময় প্রবন্ধাদি রচনা করিতে হয় অক্ষম, নয় উদাসীন। ইহার প্রমাণ এই যে, নব পর্য্যায়ের "কোহিনূর" ও "আল-এসলাম" বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হইলেও 'নব-নূরের' সেই শক্তিশালী লেখক সম্প্রদায়ের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ ঘটে নাই। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট লেখক ব্যতীত নূতন শক্তিশালী লেখকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের ধর্ম্মগত বিশিষ্টতাশূন্য বিশ্ব-জনীন মৌলিক রচনা আমাদের মাসিক পত্রে একরূপ দেখাই দেয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজিও বিচিত্র রস-গন্ধ-ময় কাব্য গল্প উপন্যাস প্রভৃতি সুকুমার সাহিত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আদৌ পতিত হয় নাই। সুকুমার সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষার মধ্যে ভাবের যে সমস্ত আঙ্গুর সঞ্চিত আছে তাহার রস পানে মাতিয়া উঠিবার সৌভাগ্য আমাদের একেবারেই হয় নাই। আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার এই একটি বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের লেখকগণ প্রায় সকলেই ইতিহাস ও জীবন চরিত বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। আমাদের সমাজে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই এই দুইটি বিষয় লইয়া লিখিত। জাতির অতীত গৌরব-গরিমার উজ্জ্বল-চিত্র নয়ন সমক্ষে স্থাপন করিয়া বা মহাপুরুষের মহত্ত্ব-মহিমা চোখের উপরে ফুটাইয়া তুলিয়া, এই পতিত জাতিকে সচেতন ও গৌরব লোলুপ করিবার পক্ষে, এই শ্রেণীর সাহিত্য-চর্চ্চা যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, ইহা দ্বারা প্রকৃত সাহিত্য চর্চ্চা ও তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। অনুবাদ বা অনুসরণ করিয়া পুস্তক লেখায় চিন্তা শক্তি পরিচালনের আবশ্যক হয় না। ইহাতে জাতীয় মনীষাও বিকাশলাভ করিতে পারে না। ভাব ও রস সাহিত্যের প্রাণ। যে পর্য্যন্ত ইতিহাস বা দর্শন সত্যরসের পসরা ও ভাবের মাধুরী লইয়া উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা কোন জাতির চিত্তকে অনু-প্রাণিত করিয়া তুলিতে পারে না। ভাব ও রস একেবারে মনুষ্যের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হয় বলিয়া, যে কথা রসের সহিত বলা যায়, মনুষ্যের মন তাহা

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় একেবারে লুফিয়া লয়; তাহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মন এরূপ মত্ত হইয়া পড়ে যে, বিনা চিন্তায় অজ্ঞাতসারে সেই ভাবের রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া উঠে।

ফলতঃ রসাত্মক ও মৌলিক চিন্তা-প্রসূত সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য, এবং এবম্বিধ প্রবন্ধ রচনাতেই সাহিত্য-সেবার প্রকৃততা বা প্রকৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্যই কোন দেশ বা জাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মণ্ডলীর নাম করিতে গেলে, প্রথমে সেই দেশ বা জাতির শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদিগের নামই করিতে হয়। রুষিয়ার ডস্টয় ভেস্কি ও টলষ্টয়ের গল্প-উপন্যাস সমূহে রুষ কৃষকের ভাগ্য পরিবর্ত্তনে ও ডুমা সংঘটনে কিরূপ কষ্ট তাহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই এই কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দূরের কথা যাউক, আমাদের দেশেই বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাস সমূহ বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে যে বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, বাঙ্গালীর চিন্তার স্রোত যেরূপ ভাবে নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছে, কোন মহা বাগ্মীর বাক্-শক্তি তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই।

আমরা বলিতে চাই যে, আমাদের মধ্যে এখনও প্রকৃত সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হয় নাই। আমাদের মধ্যে এমন বহু শিক্ষিত ও ধীমান ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই উৎকৃষ্ট মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু করিতেছেন না। সংক্ষেপে আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার সময় হিসাব করিলে দেখা যায় যে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কিছুমাত্র প্রসার ঘটে নাই। আমাদের মধ্যে একখানিও উৎকৃষ্ট নীতিকাব্য প্রকাশিত হয় নাই, ধরিবার মত মৌলিক গ্রন্থও তিন চারিখানার বেশী রচিত হয় নাই। এ কথায় অনেকেই রাগ করিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই রাগ মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।

গ্রন্থ যাহা রচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই আরবী বা উর্দ্দু গ্রন্থের অনুবাদ; কাব্য সমূহ ধর্ম্মহীনতার আক্ষেপ ও সমাজের দুর্দ্দশার আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ। উদার মৌলিক বিশ্বজনীন ভাবের একান্ত অভাব।

চাই কল্পনার মাধুর্য্য, রসের নবীনতা, চিন্তা ও চিন্তার মৌলিকতা। সেই প্রতিভা ও মনীষার দীপ্তি দেখিতে পাইতেছি না। ইহার কারণ কি?

সাহিত্যানুরাগের অভাব।

অনেকে বলেন, আনন্দ হইতে সাহিত্যের জন্ম এবং কাজে কাজেই উহা বিশ্রাম মুহূর্ত্তেই উৎপন্ন হয়। কোন জাতির লোকসাধারণকে যখন খাওয়া পরার জন্য কঠিন সংগ্রাম করিতে না হয়, তখনই তাহার মধ্যে এমন একদল উদ্বেগ শূন্য লোকের উৎপত্তি হয় যে তাহারা সহজেই তাস পাশার ন্যায় সাহিত্যের নেশায় মাতিয়া উঠে ও বসিয়া বসিয়া রসের মধুচক্র নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। পেট ঠাণ্ডা থাকে বলিয়াই মনের মধ্যে ভাবের কূজন শুনা যায়, এবং মাথার মধ্যে নানা রকম সোনালী খেয়াল আসিয়া জুটে; চিন্তাশক্তি নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে তৎপর হয়। বোধ হয় এই যুক্তির অনুকূলে বলা যাইতে পারে, অমন যে কবি-শিরোমণি কালিদাস, তাঁহাকেও 'চমৎকার অন্নচিন্তা'য় বিব্রত হইয়া কবিত্বের সূত্র হারাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল। সুতরাং অন্যের সম্বন্ধে আর কথা কি ?

মুসলমান সমাজ অত্যন্ত দরিদ্র। এই দরিদ্র সমাজে যে সমস্ত যুবক উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার খরচ যোগাইতে ও পরিবার পোষণ কার্য্যেই অস্থির, সুকুমার সাহিত্যের দিকে মন দিবার তাঁহাদের অবসর কোথায় ? সুতরাং যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত মুসলমান-সমাজ জীবন-সংগ্রামের পেষণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে না পারিতেছেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের সেবা ও পুষ্টি সাধনের আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি সাহিত্য-চর্চ্চা না করেন, তাহা হইলে সে জন্য তাঁহাদিগকে দোষী করা যায় না।

আমরা এই যুক্তি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

আনন্দ হইতে সাহিত্যের জন্ম হইতে পারে এবং সুখের সময় সাহিত্যের বিকাশ পক্ষে অনুকূল ইহা সত্য, কিন্তু দুঃখ হইতেও কি সাহিত্যের জন্ম হয় না ? আনন্দ দান করাই কি কেবল সাহিত্যের লক্ষ্য ? কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করাও কি তাহার লক্ষ্য নহে ? আনন্দ-সাহিত্য ও শিক্ষার সাহিত্য এই দুইটার মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ, সে প্রশ্ন এখানে তুলিব না ; কিন্তু শিক্ষাদান যে সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, দুঃখ হইতেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য উৎপন্ন হয়, এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণা হইতেও সাহিত্য চর্চ্চার বিকাশ হইয়াছে। জগতের দুইখানি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, 'ইলিয়ড' ও 'প্যারাডাইস্‌লষ্ট' অন্ধ কবির হৃদয়জাত

জিনিস। দুঃখের দাবদাহের মধ্যে তাহার উৎপত্তি। 'ডিভাইন কমেডি'র কবি দান্তে যে দুঃখ-বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তিনি শরীরের শোণিত-বিন্দু দিয়া স্বীয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখী-তাপিতের ব্যথার সুতীব্র অনুভূতি হইতে বার্ক ও হুগোর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ের উৎপত্তি। গোল্ডস্মিথ আজন্ম দুঃখদারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়া অপার্থিব কাব্যকুসুমসমূহ রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে রুসিয়া হইতে ভাবের যে নবীন ধারা উৎসারিত হইয়াছে তাহা রুষিয়ার তৎকালীন যথেচ্ছাচার রাজতন্ত্রের নিষ্পেষণের ফল। বঙ্গদেশে মাইকেল ও হেম দারিদ্র্য ও অন্ধত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। এই সেদিন কার কথা, রজনী সেন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়াও কাব্যরচনা করিয়াছেন। এখনও বিজয়চন্দ্র অন্ধ হইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেছেন এবং কবি গোবিন্দ দাস রোগ ও দৈন্যে মুহ্যমান হইয়াও সাহিত্য-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মুসলমান-সমাজেও এমন কোন কোন সাহিত্যিকের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে গিয়া ধন সম্পত্তি নষ্ট করতঃ কাঙ্গাল সাজিলেও সাহিত্যের মায়া কাটাইতে পারিতেছেন না। বঙ্গদেশের রবীন্দ্রনাথ ও ইংলণ্ডের টেনিসন ব্যতীত অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবি দুঃখদারিদ্র্যের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন, চন্দন তরুর ন্যায় দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া ভাবে সুগন্ধ দিয়াছেন।

ফলতঃ আনন্দজাত ও আনন্দমুখি সাহিত্য প্রজাপতির মত, রঙ্গিন পাখা মেলিয়া লঘু হাওয়ায় হাওয়ার মত উড়িয়া যায়। দুঃখ হইতে যথার্থ সাহিত্যের জন্ম এবং সেই সাহিত্যই সৃষ্টি সময় আনন্দের সুগন্ধ দেয়,—তাহাই মানুষের মনকে গভীর ভাবে আন্দোলিত করিয়া আসিতেছে।

রুষিয়ার অজ্ঞ ও অক্ষম কৃষক সমাজকে জাগ্রত ও উন্নত করা আবশ্যক হওয়ায়, সেখানে এই উদ্দেশ্যে এক বিরাট উপন্যাস-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া দেখান হইয়াছে, যে কৃষক, যে দীন, যে মূর্খ সেই হীন নহে, পশু নহে, তুচ্ছ নহে। তাহার মধ্যেও মনুষ্যত্বের মহিমা আছে, তাহার স্বার্থরক্ষা ও উন্নতির উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিবার অধিকার ধনী মানীর চেয়ে এক চুল পরিমাণও কম নয়।

এক্ষণে কথা এই যে, বাঙ্গালী মুসলমানদের মত দুঃখদারিদ্র্যগ্রস্ত জাতি কোথায়? বাঙ্গালী মুসলমান যুবক যে দুঃখকষ্টের সহিত শিক্ষালাভ করেন

তাহা বর্ণনাতীত। আমাদের অধিকাংশ ছাত্র কলিকাতায় একরূপ কারাকক্ষে থাকিয়া ও অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া শিক্ষালাভ করেন। তাঁহারা যে দুঃখ ভোগ করেন তাহাতে মেরুদণ্ড সবল ও চিত্তবৃত্তি সূক্ষ্ম ভাব ধারণ ও পরিচালন যোগ্য হওয়া উচিত। তথাপি তাঁহাদিগের মনে সাহিত্য-চর্চ্চাপ্রবৃত্তি জাগে না কেন? সাহিত্যে প্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টি করতঃ *মৌনমুখ মুসলমান-জনসাধারণকে উদ্বোধিত করিবার প্রয়োজন ত কাহারও অস্বীকার করিবার* উপায় নাই। তথাপি সেই অভাব পূরণের জন্য তীব্রতৃষ্ণায় শিক্ষিত-মন আকুল হইয়া উঠিতেছে না কেন?

মোটা মাহিনায় চাকরী করিয়া সুখ ভোগ করিতেছেন, পেনসন লইয়া বিশ্রাম সুখের নেশায় নিমগ্ন আছেন, সুখে স্বচ্ছন্দে যাঁহাদের সংসার চলে, এমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সমাজে অভাব নাই। তাঁহাদের সংখ্যা অল্প হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা আছেন। আজ কাল বহু মুসলমান যুবক ডেপুটি ও সবডেপুটি মুন্সেফ হইয়া সম্ভবতঃ কিয়ৎ পরিমাণে সুখের মুখ দেখিতেছেন। ঢাকা ও কলিকাতার মেসে ও হোষ্টেলে বহু কলহাস্যমুখর সুখ-পালিত ধনীতনয় গ্র্যাজুয়েটের দর্শন পাওয়া যায়, তথাপি তাঁহারা সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেছেন না।

মুসলমান বিদ্যার্থীগণ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছেন, তথাপিও তাঁহাদের মধ্য হইতে সাহিত্যের ভাব-ধারা উৎসারিত হইতেছে না।

তাহা হইলে আমাদের এই সাহিত্য-চর্চ্চার নীরসতা ও সংকীর্ণতার কারণ কি? জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকগণ কেন বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করেন না?

এখানে মনে স্বতঃই সন্দেহের উদয় হয় যে, হয়ত আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং তজ্জন্যই বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের এই নিদারুণ উপেক্ষা। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ সন্দেহ করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। বহু শিক্ষিত মুসলমান নিয়মিত ভাবে 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষে'র গল্প উপন্যাসের রস পান করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সমূহের সহিত তাঁহারা পরম সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গলা রঙ্গালয়গুলিও তাঁহাদের কলহাস্য হইতে বঞ্চিত নয়। আবার অন্যদিকে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতিও যে তাঁহারা একান্তভাবে সদয় তাহারও কোন লক্ষণ দেখি না। কোন ইংরেজী মাসিক বা সাপ্তাহিকে তাঁহারা যে নিয়মমত ভাবে রাশি রাশি সরস ও সারবান প্রবন্ধ

প্রকাশ করিতেছেন, ইংরেজী ভাষায় যে তাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, এমনও চোখে পড়ে না, সুতরাং কেমন করিয়া বলিব যে, তাঁহারা বাঙ্গালার প্রতি বিরূপ ও ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যিক। আসল কথা এই যে, আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানগণ শোচনীয় রূপে বিবেক বুদ্ধি পরিশূন্য কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন অলস উদাসীন অদ্ভুত জীব মাত্র। তাঁহাদের মধ্যে প্রাণের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সমাজের সমবেদনা ও সাহায্যের বলে তাঁহারা শিক্ষিত সম্মানিত ও সুখী হইয়াছেন, সেই দীন ও পতিত সমাজের প্রতি যে তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য আছে, মানব জীবনের যে কোন অর্থ-মূল্য ও উদ্দেশ্য আছে, ইহা তাঁহাদের গল্প-গুলজার তামাসাময় মাথায় মুহূর্ত্তের তরেও স্থান পায় না। কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি সাহিত্য কোন বিষয়ের চর্চ্চাতেই তাঁহাদের অনুরাগ ও অস্তিত্ব নাই।

এই সমস্ত শিক্ষিত যুবকগণ মৌলবীদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহা-দিগের দেখিবার চক্ষু নাই। যে কতিপয় মুসলমান কর্ম্মী সমাজে নব জীবনের স্রোত আনিতেছেন এবং আপনাদিগের ত্যাগের বলে সমাজকে উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের পোনর আনা মৌলবী। তাঁহাদের ত্যাগ সেবা ও শক্তির সহিত সমকক্ষতা করিতে পারেন, এমন লোক ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে দৃষ্টিগোচর হয় না। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত যুবকগণকে আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহারা অর্দ্ধইংরেজী শিক্ষিত বা ইংরেজি অশিক্ষিত বর্ত্তমান মুসলমান লেখকগণের রচনা পাঠে সময় ক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। সমালোচনা করিতে ইহারা সিদ্ধহস্ত, কিন্তু আধ কথা রচনা করিতে বলিলে ইহাদের চক্ষু স্থির হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের বুলি আওড়াইয়া ধর্ম্মের বিধান ধ্বংস করিতে ইহারা পটু, কিন্তু মাথা খাটাইয়া কোন ধর্ম্মবিধির জ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে ইহারা অপারগ। ধর্ম্ম পালন করিতে বলিলে ইহারা নীতি ও বিবেকের দোহাই দেন, কিন্তু যে সেবা-পরায়ণতা ও জ্ঞান-গবেষণা নাস্তিকদিগের গৌরব, সেই সেবা ও চিন্তার ক্ষেত্র হইতে তাঁহারা একেবারে অদৃশ্য।

ফলতঃ এই সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা ত দূরের কথা, ইহাদিগেরই চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য লোকের দরকার। ইহাদের অবস্থা কি, কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

যখন মিষ্টার মর্লি তাঁহার "রিফরম্ স্কীম" প্রকাশ করেন, তখন কলিকাতায়

কোন মেসে কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান যুবকের নিকট সুকবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এ সম্বন্ধে কথা তুলেন। কবিবর শুনিয়া স্তম্ভিত হন যে, ঐ সমস্ত আই-এ, বি-এ, পাঠার্থী যুবকগণ "রিফরম্ স্কীম" যে কি পদার্থ—সাপ কি ব্যাং—তাহা তাঁহারা আদৌ অবগত নহেন।

কলিকাতায় যেবার কংগ্রেস বসে, সেবার একজন স্কুলের ডিপুটি ইনেস্পেক্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কংগ্রেস একটি কায়স্থ সভা কি না? সম্প্রতি খবরের কাগজে দেখিতেছি যে দুইজন বি-এ. উপাধিধারী যুবক এই বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন যে, তাঁহাদের সহিত রাজনীতির কিছুমাত্র সংস্রব নাই; সমাজ মরুক বা বাঁচুক, কাউন্সিলে মুসলমান মেম্বর হউক বা না হউক, সেজন্য তাঁহারা মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহেন। রাজনীতির বাতাস গায় লাগিলে তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন। অথচ এই দুইটি যুবক সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট্ দিবার অধিকারী।

ফলতঃ আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অলসতা, উদাসীনতা ও প্রাণহীনতাই আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার পঙ্গুতার কারণ। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও নিরাশার বিষয়।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী।

সোনার কাঠী ও রূপার কাঠী।

হিরণ কাঠীটি ছোঁয়ালে যেদিন
মাতার উদরে তুমি,
জাগিয়া উঠিয়া হেরিনু প্রথম
তোমারে জীবন-স্বামী।

ভেবেছিনু মনে তেমনি রহিব
দু'জনায় দু'জনার,
বিফল বাসনা! সঙ্গে রয়েছ
তবু তো দেখি না আর!

কে যেন বিশ্বে রূপার কাঠীটি
ছোঁয়ায়ে দিল যে শেষে,
তন্দ্রা-অলস মনের নয়ন
মুদিল তাহারি বশে!

শেখ ফজলল করিম।

ইস্‌লাম বিস্তারে মুসলমানের অপবাদ।

মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য জাতির শিক্ষিত লোকদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, জগতের মধ্যে ইস্‌লামধর্ম্মই কেবল সামরিক ধর্ম্ম। ইহার একহাতে কোরান ও অন্য হাতে তরবারি, অর্থাৎ মুসলমানেরা একহাতে কোরান ও অপর হাতে অসি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক লোকদিগকে মুসলমান করিয়াছিল। ইহার ভাবার্থ এই যে, কোরানে বিশ্বাস করিয়া হয় মুসলমান হও, না হয়, তরবারির আঘাতে প্রাণ হারাও। ইস্‌লাম-প্রচার সম্বন্ধে এইরূপ বদ্ধমূল ধারণা হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যেই দেখা যায় এবং তাঁহারা যে বহুকাল হইতেই এইরূপ ভ্রান্তিমূলক ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

আধুনিক বহু গবেষণার সাহায্যে ইতিহাস-চর্চ্চার উন্নতি ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সত্যতা উদ্ঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই উপরোক্ত মত পোষণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। আমার বোধ হয় ইস্‌লাম-প্রচারের সত্য ইতিহাস না জানা হেতুই এরূপ অপবাদের সমুদ্ভব হইয়াছে; অথবা বিদ্বেষবশতঃ সত্য ইতিহাস জানিয়াও তাহার অপলাপ করা হইতেছে। গত বৎসর বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে সুযোগ্য পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার সভাপতির সম্বোধনের স্থানে স্থানে এরূপ তীব্র উক্তি করিয়াছেন, দেখা গেল। তিনি তাঁহার সম্বোধনের বিংশ পরিচ্ছেদকে 'বিংশ গৌরব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব মুসলমানেরা জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিল, এরূপ উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগের নিন্দা করাকেও তিনি গৌরব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

তিনি 'সম্বোধনের' সপ্তদশ গৌরবে বলিয়াছেন:—"মুসলমানেরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিয়া ফেলিল।" কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনি কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ না দিয়া এই কথা অনায়াসেই একটা সভা-স্থলে বলিয়া ফেলিলেন। সভাটি শিক্ষিত হিন্দু লইয়াই গঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার ন্যায় সুধীজনের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত সকলেই এইরূপ বিশ্বাস করিলেন যে, মুসলমানেরা ভারতবর্ষের হিন্দুদিগকে কেবল জোর করিয়াই মুসলমান করিয়াছিল। তিনি উপরোক্ত গৌরবের আর এক

স্থানে, "মুসলমানেরা মাদুর বুনে, মাদুর বুনিবার জন্য এক ঘরও হিন্দু নাই। বিহারগুলি এইরূপে শুধু যে ধ্বংস হইল এমন নহে, সেখানে মুসলমান আসিয়া বসিল এবং তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল"—মুসলমানদিগের প্রতি এইরূপ তীব্র উক্তি করিয়া যেন আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস সম্বোধনচ্ছলে বলাই সভাপতির উদ্দেশ্য এবং প্রাচীন বা মধ্যকালীন ভারতে হিন্দুদিগের যাহা যাহা গৌরবের বিষয় ছিল, তাহা তাহা উল্লেখ করাকেই তিনি 'গৌরব' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আবার এরূপ উক্তি কেন? "মুসলমানেরা মাদুর বুনে, মাদুর বুনিবার জন্য একঘরও হিন্দু নাই। বিহার গুলি এইরূপে ধ্বংস হইয়াছিল।...তাহারা চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল।" এরূপ বাক্যগুলিতে কি ঘৃণার ভাব মাখা নাই? মুসলমানেরা মাদুর বুনে বলায় বোধ হয়, মাদুর বুনা কাজটি যেন অতি নিকৃষ্ট। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, এরূপ বলায় মুসলমানদিগের একটি গৌরব প্রকাশ করা হইয়াছে। মাদুর বুনা কাজ হিন্দুদিগের জানা ছিল না। মুসলমানেরাই আসিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে মাদুরের ব্যবহার শিখাইয়াছে। কারণ মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে, মাদুর বুনা শিল্পকার্য্যটি ভারতবর্ষীয় লোকেরা আদৌ জ্ঞাত ছিল না বলিয়া জানা যায়। কেন না, হিন্দুদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, বৃত্তি অনুসারে জাতিভেদ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইলে জানা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মাদুর ও সেলাই করা কাপড়ের আদৌ ব্যবহার ছিল না। কারণ এই কার্য্য করিবার জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে কোন জাতি দেখা যায় না। লৌহ হইতে অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করা কামারের কার্য্য; মৃন্ময় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা কুমারের কার্য্য; সুবর্ণ হইতে অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করা স্বর্ণকারের কার্য্য; পরিধেয় কাপড় বয়ন করা তাঁতির কার্য্য। এইরূপ এক একটি কার্য্যভেদে জাতিভেদ দেখা যায়। কিন্তু সেলাই কাজ করিবার বা মাদুর বুনিবার তো কোন জাতিই নাই। অতএব এই কার্য্য বা এরূপ জিনীসের ব্যবহার মুসলমান আসিবার পরেই আরম্ভ হইয়াছিল।

"তাহারা অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল" বলাতে বুঝায় যে, যেন চারি পাশের লোকেরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল, আর বলিবামাত্রই তাহারা মুসলমান হইয়া গেল। ইহা হইতে এরূপ বুঝায় না যে, মুসলমানেরা জোর জবরদস্তি করিয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিয়াছিল।

বিহার ধ্বংস করার অপরাধেই যদি মুসলমানেরা দোষী হয়, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্য সকল সময়ই ঘটিয়া থাকে। যখনই কোন জাতির বা ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় ও প্রাধান্য লাভ করে, তখন তৎকালে যে ধর্ম্ম বা জাতি বিগুমান থাকে, তাহার লোপ বা বিনাশ সাধন হয়। একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রবল হইয়াছিল তখন কি হিন্দুধর্ম্মের তীর্থস্থান, মন্দির এবং দেবদেবীর অনিষ্ট ঘটে নাই? আমার বিশ্বাস যে, যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুর যে কত কত তীর্থস্থান ও দেব মন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহারা হিন্দুর দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তথায় কি বৌদ্ধমঠ স্থাপন করে নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিল।

এইরূপে যখনই কোন এক নূতন জাতির উত্থান হয়, তখনই যে তদানীন্তন জাতি বা ধর্ম্মের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। জগতের ইতিহাসে এরূপ প্রমাণের অভাবও নাই। যাহাই হউক, আমি বলি যে, বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় একজন প্রবীণ ও বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত; তাঁহার ন্যায় সুধীজনের এরূপ মন্তব্য প্রকাশ কঠোর ও মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ একটা সাহিত্য সভাস্থলে—যেখানে বহুসংখ্যক হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে, —সেখানে চিরপ্রচলিত অন্যায় বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ভাবে লোকের মনোমধ্যে স্মরণ করাইয়া দেওয়া তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির উচিত নহে। যাহাতে ঐরূপ অনৈতিহাসিক ভ্রমাত্মক ধারণা লোকের মনোমধ্য হইতে দূরীভূত হয়, তদ্রূপ 'সম্বোধনই' তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে শোভন হইত।

আজি কালি দোষগুণ বিচার করিয়া সকল বিষয়েরই চর্চ্চা হইতেছে। মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাসও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়া ইহার প্রকৃত ইতিহাস জানা গিয়াছে। ইস্‌লাম-ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত ইতিহাস সবিশেষ পাঠ না করিয়া 'একহাতে কোরান ও অন্য হাতে অসি' লইয়াই যে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এরূপ বলা উচিত হয় নাই। ঘোর ইস্‌লামধর্ম্মদ্বেষী পাশ্চাত্যপক্ষপাতী ও খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের ঐরূপ অলীক বিদ্বেষভাবযুক্ত বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে কতদূর অন্যায়, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

কে না জানে যে, ইউরোপের খৃষ্টানেরা ইস্‌লাম-ধর্ম্মসংস্থাপক মোহাম্মদকে (দঃ) অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে অতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম

বলিয়া প্রচার করে। কে না জানে যে, তাহারা তাঁহাকে আদৌ প্রেরিত পুরুষ (রসুল বা নবী) বলিতে চাহে না। কে না জানে যে, তাহারা এরূপ বলে যে, তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক কোরান 'ধর্ম্মপুস্তকই নহে', ইহা কেবল 'ছেলে-খেলা' মাত্র।

যাহা হউক, অনেকে বলেন ইস্লামধর্ম্ম-সংস্থাপক মোহাম্মদ (দঃ) তরবারি লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কিজন্য অসি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার বিচার করা আবশ্যক। তিনি কি প্রেরিতত্ব ('নৌবুয়ৎ') বা প্রচার-আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই অসি ধারণ করিয়াছিলেন? না, একেশ্বর-বাদিত্ব প্রচার করিতে গিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতীয় লোকদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য অসি ধারণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময় তিনি অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা প্রথমে দেখা আবশ্যক। ইস্লাম-ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসবিশারদ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, যখন তিনি নিরতিশয় উৎপীড়িত, ধর্ম্মপ্রচারে ব্যাঘাত ও অশেষ যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন নিরূপায় হইয়াই অসি ধরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পাছে তিনি নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করেন তজ্জন্য "ধর্ম্মের জন্য বলপ্রয়োগ করিও না—'লা একরাহা ফিদ্দীনে'—ধর্ম্মে বলপ্রয়োগ নাই" এই আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা কোরানান্তর্ভূত বাক্য। তিনি ঈশ্বর প্রেরিত, কোরান ঈশ্বরবাণী ও ইহা ঈশ্বরের নিকট হইতে অবতীর্ণ বলিয়াই তিনি দাবি করিয়াছিলেন। অতএব তিনি কখনও কোরানের আজ্ঞার অতিরিক্ত একপদও অগ্রসর হন নাই, বা কোরানের একটি আদেশও উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে কিজন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবার আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপ্রচারকল্পে বলপ্রয়োগ না করিতে কোরান কিরূপ আদেশ করিতেছে এবং কিরূপে অন্যান্য দেশে ইস্লাম-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এবং কখন কিরূপ ভাবে আফ্রিকা মহাদেশে ইস্লামধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিলেন বা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, তৎপরবর্ত্তী মুসলমান খলিফা, সুলতান, বাদশাহ, আমীর, নবাব প্রভৃতি নৃপতিরা যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের লোকদিগকেও তাঁহারা জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাসও অনেকের মনে বদ্ধমূল আছে। মুসলমানদিগের আর একটা

অপবাদ এই যে, ভারতবর্ষেও মুসলমানেরা এইরূপ জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিল—একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি একথা সত্য হয়, তবে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহই কি এ বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখ করিতেন না? ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, বিদ্বেষপরায়ণ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা মুসলমান জাতির কতই নিন্দাবাদ এবং যুদ্ধবিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, চাতুর্য্য ও উৎপীড়নসূচক ঘটনার কতই না অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছেন, —যাহা এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে—কিন্তু কেহই তো বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মান্তরিত করিবার কথা উল্লেখ করেন নাই? মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও অতিরঞ্জিত বর্ণনায় পটু ছিলেন, একথা অনেকই বলিয়া থাকেন। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহারা অবশ্যই অন্য ধর্ম্মের লোকদিগকে আপন ধর্ম্মে আনয়ন কার্য্য গৌরবজনক মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাও বোধ হয়, কোন মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না।

আমি ভারতবর্ষের প্রাথমিক মুসলমান আক্রমণকারী বা বিজেতার ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে দেখাইব যে, তাঁহাদিগের কেহই বোধ হয় পরধর্ম্মের লোকদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আদৌ চেষ্টা করেন নাই। তবে যদি কেহ স্বইচ্ছায় আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তো সে কথা স্বতন্ত্র। যখন যে ধর্ম্মের বা জাতির প্রাধান্য হয়, তখন সেই জাতির ধর্ম্ম বা আচার-ব্যবহার হাবভাব অবলম্বন করিয়া তদ্দেশবাসীরা কৃতার্থ হয়।

এক্ষণে পাশ্চাত্য জাতি বড়ই সভ্য জাতি। তাঁহারা কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। একথা সত্য। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতান্তর্গত এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহাতে আর অসি ধরিবার বা বলপ্রয়োগ করিবার আবশ্যকও নাই। ভারতবর্ষের লোকেরা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, তাঁহারা নামে মাত্র হিন্দু বা মুসলমান। কিন্তু তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, হাবভাব, আহারবিহার প্রভৃতি সবই খৃষ্টানদিগের ন্যায়। তাঁহারা কোন কাজ প্রকৃত হিন্দু বা মুসলমানের ন্যায় সম্পাদন করেন না। হিন্দুদিগের কেহ কেহ খাদ্যাখাদ্যের আদৌ বিচার করেন না। মুসলমান, তিনিও তদ্রূপ। পোষাক-পরিচ্ছদ সবই সাহেবী ধরণের। আহারবিহারও তদ্রূপ। তবে তিনি কিসে হিন্দু বা মুসলমান? তিনি তো সর্ব্বতোভাবে খৃষ্টানদিগের ন্যায় চলিতেছেন, তবে

তাঁহাকে খৃষ্টান করিবার আবশ্যক কি? তিনি তো খৃষ্টান হইয়াই আছেন। অতএব দেখা যায়, যখন যে জাতির অভ্যুদয় হয়, তখনই লোকে সেই জাতির আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিতে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ।

যাহা হউক, আমি এক্ষণে উদ্দিষ্ট বিষয় আলোচনা করিব। সুলতান মাহমুদ গজনীর ভারত আক্রমণ ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি কয়েকবার উপর্য্যুপরি ভারত আক্রমণ করেন এবং অতিশয় অর্থ-গৃধ্নু ছিলেন বলিয়া কেবল অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। ইহাই তো ঐতিহাসিক-দিগের কথা। তিনি এতদুপলক্ষে কতকগুলি দেবমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে 'প্রতিমাধ্বংসকারী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দেবমন্দির ধ্বংস করাও অন্যায়। কারণ ইহাতে দেববিদ্বেষী বলিয়া প্রমাণিত হয়। দেববিদ্বেষী হইয়া হিন্দুর দেবদেবী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে একথার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তিনি কাহাকেও বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিলেন কি না, তাহা কেহই উল্লেখ করিলেন না। তিনি কি একজনকেও বলপূর্ব্বক মুসলমান করিতে পারিতেন না? তাঁহার যখন দেবদেবী ধ্বংস করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তখন কি তাঁহার পক্ষে বলপূর্ব্বক পরাজিত হিন্দুদিগকে অনায়াসেই মুসলমান করিবার সুযোগ হয় নাই? কিন্তু কেহই একথা বলিতে পারেন না যে, তিনি এক প্রাণীকেও জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ইতিহাসে দেবদেবী চূর্ণ করার ন্যায় ইহারও উল্লেখ থাকিত। তিনি সোমনাথ-মন্দির ধ্বংস করিয়া সোমনাথ স্বীয় হস্তগত করতঃ একজন হিন্দু শাসনকর্ত্তার হস্তে ঐ প্রদেশের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে দেবমন্দির ধ্বংস করা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। তৎকালে দেবমন্দির বা মুসলমানের মসজিদ একরূপ দুর্গস্বরূপ ব্যবহৃত হইত বলিয়া জানা যায়। যখন কোন বিজাতীয় বিজেতা দেশ আক্রমণ করিতে আসিত, তখন তদ্দেশবাসীরা প্রাণভয়ে দেবমন্দির বা মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিত। সোমনাথ-মন্দির আক্রমণের ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যখন মাহমুদ গজনী সোমনাথ আক্রমণ করেন, তখন বহুসংখ্যক লোক উহার রক্ষার জন্য একত্রিত হইয়াছিল এবং সোমনাথ-মন্দির দুর্গস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠেও জানা যায় যে, সোমনাথ-মন্দির দুর্গের ন্যায় প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত ছিল। এজন্য তিনি দুর্গ অবরোধ করার ন্যায় মন্দির অবরোধ করতঃ ধ্বংস করিয়া থাকিবেন। অতঃপর তিনি অর্থ লইয়াই পলায়ন করেন। তিনি মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অতি যত্নে মক্কা ও গজনীতে প্রেরণ করেন।

এরূপ ঘটনা কি মুসলমানদিগের উপরও ঘটে নাই? আমি ইহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইব যে, মুসলমানদিগের উপরও কিরূপ নিগ্রহ ঘটিয়াছিল। যে সময় সন্ন্যাসীকুলচূড়ামণি ফার্ডিনাণ্ড ও তৎপত্নী ইজাবেলা 'মুর'নামধেয়

মুসলমানদিগকে স্পেন হইতে বহিষ্কৃত করিবার অন্যথা বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিবার আদেশ বাহির করিয়াছিলেন, সেই সময় তিন লক্ষ নরনারী বালকবালিকা একটি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করায়, স্পেনিয়ার্ডগণ কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই মসজিদ বারুদের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়া তিন লক্ষ নরনারী ও বালক-বালিকার প্রাণনাশ করিয়াছিল। এই দৃশ্য যে কিরূপ লোমহর্ষক ও এই ব্যাপার যে কিরূপ গর্হিত তাহা বলা যায় না। এইরূপে মোগলেরাও যখন বোগদাদ ধ্বংস করিয়াছিল, তখন যে কত কত মসজিদ—কত কত সমাধিস্থান ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

সম্প্রতি ইউরোপ মহাসমরেও এইরূপ একটি ব্যাপার ঘটিয়াছে। যখন জার্ম্মানেরা ফ্রান্সের অন্তর্গত রীমস্ নগরে গোলাবর্ষণ করে, সেই সময় তত্রতা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। তদ্ধেতু অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করা অন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মানেরা এই বলিয়া আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিল যে, রীমস নগরের বিশ্ববিদ্যালয় ফরাসিগণ দুর্গস্বরূপ ব্যবহার করিতেছে; অতএব ইহা ধ্বংস করা অন্যায় নহে। এখানে দেখা যাইতেছে, দেবতার স্থান দেবমন্দির বলিয়া ধ্বংস করা যেরূপ অন্যায়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামন্দির বলিয়া ধ্বংস করাও তদ্রূপ অন্যায়। কিন্তু দুর্গস্বরূপ ব্যবহৃত হইলে উপায়ান্তর অভাবে শত্রুপক্ষ তাহা অবরোধ করিতে বাধ্য হয়। আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষের মুসলমানেরা এই হেতুই এইরূপে দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া থাকিবে। কারণ সে সময় দেব-মন্দিরগুলি দুর্গের ন্যায় পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত ছিল এবং দুর্গস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। আর মুসলমানেরা যদি ভারতবাসীকে জোর করিয়াই মুসলমান করিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে হিন্দুর নাম গন্ধও থাকিত না। সকলেই মুসলমান হইয়া যাইত। মুসলমানেরা সার্দ্ধ পঞ্চাশত বর্ষের অধিক ভারতবর্ষে অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বলপ্রয়োগ দ্বারা সমস্ত হিন্দুকেই অনায়াসে মুসলমান করা যায়। কিন্তু এক্ষণে তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ছয় কোটী মুসলমান। হিন্দু মুসলমান হইয়া পুনরায় হিন্দু হইতে পারে না। যদি পুনরায় হিন্দু হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও বিশ্বাস করা যাইত যে, যাহারা প্রাণভয়ে মুসলমান হইয়াছিল তাহারা আবার সুযোগ পাইয়া হিন্দু হইয়াছে। অতএব কিরূপে জানা যাইবে যে, কত হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল! কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা তো হইতেই পারে না। যে একবার জাতিচ্যুত হইল, সে অনন্তকাল জাতিচ্যুত থাকিবে।

পাঠান নৃপতি আলাউদ্দীন সতী পদ্মিনীর জন্য যে অন্যায় করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন এরূপ কথা তো কিছুই উল্লেখ নাই।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

চট্টগ্রামের মুসলমান।

সুপ্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম বাণিজ্যের জন্ত সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহার বাণিজ্য-খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে বণিগ্গণ এখানে আসিয়া বাণিজ্য করিত। ওদিকে সোণার গাঁও, আর এদিকে চট্টগ্রাম বাঙ্গালার মধ্যে বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। আর্ম্মানী, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইহুদী, ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার ও আরব প্রভৃতি জাতীয় বণিকেরা এখানে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন বলিয়া মহাকবি আলাওল তাঁহার রচিত 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যে বারংবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আজও চট্টগ্রাম ভারতের মধ্যে একটা অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থান।

আরব, ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজ বণিগ্গণ এখানে যত আগমন করিতেন, অপর কোন জাতীয় বণিক তত আগমন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। আরবগণের পরে ও ইংরেজগণের পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ (ফিরিঙ্গি) বণিগ্গণ এখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শুধু বাণিজ্যে নহে,দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাহাদের অসীম প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস ও অত্যাচার দমন করিবার জন্ত বাঙ্গালার নবাবকে সময় সময় বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল দেখিয়া তাহারা চট্টগ্রামকে Porte grande (grand port) আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। ইংরেজগণ আসিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত না করিলে, তাহারাই যে এদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই পর্ত্তুগীজগণ এখন "মেটে ফিরিঙ্গি" নামে অভিহিত হইয়া চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থানে নগণ্যভাবে জীবনযাপন করিতেছে।

একসময়ে আরবেরা বাণিজ্যে এবং নৌ-বিদ্যায় অতি উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। 'মৌসুম'-বায়ুর বিষয় সর্ব্বপ্রথম তাঁহারাই অবগত ছিলেন বলিয়া বাণিজ্য-পথ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের নিকটেই উন্মুক্ত হইয়াছিল। এই কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। হস্তিদন্ত, মণি-মুক্তা ও মসলা ইত্যাদির বাণিজ্য করিবার জন্ত তাঁহারা বাণিজ্য-পোত লইয়া ভারত-মহাসাগরের তীরস্থিত নানা বন্দরে গমনাগমন করিতেন। ইস্লাম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই

তাঁহারা বাণিজ্যার্থ ভারতে আগমন করিতেন বলিয়া জানা যায়। সিংহলে হজরত আদমের সমাধি অবস্থিত থাকায়, অনেকে তথায় 'জেয়ারত' করিতেও আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেকেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া সিংহলে থাকিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের বংশধরেরাই 'মোপলা' নামে আখ্যাত।

আরবগণ বাণিজ্যব্যপদেশে এই চট্টগ্রামেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই দলে দলে আগমন করিতেন বলিয়া জানা যায়। চট্টগ্রামের নৈসর্গিক অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া এ দেশেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে আরব্য ভাষার শব্দরাজির * যতটা ভূরিপ্রয়োগ আছে, আর কোন ভাষার শব্দসমূহের ততটা প্রয়োগ নাই। আরবদের সহিত বিশেষ সংস্রব না থাকিলে, এদেশের ভাষায় এত অধিক পরিমাণে আরব্য শব্দ কখনই প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। এসব বিবেচনা করিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আরবদিগের বংশধর।

কেবল ভাষার দিক দিয়া নহে, আরও কয়েকটা কারণে চট্টগ্রামের মুসলমানদিগকে আরবদিগের বংশধর বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। অনেকেই জানেন, আরবদিগের মধ্যে 'সেখ' উপাধির ব্যবহার খুবই বেশী। চট্টগ্রামে উক্ত উপাধিধারী লোকদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তাহাদিগকে সহজেই আরব-

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র শব্দের উল্লেখ করিতেছি। যথা :—

প্রচলিত শব্দ	অর্থ	আরবী শব্দ
ইন্দি	নিকট দিয়া	ইন্দি
বাইন্দুয়ার	ঘরের পিছনের দরজা	বাইনদ্ধার
মোহামস্তা	দরজার খুঁটি	মামনিয়া
খন্দক	গড়খাই	খন্দক
কদ্দা	মাটীর বাটি বা পেয়ালা	কদা
লব্বয়	আহ্বানের জবাব— যেমন 'আজ্ঞা'	লব্বয়েক

সময়ান্তরে আমরা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করিব বলিয়া আজ আর বেশী দৃষ্টান্ত দিলাম না।

সেখদিগের বংশজাত বলিয়া বিনিশ্চিত করা যায়। সকলেই জানেন, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেনের বংশধরগণই 'সৈয়দ্' নামে আখ্যাত। চট্টগ্রামের বহুস্থানেই সৈয়দ্-বংশ বিদ্যমান। তাঁহারা এদেশে পীর বা দীক্ষাগুরুর সম্মানিত কার্য্য করিয়া থাকেন। আরবগণ এদেশে আসিবার সময় তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারতের কথা বলিতে পারি না, বঙ্গদেশে যদি কোথাও খাঁটি ইস্‌লাম বলিয়া কিছু থাকে, তাহা এই চট্টগ্রামে ভিন্ন আর কোথাও নাই। চট্টগ্রামের সীমা পার হইয়া গেলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া লওয়া একরূপ কঠিন ব্যাপার বলিলেই হয়। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের জন্মস্থান-সম্ভাত আরবগণ পৃথিবীর সকল মুসলমান হইতেই বেশী খাঁটি মুসলমান হইবেন, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই। অধিকাংশ লোক সেই আরবদিগের বংশজাত না হইলে, চট্টগ্রামে এতটা ইস্‌লাম-প্রভাব কখনই থাকিতে পারিত না, একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে চট্টগ্রাম সুধু নামে নহে, কাজেও ইস্‌লামাবাদ বটে।

স্ত্রীলোকদিগের 'আবরু'-রক্ষা ইস্‌লামের একটা কঠোর অনুশাসন। সেই অনুশাসনমূলক অবরোধ-প্রথা অদ্যাবধি চট্টগ্রামে যেরূপ কঠোরতার সহিত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, অন্ততঃ বাঙ্গালার আর কোথাও সেরূপভাবে প্রতিপালিত হয় কি না, জানা যায় না। ইহাও আরবদিগের সংস্রবের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

চট্টগ্রামকে 'আউলিয়া দরবেশে'র লীলাস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার এই পর্ব্বত-মেখলা সাগরাম্বা জন্মভূমির গর্ভে একসময়ে বহু আউলিয়া ও দরবেশের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহা ছাড়া দেশ-দেশান্তর হইতে কত সিদ্ধপুরুষ এদেশের শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতে আসিয়াছিলেন, কে তাহার খোঁজ রাখে? একথা লোকপ্রসিদ্ধ যে, সুপ্রসিদ্ধ বদর আউলিয়া সাহেব আসিয়া পরীগণ হইতে একটা চাটির (প্রদীপের) স্থান চাহিয়া লইয়া চট্টগ্রামে লোকাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন ; তাই ইহার এক নাম 'চাটিগাঁও'। ইরাণের অন্তর্গত বোস্তাম হইতে সুলতান বায়োজিদ বোস্তামী আসিয়া এ দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া বার-আউলিয়াগণ অবশেষে এই দেশেই যোগাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ আর কত মহাত্মার নাম করিব? এই সব মহাপুরুষদের প্রভাবেই সম্ভবতঃ এক সময়ে এখানে দরবেশী

ভাবের বড়ই ছড়াছড়ি ছিল এবং বহু পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞ কবির অভ্যুদয় হইয়াছিল। আলিরাজা ওরফে কানু ফকিরের 'জ্ঞান-সাগর' ও 'যোগ কালন্দর,' সৈয়দ্ সুলতানের 'জ্ঞান-প্রদীপ,' মোহম্মদ সফির 'নূর কন্দিল,' সেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ-বিজয়' প্রভৃতি অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থ ঐরকম ফকিরী কথায় পরিপূর্ণ। একদিকে ইহার স্বাভাবিক মনোহারিত্ব, অন্যদিকে আরবদিগের সংস্রবে ইহার পুণ্যময়ত্ব—এই দুই গুণে আকৃষ্ট হইয়াই প্রাগুক্ত মহাত্মগণ সম্ভবতঃ এখানে সাধনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন এ 'মগের মুল্লুকে' তাঁহাদের আগমনের অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

চট্টগ্রাম যে কেবল বাণিজ্যোপযোগী ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, এমন নহে; ইহা জাহাজ-নির্ম্মাণের জন্যও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এবিষয়ে তখন চট্টগ্রাম ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার নির্ম্মিত জাহাজ দেশ-দেশান্তরে গিয়া বাণিজ্য করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। বাষ্পীয় পোত আসিয়া আমাদের দেশী জাহাজগুলিকে এখন একরূপ সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অশিক্ষিত দেশীয় কারিগরেরা যেরূপ নিপুণতাসহকারে বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করিত এবং এখনও করে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে অতি কম খরচেই জাহাজাদি নির্ম্মিত হইতে পারিত। কথিত আছে, এরূপ সুবিধা পাইয়াই তুরস্কের সুলতান চট্টগ্রাম হইতেই জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন। চট্টগ্রামের খালাসী ও লস্করগণের নৌ-চালন-বিদ্যায় দক্ষতা সর্ব্বলোকবিদিত। এখনও এখানকার অনেক মুসলমান বিলাতী জাহাজে 'সারাঙ্গ,' 'টেণ্ডল,' 'মালুম' ও 'লস্করে'র কাজ করিয়া থাকে। আরবদিগের সংস্রবে এবং তাহাদের নিকট হইতেই চট্টগ্রামবাসিগণ এই জাহাজনির্ম্মাণের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে অনেক বেশী। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, হিন্দুগণকে জোর করিয়া মুসলমান করা হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। এরূপ অপবাদ একেবারে ভিত্তিহীন। কেবল জোর-জবরদস্তিতে কোন ধর্ম্ম এতটা প্রচারিত হইতে পারে না। মুষ্টিমেয় ইস্‌লাম-সন্তানগণ কেবল জোর করিয়া পৃথিবীময় তাহাদের ধর্ম্মবিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের উক্তি। জোর করিয়া বরং রাজ্যবিস্তার করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবিস্তার করা যায় না। মুসলমানগণও তাহাই করিয়াছিল। আজ

মুসলমানের গায়ের জোর কোথায় যে, তাহারা বিলাতে, জাপানে ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত ইস্‌লামের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে পারিতেছে? আজ ইস্‌লামের কোন্ তরবারি আফ্রিকায় খৃষ্টান-শক্তি প্রতিহত করিয়া তথাকার লোকদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে? বস্তুতঃ ইস্‌লামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ একেবারে অসার ও বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত। অনেক বিধর্ম্মী লোক ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার কথা নহে; কিন্তু তাহারা জোরে মুসলমান হয় নাই, স্বেচ্ছায়—ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আরব-বণিগ্‌গণ শুধু বাণিজ্য-কার্য্যেই লিপ্ত ছিলেন না, তাঁহারা দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াও বেড়াইতেন। বোগ্‌দাদের খলিফাগণ দেশবিজয়ের জন্য যেমন সেনাদল প্রেরণ করিতেন, ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তেমনই ধর্ম্মপ্রচারকও প্রেরণ করিতেন। চট্টগ্রামেও যে হিন্দু হইতে মুসলমান একেবারে হয় নাই, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। তবে সেরূপ লোকের সংখ্যা এখানে খুব কম। এখানকার বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত বংশ গৌড় হইতে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন এবং অধিকাংশ লোকই আপনাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, এই সকল লোকের মধ্যে অধিকাংশই আরব-বণিক্‌দিগের ও তাঁহাদের সংস্রবে সমাগত আরবীয়দের বংশজাত। অনেক বংশ যে গৌড় হইতে এখানে আগমন করিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার কথা নহে। বলিয়া রাখা উচিত যে, এদেশে সেখ ও সৈয়দ ব্যতীত পাঠান ও মোগল-বংশীয় মুসলমানও অল্প-বিস্তর আছেন। পাঠান টুলী ও মোগল-টুলী প্রভৃতি গ্রামের নাম আজও তাঁহাদের অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে। *

আবদুল করিম।

* (লেখকের অনুমতিক্রমে "মর্ম্মবাণী" হইতে গৃহীত।) অনবধানতা বশতঃ একটা গুরুতর ভ্রম সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে "সোণার গাঁ"র উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা "সোণার গাঁও" না হইয়া "সপ্তগ্রাম বা সাত গাঁও" হইবে। ইতিহাসাভিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীকে তাহা বলিয়া না দিলেও বোধ হয় চলিত।

কারনেজি

—~~~—

মানবহিতৈষী দানবীর কারনেজির জীবনের কথা অতি বিচিত্র। তাঁহার পবিত্র জীবনচরিত পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

কারনেজি আমেরিকার অধিবাসী; কিন্তু স্কটল্যাণ্ড তাঁহার পিতৃভূমি; স্কটল্যাণ্ডের তিনি উজ্জ্বল মণি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের বৎসরে অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কারনেজি জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা বস্ত্রবয়ন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার চারিখানা তাঁত ছিল; অনেকে তাঁহার অধীনে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিত। তিনি একজন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী রূপে লোকের সম্মানভাজন ছিলেন। তৎকালে বাষ্পযন্ত্র চালিত তাঁতের প্রচলন হয়; কিন্তু কারনেজির পিতা এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে অসমর্থ হন এবং তৎকালে তাঁহার ব্যবসায় সাতিশয় অধোগতি লাভ করে।

অতঃপর কারনেজির পিতা উন্নতির আশায় স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকায় গমন করেন এবং পিটস্‌বার্গ নামক নগরে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তত্রত্য একটি তুলার কারখানায় কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কারখানায় বালক কারনেজির শিক্ষানবিসীর সূত্রপাত হয়; তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সে সাপ্তাহিক পাঁচ শিলিং বেতনে কাজ করিতে আরম্ভ করেন।

কারনেজি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া একান্ত সন্তোষলাভ করিলেন এবং পিতামাতার সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি উত্তরকালে আপন প্রথম কাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এইরূপ নিয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রগতিতে বালককে মনুষ্যে পরিণত করে এবং সে বালকের অভ্যন্তরে যথার্থ মনুষ্যত্ব নিহিত থাকিলে তাহাকে প্রকৃত মনুষ্য করিয়া তোলে। যদি কোন বালক অনুভব করে যে, তাহার দ্বারা সংসারের উপকার সাধিত হইতেছে, তবে তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। আমি এই নিয়োগের পর বহু অর্থের কারবার করিয়াছি; কিন্তু অর্থোপার্জ্জন যদি আনন্দলাভের অথবা আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাব—নির্ম্মল সন্তোষ—লাভের হেতু স্বরূপ গণ্য করা যায়, তবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারি যে,

পরবর্ত্তী কালের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ একত্র করিলেও তাহা এক ডলার বিশ সেণ্টের তুল্য নহে। আমি এক সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই অর্থ উপার্জ্জন করিতাম। এই পরিশ্রম এত কঠোর ছিল যে, যদি অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পবিত্র না হইত, তবে সে পরিশ্রমকে দাসত্ব নামে অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি হইত না।"

কারনেজি দীর্ঘকাল এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর প্রাগুক্ত তুলার কারখানায় ইঞ্জিন পরিচালকের কার্য্য লাভ করেন। এই কাজে তাঁহাকে আরও গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। এই সময় হইতেই তাঁহার গুণরাজি বিকাশ-লাভ করিতে থাকে, তাঁহার দৃঢ়তা ও কৌশলজ্ঞতা দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে। কারনেজি কৈশোর কাল হইতেই ভবিষ্য-জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম, আমার আশা ছিল; অভ্যন্তর হইতে কে যেন আমাকে বলিত, তোমার এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না, অচিরেই তোমার উন্নতি লাভ হইবে।"

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে কারনেজি টেলিগ্রাফ বিভাগে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এই পরিবর্ত্তন তাঁহাকে বড় সুখী করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই পরিবর্ত্তন বশতঃ আমি অন্ধকার হইতে আলোকে নীত হইয়াছিলাম,—মরুভূমি হইতে নন্দন কাননে নীত হইয়াছিলাম।" কারনেজি এই কার্য্যে সপ্তাহে বার শিলিং করিয়া প্রাপ্ত হইতেন। তিনি তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের কার্য্য শিক্ষা করিয়া বিশ্রামকাল অতিবাহিত করিতেন। এই সময় একদিন একটি জরুরি সংবাদ প্রেরণ করিবার সময় লোকাভাব উপস্থিত হয়; কারনেজি এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহারা তাঁহাকে বার্ষিক ৬০ পাউণ্ড বেতনে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরকের পদে উন্নীত করেন।

এই সময় কারনেজির পিতা পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কারনেজি পিতৃভবন বন্ধক রাখিয়া একশত পাউণ্ড প্রাপ্ত হন এবং এই অর্থ কারবারে ন্যস্ত করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম সংস্থান। এই প্রথম সংস্থান লাভজনক হইয়াছিল। অতঃপর তিনি যে ব্যবসায়েই অর্থ ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাই লাভজনক দাঁড়াইয়াছে। কারনেজি Speculate করিবার জন্য কখনও ব্যবসায়ে অর্থ ন্যস্ত করেন নাই। তিনি সরলভাবে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যবসায়ে অর্থ ন্যস্ত করিয়া আসিতেছেন এবং এই পথ অবলম্বন করিয়াই ধনকুবের হইয়াছেন।

কারনেজি টেলিগ্রাফ বিভাগের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রেলওয়ে বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎকালে দাসত্ব প্রথা লইয়া আমেরিকায় অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হয়। কারনেজি দাসযুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতরণ করেন নাই; কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। একদা তাদৃশ গুরুতর কর্ত্তব্য পালনে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন, তাঁহার গণ্ডদেশে গভীর ক্ষত হয়। কিন্তু তিনি আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে বহু যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, বুল রান যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় হইলে সৈন্যবৃন্দ পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কতিপয় ব্যক্তি সহকারে সর্ব্বশেষে বুল রান ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। আমেরিকার দাসযুদ্ধে বহু রক্তপাত ও লোকনাশ হইয়াছিল। তাদৃশ দৃশ্য তাঁহার করুণহৃদয় সাতিশয় ব্যথিত করে; তদবধি যুদ্ধের কুফল সম্বন্ধে তাঁহার সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে এবং তিনি সময়ে অসময়ে সর্ব্বদা শান্তির উপকারিতা সম্বন্ধে লোকমত গঠন জন্য যত্ন করিতেছেন।

আমেরিকার দাসযুদ্ধ শেষ হইলে তিনি রেলওয়ে বিভাগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং কতিপয় সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া রেলওয়ের জন্য নিদ্রোপযোগী গাড়ী প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হন। এই কাজে তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ করেন এবং সে অর্থ লইয়া কেরোসিন তৈলের কারবারে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে কেরোসিন তৈলের আবিষ্কার মাত্র হইয়াছিল; লোকে তখনও কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়ের কলকৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। তিনি তাদৃশ অভিনব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অল্পদিন মধ্যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন।

কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়ে কারনেজির বিপুল অর্থাগম হইতেছিল; কিন্তু তাদৃশ বিপুল অর্থাগমও তাঁহার অর্থাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করিতে অসমর্থ হইল। তিনি এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর লাভের আশায় লোহার কারবারে প্রবৃত্ত হইলেন। লৌহের ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশের পূর্ব্বে রেলওয়ে সেতু সকল কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইত। এই সকল সেতু অনেক সময় পুড়িয়া যাইত, সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি লৌহের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া রেলসেতু নির্ম্মাণোপযোগী লৌহ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। কারনেজি তৎকালে যে লৌহ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা অদ্যাপি পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারখানা রূপে পরিগণিত রহিয়াছে। কতিপয় বৎসর পরে ইস্পাত দ্বারা রেলসেতু নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয় এবং কারনেজি অগ্রবর্ত্তী

হইয়া রেলসেতু নির্ম্মাণোপযোগী ইস্পাত প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। লৌহের সঙ্গে ইস্পাত মিলিত হইয়া তাঁহার কারখানাকে অত্যন্ত বহ্বায়তন করিয়া তুলিয়াছে এবং উহা পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানায় পরিণত হইয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই কারখানার মূলধন দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। চল্লিশ সহস্র শ্রমজীবী প্রত্যহ কারখানার কাজে নিযুক্ত থাকিত। কারখানার কাজের নিমিত্ত বিস্তৃত কয়লার খনি এবং দীর্ঘরেলওয়ে ও বহুসংখ্যক বাষ্পীয় পোত ছিল।

এই সময় মরগান ও রাঁকফেলার নামক দুইজন শ্রেষ্ঠ বণিক কারনেজির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসায় একচেটিয়া করিতে মনন করিলেন। তাঁহারা তদর্থ এগার কোটি আশী লক্ষ পাউণ্ড মূলধন সংগ্রহ করিলেন। ইউনাইটেডষ্টেট্সের আট জন শ্রেষ্ঠ বণিক তাঁহাদের সহায় হইলেন। অতঃপর তাঁহারা কারনেজির কারখানা এক কোটি পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কারনেজি তাদৃশ অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও অবিচলিত রহিলেন এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার বিপুল আয়োজন দেখিয়া প্রতিপক্ষ ভীত হইয়া পড়িলেন এবং পাঁচ কোটি পাউণ্ড মূল্যে উক্ত কারখানা বাধ্য হইয়া ক্রয় করিয়া লইলেন।

অতঃপর কারনেজি কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া পিতৃভূমি স্কটল্যাণ্ডে উপনীত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি স্কিবু নামক প্রাচীন দুর্গে বাস করিতেছেন। কারনেজি তাদৃশ জরাজীর্ণ প্রাচীন দুর্গের আমূল সংস্কারসাধন করিয়া তাহাকে সৌষ্ঠবশালী সৌধমালায় পরিণত করিয়াছেন।

কারনেজি কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার অগাধ অর্থরাশি লোকহিতব্রতে উৎসর্গ করিয়াছেন। সে পুণ্যকাহিনী পাঠ করিলে আত্মার কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। কারনেজির একটি কন্যাসন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিলে সংবাদ পত্র সমূহে এইরূপ উল্লেখ করা হয় যে, "সাত কোটি পাউণ্ডের উত্তরাধিকারিণীর জন্ম হইয়াছে।" মানবহিতব্রত কারনেজি এই মন্তব্য পাঠ করিয়া বলেন,—"আমার পত্নী ও দুহিতা অগাধ অর্থরাশি লাভ করিয়া অভিশপ্ত হইবে না। অর্থ মনুষ্যকে পরহিত সাধনের সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে, এইজন্যই অর্থকে সুখদায়ক বলা যাইতে পারে। পরকে সুখী করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখলাভ করা যায়।" তিনি আর একস্থানে লিখিয়াছেন,—"এরূপ দিন

অদূরবর্ত্তী, যখন সঞ্চয়কারী ধনীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না, তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিবে না, তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিবে না। জন-মত এই ভাবে গঠিত হইবে যে, অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া পরলোক গমন আর জনপুঞ্জের অবজ্ঞাভার মস্তকে লইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান ধনাঢ্য ব্যক্তি সমতুল্য বলিয়া অনুভব করিবেন।"

মানব-প্রেমিক কারনেজির যে কথা, সেই কাজ। তিনি পর-হিতার্থ আপনার অগাধ ধনভাণ্ডার অনর্গল করিয়া দিয়াছেন। ধন বিতরণকালে তাঁহার স্বর্ণমুষ্টি আর ধূলিমুষ্টিতে কোন প্রভেদ নাই। তিনি এ পর্য্যন্ত নানা সৎকার্য্যে ন্যূনাধিক চারি কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি আরও তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড বিতরণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দানবীর সম্ভবতঃ মূলধনও দান করিয়া যাইবেন। কিন্তু মূলধন রক্ষা করিলেও তিনি প্রত্যেক বৎসর সাতাইশ লক্ষ পাউণ্ড বিতরণ করিতে সমর্থ।

ইংরেজীভাষী জনপুঞ্জের জন্য সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য। তাঁহার অর্থব্যয়ে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর নানাস্থানে আঠার শত পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। কারনেজির সাধারণ পাঠাগার স্থাপন জন্য অদম্য ইচ্ছা তদীয় পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"আমার পিতা বস্ত্রবয়ন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি আর চারি জন সমব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলিত হইয়া আপন আপন পুস্তক সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠার্থীদের জন্য পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার ক্ষুদ্র তাঁতগৃহের একাংশ পাঠগৃহে পরিণত হইয়াছিল। আমার জন্ম-নগরীতে সাধারণ পাঠাগারের এই প্রথম অনুষ্ঠান। আমার জন্মের অব্যবহিত পরে এই অনুষ্ঠান হইয়াছিল। আমার পিতা আমার জন্ম-নগরীর প্রথম পাঠাগারের অন্যতম অনুষ্ঠাতা ছিলেন, আর আমি তাঁহার পুত্র, সর্ব্বশেষ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমি বস্ত্রবয়ন ব্যবসায়ী পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারী, আমার এই বংশ-পরিচয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।"

বীর-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা কারনেজির আর একটি কীর্ত্তি। যে সকল ব্যক্তি পরহিতার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন অথবা বিকলাঙ্গ হইবেন, তাঁহার পরিজনের অথবা তাঁহার নিজের সাহায্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে সৈন্য রণক্ষেত্রে নর-হত্যা সাধন করে, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বৃত্তি প্রদান করেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি মনুষ্যের জীবন রক্ষা করে, তাহাকে বৃত্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। একজন

বর্ব্বরতার প্রতিনিধি, অপর জন সভ্যতার প্রতিনিধি। মনুষ্যকে বিনষ্ট অথবা বিকলাঙ্গ করা বীরত্ব নহে, জীবের রক্ষা এবং সেবাই প্রকৃত বীরত্ব; এক সময় এই মত সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে। কারনেজি ঈদৃশ মত প্রকাশ করিয়া বীর-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা কল্পে বিপুল অর্থ ন্যস্ত করিয়াছেন।

কারনেজির তৃতীয় কীর্ত্তি শান্তি ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা। কারনেজি যুদ্ধের বিরোধী। যাহাতে পৃথিবী ব্যাপিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তজ্জন্য তিনি দুই কোটি পাউণ্ড দান করিয়াছেন। এই বিপুল অর্থ অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর যে মঙ্গল সাধন করিবে, তাহা অনুধাবন করিলে হৃদয়মন গভীর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

কারনেজির মাতার প্রভাব তাঁহার চরিত্র এবং প্রকৃতি গঠনের প্রধান উপাদান ছিল। তাঁহার মাতা দৃঢ়চিত্ত, মিতব্যয়িতা এবং পরদুঃখকাতরতার জন্য প্রতিবাসীবর্গের নিকট সম্মানের আস্পদ ছিলেন। কারনেজি আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন, তার পর তিনি স্কুলে গমন করেন। বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালে পাঠারম্ভের পূর্ব্বে বালকগণ ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিত। একদা তাহারা বাইবেল হইতে এক একটি প্রবাদ বাক্য আবৃত্তি করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। কারনেজির আবৃত্তির সময় উপস্থিত হইলে তিনি দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমরা পেনি রক্ষা কর, পাউণ্ড আপনা আপনি তোমাদের হস্তগত হইবে।" বালকের হৃদয়ে এই নীতিবাক্য তদীয় মাতা কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তদীয় মাতার যত্নে তাঁহার তরল-হৃদয়ে যে শিক্ষার বীজ উপ্ত হয়, তাহাই কালক্রমে সংসারতাপক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়স্থল ছায়াশীতল মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

কারনেজি অগাধ ধনরাশি উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছেন এবং জীবনের অপরাহ্নে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সে ধনরাশির সদ্ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই সঞ্চিত অর্থ-রাশির সদ্ব্যয় করিতে বিমুখ রহিয়াছেন। এতৎ সত্ত্বেও কারনেজি ধনার্জ্জন ও ধনসঞ্চয়ের সমর্থন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহার বাক্যের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি। ধনাঢ্যের অধিকাংশ অর্থই নির্ধনের উপকার সাধন করিয়া থাকে। ধনী বিলাসে মগ্ন হইয়া অর্থের অপচয় করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার বিলাসের আয়োজন করিতে শ্রমজীবির সহায়তা আবশ্যক। এজন্য তাঁহার অর্থের বিপুল অংশ তাহাদের হস্তগত হইয়া থাকে। ধনী উত্তম গৃহে

বাস করেন, সুখাদ্য আহার করেন, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করেন ; এই সকলের জন্যই শ্রমজীবির সহায়তা আবশ্যক। বস্তুতঃ ধনীর ধনের অতি সামান্য অংশই প্রকৃত পক্ষে অপচিত হয়।

কারনেজি প্রাগুক্ত ভাবে ধনার্জ্জন ও ধনসঞ্চয়ের সমর্থন অন্তে চিত্রের অপর পার্শ্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ধন মনুষ্যের সুখ বর্দ্ধন করে না, বরং তাহার হ্রাস করে। প্রফুল্লহৃদয় ধনী বিরল। পারিবারিক কলহ উপস্থিত হইয়া অনেক সময় ধনীর গৃহ অশান্তিপূর্ণ করিয়া থাকে। অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ এই সকল কলহের মূলীভূত কারণ। যাহারা ধনার্জ্জন এবং ধনসঞ্চয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া থাকে। তাঁহাদের কর্ম্মক্লান্ত দেহমন অবসর অভিলাষী হয়। কিন্তু প্রকৃতি তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রের নাগ-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখে ; তখন জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়ে। ধনার্জ্জন এবং ধনসঞ্চয়ে তাঁহাদের জীবনের আরম্ভ ও ধনার্জ্জন এবং ধন সঞ্চয়েই তাঁহাদের জীবনের শেষ হইয়া থাকে।

কারনেজি কেবল নিজে ধনার্জ্জন ও ধনসঞ্চয় করিয়াই আপন কার্য্য শেষ করেন নাই। যাহাতে প্রতিভাশালী কর্ম্মচারীবৃন্দ ধনাঢ্য হইতে পারেন, তজ্জন্যও সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। তাঁহার যত্ন ও সহায়তায় অন্যূন চল্লিশ জন কর্ম্মচারী ক্রোড়পতি ধনী হইয়াছেন। এই সকল ধনী অদ্যাপি বৎসরান্তে একবার সম্মিলিত হন, কারনেজি তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন।

কারনেজির মতে যৌবনের প্রারম্ভে মনুষ্য যদি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার স্কন্ধে যদি গুরুতর কর্ম্মভার অর্পিত হয়, তবে তাঁহার সদ্‌গুণরাশি অবশ্যই বিকশিত হইয়া উঠিবে। একাগ্রতা সাফল্যলাভের প্রধান উপায় ; কিন্তু সাধুতা সর্ব্বপ্রধান, তারপর পরিশ্রম, সর্ব্বশেষে একাগ্রতা। দারিদ্র্য মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। ধনীর সুখশয্যায় জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্যের পক্ষে ধনার্জ্জন কঠিন হইয়া থাকে। ধনার্জ্জনাভিলাষীকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তিনি সন্তরণ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইবেন, অথবা জলমগ্ন হইয়া মানবলীলা সমাপ্ত করিবেন। *

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

* এই প্রবন্ধটি বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। "কোহিনূরে"র প্রচার সহসা বন্ধ হওয়ায় যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই।—কোঃ সঃ।

ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণের একাংশ।

দিল্লীর সম্রাটগণের ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১২। খোসরু খাঁ।—অবশেষে সেই রাত্রেই খোসরু সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক 'আমীরল ওমরা' ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা আগমন করতঃ খোসরু খাঁকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সকলেই একে একে অধীনতা স্বীকার করিলেন। প্রাতঃকালে অধীনস্থ রাজা এবং সুবেদার ও কাজীদিগের নিকট আদেশ-লিপি প্রেরণ করা হইল। ঐ সঙ্গে মূল্যবান খেলাৎও প্রেরিত হইল। সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু দেবালপুরের * শাসনকর্ত্তা সুলতান তোগলক তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করতঃ আদেশ-লিপি ও খেলাৎ বারংবার পদদলিত করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া খোসরু একদল সৈন্যসহ স্বীয় ভ্রাতা খানখানানকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি তোগলকের হস্তে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

খোসরু সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে

---

* দেবালপুর—জেলা মণ্টগমারীর অন্তর্গত এবং বেয়াস নদের পুরাতন গর্ভে পাকপটনের ২৮ মাইল পূর্ব্বদিকে আওকড়া ষ্টেসন হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কানিংহাম বলেন, রাজা দেওপাল এই সহর স্থাপন করেন; কিন্তু কোন সময়ে এই রাজা বর্ত্তমান ছিলেন ঠিক বলা যায় না। অন্যস্থানে কানিংহাম বলেন, বাতলিমুস যে "ডেদালাহ" সহরের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই দেবলপুর। ফিরোজ শাহ তোগলক এই সহরে একটি নহর খনন করিয়া আনেন এবং একটি জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মোগল-সম্রাটদিগের পূর্ব্বে, দাস ও খিলিজীগণের সময়ে এই সহর পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী ছিল। কারণ ঐ সময় চঙ্গেজ খাঁর সৈন্যগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ভয়ে লাহোর ও মুলতানের মধ্যে এমন একটি সহরের আবশ্যক হয় যে, ঐ সহরে থাকিয়া লাহোর ও মুলতানের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করা যায় এবং অন্যান্য সকল প্রকার দ্রব্যাদির সাহায্য করা হয়। পুরাতন সহরের ভগ্নাবশেষ এখনও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হয়। ইহা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এক সময়ে এই সহর প্রায় তিন মাইল স্থান ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান সহরের লোকসংখ্যা প্রায় চারি সহস্র। তৈমুরের সময় এই সহর মুলতানের সমকক্ষ ছিল। এবং এই সহরে ৮০টি মসজিদ বিদ্যমান ছিল। বাবরের সময়ও এই সহর জনাকীর্ণ ছিল এবং লাহোরাপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না।

লাগিলেন। এবং কোন দেশে কেহ গো হত্যা করিতে পারিবে না এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এই আজ্ঞা প্রচারের পর যদি কেহ গো হত্যা করিত, তৎক্ষণাৎ ঐ গোচর্ম্ম মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তাহাকে ভস্মীভূত করা হইত। হিন্দুগণ গোজাতিকে বিশেষ ভক্তি করেন এবং ঔষধ স্বরূপ উহার মূত্র পান করিয়া থাকেন। গোময় দ্বারা আপন গৃহ এবং দেওয়াল লেপন করেন। খোসরুর ইচ্ছা ছিল যে, মুসলমানদিগের মধ্যেও ঐরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হউক। সেইজন্য সমস্ত লোক তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করতঃ একে একে তোগলক শাহের পক্ষাবলম্বন করিতে লাগিল।

শেখ রুকনুদ্দিন কোরেশী মুলতানীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি তোগলক তুর্কিজাতি মধ্যে "কোরওনা" * ছিলেন। ইহারা তুর্কস্থান ও সিন্ধুর মধ্যস্থলে বাস করিয়া

* কোরওনা বা করয়ানাহ—মার্কপোল লিখিয়াছেন, "তাতারা পুরুষ ও হিন্দুস্থানী স্ত্রীর সংমিশ্রণে যে সন্তান জন্মে তাহাদিগকে করুয়ানাহ বলা হয়। উহারা লুণ্ঠন ও দস্যুতা প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যে দেশের মধ্যে এই জাতীয় সৈন্য গমন করে, সে দেশ শূন্য করিয়া ফেলে।" ঐ ব্যক্তি আপন পিতৃব্যের নিকট হইতে পলায়ন করতঃ একদল করুয়ানাহ সৈন্য সমভিব্যাহারে বাদাখসাঁর পথে কাশ্মীর আগমন করেন এবং লাহোর অধিকার করতঃ তথায় থাকিয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তোগলক সম্বন্ধে ইতিহাস হইতে জানা যায়, প্রথমে মোগলসৈন্যের সহিত দশসহস্র করয়ানাহ সৈন্য অবস্থান করিত। কিন্তু পরে তাহারা দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে। কথিত আছে যে, চীনের উত্তরে করচিদন বা করখিদন নামক পর্ব্বতশিখরে উহারা বাস করে। কর্ণেল বেল বলেন, মার্কপোল এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, উহা ভুল। কিন্তু খোলাছতাহ-অল-তওয়ারিখ প্রণেতা লিখিয়াছেন "পেদেরে সুলতান তোরকে জাদ বা ছম তোগলক আজ্ গোলামান সুলতান গেয়াস-উদ্দিন বলবন ও মাদর বু আজ কওম জঠ পঞ্জাব বুদ"। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বতুতার লেখক 'করুয়ানাহ' অর্থে এই বুঝিয়াছিলেন যে, সুলতান তোগলক দ্বিজাতীয় ছিলেন এবং মার্কপোল 'করুয়ানাহ' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ইহাও ঠিক। ইহাতে আরও বুঝা যাইতেছে যে "তোগলক" এই বাদশার জাতির নাম ছিল না বরং তাঁহার পিতার নাম ছিল। শমছ সেরাজ আফিফ লিখিতে আলস্য করিয়াছেন, নচেৎ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিতাম। তারিখ-ই ফিরোজশাহীর টীকায় লেখা আছে, "আমি তোগলক শাহের বংশাবলী আমার লিখিত "মনাকেবে সোলতান তোগলক নামক পুস্তকে সমস্ত লিখিয়াছি, এই জন্য এখানে দ্বিতীয়বার লিখিলাম না।" কিন্তু ঐ পুস্তকের কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। মুদ্রার উপর "অল-সুলতান অল-গাজী গেয়াস অল-দনিয়া ও অল-দিন আবুল মোজাফ্ফর তোগলক শাহ অল-সুলতান নাছের আমীর অল-মোমে নন" লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার পুত্রের মুদ্রার উপর "অল-মজাহেদ ফি ছেবিল-আল্লাহ্ মহম্মদ বেনে তোগলক শাহ ইয়া অল-রাজি রহমত-আল্লাহ মহম্মদ বেনে তোগলক শাহ" লিখিত আছে। ইহা হইতে

থাকে। তোগলক নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। সিন্ধু প্রদেশে আসিয়া কোন লোকের গৃহে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হন। এই ঘটনা সুলতান আলাউদ্দিনের সময় ঘটে। ঐ সময়ে সম্রাটের ভ্রাতা আওসু খাঁ (আলগ খাঁ) সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তোগলক পূর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার নিকট কর্ম্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি পদাতিকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। আলগ খাঁ তাঁহার বংশ পরিচয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একজন অশ্বারোহীর এবং শেষে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। অবশেষে তিনি ওমরাও মধ্যে পরিগণিত হইয়া বিশেষ গণ্যমান্য হয়েন। আমি মুলতানে তোগলকের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ দেখিয়াছি। ঐ মসজিদে যে শিলালিপি রহিয়াছে তাহাতে খোদিত আছে যে, তোগলক অষ্টাত্রিংশ বার তাতারদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। সেইজন্য তিনি "মালেক-গাজী" নামে অভিহিত হইতেন। সুলতান কুতব-উদ্দিন তাঁহাকে দেবালপুরের শাসনকর্ত্তা এবং তাঁহার পুত্র জুনা খাঁকে "মীর আখওয়ার" * পদ প্রদান করেন। খোসরু মালেকও তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত রাখেন।

তোগলক স্বীয় ত্রিশত বিশ্বাসী সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু অবশেষে মাত্র এই ত্রিশত সৈন্য লইয়া সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া মুলতানের শাসনকর্ত্তা কসলু খাঁর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া এক পত্র লিখেন। মুলতান দেবলপুর হইতে মাত্র তিন মঞ্জেল দূরে অবস্থিত। কসলু খাঁ উত্তর দিলেন—"যদি আমার পুত্র খোসরু খাঁর নিকট না থাকিত, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডে তোমাকে সাহায্য করিতাম।"

মালেক-গাজী অর্থাৎ গেয়াস-উদ্দিন তোগলক ঐ পত্র পাইয়া আপন পুত্র জুনা খাঁকে সমস্ত বিষয় লিখিলেন এবং উপদেশ দিলেন,—"যত শীঘ্র হয় তুমি এবং কসলু খাঁর পুত্র সম্রাটের নিকট হইতে চলিয়া আইস।" জুনা খাঁ পিতার

স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তোগলক কোন জাতির নাম ছিল না পরন্তু উহা গেয়াস-উদ্দিনের নিজের বা তাঁহার পিতার নাম। "তোগলক" শব্দের অর্থ তুর্ক-ভাষায় পার্ব্বতীয়। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন যে, আমি তোগলকের বংশাবলী লাহোর এবং অন্যান্য সহরে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও জ্ঞাত হইতে পারিলাম না।

* মীর আখওয়ার—অশ্বশালার অধ্যক্ষকে মীর আখওয়ার বলা হইত। এই পদটি বিশেষ উচ্চপদ ছিল। সেইজন্য আলা-উদ্দিন খিলিজীর ভ্রাতা স্বীয় পিতৃব্যের সময় মীর আখওয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আখওয়ার বেগও এই পদস্থ অধ্যক্ষকে বলা হইয়া থাকে। গেয়াস-উদ্দিন তোগলকও সুলতান আলা-উদ্দিন খিলিজীর সময় মীর আখওয়ার বা আখওয়ার বেগের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

পত্র পাইয়া অল্প দিবসের মধ্যে কসলু খাঁর পুত্র সহ আপন পিতার নিকট পৌঁছিলেন। *

তোগলক পুত্রের আগমনমাত্র বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলেন। সম্রাট আপন ভ্রাতা খানখানানকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। খানখানান এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং সৈন্যগণ পলায়ন করে। যুদ্ধের যাবতীয় অস্ত্রাদি তোগলকের হস্তগত হয়। অবশেষে তোগলক রাজধানী অভিমুখে গমন করেন। খোসরু স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া সম্মুখীন হন এবং সহরের নিকটবর্ত্তী আছিয়াবাদ নামক স্থানে উভয় দলের যুদ্ধ হয়। সম্রাট রাশি রাশি অর্থ সৈন্যগণকে বিতরণ করেন। শেষে তোগলকের সৈন্যগণ পলায়ন করে। সেই অবসরে খোসরুর সৈন্যগণ তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন মানসে গমন করিলে, তোগলক আপনার তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া সম্রাটের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সে সময় সম্রাটের নিকট অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। আরও একটি কারণে শীঘ্রই আক্রমণকারিগণ সম্রাটকে চিনিতে পারে। হিন্দুস্থানে প্রথা আছে সর্ব্বদা সম্রাটের নিকট ছত্র থাকে। সেইজন্য শীঘ্রই তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। মিশরে ছাতাকে "তিরইয়াকব্বাহ" বলে। কেবল ঈদের দিবস সম্রাট ছত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু হিন্দুস্থান ও চীনে সম্রাটগণ সর্ব্বদা রাজছত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। তোগলক সম্রাটের নিকটবর্ত্তী হইলে উভয় পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ হয় এবং সম্রাটের সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। সম্রাট অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় মস্তকের লম্বা লম্বা কেশ দ্বারা মুখাবরণ করতঃ একটি উদ্যান মধ্যে লুক্কায়িত হন। তোগলক সহরে প্রবেশ করিলে কোতয়াল রাজপ্রাসাদের সমস্ত চাবি তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। তোগলক নির্বিঘ্নে রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন। অবশেষে তোগলক কসলু খাঁকে সম্রাট হইবার নিমিত্ত বিশেষ-

* এই বিষয় অন্য কোন পুস্তকে নাই। কেবল বাদাউনী লিখিয়াছেন যে "মালেক যাজ্ঞদ্দিন জুনা (যিনি পরে সুলতান মহম্মদ তোগলক হন) স্বীয় পিতাকে লিখেন যে, স্থানে স্থানে ডাকচৌকির ঘোড়া রাখা হউক। অতঃপর একদিন রাত্রে মালেক বাহারাম আইবাহ অর্থাৎ মুলতানের শাসনকর্ত্তা কসলু খাঁর পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করেন এবং সরসা নামক যে স্থানে তাঁহার পিতা ছিলেন তথায় পঁহুছেন। তাঁহার পিতা দুই শত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য পুস্তকে সরসা স্থানে ভাটিন্ডায় উল্লেখ আছে। এবং রাত্রি দুই প্রহরের সময় পঁহুছার বিষয়ও ফেরেস্তা লিখিয়াছেন। ইহা হইতে বতুতার লেখার অনেক সমর্থন হইতেছে।

ভাবে অনুরোধ করেন কিন্তু কসলু খাঁ স্বীকার করেন না। কসলু খাঁ তোগলককেই সিংহাসনে উপবেশনার্থ অনুরোধ করিলেন। ভারত-সিংহাসন লইয়া উভয়ে তর্ক হইতে লাগিল। একজন বলেন, তুমি সিংহাসন গ্রহণ কর। অন্য জন বলেন, তুমি গ্রহণ কর। শেষে কসলু খাঁ বলিলেন, "যদি তুমি সিংহাসনে উপবেশন না কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র জুনা খাঁকে সিংহাসনে বসাইব।" অবশেষে তোগলককেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে হইল। আমীরল ওমরাওগণ একে একে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

খোসরু খাঁর হত্যা।—* খোসরু দিবসত্রয় পর্য্যন্ত উদ্যান মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন। চতুর্থ দিবসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া উদ্যান হইতে বহির্গত হইলে উদ্যানপাল তাঁহাকে চিনিতে পারে। খোসরু উদ্যান-রক্ষককে স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করতঃ বলেন, এই অঙ্গুরী বন্ধক দিয়া কিছু আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দাও। উদ্যান-রক্ষক অঙ্গুরী লইয়া দোকানে গমন করিলে, বিক্রেতাগণের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহাকে কোতয়ালের হস্তে সমর্পণ করে। কোতয়াল তাহাকে তোগলকের নিকট লইয়া যায়। তোগলকের নিকট সে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে সম্রাট আপন পুত্র জুনা খাঁকে আদেশ দিলেন যে, তুমি খোসরুকে বন্দি করিয়া আনয়ন কর। জুনা খাঁ তাঁহাকে অশ্বের উপর আরোহণ করাইয়া তথায় আনয়ন করেন। খোসরু সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে আমি ক্ষুধার্থ। সম্রাট তাঁহাকে সরবত প্রদান করিলেন এবং আহার করাইবার আদেশ দিলেন। শেষে নিদ্রান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে দেন। খোসরু তোগলককে বলিলেন, আপনি আমাকে অপদস্থ না করিয়া ভদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিলে বাধিত হইব। তোগলক "নিশ্চয় সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে" বলিয়া আজ্ঞা দিলেন যে, যে স্থানে খোসরু কুতব-উদ্দিনকে নিহত করিয়াছেন, সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বধ কর। এবং যে প্রকারে তিনি কুতব-উদ্দিনের মস্তক ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, সেইরূপে তাঁহারও মস্তক ছুঁড়িয়া ফেলাইয়া দাও। অবশেষে ঐ প্রকারে তাঁহাকে নিহত করা হইলে, তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

মোহাম্মদ হাফিজল হাসান।

---

* বাদাউনীর বর্ণনামত খোসরু খাঁ মালেক-সাদির সমাধি-মন্দিরে লুক্কায়িত ছিলেন এবং ঐ স্থানেই ধৃত হন। উদ্যানমধ্যে তাঁহার ভ্রাতা খানখানান ধৃত হইয়াছিলেন। খোসরু খাঁ ও মালেক-গাজী তোগলকের যুদ্ধ মদিনাহ্ নামক গ্রামের নিকটে হইয়াছিল। "ছায়রল মতাখরিন"-নামক পুস্তকে এই নাম লিখিত আছে। কিন্তু কোন স্থানে যে এই গ্রাম ছিল তাহা জানা যায় না। এই নামের একটি গ্রাম মহেম ও রোহতকের রাজবর্ত্মের উপর রহিয়াছে। দিল্লীর নিকটে ঐ নামের কোন গ্রাম না থাকিলে এই স্থানে যুদ্ধ হওয়াই সম্ভব। কারণ ঐ গ্রামটি গাজী মালেকের রাজবর্ত্মের উপরেই রহিয়াছে।

[নব পর্য্যায়।]

২য় বর্ষ।] চৈত্র, ১৩২২। [১২শ সংখ্যা।

সাহিত্য সেবা।

আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন, বই লিখিলে ছাপাইতে পারি না, তা আর বই লিখিব কি? বই ত অনেক লিখিতে পারি, লিখিয়াছিও অনেক; কিন্তু সে সব যদি চিরকালের মত বাক্সের মধ্যে থাকিয়াই কীটের খোরাক জোগাইল, তাহা হইলে সাহিত্য সেবার এ বিড়ম্বনা ভোগ কেন? যদি বা কোন রকমে একখানা পুস্তক বাহির করা যায়, তাহাও আবার বিক্রয় হয় না। ঐ যথা পূর্ব্বং তথা পরং; প্রেসের মার্কা মারা হইয়া আসিলেও কীটের উদরস্থ হওয়াই সার। এরূপ অবস্থায় সাহিত্য সেবা করিবে কে, আর করিবারই বা প্রয়োজন কি?

এই কথা যতই সত্য ও সন্তাপের কথা হউক না কেন, ইহা কখনও সাহিত্য-রসিকের উক্তি নহে। প্রকৃত সাহিত্যসেবী কাহারও মুখ চাহিয়া বা লাভের আশা করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করেন না। সাহিত্য সেবা তাঁহার স্বভাব ও ধর্ম্ম; তাঁহার আনন্দ ও বিলাস। বিহঙ্গ যেমন প্রদোষ-প্রভাতে বৃক্ষের ডালে ডালে বসিয়া আপন মনে মাধুর্য্যের লহরি তুলে, তটিনী আপন মনে কুলু কুলু স্বনে বহিয়া যায়, কুসুম-বালা মলয়-সমীরে হেলিয়া দুলিয়া সুষমা বিস্তার করে, প্রকৃত সাহিত্যিকও সেইরূপ আপন মনে ভাবের রাগিণী তুলেন ও রসের মধুচক্র নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। তিনি ভাবের সমীরে ভাসেন ও চিন্তার তলে ডুবিয়া যান। আপন মনে গান বাঁধেন ও আপন মনেই গান করেন।

কেহ তাঁহার কথা শুনিবে কি না, তাঁহার লেখা কেহ পড়িবে কি না, পুস্তক বিক্রয়ে লাভ হইবে কি ক্ষতি হইবে, লেখা পড়িয়া কে কি কথা বলিবে, এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সাহিত্য-রসিক প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করেন না। তিনি লিখিয়াই সুখী। ধর্ম্মাচরণের মত রসবোধই তাঁহার পুরস্কার। আর কেহ পড়িবে কি না পড়িবে সেজন্য তিনি আদৌ ব্যস্ত নহেন। লাভ-ক্ষতির গণনা তাঁহার মাথায় মুহূর্ত্তের তরেও স্থান পায় না। অর্দ্ধ আলো ও অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ভাব-সুন্দরীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সাহিত্যসেবী যে অপূর্ব্ব সুষমা সন্দর্শন করেন—ভাষায় সে সুষমাকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়া তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন—নব নব তত্ত্বের ধারণা ও উদ্ভাবনায় তিনি যে গভীর সুখ উপভোগ করেন, তাহার নিকটে যশের মালা ও কাঞ্চন-কিরীট তুচ্ছ পদার্থ।

সাধু-সাধকদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী স্বীয় রূপ ও রত্নের শোভা-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া সমুদয় সুখ-সোহাগের পসরা লইয়া তাঁহাদের চরণতলে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহারা সে সুখ, শোভা ও সোহাগ পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রকৃত সাহিত্যিক সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। সাধু-সাধক ও কবি-সাহিত্যিক একই ধাতুতে গড়া। আনন্দ তাঁহাদের আহার, আনন্দ তাঁহাদের বিলাস। আর কিছুরই তাঁহারা ভিখারী নহেন। তাঁহারা যে স্থানে বাস করেন, সে স্থান গুপ্ত ও নিভৃত, অজ্ঞাত ও অন্ধকার। লোকের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি সেখানে কখনও পতিত হয় না। কাঞ্চন-দীপ্তি ও যশের ধ্বনি কখনও সেখানে পৌঁছিতে পারে না। তাঁহারা উভয়েই ছিন্ন কাঁথায় শয়ন করিয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখেন। অবহেলা ও দারিদ্র্যে দগ্ধ হইয়া চন্দন তরুর ন্যায় তাঁহারা প্রেম, জ্ঞান ও আনন্দের সুগন্ধ বিস্তার করেন। লাভা-লাভের গণনা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না।

দরবেশ পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় গুপ্ত হইয়া বিভুর ধ্যান করেন; তাঁহার অন্তরে অনুক্ষণ যে অমৃতের ধারা উৎসারিত হয়, তাহা পান করিয়া তিনি মত্ত ও মহীয়ান। কম্বল তাঁহার বস্ত্র, ধূলি তাঁহার শয্যা; কিন্তু সম্রাটের মণি-মুকুট ও সিংহাসন তাঁহার নিকট তৃণবৎ উপেক্ষার বস্তু। সাহিত্যিকও সর্ব্বদা দৈন্য ও দুঃখের মধ্যে বাস করেন। তাঁহাকে কখনও ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি রাজধানীর কোন কোটরবৎ কক্ষে দেখিতে পাই, কখনও তিনি পল্লীর কোন অজ্ঞাত নিভৃত কোণে কালযাপন করেন। কখনও তিনি অন্ধ—; ভিক্ষা তাঁহার

উপজীবিকা; কখনও প্রস্তর তাঁহার আহার্য্য বস্তু। তাঁহার ক্ষীয়মাণ সম্পত্তি উত্তমর্ণের করতলগত, তাঁহার গৃহ অভাবের আর্ত্তনাদে শ্মশান, তাঁহার পত্নী-লোচন সর্ব্বদা ভ্রুকুটি মাখা, পুত্র-কন্যার মুখে অনশনের ম্লান রেখা; কিন্তু কিছুতেই তিনি বিচলিত নহেন।

রোগের যন্ত্রণা, অভাবের তাড়না, লাঞ্ছনার বেদনা তাঁহাকে আরও নিবিড় করিয়া আপনভাবে ডুবাইয়া দেয় ও আপন গৌরবে ফুটাইয়া তুলে। তাঁহার চোখে ভাবের কি মাধুরি খেলে, তাঁহার মাথায় চিন্তার কি আলো জ্বলে, তাঁহার হৃদয়ে মধুর কি প্রবাহ চলে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। ভাব ও চিন্তার নব নব রূপ দেখিয়া তিনি হাসিয়া আকুল হন। তাহাদের অঙ্গে নব নব পোষাক পরাইয়া ও নব নব মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি রোমে রোমে যে হর্ষ অনুভব করেন, তাহার নিকটে জগতের সমুদয় সুখ নগণ্য; সমুদয় দুঃখ পুষ্পের আঘাত। দুঃখের আগুন যত জ্বলে, ভাব ও চিন্তার আনন্দমূর্ত্তি ততই তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়া গভীরতর আনন্দ প্রদান করে।

সাহিত্যিক প্রকৃতির কুম্ভকার। তিনি কুম্ভ বিক্রয় করেন না—কুম্ভ নির্ম্মাণ করেন। প্রকৃতির মুখে যে বিচিত্র সুষমা আছে, মানব মনে ভাবের যে বিচিত্র রাগিণী আছে, মানব জীবনে সত্যের যে বিচিত্র বিকাশ আছে, সমুদয় পার্থিব চিন্তালেশ শূন্য নির্ম্মল নির্দ্দোষ ক্রীড়ারত হাস্যময় বালকের নাচিয়া নাচিয়া বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতি ধরার মত সেই সমস্ত নানাবর্ণের ভাব, চিন্তা ও সত্য ধরিয়া ভাষার মূর্ত্তি প্রদান করাই তাঁহার কাজ; এই কাজ করিয়াই তিনি সুখ শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেন। ইহা তাঁহার নেশা; ইহা করিতে না পারিলে কিছুতেই তাঁহার শান্তি নাই।

সাহিত্য সেবা নেশা; প্রকৃত সাহিত্যিক মাতাল। যিনি পুস্তক লিখিয়া টাকার আকাঙ্ক্ষা করেন বা যশের আশায় বই লিখেন, তিনি ভূয়ো সাহিত্যিক। অভাব বা অনাদরের সামান্য তাপেই তাঁহার মেকিত্ব ফুটিয়া উঠে; তিনি বকিতে বকিতে সাহিত্য-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

পতঙ্গ যেমন প্রদীপে পুড়িয়া মরে, মরিয়াই সুখ পায়, মেঘ দেখিলে ময়ূর যেমন নাচে, আর চাতক আকাশপানে ছুটিয়া যায়, সাহিত্যিকও তেমনি অজ্ঞাতসারে সাহিত্য-চিন্তায় ডুবিয়া যান ও অনন্যমনে সাহিত্যের সাধনা করেন। সাহিত্য-চর্চ্চা বিশ্রাম সময়ের আলাপ নহে, জীবনের সাধনা। কিন্তু সেই

সাধনা কেবল সাধনা নহে—আনন্দের সাধনা, স্বভাবের প্রেরণা। সাহিত্যিক নেশায় মাতিয়া সে সাধনা করেন এবং সাধনা করিয়া আনন্দ পান। প্রজাপতি বিচিত্র রঙ্গের ডানা মেলিয়া মলয়-সমীরে উড়িয়া বেড়ায়, তিনিও মাধুরি ফুটাইয়া ভাব-সমীরে ক্রীড়া করেন। তিনি সকল সময়েই সাহিত্য-চিন্তায় মগ্ন থাকেন। কি সুখে কি দুঃখে, কি উপবনে কি বিপিনে, কি অনিলে কি আগুনে, সর্ব্বদাই তাঁহার মনে ও মাথায় ভাব ও চিন্তার উর্ম্মিমালা খেলিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অজস্র আনন্দ-কিরণ তাঁহার উপরে নৃত্য করিতে থাকে। ভাষায় ভাবের একটি রেখাপাত করিয়া—রসের একটি পংক্তি রচনা করিয়া, দর্শন ও ইতিহাসের একটি নবতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করেন। এই সুখের নেশা তাঁহাকে পাগল করিয়া রাখে, তিনি পুষ্পপ্রবিষ্ট মক্ষিকার মত আত্মহারা হইয়া আনন্দ-মধু পান করেন; অন্য চিন্তা করিবার তাঁহার অবসর নাই। সাহিত্য তাঁহার সাধনা ও সাহিত্য তাঁহার বিলাস।

সুতরাং ছাপাইতে পারি না বা বিক্রয় হয় না বলিয়া পুস্তক প্রণয়নে ক্ষান্ত হওয়া, এমন কি প্রবন্ধ প্রকাশেও পরাঙ্মুখ হওয়া কখনই সাহিত্যিকের কার্য্য নহে। যিনি সাহিত্যিক, লিখিতে না পারিলে তাঁহার নিদ্রা হইবার কথা নাই। আমাদের সমাজে এমন সত্য সাহিত্যিক—এমন মনের সম্রাট—আছেন কি না জানি না। যদি তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে আমাদিগের অন্ধকার বিদূরিত হইবার বিলম্ব নাই। দুঃখের অন্ধকারে তাঁহারা হয়তঃ গুপ্ত থাকিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত রত্নরাজি আজ না হয় কাল এই পতিত সমাজকে উজ্জ্বল গৌরব-আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। কিন্তু তাঁহারা আসিয়াছেন কি না সে সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ বিদ্যমান। তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক-রাজি অর্থাভাবে অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের ভাব ও চিন্তার আভা হইতে সমাজ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাঁহারা অল্পায়তন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, অথবা স্বপ্রণীত পুস্তক হইতে অংশ বিশেষ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারেন। তাহারও নিদর্শন পাইনা কেন? নবপর্য্যায়ে "কোহিনূর" বৎসরাধিক সুপরিচালিত হইয়াছে, "আল ইসলামে"র প্রকাশও এক বৎসরের উপর হইতে চলিল, কিন্তু তাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না কেন? তাঁহাদের প্রবন্ধ বা পুস্তকের অংশ বিশেষ এই দুই খানি কাগজে অনায়াসে

প্রকাশিত হইতে পারিত ও পারে। কিন্তু তাঁহারা কোথায়? কৈ-সে আকুল উন্মাদনা ও নেশার বশে নব নব রঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন দান? আলো ও বাতাসে বাহির হইবার জন্য রেশম-কীটের আঘাতের উপর আঘাত—তাহা কোথায়? কোথায়?

কোথায়? প্রাণের মধ্যে ক্রন্দন শুনা যায়, তাঁহারা নাই—আসেন নাই তাঁহারা—সে ভাবের প্রজাপতি, চিন্তার মক্ষিকা ও আনন্দের পতঙ্গ। আসিলে ও থাকিলে তাঁহাদের বর্ণ অবশ্যই ফুটিয়া উঠিত। দৈন্যের পেষণ তাঁহাদিগকে শুষ্ক করিয়া রাখিতে পারে না। অবহেলার অন্ধকার তাঁহাদিগকে আনন্দের খেলা হইতে বিরত করিতে সমর্থ নহে। রোগ-শোকের যন্ত্রণা তাঁহাদের রসের নেশা ভাঙ্গিয়া দিতে সক্ষম নহে।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী।

ভাগ্যদোষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দূতী-সংবাদ।

কলেজ ষ্ট্রীটে—নং ছাত্রাবাসে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে। বেচারী বিনোদকে লইয়া একটা শক্ত রকম ঝকমারী বাধিয়াছে। কেহ বলিতেছে "মহৎ আশ্রমে দুইদিন নইলে ছাড়্‌ব না", কেহ বলিতেছে "তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে", কেহ বা "বিদ্যাবতী রসবতী ইত্যাদি"।

কলেজ হইতে বাসায় আসা মাত্রই 'বৃন্দা দূতী' তিন 'তস্‌লিম' করিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

'বৃন্দাদূতী'র আসল নাম হইতেছে, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বি, এ ক্লাসের ছাত্র। খুব লম্বা পুরুষ, বয়সের বার্দ্ধক্য থাকিলেও দাড়ি গোঁফের বিকাশ হয় নাই। তাহার বিশেষ গুণ পরের পত্র—বিশেষতঃ অন্যের স্ত্রীর পত্র চুরি করিয়া পড়া এবং সর্ব্বত্র সে কথা বলিয়া বেড়ান। এইজন্য তাহার সাধারণ উপাধি 'বৃন্দাদূতী'। সম্প্রতি 'ষ্টারে' 'বেনজীর বদরেমুনীর' প্লে দেখিয়া আসিয়াছে, তাই কথায় কথায় তস্‌লিম করিয়া থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাই বৃন্দাদূতী, আজ আবার কি করে বসেছ?

বৃন্দা। কর্ম্মচিত্রি।

আমি। ব্যাপার খানা কি,—শুনি না?

বৃন্দা। মস্ত বড় বৌয়ের সঙ্গে বে' ঠিক হয়ে গেছে।

আমি। বাঃ, মেঠাই খাওয়াও।

বৃন্দা। দূর পাগল; আমার নয়, বিন্নুর।

আমি। তাতে তোমার অত লম্ফ ঝম্ফ কেন?

বৃন্দা। আরে রাম,—খাওয়া আদায় না কোরে ছাড়ব্?

আমি। খাওয়া না দিলে বুঝি পায়খানায় গেলে বাইরে শিকল দেবে?

বৃন্দা। তা দেখা যাবে এখন, শিকল দিই কি তোমার দশা করি।

আমি একবার এই মহাপ্রভুদের কৃপায় বড় লজ্জিত হইয়াছিলাম। আমাকে জব্দ করার যে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা আমি বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না। একদিন বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গল্প সল্প করিতেছি, এমন সময় 'বাটুল' আমার পকেট হইতে অতি গোপনীয় একখানি পত্র বাহির করিয়া ফেলিল। সে কি যে-সে পত্র,—স্ত্রীর সচিত্র প্রেমপত্র—বাঁকা বাঁকা মেয়েলী অক্ষরে কবিতায় লেখা। বৃন্দাদূতী রাগরাগিণীর সংযোগে পত্রখানি পাঠ করিল।

হাসির একটা তুফান আরম্ভ হইল। আমি যে আদৌ বিবাহই করি নাই, কেহ সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না। তারপর পত্রের এই অংশটুকু—

"হৃদয় চিরিয়া যদি দেখাবার হত।
দেখাতেম প্রাণনাথ ভালবাসি কত॥"

প্রভুরা যখন তখন আবৃত্তি করিয়া আমাকে এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল যে, অবশেষে একটি অজপুত্র উৎসর্গ করিয়া তাহাদের কুদৃষ্টি ছাড়াই।

যাহা হউক, শ্রীমান বৃন্দাদূতীর সঙ্গে আলাপ করিতেছি, এমন সময় "মহেশ দা" রান্নাঘর হইতে ও—উ করিয়া একটি সুদীর্ঘ ঢে'ক দিয়া উঠিলেন।

বৃন্দা দৌড়িল, বাটুল দৌড়িল; অনেকেই রান্নাঘরে উপস্থিত। সর্ব্বনাশ! মহেশ দা সবগুলি জলখাবার উদরসাৎ করিয়াছেন।

কেহ বলিল মারো, কেহ বলিল পেট চের, কেহ বলিল দাড়ি ছেঁড়। তখন মহেশ দা যোড় করে সবিনয়ে বলিলেন, "মহাশয়গণ, মাফ্ করবেন্। আমি বিন্নুর ভেবে সব খেয়েছি। ফেরত চান কাল প্রাতে দেব। ও—উ—"।

সমস্ত বৈকাল যেগে নানারূপ কৌতুক চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহেশ দা ধরণীতলে।

বিনোদের সহিত আমার খুব ভাব। সন্ধ্যাকালে উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যি তোর বে' নাকি রে, বিনোদ?"

বিনোদ। সত্যি, কাকা লিখেছেন।

আমি। মহাত্মাদের দুষ্টুমি নয় ত? আঁখরগুলি তোর কাকার হাতের, ঠিক দেখেছিস?

বিনোদ। হাঁ, তাতে সন্দেহ নেই।

আমি। কোথায় ঠিক হ'ল?

বিনোদ। কেষ্টনগর। কালিদাস মুন্সীর মেয়ের সঙ্গে।

আমি এ পাত্রী অনেকবার দেখিয়াছি। কন্যা একটুও সুন্দরী নহেন। মনে মনে দুঃখিত হইলাম; মুখে বলিলাম "তা বেশ ত, বে' করগে। কিন্তু খবরটা এরা পেল কোত্থেকে?"

বিনোদ। বৃন্দাদূতী পত্রখানি চুরি করিয়া ঢোল দিয়াছেন।

তারপর কথায় কথায় বৈদ্য কায়স্থদের মধ্যে কে বড়, এই প্রসঙ্গ লইয়া বাদানুবাদ করিতে করিতে বাসায় ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, এক মহাকাণ্ড উপস্থিত।

মহেশ দা আপনার নিভৃত কক্ষে কৃত্রিম টেবিলে ভর দিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন,—প্রণয়িনীর নিকট পত্র লিখিতেছেন। সম্মুখে কয়েকখানি পুস্তক খোলা রহিয়াছে,—তন্মধ্যে 'রাজা ও রাণীর' "আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর মত বাসিও" এবং 'পদ্মার' "ঝর্ ঝর্ শাঙণ নিশীথে পশে গো সে বিদ্যুৎ হইয়া" ইত্যাদি লাল কালিতে দাগ দেওয়া।

সুরেশ ও সুরেন্দ্র চুপি চুপি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। কেরোসিনের বাক্স রচিত মহেশ দার্ শিরীষকোমল শয্যা হইতে সুরেশ অতি সতর্কতার সহিত একটি বাক্স লইয়া আসিল, সুরেন্দ্র একটি আনিল,—আরও একটি,—আরও একটি। মহেশ দা যে বাক্সটিতে উপবিষ্ট ছিলেন, কেবল সেইটি ব্যতীত সব-গুলি বাক্সই চুরি হইয়া গেল। মহেশ দা ত স্ত্রীর পত্র লইয়াই ব্যস্ত, কিছুই জানিতে পারেন নাই। একটু আরামের জন্য যেই শয্যায় আশ্রয় লইবেন,—অমনি পপাত ধরণীতলে।

হাস্য-কোলাহলে ছাত্রনিবাস মুখরিত হইয়া উঠিল। মহেশ দার দোয়াত ভাঙ্গিল, চিঠিপত্র অপহৃত হইল। তিনি রাগ করিয়া বলিলেন, "যাও, তোমাদের মত বদলোক কোথাও দেখি নাই।"

একজন বলিল 'মেঠাই খাও।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহা প্রস্থান।

লুচি, সন্দেশ, বালুসাই, রাবড়ী,—ঢের আমদানি হইয়াছে। বিনোদ ভোজ দিয়াছে, অথবা দিতে বাধ্য হইয়াছে।

বৃন্দা লুচি চিবাইতে চিবাইতে বলিল,—'বৌয়ের লক্ষ্মীর দৃষ্টি হউক'। সারদা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া বলিল, "বেঁচে থাক বিনোদচন্দ্র চিরজীবী হয়ে"। কালা দেবেন বলিল, "তুমি প্রতি বছর বে' কর, আর আমরা এম্নি মেঠাই খাই।"

হঠাৎ একটা তর্ক বাধিয়া গেল, রাঢ়ী বড় কি বারেন্দ্র বড়? একদল বলিল, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে আরশুলাও পাখী— * * রায়ও কবি।

অন্যদল বলিল—"রাঢ়ী হাড়ী সমস্মৃতঃ"; অর্থাৎ স্মৃতি বলেছেন, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হাড়ী চণ্ডালের সমান।

একজন বলিল, "বেঙ্গলী" বড্ড হুজুগে। কথায় কথায় দেবনাথ 'অমৃত বাজার'কে জুচ্চোর বলিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিয়া রমেশ বলিল, 'তুমি কি সুরেন বাড়ুর্য্যের বাহন?'—পিছন হইতে ডিক্সনারীর উপর তেরেকেটে তাল কাটিয়া সজোরে হটাৎ চাপড় সহ হীরেন্ জিজ্ঞাসা করিল, "সতীশ 'প্রবাসী'তে প্রমথবাবুর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ পড়েছিস্?"

সতীশ। পড়েছি, কাকে কটাক্ষ—

এমন সময় মতি নরেশের চিবুক ধরিয়া বলিল, "তোরে ছেড়ে বিবি হামি দেশে নাহি যাবে।" অর্থাৎ মতি ও নরেশবাবু এক রুমে থাকেন; এ পর্য্যন্ত টাকা না আসাতে উভয়ে বাড়ী যাইতে পারিতেছেন না; কলেজ বন্ধ হইয়াছে।

আমি বিনোদকে বলিলাম, "বেশী দেরী নেই, এই বেলা তৈয়েরী হও।"

আজ রাত দশটার ট্রেণে আমি ও বিনোদ বাড়ী যাইব। মেসে একটা রব উঠিল, "এবার বিনোদের মহা প্রস্থান।"

ষ্টেশনে রওনা হইব এমন সময়—'বাদলা' ওরফে হারাণ মুখুটী কিঞ্চিৎ পদরজঃ লইয়া সহসা আমাদের কপালে মাথাইয়া বলিল,—"দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, হতভাগা পামর শুম্ভ-নিশুম্ভের দল।"

হো হো করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

ছাত্র-জীবন বড় সুখের।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

টিকি ও টাক।

বাড়ীতে আমার মন টিকিল না। ঘরে কেহ নাই, একমাত্র মা সম্বল,—তিনিও গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। কথা বলি এমন লোক পাই না।

কৃষ্ণনগরে আমার পিতার মাতুল থাকিতেন। তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। মাকে বলিয়া কয়েক দিনের জন্য সেইখানে গেলাম।

দাদা মশাইর বাড়ী পৌছিয়া দেখি, তিনি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান সূর্য্যকে ডাকিতেছেন,—

"আদিত্যং প্রথমং নাম্নি দ্বিতীয়ন্তু বিভাকরং
তৃতীয়ো ভাস্করঃ প্রোক্তঃ—"

আমি পশ্চাৎ হইতে বলিলাম,—

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং।"

তিনি বিস্মিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আরে খোকা এসেছিস নাকি?"

আমি। আজ্ঞে না, আমি এখনো বাড়ী শুয়ে ঘুমুচ্ছি।

এমন সময় ঠাকরুণদিদি আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। আমি বলিলাম, "পেন্নাম হই"—"থাক্ পেন্নাম টেন্নাম, একশ বচ্ছর পরমায়ু হোক, নোয়ার খাড়ু হয়ে ছেরজীবি থাক্।"

"তবে ত গেছি"।

খুব আদর ও যত্নের সহিত এই বৃদ্ধ দম্পতীর গৃহে কতিপয় দিবস থাকিলাম। বাল্যকালেই আমার মস্তকের কতকগুলি চুল পাকিয়া গিয়াছিল। এজন্য দাদা মশাই সর্ব্বদাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন, "অঙ্গং ললিতং পলিতং মুণ্ডং"। আর তাঁহারা ছোটকালে যে আমাকে খোকা বলিতে অভ্যাস করিয়াছেন, অদ্য আমার এই পরিণত বয়সেও তাঁহারা সে বুলি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

গৌরীদাস মুন্সী দাদামশাইর প্রতিবেশী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম কালিদাস। কালী কৃষ্ণবর্ণ, গৌরী গৌরবর্ণ,—কালীর মাথায় সুবৃহৎ টিকি,—

গৌরীর মাথায় মস্ত টাক্। সাধারণতঃ লোকে বলিত "টিকি মুন্সী" ও "টাক মুন্সী"। টিকির কন্যার সহিত আমাদের বিনোদের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। 'টাক মুন্সীর'ও একটি বয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা আমাকে ধরিয়া বসিলেন। দিদিঠাকরুণ ও দাদামশাই এ বিষয় যথেষ্ট ওকালতী করিলেন। "দেবে থোবে" ভাল,—মারও মত হইল। পাত্রী দেখা আবশ্যক হইল না। কারণ আমি পাত্রীকে হাজার বার দেখিয়াছি, একটু আধটু আলাপও আছে। পাত্রী সুন্দরী, বেশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিকের বৌ কলাগাছ।

এক তারিখে আমার ও বিনোদের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

অদ্য শুভ রাত্রি। আমি লোকটা কিছু বেরসিক; কাজেই সুরসিকা মহিলাগণ আমার ধারে বেশী আসেন নাই। সব ঝুকিয়াছেন বিনোদের ঘরে, বিনোদ ভায়াও তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণপণে রসিকতা করিতেছেন। কতকক্ষণ পরে বিনোদের একটি গান শুনিলাম,—যদিও তিনি চিরকাল গাইতে অনভ্যস্ত—

"যদি বারণ কর তবে গাহিব না,
যদি সরম লাগে তবে চাহিব না,
যদি বিরলে মালা গাঁথা, সহসা পায় বাধা
তোমারি ও ফুলবনে যাইব না।"

আমি ভাবিলাম, অমন কাল মুড়ি বৌ পেয়ে বিনুর এত স্ফূর্ত্তি কেন? তখন একটু অহঙ্কারের সহিত স্বীয় ভার্য্যার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া ডাকিলাম "ও মরুভূমির মরীচিকা।"

শ্রীমতী ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া দিলেন। কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশ! এ যে বিষম কালো, বিশ্রী চেহারা—হায় হায়!

স্থির করিলাম, এটা টিকি ও টাকের শক্ত জুয়াচুরি—দাদামশাইরও ভাগ আছে। রাগে শরীরটা গর গর করিতে লাগিল।

যাহা হউক, বাস্তবিক ঘটনা বুঝিতে বেশীক্ষণ দেরী হইল না। কালিদাস মুন্সীর কন্যা খুব সুন্দরী, কিন্তু আজন্ম আমি তাহাকে গৌরীদাস মুন্সীর কন্যা স্থির করিয়া আসিয়াছি। পক্ষান্তরে গৌরীদাস মুন্সীর কুৎসিতা কন্যাকে কালিদাস

মুন্সীর কন্যা ভাবিয়াছি। বোধ হয়, উভয় ভ্রাতার বর্ণগত পার্থক্য হইতে আমার এ সংস্কার জন্মিয়াছিল। সেইজন্যই বেচারী বিনোদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু বাঁদরের আপদ বেড়ালের ঘাড়ে চাপিল। ইহা অপেক্ষা ভাগ্যদোষ আর কি হইতে পারে ?

নিজের মস্তক নিজে মুণ্ডন করিয়াছি, দোষ দিব কাহাকে ? কেহ ত আমাকে এ ভ্রান্ত সংস্কার জন্মাইয়া দেয় নাই। দাদা মহাশয়ের উপর কিছু ক্রোধ হইল, কিন্তু তাঁহারই বা দোষ কি ?—ষাট বছরের বুড়ো সৌন্দর্য্যের বোঝেই বা কি ; আর তাঁহাদের ত মত, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। বিশেষতঃ তিনি ত আর আমাকে পাত্রী দেখিয়া লইতে নিষেধ করেন নাই, অথবা অপছন্দ হইলেও বিবাহ করিতে বলেন নাই।

প্রাণটা ছটফট্ করিতে লাগিল। সারা জীবন যাহাকে লইয়া কাটাইব, সেই হইল কুৎসিতা।

সেই নিশীথে—সেই দুঃখের মুহূর্ত্তে এক বৈরাগী মোটা সুরে গাহিতেছিল,—

নিশার স্বপন ওরূপ যৌবন

গুরুর চরণ শুধু ভরসা।

এ জীবনের নাইরে আশা—

* * * *

নববধূকে লইয়া বাড়ী আসিলাম। যাহারা বৌ দেখিতে আসিল, তাহারা একবাক্যে বলিল—"কার্ত্তিকের বৌ কলাগাছ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রূপে কালী গুণে লক্ষ্মী।

কয়েক দিন পরে মা বলিলেন, বৌটি বড় লক্ষ্মী, সংসারের ষোল আনা কাজ জানে।

একদিন শ্রীমতী আমার শরীরের একটা মাপ লইলেন, তিন চার দিন পরে দেখি, আলনার উপর একটি সুন্দর জামা রহিয়াছে।

আর একদিন তাহার স্বহস্ত নির্ম্মিত এক জোড়া কারুকার্য্যময় কার্পেটের জুতা উপহার পাইলাম। আর একদিন দেখিলাম, তাহার হাতের লেখাগুলি বড় সুন্দর। ভাল কবিতা লিখিতে পারে।

মা বলিলেন—রূপে কি করে গুণ যদি থাকে।

বি. এ. পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম, পাস হওয়ার কোন ভরসাই ছিল না। হঠাৎ গেজেটে নাম বাহির হইল, লোকে বলিল, "বৌএর কপাল!"

কোন হৌসে একটা ভাল চাকরী খালি ছিল। প্রাপ্তির সম্ভাবনা একরূপ না থাকিলেও আবেদন করিয়াছিলাম। ডাকে একদিন নিয়োগ পত্র আসিল—লোকে বলিল,—"বৌটার ঘোর কপাল"।

আমি বলিলাম,—'বেশ!'

অনেক দিন পরে বিনোদের একখানা পত্র পাইলাম। পত্র খানিতে তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অনেক অপ্রীতিকর কথা ছিল। পত্রের এক অংশ এইরূপ—

"স্ত্রীটা এমন ঝগড়াটে মার সহিত একেবারেই বনেনা; ছোট ভাই-বোন গুলিকে দেখিতে পারে না। এতখানি বয়স হইয়াছে, একটাও গৃহকর্ম্ম শিখে নাই। আমার সহিত দা কুড়ুল সম্পর্ক,—রূপে ছাই" ইত্যাদি।

ভাগ্যদোষে বিবাহের সময় বদল হইয়াছিল, এখন বদলাইয়া লইলে কেমন হয়?

প্রিয় পাঠক বিচার করুন, ভাগ্যদোষ কাহার? আমার না বিনোদের?

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

চট্টগ্রামের মুসলমান।*

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ।)

চট্টগ্রামের মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই যে আরব বণিকদিগের বা তাঁহাদের সংস্রবে সমাগত আরবদিগের বংশজাত, পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা সে কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক যে গৌড় হইতেই এখানে আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা সে কথারও উল্লেখ করিয়াছি। চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশগুলির

* লেখকের অনুমত্যনুসারে "মর্ম্মবাণী" হইতে গৃহীত।

আদি বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে আমাদের উক্তরূপ সিদ্ধান্তের সমীচীনতায় কেহই সন্দিহান হইতে পারিবেন না। সে সকল বিবরণ সংগৃহীত হইলে কেবল চট্টগ্রামের মুসলমানগণেরই ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে, এমন নহে; তাহা দ্বারা চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। প্রাদেশিক ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে কোন দেশের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলা যাইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা চট্টগ্রামের বড় বড় মুসলমান বংশগুলির বিবরণ-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সকল বিবরণের মধ্যে যে অনেকটা কল্পনার লীলা, অতিরঞ্জনের ঘটা ও অসত্যের সংমিশ্রণ আছে, তাহা কিছুতে অস্বীকার করা যায় না। তাহা হইলেও, তন্মধ্যে কতটা সত্য ও কতটা মিথ্যা বিজড়িত রহিয়াছে, এই সুদীর্ঘ স্মরণাতীত কাল পরে তাহা বাছিয়া লইবার উপায় নাই। তথাপি একটা বিষয়ে আমাদের পথ পরিষ্কার প্রতিভাত হইবে অর্থাৎ যাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছি, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ তাহা প্রতিপন্ন হইতে কোন বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। আজ আমরা ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর (Nanupur) গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ আজগবি শাহের বংশের বিবরণ প্রদান করিব।

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের একতম সহচর মহাত্মা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক মক্কা নগরীতে জন্মপরিগ্রহ করেন। হজরতের তিরোধানের পর তিনিই মোস্লেম জগতের খলিফা-পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র গাজী আবদুর রহমান ছিদ্দিকীকে রাখিয়া তিনি অমরধামে প্রস্থান করেন। কথিত আছে, মোহাম্মদ ছিদ্দিকী নামক জনৈক পুরুষ উক্ত গাজী সাহেবেরই বংশে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে আবির্ভূত হন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় অনুচর ও শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে মক্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে গৌড় বা জিন্নত নগরে পদার্পণ করেন। সম্ভবতঃ ধর্ম্মপ্রচারার্থই তিনি ঐস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। এ দেশের উৎকৃষ্ট জলবায়ু ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া ঐস্থানেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার অসাধারণ গুণ-গরিমার পরিচয় পাইয়া গৌড়ের তৎকালীন বাদশাহ নবাব মুনায়েম খাঁ বাহাদুরের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। কথিত আছে, উক্ত নবাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকীর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ও মহামারিতে গৌড় নগর ধ্বংসমুখে

পতিত হইলে, উক্ত ছিদ্দিকী সাহেব সপরিবারে গৌড় নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক চট্টগ্রামে আগমন করিয়া পটীয়া থানার অন্তর্গত সারোয়াতলী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আবু সৈয়দ তাঁহার একমাত্র পুত্র। আবু সৈয়দের পুত্র শাহ আবু জায়েদ। তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ ইমামুল হক ছিদ্দিকী অতিশয় শিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং নবাব সায়েস্তা খাঁর পীর বা ধর্ম্মগুরু ছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ হইতে তিনি বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

শাহ ইমামুল হক ছিদ্দিকীর দুই পুত্র—গরিব উল্লা খাঁ ছিদ্দিকী ও মোহাম্মদ আলি খাঁ ছিদ্দিকী। গরিব উল্লা খাঁর তিন পুত্র—মোহাম্মদ দৌলত, জমসের চৌধুরী এবং আহাম্মদ বক্শ্ চৌধুরী। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে গরিব উল্লা খাঁর ১ম পুত্র দৌলত ও ২য় পুত্র জমসের চৌধুরী কোন কার্য্যোপলক্ষে কুমিল্লায় গমন করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এদিকে গরিব উল্লা খাঁ ও মোহাম্মদ আলি খাঁর মৃত্যু হয়। শাহ ইমামুল হক ছিদ্দিকী, তাঁহার পৌত্র আহামদ বক্শ্ ও আবদুল নবিকে সঙ্গে লইয়া ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত কেফায়েত নগর ও কৃষ্ণনগর গ্রামে আপনার দানপ্রাপ্ত জমিদারীতে গমন করেন। তাঁহার তথায় থাকিবার ইচ্ছা হওয়ায়, উক্ত গ্রামদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটি ছোট পাহাড়ে তিনি আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় সাধনভজনে নিরত হইলেন। তদীয় পৌত্রদ্বয়ও তথায় তাঁহার সাহচর্য্যে ও পরিচর্য্যায় রহিয়া গেলেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে শাহ ইমামুল হক পরলোকপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত পাহাড়েই সমাধিস্থ হন।

ইহার কিছুদিন পরে আবদুল নবি ছিদ্দিকীও ফকির হইয়া যান এবং লোক-সমাজে আজগবি শাহ নামে পরিচিত হন। আহামদ বক্শ্ চৌধুরী জমিদারীর শাসন সংরক্ষণ করিতেন। আজগবি শাহ অকৃতদার; সুতরাং নিঃসন্তান ছিলেন। আজগবি শাহ ও আহামদ বক্শ্ চৌধুরী পরলোকগত হইলে, শেষোক্ত চৌধুরীর পুত্র মোহাম্মদ আনওয়ার চৌধুরী সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি শাহ ইমামুল হকের দরগাহ্ ছাড়িয়া তাঁহার ১০।১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র শাহ মোহাম্মদ চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া নিকটবর্ত্তী নানুপুর গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। শাহ ইমামুল হক ও আজগবি শাহের সমাধি এবং মস্জিদ্ আজও প্রাগুক্ত পাহাড়ে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মোহাম্মদ আনোয়ারের পুত্র শাহ্ মোহাম্মদ চৌধুরী অতি বিজ্ঞ ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর পরিত্যক্ত মস্জিদের খয়রাত ও অপর

জমিদারী ব্যতীত তিনি নানুপুর গ্রামে আরও অনেক ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহের আমলে শাহ্ ইমামুল হক ও আজগবি শাহের দরগাহ্ এবং মস্‌জিদের জন্য ৯৯নং জিম্মা আজগবি শাহ নামকরণে এক জায়গীর বা খয়রাত প্রদত্ত হয়। শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী উক্ত সম্পত্তির মতোয়াল্লী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মৌলবী দেওয়ানত আলী ছিদ্দিকী মতোয়াল্লী ছিলেন।

এইরূপে শাহ মোহাম্মদ চৌধুরীর বংশধরগণ জায়গীরের উপস্বত্বদ্বারা বহুদিন পর্য্যন্ত বেশ স্বচ্ছন্দ অবস্থায় ছিলেন। কালের কুটিল গতিতে এখন সে সকল সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব রেজা খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিয়া বহু জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ চারলটন সাহেব কেফায়েত নগরে অবস্থিত মহাল আজগবি শাহ-সম্বন্ধে-প্রদত্ত সনদের বৈধতা স্বীকার করেন। আজগবি শাহকে প্রদত্ত জায়গীর-সম্বন্ধে আরও একখানি সনদ লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। উক্ত সনদসমূহ এখন চট্টগ্রামের 'কালেক্টরী'তে সংরক্ষিত আছে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব রেজা খাঁ প্রায় সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেও উপযুক্ত রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া তৎসমুহ পুনরায় উক্ত বংশীয়দিগকে প্রদান করিয়াছেন। মৌলবী দেওয়ানত আলীর দুই পুত্র, মৌলবী আমান আলী ও মৌলবী কলিম উল্লার মধ্যে সদ্ভাব না থাকায়, মামলা-মোকদ্দমায় তাঁহারা ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়েন। তাহাতে মহাল আজগবি শাহ ব্যতীত আর সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইয়া যায়। এই সামান্য সম্পত্তির বার্ষিক আয় হইতেই বর্ত্তমানে উক্ত মস্‌জিদ্ ও সমাধির যাবতীয় ব্যয় ও মালীকদিগের সংসারযাত্রা কোনরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই বংশেরই একজন মিঞা আমিনুর রহমান ছিদ্দিকী সাহেব এখন চট্টগ্রাম সদর মুনসেফী আদালতের সেরেস্তাদার। তাঁহার ভ্রাতা মৌলবী মফজ্জলর রহমান সবরেজিষ্টার-পদে এবং মৌলবী হাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী সাহেব হাটহাজারী থানার কাজীর পদে নিযুক্ত আছেন। পর পৃষ্ঠায় ইহাঁদের বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।

আবদুল করিম।

মোহাম্মদ ছিদ্দিকী
শাহ আবু ছৈয়দ
শাহ আবু জায়েদ
শাহ ইমাদুলহক
গরিব উল্লা খাঁ
মোহাম্মদ আলি খাঁ
আবদুল নবি ওরফে আজগবি শাহ
মোহাম্মদ দৌলত চৌধুরী
ইঁহার বংশ কুমিল্লা বটগ্রাম প্রকাশ শুয়াগাজি গ্রামে বিদ্যমান আছে। মৌলবী তফজ্জল আহাম্মদ চৌধুরী ওরফে আনু মিঞা সাহেব বর্ত্তমানে বিখ্যাত জমিদার।
মোহাম্মদ জমসের চৌধুরী
ইঁহার বংশ কুমিল্লা বাশপাটা গ্রামে বর্ত্তমান আছে।
আহামদ বক্শ চৌধুরী
মোহাম্মদ আনওয়ার চৌধুরী
শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী
মৌলবী দেওয়ানত আলী
(জজের উকীল ছিলেন)
মৌলবী আমান উল্লা
মৌলবী কলিম উল্লা
(মুন্সেফীর উকীল ছিলেন)
মুন্সী আহাম্মদ রহমান
মৌলবী হাফিজুর রহমান
মুন্সী মখলেছর রহমান
মিঞা আমিনুর রহমান
(সেরেস্তাদার)
মুন্সী আজিজর রহমান
মৌলবী মফজলুর রহমান
(সব রেজিষ্টার)